আর্য্যাবর্ত্ত।

মাসিক পত্র

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সম্পাদিত।

প্রথম বর্ষ।

২য়

প্রথম খণ্ড।

(বৈশাখ হইতে আশ্বিন।)

১৩১৮

প্রকাশক—শ্রীদুর্গানাথ বসু।

১০৬।২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

প্রথমখণ্ড।

গ

ভ

ম

য

য়

র

ব

শ

স

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী।

প্রথমখণ্ড।

চিত্রসূচী।

———



By courtesy of Babu Rakhal Das Banerji.

বৈশাখ।

ঘুচাতে হৃদয়ের কাল।
আমি আসিয়াছি আজি, রিক্ত করি' তরুরাজি,
[illegible]
রুক্ষ করি' ভূধর [illegible] বয়োজল,
গগনে উড়ায়ে ধূলিজাল।

২

আসিয়াছি এবারও তপন।
ভাল মলয়ের বাস, কোকিলের কল ভাষ,
যুগে যুগে মধুপ-গুঞ্জন।
অলস মধুর গতি, নাহি ফিরে প্রজাপতি,
বিলাসীর বিলাস এখন।

৩

আনিয়াছি—জীবন, মরণ—
রুদ্রতেজ ঝঞ্ঝাবাত, কঠোর করকাপাত,
কৃষ্ণ মেঘ বিদ্যুৎ-কেতন,
দীপ্ত দিবাকর-কর, স্নিগ্ধ-ছায়া জলধর,
বজ্র-জ্বালা স্নিগ্ধ বরিষণ।

৪

আনিয়াছি সৃজন, বিনাশ;
পুরাতনে পদে দলি, নূতনে গঠিতে চলি
করি, সর্ব্বহিত—সর্ব্বনাশ,
কঠোর করুণাহারা, বিগলিত স্নেহ-ধারা
রুদ্র-স্নিগ্ধ যুগল বিকাশ।

৫

রুদ্ররূপে মোর আবাহন।
বিষম বিষাণ-রবে, চকিতে চমকি' সবে,
প্রলয়ের করি আয়োজন;
সেই মরণের মাঝে, নূতন জীবন রাজে
বিনাশের অরুণ-কিরণ।

৬

আমি রুদ্র—কঠোর [illegible]
মোর বক্ষে স্নিগ্ধ ধারা, [illegible]
[illegible]
আনিয়াছি সৃষ্টি, লয়, জয় আর পরাজয়,
আনিয়াছি জীবন-মরণ।

পুরাতন প্রসঙ্গ।*

আজ প্রথমেই পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন—"রামেন্দ্র বাবুর 'বিজ্ঞানে পৌত্তলিকতা' প্রবন্ধ পড়িয়াছি। লেখা আমার ভালই বোধ হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু এ রকম ভাষা পছন্দ করিতেন না। গম্ভীর প্রবন্ধের মধ্যে 'লেনা দেনা' ও ঐ রকম চলিত কথা তিনি ক্ষমা করিতেন না।

"দেখ, ব্যাকরণ-দুষ্ট ভুল শব্দ ভাষার মধ্যে কেমন স্থান পায় সে বিষয় চিন্তা করিলে বেশ আনন্দ অনুভব করা যায়। এই 'পৌত্তলিকতা' শব্দটাই দেখ না কেন। সংস্কৃত ভাষায় 'পুত্তলিকা' নাই, 'পুত্রিকা' আছে। প্রাকৃত পুত্তলিকা সংস্কৃত ব্যাকরণের দৌলতে রূপান্তরিত হইয়া 'পৌত্তলিকতা' প্রাপ্ত হইয়াছে। রামেন্দ্র বাবুর বহুপূর্ব্বে এই শব্দ ভাষায় প্রবেশলাভ করিয়াছে। রামমোহন রায়ের 'পৌত্তলিক প্রবোধ' প্রবন্ধই এই উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিতেছে।

"আমার মনে হয়, সংস্কৃত শব্দের মধ্যে phonetic decayর চিহ্ন যেন এখনও সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে। একটা শব্দ দেখ না,—'কালিন্দী'। আমার যতদূর স্মরণ হয়, যমুনার একটি নাম কালিন্দী অমর-কোষেও আছে। আমি অনুমান করি যে, ঐ শব্দটি 'কালী নদী' এই দুইটি শব্দের একীকরণে সমুদ্ভূত হইয়াছে। যমুনার কালো জল দেখিয়া উহাকে কালী নদী বলা বিচিত্র নহে। এই কালী নদী কালক্রমে phonetic decayর দরুণ কালিন্দী রূপ ধারণ করিয়াছে। ক্রমে লোকে ভুলিয়া গেল যে, কালিন্দী কালী নদীর অপভ্রংশমাত্র। শব্দটির জন্মকথা নূতন করিয়া কল্পিত হইল; গঙ্গার ন্যায় তাহাকে গিরিসুতা কল্পনা করাই সঙ্গত বোধ হইল। কালিন্দী দাঁড়াইল 'কলিন্দ-গিরিনন্দিনী।' আবার দেখ,—বাঙ্গালা 'অপরূপ' শব্দ সংস্কৃত 'অপূর্ব্ব' হইতে প্রাকৃত 'অপূরবের'র (বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে দেখিতে পাইবে) ভিতর দিয়া পাওয়া গিয়াছে।

"পুরাতন সাহিত্যের আলোচনা করিতে বসিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের আসন খুব উচ্চে। আমার যখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স, তখন আমার সহিত কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রথম আলাপ হয়; প্রথম পরিচয় ঠিক কেমন করিয়া কোন্ সময়ে হয়, তাহা এখন আমার স্মরণ নাই।

* অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পূর্ব্বস্মৃতি।

তাঁহার বাড়ীর দোতালায় একটি Debating Club ছিল, আমি সেই সভার সভ্য হইয়াছিলাম। সেই স্থানে ৺কৃষ্ণদাস পালের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। এখনও আমার বেশ মনে আছে, যেদিন কৃষ্ণদাস পাল commerce সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন, ইংরাজিতে তাঁহার সেই বক্তৃতা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তখন যদিও আমি ছেলে মানুষ, ইংরাজি বক্তৃতার ভাবটা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ, তথাপি মনে হইল যে, এই লোকটি একদিন বড় লোক হইতে পারিবে। আমিও প্রবন্ধ পাঠ করিতাম, কিন্তু বাঙ্গালায়। আমি ছেলে মানুষ বলিয়াই হৌক বা আর কোনও কারণেই হৌক, প্রবন্ধগুলির জন্য আমি প্রশংসা পাইতাম। একদিন আমার একটি প্রবন্ধের আলোচনা হইতেছিল,—কি বিষয়ে সে প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল, এখন আমার স্মরণ নাই, বোধ হয় বিধবা-বিবাহের উপর, —এমন সময় একজন সভ্য বলিয়া উঠিলেন—'ছেলে মানুষের প্রশংসা ক'রে ক'রে রাত কাটান যাবে নাকি?' কালী সিংহ সভার নাম দিয়াছিলেন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'; দুষ্ট লোকে তাহার নামকরণ করিল 'মদ্যোৎসাহিনী সভা'। তিনি সভার patron গোছ ছিলেন। কখনও কোনও প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন কি না, মনে পড়ে না। মধ্যে মধ্যে সভ্যদিগের ভোজনাদির ব্যবস্থা হইত; আমি কিন্তু কখনও আহারাদিতে যোগদান করি নাই।

"বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তিনি অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। মহাভারতের অনুবাদ বিদ্যাসাগরের প্ররোচনায় হইয়াছিল, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বিদ্যাসাগর এই কার্য্যে ব্রতী করিয়াছিলেন; যে পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা মহাভারত অনূদিত হইয়াছিল, তাঁহারাও বিদ্যাসাগরের লোক। সেকালে সমস্ত বড়লোক বিদ্যাসাগরের অনুগত ছিল। পাইকপাড়ার রাজারা তাঁহার কথায় উঠিতেন বসিতেন; তাঁহার কথায়, কোনও security না লইয়া তাঁহারা এক ব্যক্তিকে তিন লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সময় বিদ্যাসাগরের যখন টাকার দরকার হইল, তিনি টাকার অভাব রাজাদের নিকট জ্ঞাপন করিলে তাঁহারা বলিলেন,—'আপনার টাকার দরকার হইতে পারে, একথা পূর্ব্বে বলেন নাই কেন? তাহা হইলে কিছু রাখিতাম। নগদ টাকা সব খরচ করিয়া ফেলিয়াছি।' বিদ্যাসাগরের মুখে প্রসঙ্গক্রমে এই কথা আমি শুনিয়াছি। সাহিত্যের দিক্ দিয়া যদি দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, এই পাইকপাড়ার রাজারা মাইকেল

বন্ধুবর্গের [illegible] poison ছিলেন। [illegible] পতিত হয়।

"বিদ্যাসাগরের প্রতি এই যে ভক্তি, ইহার একমাত্র কারণ যে তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষ, তাহা নহে। অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি বিশিষ্ট কারণ আছে, যাহার উল্লেখ করিলে আমাদের বাঙালীর চরিত্রগত একটা দোষ প্রকটিত হইয়া পড়িবে। যে সময়ের কথা আমি বলিতেছি, সে সময়ে এটা বেশ বোঝা যাইত যে, 'সাহেবদের' কাছে বিদ্যাসাগরের খুব প্রতিপত্তি ছিল বলিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট তিনি অত খাতির পাইয়াছিলেন। 'সাহেবদের' নিকট প্রতিপত্তি না হইলে বাঙালী মানুষের মূল্য বুঝিতে পারে না। মুখে না বলি, কিন্তু মনে মনে সাহেবদের বড় বলিয়া মানি, তাঁহাদের শিল মোহরের ছাপ না থাকিলে জিনিষের মূল্য হয় না।

"আবার খুব বোঝা যে, বিদ্যাসাগরেরও সময়ে সময়ে আশঙ্কা হইত যে, পাছে আর কোনও বাঙালীর 'সাহেবদের' কাছে তাঁহার চেয়েও বেশী প্রতিপত্তি হয়। পূর্ব্বে আমি যে তাঁহার literary jealousyর কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মূলে যে এইরূপ একটা কারণ নিহিত ছিল না, এ কথা বলা যায় না। তিনি কাহারও নিকট মাথা হেঁট করিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এইটুকু দৌর্ব্বল্য ছিল, এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। 'সাহেবদের' নিকট আপনার জাহাইবার চেষ্টা যে তিনি [illegible] করিয়াছিলেন, একথা আমি বলিতেছি না; তবে তাঁহার বিদ্যাগৌরবে 'সাহেব'-সমাজে যে প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তাহা তিনি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

"কালীপ্রসন্ন সিংহের দোষ নহে, পাইকপাড়ার রাজাদের দোষ নহে, দোষ দিতে হয় সমস্ত বাঙালী জাতিকে দাও। Mrs. Besant হিন্দুয়ানির ব্যাখ্যা করিলেন, বাঙালী সমাজ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি দরিদ্র হিন্দুর তীর্থস্থানে হিন্দু কলেজ স্থাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, হিন্দু রাজন্যবর্গ টাকা ঢালিয়া দিল, প্রকাণ্ড কলেজ স্থাপিত হইল। এই যে ভাব, ইহা আমাদের জাতীয় অবনতির একটা অপরিহার্য্য প্রমাণ।

"যৌবনেই কালীপ্রসন্নের মৃত্যু হয়; বোধ হয় আমি তাঁহার সমবয়স্ক ছিলাম। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার কতকটা নৈতিক অবনতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার যৌবনের মত ছিল না। বোধ হয়, তিনি purse-proud ভাব কতকটা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তিনি যেমন তাঁহার



কালীপ্রসন্ন সিংহ।

Printed by K. V. Seyne & Bros.

purseএর সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন, তেমন আর কেহই জানিত না। যেদিন Revd. Mr. Longএর মোকদ্দমার রায় প্রকাশ হইবার কথা ছিল, সেদিন কালীপ্রসন্ন আদালতে উপস্থিত ছিলেন ; হাজার টাকা জরিমানা হইবা-মাত্রই তিনি তৎক্ষণাৎ সেই জরিমানার টাকা—আদালতে দাখিল করিয়া দিলেন। কেহ তাঁহাকে টাকা লইয়া যাইবার পরামর্শ দেন নাই। আমরা কেহই জানিতাম না যে, তিনি মনে মনে এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়া-ছিলেন।

"মহাভারত তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ। রাধাকান্তের শব্দকল্পদ্রুমের পার্শ্বে কালীপ্রসন্নের মহাভারতের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বলিয়াছি, তিনি বিদ্যাসাগরের কথায় এই বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার নিজেরও higher nobler sympathies যথেষ্ট ছিল ; লেখাপড়ার দিকে ঝোঁক, লেখাপড়ার প্রচারের একটা প্রবল বাসনা ছিল।

"তাঁহার 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র অবশ্যই প্রতিভার কোনও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু গ্রন্থখানির মূল্য আছে। রচনা সম্বন্ধে একটি কথা তোমাদের মনে রাখিতে হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত-বহুল রচনার বিরুদ্ধে একটা revolt হইয়াছিল। বোধ হয়, ১৮৫৪।৫৫ খৃষ্টাব্দে রাধানাথ সিক্‌দার 'মাসিক পত্রিকা' নামে একখানি কাগজ বাহির করেন, তাহাতে অনেক চলিত কথা ব্যবহৃত হইত। একটা প্রবন্ধের মধ্যে 'Xenophon থেকে ভাজা' এই শব্দযোজনা ছিল। বিদ্যাসাগর হাসিতেন। 'মাসিক পত্রিকা'র সহযোগী সম্পাদক ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। তিনি তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলালে' সেই tendencyর চূড়ান্ত করিয়া যায়েন। তাহার পরে যখন এই দুই বিরুদ্ধ ভাবের সামঞ্জস্য সঙ্ঘটিত হইল, বাঙ্গালা সাহিত্য নূতন আকার ধারণ করিল—নূতন বল সঞ্চয় করিল। সাহিত্যরথ বঙ্কিমচন্দ্র হইতে সাহিত্যরথ রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলেই আমাদের সাহিত্যের ভাষায় সেই সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিলেন।

"হুতোম প্যাঁচার মধ্যে যথেষ্ট লোকজ্ঞতা ও পরিহাস-রসিকতা প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক স্থলেই তখনকার ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কটাক্ষপাত আছে। পাথুরিয়াঘাটার কোনও ধনী প্রবীণ বয়সে নিজের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের বিদ্রূপ-বাণ তাঁহার উপর বর্ষিত হইল, নক্সায় পাথুরিয়াঘাটা 'ছুঁড়িঘাটা'র রূপান্তরিত

হইল। মাহেশে রথের সময় বাচখেলা, মেয়ে মানুষ সঙ্গে লইয়া দ্বাদশ-গোপাল দেখিতে যাওয়া ইত্যাদি তিনি নিপুণ হস্তে চিত্রিত করিয়াছেন। ইংরাজেরা ঠাট্টাপ্রসঙ্গে যাহাকে 'Arry বলে, অর্থাৎ যে সকল সামান্য লোক ইয়ার্কির উপলক্ষে বেইস্তার হইয়া নানা প্রকার বাঁদরামি করিয়া থাকে, সস্তায় আমোদ করিবার চেষ্টা করে, নক্সায় সেই প্রকৃতির লোকদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও বঙ্গসমাজে এইরূপ লোক দেখিতে পাইবে।

"Satire হিসাবে হুতোম প্যাঁচা যে খুব effective হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। But as an early specimen of that type of writing it deserves not to be forgotten ; এবং রুচিহিসাবে হুতোম ঈশ্বর গুপ্তের ও 'গুড় গুড়ে ভট্‌চার্য্যি'র লেখার চেয়ে অনেক অংশে শ্রেষ্ঠতর। 'প্রভাকরে'র সম্পাদক এবং 'ভাস্করে'র সম্পাদক নিভাঁজ খেউড় গাহিতেন, ধাপার মাঠে ছাড়া আর কুত্রাপি ঐ সকল লেখার জায়গা হইতে পারে না। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ওরফে গুড় গুড়ে ভট্‌চার্য্যি যে 'রসরাজ' রচিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অপাঠ্য। কিন্তু সে সময়ে ধনীর আসরে, বিষয়ী লোকের বৈঠক-খানায় এই সকল রচনা পঠিত হইত। বিকৃতরুচি সমাজের মধ্যে এই সকল রচনা উপভোগ্য হইয়াছিল।

"বিদ্যাসাগরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ ? তিনি এই একটানা কুরুচির স্রোতের বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া কি করিতে পারেন ? নব্যদলের মধ্যে তাঁহার পসার প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল বটে, কিন্তু প্রাচীন বনিয়াদি বড় লোকের আসরে তিনি কি করিতে পারেন ? তথায় সুরুচির দোহাই দিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে অপদস্থ হইতে হইত।

"কিন্তু unconsciously সাহিত্যে উৎকট কুরুচি হইতে সুরুচির দিকে যে transition আরব্ধ হইয়াছিল, বিদ্যাসাগর তাহাতে কতকটা, সহায়তা করিয়াছিলেন। সচেষ্ট ভাবে একটা reform movement যে করিতে হইয়াছিল, তাহা নহে। এই transitionএর ইতিহাস চাহ ? ঠিক ইতিহাস দিতে পারিব না, তবে কয়েকটি কথা বলিতে পারি।

"বিদ্যাসাগর যখন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তখনই যে তাঁহার সাহিত্যিক হিসাবে খাতির হইয়াছিল, তাহা নহে। তিনি বালকদিগের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিতে ব্যস্ত ছিলেন, সমাজের কুরুচিব্যাধি দূর করিবার

জন্য সচেষ্ট হইবার অবসর তাঁহার ছিল না। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গেসঙ্গেই যে সমাজের ও সাহিত্যের রুচি মর্জ্জিত হইবে, ইহা তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল। অত কথায় কায কি, স্বভাবকবি ধীরাজ বিধবা-বিবাহের আন্দোলনের সময় বিদ্যাসাগরের নামে যে গান রচনা করিয়াছিল, সে গানটি এত রুচি-বিগর্হিত ও অশ্লীল যে তাহা পত্রিকায় মুদ্রিত করা অসম্ভব। কিন্তু বিদ্যা-সাগর ধীরাজকে নিজের বাড়ীতে ডাকাইয়া বলিতেন 'ধীরাজ, একবার সেই গানটা গাও ত।.সেই যে,'বিদ্যাসাগরের বিদ্যে বোঝা গিয়েছে'। ধীরাজ অমনই সভার মধ্যে গান ধরিত, 'বিদ্যাসাগরের বিদ্যে বোঝা গিয়েছে'; গানের অন্যান্য চরণগুলি এখনকার রুচিহিসাবে অপাঠ্য, অশ্রাব্য। এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ যে, সে সময়ে সমাজের বায়ু কিরূপ দূষিত ছিল। কোম্‌ৎ যে intellectual sanitationএর কথা বলিয়াছেন, আমাদের সমাজে সে দিকে কাহারও দৃক্‌পাত ছিল না।

"কিন্তু বিদ্যাসাগরের সময় যে নব্য-যুবক-সম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল, তাহাদের মানসিক স্বাস্থ্য অনেকটা সবল ও পরিপুষ্ট হইতে পারিয়াছিল। কেশব সেন যখন আসিলেন, তখন transition হইয়া গিয়াছে।

"মহারাণী ভিক্টোরিয়ার গভর্মেণ্ট যখন আরব্ধ হইল, তখন হইতে লোকের মন রাজনীতির দিকে ঝুঁকিল। সভায়, debating clubএ, বৈঠকখানার আসরে রাজনীতির চর্চ্চা হইতে লাগিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে আমি যখন Presidency Collegeএ প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি, তখন আমা-দের একটা debating club ছিল। তখন আমাদের কলেজের প্রথম-বার্ষিক শ্রেণী ৺রামকমল সেনের বাড়ীর (এখনকার এল্‌বার্ট কলেজের) এক অংশে বসিত। ক্লাবের সম্মিলনও সেই স্থানে হইত। ক্লাবে কেশব সেনের বক্তৃতা আমি প্রথম শ্রবণ করি। আমার সহপাঠী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধের বিষয় ছিল-Heroism of the ancient Hindus ; ভীষ্ম, দ্রোণ ইত্যাদি মহাভারতের কয়েকটি চরিত্র লইয়া প্রবন্ধটি রচিত হইয়াছিল। কেশব বাবু আধ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন, এবং এই সময়ের মধ্যে তিনি 'exonerate' কথাটি চার বার ব্যব-হার করিয়াছিলেন। তখনও তাঁহার বোল্‌ ফোটে নাই। কিন্তু যুবকগণ তাঁহার ইংরাজি বক্তৃতায় চমৎকৃত হইয়াছিল। সকলের মনে seriousness ও reigious fervour জাগাইয়া তুলিয়া তিনি যে সাহিত্যে ও সমাজে যুগ-

চির পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কেশব বাবু ক্রমশঃ দেশে বিদেশে খ্রীষ্টান্ অখ্রীষ্টান্ সকলের নিকট আদর পাইলেন। খ্রীষ্টান্ তাঁহার electicismএর আবরণ ভেদ করিতে প্রথম প্রথম পারেন নাই। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, কেশব সেন শীঘ্রই খ্রীষ্টান হইবেন; এমন কি, Lord Lawrenceএর মনেও এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল।

"কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাষ করিয়াছিল সোমপ্রকাশ। রাজনীতি, সমাজ-তত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, সকল বিষয়েই বাদানুবাদ, তর্কবিতর্ক সোমপ্রকাশ পত্রে হইতে লাগিল। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই প্রথমে দেখাইলেন যে, বাঙ্গালায় সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর কাগজ হইতে পারে। সাহিত্যে ও সমাজে সোমপ্রকাশ যুগান্তর আনয়ন করিল। কুরুচি ও অশ্লীলতা আর কতদিন টিকিতে পারে? হিন্দু স্কুলেজের এক শিক্ষকের সহিত বিদ্যাভূষণ মহাশয় এক বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে যখন ছেলেদের জলপান করিবার ছুটি হইত, সেই সময়ে সেই শিক্ষকটি সংস্কৃত কলেজে আসিতেন এবং তাঁহাকে ইংরাজি শিখাইতেন, তৎপরিবর্ত্তে বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহাকে সংস্কৃত শিখাইতেন। ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া এইরূপ বিদ্যাভ্যাস হইত। তাঁহার ইংরাজি ভাষায় এমন ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল যে, Schmitz রচিত রোমের ইতিহাস তিনি বাংলায় অনুবাদ করিয়া ফেলেন।

"৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের কথাপ্রসঙ্গে আমার নিজের একটা কথা মনে পড়িতেছে। তিনি একবার একজন phrenologistকে আমার মস্তক পরীক্ষা করিতে বলেন। আমি তখন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ক্লাসে অধ্যয়ন করি। Phrenologistএর নাম কালীকুমার দাস। কালী বাবু সুপণ্ডিত ছিলেন। Mr. Duffএর সঙ্গে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিয়া দুই শত পৃষ্ঠার একখানি প্রকাণ্ড duodecimo পুস্তক প্রকাশিত করিয়া ফেলেন। তিনি কি কাষ করিতেন, ঠিক আমার স্মরণ নাই। কিন্তু ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে যখন ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইল, কালী বাবু কাষ-কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেন, বলিলেন, 'খবরের কাগজ পড়িতে হইবে, কাষ না ছাড়িলে সময় হইবে না।' ভদ্রলোক আমার মাথা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, আমার রাগ এত ভয়ানক যে, আমি মানুষ খুন করিতে পারি। কথাটা নেহাৎ অমূলক বলিয়া মনে হয় না। বরাবর আপনাকে অত্যন্ত সাবধান হইয়া সামলাইয়া চলিতে হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতের কথা।

(গ্রীক ও লাটিন ভাষায় লিখিত প্রাচীন ভারতের বৃত্তান্ত সংগ্রহ)।

(১) বার্ডেসানেস।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে বাবিলনান্তর্গত বার্ডেসানেস নামক এক গ্রন্থকার প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সিরিয়া দেশে মার্কাস ওরিলিয়াস নামক এক নরপতি ২১৮ হইতে ২২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার নিকট দূত প্রেরিত হয়। এই দৌত্যবাহিনীর অধ্যক্ষ দণ্ডনিস বা সন্দনিসের (Dandanis or Sandanes) সহিত মেসোপটমিয়া দেশে গ্রন্থকার বার্ডেসানেসের সাক্ষাৎ হয়। দণ্ডনিসের প্রমুখাৎ ভারতীয় যোগি-গণের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া গ্রন্থকার ঐ বিবরণ তাঁহার পুস্তকে নিবদ্ধ করেন। বার্ডেসানেসের পুস্তক এখন পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁহার লিখিত বৃত্তান্ত ষ্টোবেয়াস নামক অন্য এক লেখকের গ্রন্থে পাওয়া যায়।

বার্ডেসানেস বলিয়াছেন যে, ভারতীয় যোগিগণ (যাহারা গ্রীস দেশে ব্রহ্মজ্ঞানবিৎ বলিয়া আখ্যাত হয়) দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ও শমন। গ্রন্থকার শ্রমণগণকে বরাবরই শমন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ একই পিতামাতার সন্তান ; একই বংশীয় এবং তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান যাজক-রূপে উত্তরাধিকারস্বত্বে প্রাপ্ত হয়। শমনগণ সকল জাতি হইতেই গৃহীত হইতে পারে এবং যাহারা ঐশ্বরিক জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারাই এই শ্রেণিভুক্ত হইতে পারে। ব্রাহ্মণগণকে অন্যান্য জনসাধারণের ন্যায় রাজকর দিতে হয় না এবং তাহারা কোন রাজার প্রজা নহে। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে সকল দার্শনিক আছে, তাহারা পর্ব্বতে বাস করে, কেহ বা গঙ্গাতীরেও থাকে। পর্ব্বত-বাসী ব্রাহ্মণগণ গোদুগ্ধ, ফল ও মধ্যে মধ্যে শাক ভোজন করে। গঙ্গাতীরে যাহারা বাস করে, তাহারা কেবলমাত্র ফলভোজনেই জীবন ধারণ করে। এই ফল পর্য্যাপ্তরূপে নদীতীরে পাওয়া যায়। যদি কোন সময়ে ফলের অভাব হয়, তবে স্বচ্ছন্দ-বনজাত ধান্যের উপর ইহারা নির্ভর করে। অন্য খাদ্য ভোজন করা বা মাংস স্পর্শ করা ঘোরতর পাপ বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর আছে এবং ইহারা দিন ও রাত্রির অধিকাংশ সময় প্রার্থনায় ও দেবতার ভজন গাহিয়া

অতিবাহিত করে। ইহারা নির্জ্জনবাসই অত্যন্ত ভালবাসে এবং যদি কোন কারণে এক ব্রাহ্মণের অপরের সহিত সাক্ষাৎ বা অধিক বাক্যব্যয় করিতে হয়, তবে অনেকদিন ধরিয়া নির্জ্জনে বাস করিয়া ও মৌন থাকিয়া প্রায়শ্চিত্ত করে।

শমনগণের সহিত ব্রাহ্মণদিগের যথেষ্ট পার্থক্য। যে এই শ্রেণিভুক্ত হইতে অভিলাষ করে, সে নগরের বা গ্রামের অধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ অভিলাষ জ্ঞাপন করে ও স্বকীয় সম্পত্তির স্বত্বত্যাগ করে ও পরে মস্তক মুণ্ডন করিয়া শমনদিগের বাস পরিধান করিয়া তাহাদের নিকট গমন করে; স্ত্রী পুত্র থাকিলে তাহাদের সহিত বাক্যালাপ বা তাহাদের মুখদর্শনও করে না এবং তাহাদের বিষয় কোনরূপ চিন্তাও করে না। রাজা তাহার পুত্রকন্যাগণের, তাহার আত্মীয়স্বজনের ও তাহার স্ত্রীর ভরণ পোষণ করেন। শমনগণ নগর-বহির্ভাগে বাস করে এবং পরমার্থ বিষয়ে সকল সময়েই আলোচনা করে। দেশের রাজা তাহাদের জন্য গৃহ ও মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং ঐ সকল গৃহের ও মন্দিরের পরিচারককে রাজা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে আহার্য্য সরবরাহ করেন। মঠের ঘণ্টাধ্বনি হইলে গৃহ ও মন্দিরাদি হইতে আগন্তুকগণ বহির্দ্দেশে গমন করেন। তখন শমনগণ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উপাসনা করেন। প্রার্থনা শেষ হইলে পুনরায় ঘণ্টাধ্বনি হয়, এবং তখন ভৃত্যগণ প্রত্যেক শমনের সম্মুখে পাত্রে ভাত এবং যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের জন্য শাক ও ফল প্রদান করে। শমনগণ একাকী আহার করেন। আহার যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করিয়া তাঁহারা নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। শমনগণ বিবাহ করিতে বা সম্পত্তি অর্জ্জন করিতে পারেন না।

ব্রাহ্মণ ও শমনগণকে অধিবাসীরা অত্যন্ত সম্মান করে। দেশের রাজাও মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহাদের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন এবং আপদ বিপদে উদ্ধার পাইবার জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করেন।

শমন ও ব্রাহ্মণগণ মৃত্যুকে ভয় করা দূরে থাকুক,সাগ্রহে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। সুস্থশরীরেও কোন শমন বা ব্রাহ্মণ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া সকলকে আহ্বান করেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে নিরস্ত করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে আরও উৎসাহিত করে; এবং

"সমাজে ও সাহিত্যে পুরাতনের সহিত নূতনের দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। নূতন দল পুরাতনের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইল; পুরাতন নিজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সমাজকে ও সাহিত্যকে দৃঢ়তরভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিল। এই ঘাতপ্রতিঘাতে সমাজ ও সাহিত্য সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বিধবাবিবাহের গোলমাল চুকিয়া গেল, কিন্তু কৌলীন্যপ্রথার উপর আক্রমণ আরব্ধ হইল।

"তখন আমার প্রথম যৌবন; ১৪।১৫ বৎসরমাত্র বয়স। শিবতলায় বসাকদিগের বাড়ীতে 'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব' নাটক অভিনীত হইল। আমি সেই অভিনয় দেখিতে গেলাম। কেমন করিয়া তোমায় বুঝাইব যে, শিক্ষিত বঙ্গসমাজ কিরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিল। The play came out as a surprise upon the Bengali reading public; বোধ হয় ইংরাজি খুব ভাল ভাল comedy অপেক্ষা কোনও অংশে ইহা মন্দ নহে। রচয়িতা পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, আমার শিক্ষক ৺প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের 'রত্নাবলী' শিক্ষিত বঙ্গসমাজের আদরের বস্তু। সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে তিনি যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, সেরূপ প্রায় দেখা যায় না। 'কুলীন-কুলসর্ব্বস্বে' ইহার যথেষ্ট নমুনা আছে। একটি শ্লোক আছে যাহা মাঘ কবি লিখিলেও অগৌরব হইত না। কবিতাটি এই :—

অতিরক্তবপুঃ স্খলদ্গতি
র্বসুহীনো বিগতাম্বরো রবিঃ।
পততি প্রতিবারি বারুণী-
বহুসেবাফলমেতদেব হি॥

এই শ্লোকটির মধ্যে যে double entendre, যে pun রহিয়াছে, তাহা কেমন সুন্দর।

প্রথম অর্থ—সূর্য্যদেব অত্যন্ত লাল হ'য়ে, মন্দগতি হ'য়ে, কিরণ সব মিলিয়ে যাচ্চে, সমস্ত আকাশ অতিক্রম ক'রে জলে ঝাঁপ দিচ্চে। পশ্চিম্ দিকে যাওয়ার এই ফল।

দ্বিতীয় অর্থ—মদ খেয়ে মাতালের শরীর লাল হ'য়ে উঠেছে, সে চল্‌তে গিয়ে হোঁচট্ খাচ্চে, সব টাকা উড়িয়ে দিয়েছে, গায়ের কাপড় গা থেকে খ'সে পড়্‌ছে, সে জলে ঝাঁপ দিচ্চে। অত্যন্ত মদ খাওয়ার ফল এই।

"এই মদ্যপান-প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকারের নাম স্মরণ করা উচিত। একটি Temperance movement গঠিত করিয়া তিনি অনেক দিন তাহার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। চারিদিকে মদ্যপানের বিরুদ্ধে crusade চলিতে লাগিল। তাঁহার এই Temperance movement শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে মদ্যপান-নিবৃত্তি বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। মাতাল-দিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া তিনি প্রতিজ্ঞাপত্রে তাহাদিগের স্বাক্ষর করাইয়া লইতেন। আমি কয়েক জনের কথা জানি, যাহারা সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নাই। তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল ছিল; কিন্তু একটা কথা প্রচারিত হইল, তিনি গঞ্জিকা-সেবন করেন! আমার মনে হয় It was a calumny propagated by drunkards। ধীরাজ কিন্তু গান ধরিল—

মধুপান আর কোরো না,
Young Bengal, বাঁচবে না,—

* * *

কিন্তু ড্যা-ঙ্গা প-থে নাইকো মানা।

ঐ "ড্যা-ঙ্গা প-থে নাইকো মানা" চরণটি গাহিবার সময় ধীরাজ হেলিয়া দুলিয়া pantomimeএর মত স্বহস্তে গঞ্জিকামর্দ্দনের অনুকরণ করিয়া, হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া দিত। ধীরাজ মদ খাইত।

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

হৃদয়ের ব্যবহার।

যেখানে প্রেম নাই বিচার বিবেচনা
হৃদয়ে বেঁধে রাখে হাতে পায়।
যেখানে প্রেম আছে হৃদয় অবিচারে
সরল শতধারে গলে যায়।
যেখানে প্রেম নাই অর্থ খুঁজে বুঝে
ওজন করে' করে' কথা কয়।
যেখানে প্রেম আছে সকল বাধা ভেঙ্গে
নদীর স্রোত হেন কথা বয়।

শ্রীকালিদাস রায়।

বেদ নির্গত হয় যে, ব্রাহ্মণগণ ব্যজন না করিলে ঐ ঘর্ম্মে তলদেশ ভিজিয়া যাইত। গহ্বরাভ্যন্তরে মূর্ত্তির পশ্চাতে একটি অন্ধকারময় পথ আছে এবং উহার শেষ দিকে একটি দ্বার আছে। এই দ্বার দিয়া জল নির্গত হইয়া হ্রদ হইয়াছে। যাহারা নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হইতে চাহে, তাহাদের এই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। যাহারা নির্দ্দোষ তাহারা অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। তাহাদের দেখিয়া দ্বার উন্মুক্ত হয়, এবং তাহারা উহার মধ্যে দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ জলরাশি দেখিতে পায়। দোষী ঐ দ্বার দিয়া প্রবেশের চেষ্টা করিলে অকৃতকার্য্য হয় এবং তাহার দোষ স্বীকারে বাধ্য হয়। তাহারা উপবাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করে ও অপরকে তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিতে বলে।

(৪) ডায়ন থ্রিসসটম।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে মিসিয়া দেশান্তর্গত প্রুসা নগরে ডায়ন থ্রিসসটম নামক এক বাগ্মী জন্মগ্রহণ করেন। ডায়নকে তদ্দেশবাসী ব্যক্তিগণ "স্বর্ণমুখ" উপাধিভূষিত করে। কিছুদিন পরে ডায়ন রোমে গমন করেন, কিন্তু সেই সময় রোমক সম্রাট্ ডমিসিয়ান বাগ্মী ও দার্শনিকগণকে রোম হইতে বিতাড়িত করিলে, ভিক্ষুকের বেশে থ্রেস, মিসিয়া, সিথিয়া প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি যে যে স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানের অধিবাসিগণ তাঁহার বাগ্মিতায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি যত্ন করিত। সম্রাট্ ডিমিসিয়ানের মৃত্যুর পর তিনি রোমে প্রত্যাগমন করেন এবং পরবর্ত্তী রোমক সম্রাট্ নার্ভা ও ট্রাজান তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন। ১১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি যে সকল সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার ৮০টি বক্তৃতা এখনও পাওয়া যায় এবং তাহা হইতে সম্যক্রূপে প্রণিধান করা যায় যে, তিনি দার্শনিক ও বাগ্মীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবার উপযুক্ত। ডায়ন প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মর্ম্মে তাঁহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

পৃথিবীর মধ্যে ভারতবাসীরাই সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। তাহাদের দেশের নদী অপর দেশের নদীর ন্যায় কেবল জলপূর্ণ নহে। কোন নদী স্বচ্ছ মদ্যপূর্ণ, কোনটিতে মধু, কোনটি বা তৈলপূর্ণ। বস্তুতঃ এই সকল নদীর উৎস পৃথিবীর বক্ষঃস্থলে অর্থাৎ পর্ব্বতে স্থাপিত। এই জন্য ডায়ন বলিয়াছেন যে, সুখে ও শক্তিতে অন্যান্য জাতি ও ভারতবাসীদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ দেখা

যায়। বৃক্ষ হইতে ফলকাষ্ঠ আহরণ করিয়া, বৎসকে বঞ্চনা করিয়া দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া, মধুমক্ষিকাকে তাহার মধুচক্র হইতে বিতাড়িত করিয়া—এই সকল অন্যায় ও অপকৃষ্ট উপায়ে অন্যান্য দেশের লোককে এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভারতবর্ষের নদী এক মাস রাজাদের জন্য প্রবাহিতা হয় ; বৎসরের অন্যান্য মাসে জনসাধারণের জন্য উহারা প্রবাহিতা হয়। নদী যে এক মাস রাজার জন্য প্রবাহিতা হয়, রাজা সেই মাসে নিজ কর সংগ্রহ করেন। এই জন্য প্রকৃতিপুঞ্জ তাহাদের পুত্র-কলত্রের সমভিব্যাহারে নদীর উৎস বা তটদেশে আমোদ আহ্লাদে কাল অতিবাহিত করে। তাহাদের দেশে যেন অবিরামই উৎসব। নদীতীরে বিকশিত পদ্ম শোভা পাইতেছে। এই পদ্ম অন্যান্য দেশের পুষ্পাপেক্ষা উত্তম। এতদ্দেশে প্রচুর পরিমাণে তিল জন্মে। গম ও যব অপেক্ষা সুস্বাদু অন্য এক প্রকার বীজও উৎপন্ন হয়। এই বীজ গোলাপের পাপড়ির ন্যায় এক প্রকার পাপড়ির মধ্যে জন্মে, কিন্তু এই সকল পাপড়ি গোলাপের পাপড়ি অপেক্ষা বৃহৎ ও সুগন্ধযুক্ত। অধিবাসীরা এই লতার মূল ও ফল উভয়ই ভক্ষণ করে এবং এই লতা উৎপন্ন করিতে কোন প্রকার কষ্ট করিতে হয় না। নদী হইতে জলনির্গমের অনেক প্রণালী আছে। এই সকল প্রণালী অধিবাসিগণের ইচ্ছানুসারে প্রস্তুত করা হয় এবং নল দ্বারা এই জল সরবরাহ করা হয়। স্নানের জন্য দুই প্রকার জলাশয় আছে। এক প্রকারের জল উষ্ণ ও রৌপ্যের ন্যায় স্বচ্ছ ; অন্য প্রকারের জল গভীরতা ও শীতলতার জন্য ঘন-নীলাভ। এই সকল জলাশয়ে সৌন্দর্য্যের আদর্শ স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাগণ সন্তরণ করে। স্নানান্তে তাহারা তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে যাইয়া আহ্লাদে গান করে। এই সকল প্রান্তর দেখিতে অতি সুন্দর এবং পুষ্পাকীর্ণ। ইহাতে ফলশালী বৃক্ষ ছায়াদান করিয়া লোকের তৃপ্তিসাধন করে। দেশে নানা প্রকারের পক্ষী যথেষ্ট আছে। তাহাদের কাকলিতে তাহাদের বাসস্থান পর্ব্বতসমূহ মুখরিত। কোন কোন পক্ষী বৃক্ষোপরি বসিয়া এমন সুমিষ্ট কূজন করে যে,উহা অন্যান্য দেশের বাদ্যধ্বনি অপেক্ষা শ্রুতিমধুর।

ভারতবর্ষের বাতাস মৃদু মৃদু প্রবাহিত হয়। তথায় ঋতু নাতিশীতোষ্ণ ; আকাশ মেঘহীন এবং অন্যান্য দেশের আকাশ অপেক্ষা অধিক তারকা-সমাকীর্ণ। চল্লিশ বৎসরের অধিক কাল অধিবাসীরা জীবিত থাকে না ; কিন্তু যতদিন জীবনধারণ করে, ততদিনই তাহারা সুস্থ দেহে কালযাপন করে।

তাহাদের পরলোকগত আত্মীয় স্বজনের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে। ইহাঁদের বিশ্বাস দেহত্যাগের পর একজনের আত্মার সহিত অপরের আত্মার মিলন হয়। মৃত আত্মীয়স্বজনের নিকট যে যে সংবাদ প্রেরণ করিতে হইবে, সকল বন্ধুবান্ধব তাহা জ্ঞাপন করিলে, তিনি অগ্নিকুণ্ডে দেহনিক্ষেপ করেন এবং অন্যান্য শমনগণ কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে ভজন গান করিতে থাকেন।

বার্ডেসানেস বলিয়াছেন যে, তাঁহারা মৃত্যু অত্যন্ত সুখকর বলিয়া বিবেচনা করেন এবং যিনি এই প্রকারে অবিনশ্বরত্ব লাভ করেন, তাঁহাকে সকলেই সুখী বলিয়া মনে করে। বার্ডসানেস এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করিয়াছেন, "সকলেই যদি এইরূপে দেহত্যাগ করে, তবে এ পৃথিবীর কি দশা হইবে?"

(২) পরফাইরি

পরফাইরি নামক অন্য এক গ্রন্থকারের "On Abstinence from Animal Food" (মাংসাহারে নিস্পৃহা) গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত বার্ডেসানেসের বৃত্তান্তের কতকাংশ পাওয়া যায়। এই বৃত্তান্ত ও পূর্ব্ব বৃত্তান্ত একই; সুতরাং উহা পুনর্ব্বার উদ্ধৃত করা নিস্প্রয়োজন বোধে আমরা তৃতীয় গ্রন্থকারের বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিব।

(৩) জোহানেস ষ্টোবেয়স।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ষ্টোবেয়সের গ্রন্থে বার্ডেসানেসের বৃত্তান্তের কিছু কিছু অংশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ষ্টোবেয়সের সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না; এমন কি, তিনি কোন্ দেশবাসী বা কোন্ সময়ের লোক তাহারও কোন নির্দ্দেশ নাই। সম্ভবতঃ তিনি খৃষ্টান ছিলেন। ষ্টোবেয়স তাঁহার পুস্তকে অনেক গ্রীসদেশীয় গ্রন্থকারগণের পুস্তক হইতে সার সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যে সকল পুস্তক হইতে তিনি এই প্রকার সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অনেক পুস্তক এখন পাওয়া যায় না। এই জন্য ষ্টোবেয়স আমাদের প্রভূত উপকার সাধিত করিয়াছেন, বলিতে হইবে। ষ্টোবেয়স বার্ডেসানেস হইতে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে একটি হ্রদ আছে, যাহাকে "পরীক্ষা হ্রদ" (Lake of Probation) বলে। অপরাধী ব্যক্তি স্বীয় দোষ অস্বীকার করিলেই তাহাকে এই পরীক্ষা দিতে হয়। ব্রাহ্মণগণ নিম্নলিখিত প্রকারে অপরাধীকে পরীক্ষা করেন। অপরাধীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সে এই পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত কি না; যদি সে অস্বীকার করে, তবে তাহাকে দোষী বিবেচনা

করিয়া শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু যদি সে স্বীকার করে, তবে তাহাকে ও তাহার অভিযোগকারিগণকে এই হ্রদের নিকট লইয়া যাওয়া হয়। অপরাধীর সহিত অভিযোগকারিগণকেও এই পরীক্ষা দিতে হয়; কেন না, তাহা হইলে কেহই ছলনা পূর্ব্বক বা মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে না। যদি অপরাধী নির্দোষ হয়, তবে এই হ্রদের একদিক হইতে অন্যদিকে হাঁটিয়া গেলে হ্রদের জল হাঁটুর উপরে উঠে না; কিন্তু দোষী হইলে অধিক দূর যাইতে না যাইতে সে জলে নিমজ্জিত হয়। শেষোক্ত অবস্থায় ব্রাহ্মণগণ তাহাকে জল হইতে আনয়ন করিয়া অভিযোগকারিগণের হস্তে অর্পণ করেন। উহারা মৃত্যু ব্যতীত অন্য যে কোন দণ্ড বিধান করিতে পারে। কিন্তু ইহা সচরাচর ঘটে না, কেন না এই পরীক্ষার আশঙ্কায় কেহ নিজ দোষ অস্বীকার করিতে সাহসী হয় না।

স্বেচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য ভারতবাসীদিগের এই প্রকার পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু স্বেচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত উভয় প্রকার অপরাধের বিচারের জন্য অন্য প্রকার ব্যবস্থা ও আছে। এরূপ স্থলে নিম্নলিখিত প্রথা অবলম্বন করা হয়।

উচ্চ-পর্ব্বত-মধ্যে একটি স্বাভাবিক গুহা আছে। ঐ গুহায় ১০।১২ হাত উচ্চ একটি প্রতিমূর্ত্তি আছে। ঐ মূর্ত্তির দক্ষিণার্দ্ধ মনুষ্যের ন্যায় ও বামার্দ্ধ স্ত্রীলোকের ন্যায়। উভয়ার্দ্ধই একত্র সংযোজিত। ঐ মূর্ত্তির বক্ষের দক্ষিণাংশে সূর্য্য ও বামাংশে চন্দ্র ক্ষোদিত, হস্তে দেবদূত এবং অন্যান্য স্থানে আকাশ, পর্ব্বত, সাগর, নদী, তারকা, পশু, পক্ষী অর্থাৎ সকল প্রকার চেতন অচেতন মূর্ত্তি অঙ্কিত। ভারতবাসীরা বলে যে, এই মূর্ত্তি—সৃষ্টিকর্ত্তা যে যে দ্রব্য সৃজন করিয়াছেন তাহাদের বর্ণনার জন্য—তাঁহার পুত্রকে দান করেন। কি কি উপাদানে এই মূর্ত্তি নির্ম্মিত, তাহা কেহই বলিতে পারে না। তবে ইহা সুবর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, প্রস্তর অথবা জানিত কোন দ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত নহে। যদিও ইহা কাষ্ঠনির্ম্মিতও নহে, তত্রাপি ইহা দেখিতে কাষ্ঠের ন্যায় কিন্তু ইহাতে ঘুণ ধরে না। প্রকাশ এইরূপ যে, ভারতবর্ষীয় কোন রাজা এই মূর্ত্তির গলদেশের লোম উৎপাটনের চেষ্টা করাতে ঐ স্থান হইতে রক্ত নির্গত হইয়াছিল। রাজা এই দৃশ্যে ভীত হইয়া মূর্চ্ছা যায়েন এবং ব্রাহ্মণদিগের সহস্র প্রার্থনা সত্ত্বেও চেতনা পায়েন নাই। এই মূর্ত্তির মস্তকোপরি সিংহাসনোপবিষ্ট দেবতার মূর্ত্তি। গ্রীষ্মকালে মূর্ত্তির শরীর হইতে এত

ভারতবর্ষে সুখভোগের সীমা নাই; কিন্তু তত্রাপি ব্রাহ্মণ নামক এক প্রকার মনুষ্য আছে, যাহারা এই সকল নদী ও আত্মীয় স্বজন হইতে দূরে বাস করে। তাহারা দর্শনের আলোচনায় এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক নানাপ্রকার ক্লেশকর প্রক্রিয়াসক্ত হইয়া জীবনযাপন করে। পরম্পরায় অবগত হওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণগণ সত্যের উৎস আবিষ্কার করিয়াছে। যাহারা এই উৎসের আস্বাদন একবার পায় তাহারা আর কিছুতেই এই পথ পরিত্যাগ করে না।

ডায়ন প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন যে, তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। যাহারা ভারতবর্ষ হইতে ঐ দেশে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট প্রাপ্ত বর্ণনার উপরেই এগুলি লিখিত। ডায়ন বলিয়াছেন যে, ভারত-বাসীরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। তাহারা শৃগালাপেক্ষা বৃহৎ এক প্রকার পিপীলিকা হইতে সুবর্ণ সংগ্রহ করে।

ব্রাহ্মণগণ সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় এবং ঈশ্বরভক্ত। ডায়ন বলিয়াছেন যে, হোমরের পদ্যও ভারতবাসীরা অনুবাদ করিয়াছে; এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তাহারা অধিক ধারণা করিতে পারে।

(৫) কালিসথিনিস্।

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক অরিষ্টটেলের আত্মীয় কালিসথিনিস আলেক-জান্দারের সহিত তাঁহার অভিযানের সহগামী হয়েন। কিন্তু আলেকজান্দার পারস্যদেশীয় আচার ব্যবহার অবলম্বন করিলে কালিসথিনিস আলেক-জান্দারের নিন্দা করেন। আলেকজান্দার ইহাতে রুষ্ট হয়েন। পরে কালিসথিনিসকে রাজকীয় বালক ভৃত্যের বিদ্রোহে সংশ্লিষ্ট বলিয়া আলেক-জান্দার তাঁহার মৃত্যুর আদেশ দেন। এই আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছিল। কালিসথিনিস গঙ্গানদীকে স্বর্গ হইতে প্রবাহিতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। থিবস নগরান্তর্গত কোন ব্যক্তির নিকট কালিসথিনিস ভারতবর্ষের যে বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন, আমরা তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম। কালিসথিনিসের বৃত্তান্তের অনেকাংশ লঙ্কা দ্বীপেরই বর্ণনা।

লঙ্কা (তাপ্রোবেন) দ্বীপের অধিবাসী বৃদ্ধগণ দেড়শত বৎসর জীবিত থাকে। এই স্থানের জলবায়ু অত্যন্ত সুন্দর। এই দেশে ভারতবর্ষের মহারাজা বাস করেন। দেশের অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতিগণ ইঁহারই অধীনস্থ এবং ইঁহারই শাসনকর্ত্তারূপে দেশ শাসন করেন। এই দ্বীপের সন্নিকটে ইরিথ্রিয়ান সাগর-মধ্যস্থ অন্যান্য দ্বীপ। এই দ্বীপে জলযান

গমনোপযোগী পাঁচটি নদী আছে। এই প্রদেশস্থ বৃক্ষ সকল বৎসরের বার মাস ফলপূর্ণ থাকে। দেশে তাল ও সুপারী বৃক্ষও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এই ফলগুলি বৃহৎ। অধিবাসীরা ভাল, দুগ্ধ ও ফল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। দেশে কার্পাস জন্মে না এবং সেই জন্য অধিবাসিগণ কারুকার্য্য সমন্বিত মেষজাতলোমনির্ম্মিত বস্ত্রদ্বারা লজ্জা নিবারণ করে। মেষগুলি যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ দেয়। তাহাদিগের লাঙ্গুল দীর্ঘ। ইহারা মেষের মাংস আহার করে কিন্তু শূকরের মাংস গ্রহণ করে না। দেশে লঙ্কা জন্মে।

ব্রাহ্মণ জাতিতে ইচ্ছানুসারে প্রবেশ করা যায় না। ইহারা উলাঙ্গাবস্থায় নদীতীরে বাস করে। ইহাদের গৃহপালিত পশু নাই। ইহারা ভূমি কর্ষণ করে না এবং লৌহ, অগ্নি, মদ্যের ব্যবহার জানে না। ইহারা ভগবানকে যথেষ্ট ভক্তি করে ও অনবরত প্রার্থনা করে; স্বচ্ছন্দপ্রাপ্ত ফল খাইয়া জীবন ধারণ করে এবং বৃক্ষ পত্রের উপর নিদ্রা যায়। দেশে যথেষ্ট সর্প এবং হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়; স্বর্ণপ্রসূ পিপীলিকা ও বিছাও যথেষ্ট দেখা যায়। এদেশে ভ্রমণ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

[এই প্রবন্ধ সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ম্যাক্রিণ্ডেলের পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।]

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার।

গতি।

যে পাখী বিটপ-শাখে বাঁধে ক্ষুদ্রনীড়
উড়িয়া সুনীল নভে দূর শূন্যে যায়,
মানবের ক্ষুদ্র হৃদে নিবসে যে প্রেম
বহু ঊর্দ্ধে গতি তা'র—স্বর্গপানে ধায়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মৃত্যুমিলন।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।



বিধুরা।



রাজার নিকট হইতে যাইয়া রাণী শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল; তিনি আপনাকে আপনি সম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না।

তিনি উচ্চ আদর্শের আশা করিয়া হতাশ-বেদনায় আপনার প্রেমকে সংযত—সংহত করিয়া আপনি কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। তাহার পর এখন যখন সেই আদর্শ বাস্তবে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত, তখন—হায়, তখন তিনি কিছুতেই আপনার কথা বলিতে পারিতেছেন না—তখন তৃপ্তির কূলে অতৃপ্ত পিপাসা তাঁহাকে ব্যথিত করিতেছে। উপাসিকা বহু যত্নে উপাসিতকে ধ্যান করে; যখন সেই উপাসিত—সেই বাঞ্ছিত—সেই চিরপ্রার্থিত সম্মুখে, তখন—তখন যদি আশায় ও আনন্দে উদ্বেল হৃদয় আত্মপ্রকাশ করিতে না পারিয়া নূতন যাতনায় ব্যথিত হয়—তবে সে উপাসিকার মত দুঃখী কে? রাজার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাণীরও অসাধারণ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল—রাজার চরিত্রে রাজগুণ যেমন সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল, রাণীর হৃদয়ে তেমনই প্রেম, শ্রদ্ধা, ভক্তি ফুটিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু হায়!—রমণীসুলভ লজ্জা আজ পদে পদে তাঁহার সেই প্রেম, সেই শ্রদ্ধা, সেই ভক্তি প্রকাশের অন্তরায় হইতেছিল।

তিনি কেমন করিয়া আপনার তৃষিত হৃদয়ের কথা রাজাকে জানাইবেন? আজ কত দিন হইতে এই চিন্তা তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া আছে। কত দিন তিনি নিশীথে শ্রান্ত নিদ্রাভিভূত স্বামীর চরণতলে বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন। তিনি আপনার হৃদয়ের স্পন্দনে আপনি শঙ্কিতা হইয়াছেন—পাছে স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইয়াছে,—তিনি দেখিলে কি ভাবিবেন? আর?—আর যদি তিনি তাঁহার মনোভাব বুঝিতে না পারেন? তবে সে দুঃখ, সে লজ্জা, সে বেদনা তিনি কেমন করিয়া সহ্য করিবেন? তাই তিনি যখনই রাজার সুপ্তি-

লোপ-সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়াছেন—তখনই চলিয়া আসিয়াছেন, আপনার ব্যথিত—তৃষিত—কাতর হৃদয়ের বেদনাভার বহিয়া আসিয়া নিভৃতে রোদন করিয়াছেন।

আজ—তিনি তেমন সতর্কভাবে স্বামীকে লক্ষ্য করিতে পারেন নাই—আপনার ভাবে আপনি এমনই বিভোর ছিলেন। তিনি মুগ্ধনেত্রে সুপ্ত পতিকে দর্শন করিতেছিলেন—আপনার বেদনায় আপনি ব্যথিতা হইতেছিলেন। তাই আজ সেই আশঙ্কার—সেই আশার অবসর আসিয়াছিল। তাই আজ রাজা জাগিয়া পদপ্রান্তে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

কিন্তু—এত দিন ত আশঙ্কার মধ্যে আশার অবসর ছিল—এতদিন আশার অরুণ-কিরণে বেদনা—যাতনা উদ্ভাসিত হইত। আজ যে এক মুহূর্ত্তে সে আশার শেষ আলোকরেখা অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল!

রাজা ত তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিলেন না! তাঁহার হৃদয়-দর্পণে ত পত্নীর প্রেমবিহ্বলতা প্রতিবিম্বিত হইল না! ভালবাসার কি ভালবাসা চিনিতে বিলম্ব ঘটে? রাজা যে কেবলই বিস্ময় প্রকাশ করিলেন!

রাণীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

রাণীর জীবনে ধিক্কার জন্মিতে লাগিল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে অভিমান সেই ধিক্কারকে আবৃত করিয়া ফেলিল। প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে কে কবে জয়ী হইতে পারে? যখন বসন্তের প্রারম্ভে পর্ব্বত-সানুতে সুপ্ত কুসুমের প্রথম নিদ্রাভঙ্গ হয়—কুসুমকোরক কেবল উদ্ভেদোন্মুখ হয়—তখন যদি সহসা তুষারপাত হয়, তবে—কুসুমকোরক সেই তুষারাচ্ছাদনতলে অনাহত ভাবে অবস্থান করে; তাহার পর যেদিন তপ্ত তপন-কিরণে তুষাররশি বিগলিত হইয়া শত পথে—শত ধারায় প্রবাহিত হইয়া যায়, সে দিন কুসুমকোরক বিকশিত হইয়া সানুদেশে নবলাবণ্যসঞ্চার করে। তেমনই হৃদয়ের যে ভাবকে মানুষ তিরোহিত করিতে চেষ্টা করিয়া মনে করে, সে সফলকাম হইল—সেই ভাব এক দিন অবসর বুঝিয়া আত্মপ্রকাশ করে—তখন মানুষ আর তাহার বিকাশ নিবারিত করিতে পারে না। তাই তরুণ যৌবনে—প্রথম প্রণয়বিকাশকালে তিনি প্রেমসহচর যে অভিমানের স্ফূর্ত্তি হইতে দেন নাই—এখন এত দিন পরে সেই অভিমান অবসর বুঝিয়া তাঁহার হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "রাণী, কি আবশ্যক?"—সেই কথা রাণীর কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল—সে কথা যেন তাঁহার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইতেছিল।

আবশ্যক!—হায়, তিনি কেমন করিয়া বুঝাইবেন—তাঁহার আবশ্যক কি? তাঁহার আবশ্যক! তাঁহার ব্যথিত হৃদয় যে তাঁহাকেই চাহিতেছে—সে যে আজ রমণীর জীবন-সাধন-ধন লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে; যে প্রেম, যখন অযাচিত ভাবে শত ধারায় আসিয়াছিল তখন তিনি অনাদর করিয়াছেন, সেই প্রেমের বিন্দুমাত্র পাইবার জন্য আজ তিনি লালায়িতা। সে-ই তাঁহার আবশ্যক।

কিন্তু আজ কি তাঁহাকে তাঁহার আবশ্যকের কথা বুঝাইতে হইবে? কি দুর্দ্দশা!—কি দারুণ মর্ম্মপীড়া!—আজ জীবনসর্ব্বস্বকে জীবনের সাধনার কথা—হৃদয়ের একমাত্র অভিলাষ বুঝাইতে হইবে? যে বাসনা নয়নের দৃষ্টিতে ফুটিয়া বাহির হয়—মৃগনাভির সৌরভের মত যাহাকে গোপন করা যায় না—সেই বাসনার কথা আজ মুখ ফুটিয়া বলিয়া বুঝাইতে হইবে? তাহা কি বুঝাইবার? যাহা হৃদয়ের অনুভূতি—তাহা কি কথায় প্রকাশের? যুগে যুগে কত হৃদয় সেই বাসনা-বহ্নি-দাহে ভস্মীভূত হইয়াছে—কে তাহা কথায় প্রকাশ করিতে পারিয়াছে? সে যে ভাষার অতীত! সে কি বুঝাইবার?

কিন্তু প্রেম ত প্রেমকে আকৃষ্ট করে, সে ত প্রেমের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে পারে! তবে? তবে কি তাঁহার এই হৃদয়ভরা প্রেমে সে আকর্ষণ নাই? হায়—অভাগী তাঁহার ক্ষুদ্র প্রেমের সাধ্য কি সেই বিশাল হৃদয়ের প্রেম আকৃষ্ট করে? তাই যদি হয়, তবু ত রাজার প্রেম তাঁহার প্রেমের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে পারিত! তবে?—তবে কি তাঁহার পক্ষে সে প্রেমের আশা নাই? আশার ক্ষীণ আলোক নিরাশার গভীর অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল। এ দারুণ বেদনা অনুভব করিবার পূর্ব্বে তাঁহার জীবন শেষ হইয়া যায় নাই কেন?

আজ রাণীর পক্ষে জীবন নিতান্ত ব্যর্থ—কেবল বেদনার ভারমাত্র বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন তিনি নিতান্ত আশাহীন জীবনের ভার বহন করিয়া লক্ষ্যহীন দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতেছেন।

আজ তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তাঁহার পক্ষে জগৎ শূন্য।

আজ বৃহৎ শয়ন-মন্দিরের শূন্যতা যেন তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। সেই সুগন্ধ দীপের স্নিগ্ধ—অতি কোমল আলোকে সামান্যমাত্র আলোকিত বৃহৎ কক্ষ কত স্মৃতি-বিজড়িত! আজ সেই সব স্মৃতি তাঁহার পক্ষে যাতনার আকর।

কক্ষে গজদন্তের কারুকার্য্যখচিত বহুমূল্য পালঙ্কে শয্যা রচিত। সেই শয্যায় পড়িয়া রাণী দুঃসহ যাতনার জ্বালা ভোগ করিতে লাগিলেন! সে শয্যা রাজার স্পর্শপূত; কিন্তু কত দিন সে শয্যায় রাজার স্পর্শ পড়ে নাই!

রাণী রাজার উপাধান টানিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন—তাঁহার বক্ষে যে জ্বালা, তাহা কি জুড়াইবে না?

সেই শয্যায় শয়ন করিয়া রাণী তাঁহার জীবনের কথা ভাবিতে লাগিলেন। মনে পড়িল, কত আশা হৃদয়ে লইয়া তিনি নবীন জীবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন;—যখন প্রথম স্বামীর গৃহে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় কত আশায় পূর্ণ! সেই আশার উত্তেজনায় তিনি পিতৃগৃহত্যাগে বেদনা বেদনা বলিয়াই মনে করেন নাই।

তাহার পর আপনার ঔজ্জ্বল্যে আর সকল বাসনাকে ম্লান করিয়া হৃদয়ে এক প্রবল বাসনা জাগিয়া উঠিল—সে রাজপুতের হৃত গৌরবের পুনরুদ্ধার-বাসনা। তাঁহার পিতার নিকট তিনি সেই বাসনা লাভ করিয়াছিলেন—ক্রমে সেই প্রবল বাসনা তাঁহাকে আবিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। প্রথম পতিগৃহে আসিয়া পতির ব্যবহারে তাঁহার সমস্ত হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার হৃদয় প্রেমে ও ভক্তিতে পতির প্রতি আকৃষ্ট হইল।

কিন্তু দেখিতে দেখিতে সে ভাবের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। যে প্রবল বাসনা তাঁহাকে আবিষ্ট করিয়াছিল—প্রেম সে বাসনার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল—স্বামী প্রেমের নিকট আর সব তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া—প্রেম-সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার নিকট তাহা ভাল লাগিল না। তিনি যে বাসনার চরিতার্থতার জন্য সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত ছিলেন—তাহারই অন্তরায় বলিয়া সে প্রেমকে বিদলিত করিলেন; দারুণ ভ্রান্তিবশে জীবনের সকল সুখের সর্ব্বনাশ করিলেন। তিনি তখন তাহা বুঝিতে পারেন নাই—পারিলে কি এ কার্য্য করিতে পারিতেন?

পরে তিনি তাহা বুঝিয়াছেন। বুঝিয়া ভাবিয়াছেন—হায়, তিনি কি করিয়াছেন? তিনি আপনি আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার সেই বাঞ্ছিত বাসনা পূর্ণ হইবার পথে বিষম বিঘ্ন সংস্থাপিত করিয়াছেন। তখন যদি তিনি সে কথা বুঝিতেন, তবে তাঁহার জীবন বেদনামাত্র হইত না—আর হয় ত তিনি ধীরে ধীরে স্বামীকে তাঁহার ঈপ্সিত পথের পথিক করিতে পারিতেন! হয় ত কেন?—সে ভাব ত স্বামীর হৃদয়ে নিহিতই ছিল। বুঝি তাঁহারই ব্যবহার-দোষে তাহার বিকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে—বেদনার আঘাতে আহত হৃদয়ে তাহা ফুটিতে পারে নাই। তবে—তবে বুঝি তিনিই এ বিলম্বের জন্য দায়ী!

এ চিন্তায় কেবল দুঃখ—কেবল যাতনা। আজ রাণী সেই দুঃখ—সেই যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন।

আরও দুঃখ—আরও যাতনা—আজ যখন তাঁহারই সেই বাসনা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, তখন তিনিই কেবল সে কার্য্যে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিতেছেন না। তিনি আজ দর্শকমাত্র, কর্ম্মী নহেন। আপনার দোষে তিনি আপনার লক্ষ্যমুখগামিপথভ্রষ্ট!

আর সর্ব্বাপেক্ষা বেদনা—আজ অপগতউচ্চাভিলাষ রমণী-হৃদয় যখন বাহিরের সকল কার্য্য ছাড়িয়া আপনার মধ্যে আপনার শান্তি-লাভ-চেষ্টায় চেষ্টিত—যখন সে সত্য সত্যই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—যখন তাহার স্বরূপ সপ্রকাশ হইয়াছে—তখন যাহাতে জীবন মধুময় হয়, মরুভূমিতে স্নিগ্ধ সরসতার সঞ্চার হয়—দুঃখ সুখে পরিণত হয়—বেদনার বিষজ্বালা অপনীত হয়—যাতনা বেদনাহীন হয়—রমণীর সেই জীবনসাধন-ধন প্রেম তাঁহার পক্ষে অলভ্য!

এই সকল চিন্তায় রাণীর হৃদয় ব্যথিত হইতে লাগিল। চিন্তার শেষ নাই, বেদনারও শেষ নাই। বেদনার আবর্ত্তে পড়িয়া কে কবে সহজে উদ্ধার পাইয়াছে? রাণীর নিকট আজ জগৎ মরুময়। তিনি সেই শূন্য শয্যায় লুটাইয়া শূন্য হৃদয়ের পূর্ণ বেদনার বিষম জ্বালা ভোগ করিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ পরে—যেন তাঁহার চিন্তার খরস্রোতে ক্ষণিক বিরাম আসিল। রাণী দেখিলেন, কক্ষ অরুণ-কিরণে প্রফুল্ল। তিনি মুখ তুলিতেই দেখিলেন, সম্মুখে কক্ষ-প্রাচীরে উমার প্রেমসাধনার চিত্র তরুণ দিবসের প্রথম আলোকে উদ্ভাসিত। চারিদিকে প্রজ্বলিত হুতাশন—শিরোপরে দীপ্ত সূর্য্য—মধ্যে শিরীষ-কুসুম-কোমলা পর্ব্বতদুহিতা—প্রেমসাধনায় মগ্না। হৃদয়ের গভীর প্রেম তাঁহাকে এ সাধনায় সমর্থ করিয়াছে। আর এরূপ একাগ্র সাধনার সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী না হইয়া পারে না। রাণী যেন হৃদয়ে নূতন বল পাইলেন; প্রেমের সাধনা সহজ নহে। তবে এখনও আশার অবসর আছে!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুখ-স্বপ্ন।

কেন—জীবন না যায়?
গগনে ঘন-ঘটা,
দামিনী জ্বালে ছটা,
বন-ব্রততী-জটা
সমীরে শিহরায়;

ঘন গরজে ঘন,
কাঁপিয়া উঠে বন,
কেমনে বাঁধি মন
এ ঘোর বরিষায় ?
বিরহ শেজ'পরে
নয়নে নীর ঝরে,
একেলা আজি ঘরে
পরাণ তারে চায়।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয় হয়। বর্ষণ নাই, কিন্তু আকাশে সজলজলদদল কখন চন্দ্রমণ্ডল আবৃত করিয়া— কখন বা চন্দ্রালোক ম্লান করিয়া গতায়াত করিতেছে। প্রাসাদের উপবন-বেষ্টিত যে অংশে অজয় সিংহের বাস, সেই অংশে অজয় সিংহের উপবেশন-কক্ষে কয়টি উজ্জ্বল দীপ আলোক উদ্গীর্ণ করিয়া কক্ষ আলোকিত করিয়াছে। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে অজয় সিংহ কোন কার্য্যে বাহিরে গিয়াছিলেন—এখনও ফিরেন নাই। রেবার মনে হইতেছিল, সে বড় একা। তাই এ ঘর ও ঘর করিয়া—গৃহসজ্জার নানা দ্রব্য নাড়িয়া চাড়িয়া যূথিকার মালাটি কবরীতে জড়াইয়া ক্রমে সে স্বামীর বসিবার ঘরে আসিয়া উপনীতা হইয়াছিল।

সে কক্ষে একখানি মর্ম্মর-রচিত—কারুকার্য্য-খচিত আসনে অজয় সিংহের মস্যাধার লেখনী প্রভৃতি থাকিত। রেবা মধ্যে মধ্যে তাহার উপর অজয় সিংহের নূতন নূতন রচনা পাইত। অজয়সিংহ কোন নূতন গান রচনা করিলে প্রথমে পত্নীকে শুনাইতেন। ঘটনাক্রমে রচনা শেষ হইলে—পত্নীকে শুনাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে অন্যত্র যাইতে হইলে রেবা যখন কক্ষে আসিয়া গান দেখিয়া যাইত, তখন স্বামী আসিলে সে প্রথমেই স্মৃতি হইতে সে গানের আবৃত্তি করিয়া শুনাইত। তাহা লইয়া পতিপত্নীতে কত রহস্যালাপ হইত। রেবা বলিত, "তুমি অনাদর করিয়া না শুনাইলে আমি কি আর তোমার রচনার কথা জানিতে পারি না ?" অজয় সিংহ বলিতেন, "কেহ আদর করিয়া চুরি করিলে আমি আর কি করিব ?"

আজও রেবা সেই আসনোপরি অজয় সিংহের নূতন রচনা—"কেন—জীবন না যায় ?" পাইল।

রেবা কয়বার গানটি পড়িল—তাহার পর ধীরে ধীরে সুরে গাহিবার চেষ্টা করিল—দুই একবার চেষ্টার পর সুর মিলিল—কাণে বোধ হইল মিলিয়াছে। তখন রেবা গানটি গাহিতে লাগিল। আরম্ভে স্বর অতি মৃদু—পাছে কেহ শুনিতে

পায়। কিন্তু ক্রমে রেবা কিছু আত্মবিস্মৃতা হইয়া পড়িল—আজও ত আকাশে মেঘ—আর আজ এই সন্ধ্যায় তাহার ত বড় একা বোধ হইতেছে। কবিরা কেমন করিয়া মনের চঞ্চল ভাবটিকে ভাষায় চিরস্থায়ী করেন? আত্মবিস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কোচ অন্তর্হিত হইয়া গেল; তাই কণ্ঠস্বরও কিছু উচ্চ—সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল; রেবা আসনে দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি দিয়া আঘাত করিয়া তাল দিতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কার-শিঞ্জিতের মধুর ধ্বনি কণ্ঠোদ্ভূত সুধা-মধুর সুরের সঙ্গে মিশিতে লাগিল। মধুরে, মধুরে মিশিল। রেবা আত্মহারা হইয়া স্বামীর সেই গীত গাহিতে লাগিল।

রেবা জানিতে পারে নাই, অজয় সিংহ তাহার পশ্চাদ্দিকে দ্বারে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার ওষ্ঠাধারে মৃদু হাসি নদীর তরঙ্গে রবিকরের মত খেলা করিতেছিল। সৈনিকবেশে রেবার পিতৃগৃহের বিকশিত উপবনে তিনি রেবার কণ্ঠে আপনার গীত শুনিয়া মনে করিয়াছিলেন—গান সার্থক ও তিনি আপনি ধন্য হইলেন। তাহার পর তিনি কত দিন রেবাকে গান গাহিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সরম-সঙ্কোচে রেবা তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারে নাই; তিনি সেই উপবনে তাহার গানের কথা বলিলে সে লজ্জা পাইত। তাই আজ গান শুনিয়া অজয় সিংহ মনে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন।

গান শেষ করিয়া রেবা আপনার পবন-চঞ্চল ওড়না দিয়া আসনখানি মুছিতে প্রবৃত্ত হইতেছিল;—সে আসন তাহার নিকট দেবতার বেদীর মত পবিত্র।—এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কৌতুক-কম্পিত কণ্ঠে অজয় সিংহ বলিলেন—"আজ আমার গান-রচনা সার্থক হইল।"

রেবা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। দ্বারপ্রান্তে—অজয় সিংহ; দীপালোকে তাহার দীর্ঘ ছায়া তাঁহার চরণ হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত স্বচ্ছান্ধকারে আবৃত করিয়াছে—কৌতুক-প্রদীপ্ত আননে উজ্জ্বল দীপালোক।

রেবা লজ্জায় নয়ন নত করিল—তাহার মুখমণ্ডল শোণিমা-রঞ্জিত হইয়া উঠিল—যেন সহসা অবরোধমেঘমুক্ত বালাতপ-করে বিকশিত, আপনার সৌরভে আপনি পরিপূর্ণ গোলাপ আপনার সৌরভ-সুধা, সৌন্দর্য্য-সম্পদ ও মধু-মাধুরী লইয়া ভ্রমরের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। পত্নীর সেই ব্রীড়াসঙ্কুচিত মূর্ত্তি অজয় সিংহের নয়নে অসামান্য-মাধুরীময় বোধ হইল। অজয় সিংহ অগ্রসর হইলেন—পত্নীর নিকটে আসিয়া বসিলেন;—সেই কুসুম-কোমল ওষ্ঠাধরে চুম্বন করিলেন। স্বামীর আদরে রেবার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল—কুসুমের হৃদয় শিশির-বিন্দুতে ভরিয়া উঠে।

সন্ধ্যার সান্দ্র অন্ধকার প্রেমিক-প্রেমিকার চিরপ্রিয়—তখন লজ্জারক্তরাগ অদৃশ্য হইয়া আইসে—কিন্তু হৃদয় তাহা অনুভব করে, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের পুলক যে নিবিড়তা লাভ করে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। আজ সন্ধ্যায় রেবার মনে হইতেছিল—জীবন যেন বিকশিত কুসুমের মাল্য—তাহার স্খলিতদল কুসুমগুলির জন্য দুঃখিত না হইয়া মাল্যের ঘন সুগন্ধ সম্ভোগ করাই সুখ। আজ তাহার মনে হইতেছিল—জীবন কি সুখের!

সুখাতিশয্যে রেবা কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। তাহার পর সে জিজ্ঞাসা করিল—"আজ তুমি কোথায় গিয়াছিলে?"

অজয় সিংহ বলিলেন, "নদীকূলে।"

"কেন?"

"রাজা আজ নদীকূলে গিয়াছিলেন। তিনি আমাকে তাঁহার সহিত যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন।"

"কি জন্য?"

"তাহা এখনও জানিতে পারি নাই। তবে তিনি যেরূপ তন্ন তন্ন করিয়া সেতুটি পরীক্ষা করিলেন, তাহাতে বোধ হয়, সেতু ভাঙ্গিয়া অন্য কোনরূপ সেতুর নির্ম্মাণ করাইবেন।"

"এ সেতু কি জীর্ণ হইয়াছে?"

"না। অল্পদিন হইল—বর্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহার বার্ষিক সংস্কার হইয়া গিয়াছে।"

"তবে তাহা ভাঙ্গিবার প্রয়োজন?"

"সেতু যে ভাঙ্গা হইবে, তাহা আমার অনুমানমাত্র। রাজা এখনও কোন কথা কহেন নাই। সম্ভবতঃ আগামী কল্য বা আর কোন দিন জানিতে পারিব।"

"কিরূপে?"

"যখন আমাকে সঙ্গে যাইতে বলিয়াছিলেন, তখন উদ্দেশ্যের বিষয়ও বোধ হয় জানাইবেন; আজ সঙ্গে অনেক লোক ছিল, হয় ত তাই বলেন নাই। মন্ত্রগুপ্তি উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রধান উপকরণ।"

রেবা জিজ্ঞাসা করিল "নদীর প্রবল জলস্রোত কি প্রশমিত হইয়াছে?"

অজয় সিংহ বলিলেন, "হঁা। প্রবলস্রোত অল্পকাল স্থায়ী হয়। যখন অতিরিক্ত বর্ষণে পর্ব্বতাদি হইতে জলরাশি সহসা নদীতে আসিয়া পড়ে, তখনই

বন্যা আইসে। সে বন্যা অল্পকাল স্থায়ী হয়। তাহার পর নদী আবার উপলে উপলে বেণী বিনাইয়া ধীর মধুর গতিতে বহিয়া যায়। কিন্তু তাহার সেরূপ মধুর গতির এখনও বিলম্ব আছে।”

“নদীর সৌন্দর্য্য তোমার বড় ভাল লাগে।”

“হাঁ। কত রূপ—কত মূর্ত্তি—কি সৌন্দর্য্য! নদী দেখিলে আমার তোমায় মনে পড়ে।”

“আমাকে!”

“আজও নদীকূলে দাঁড়াইয়া আমার কেবল তোমাকে মনে পড়িতেছিল, আর উভয়ের সাদৃশ্য দেখিতেছিলাম।”

“সে কি?”

“সে ভাব আমি ভাষায় বদ্ধ করিতেছিলাম।”

“দেখি।”

“আমি লিখিয়া দিতেছি।”

অজয় সিংহ লেখনী লইয়া লিখিতে লাগিলেন,—রেবা উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতে লাগিল:—

‘স্রোতস্বতি, তুমি মম জীবন-সঙ্গিনী-সম,—
এই মুখে হাসি রাশি—এই অন্ধকার!
প্রেমের মধুর আলো এই ত নয়নে জ্বাল,
এই অভিমান-ম্লান আনন তোমার!
এই ক্ষুদ্র প্রবাহিণী, এই কূল-বিপ্লাবিনী,
এই মুখ হাসিমাখা—এই আঁখিজল!
এই ক্ষীণ স্রোতস্বতী, এই তীব্র-বেগবতী
সাগরে ছুটিয়া চল করি’ কল কল!
এই আসি বেলা’পরে লুটি’ পড় প্রেমভরে,
এই টুটি’ বেলা পুন বহি’ চলি যাও!
এই সঙ্কুচিতা হেন লাজে জড়সড় যেন
এই বিজয়ীর মত গরবে তাকাও!
এই রবি-আলো দিয়ে উজলিতে চাহ হিয়ে
হৃদয়ে ছড়াও এই নিবিড় আঁধার!
তাই বলি নদী মম জীবন-সঙ্গিনী-সম—
এক ভাবে গড়া হৃদি চঞ্চল দোঁহার।

রেবা বলিল, “আমাদের তোমরা কেবল চঞ্চল দেখ?”

অজয় সিংহ বলিলেন, "দেখ যাহা লিখিয়াছি—সত্য কি না।"

"কেন?"

"এই দেখ, দেখিতে দেখিতে তোমার মুখ অভিমানে অন্ধকার হইয়া উঠিল।"

রেবার মুখের সে অন্ধকার কাটিয়া গেল—তাহার ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল—যেন তিমিরাবগুণ্ঠিত উপত্যকা রবিকরে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অজয় সিংহ সাদরে পত্নীর মুখ-চুম্বন করিয়া বলিলেন, "চঞ্চলে কি সৌন্দর্য্যের অভাব? সাগরের গাম্ভীর্য্যে যেমন সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান—নদীর চাঞ্চল্যে তেমনই সৌন্দর্য্য সপ্রকাশ; ইহাতে অভিমান কেন, রেবা?"

রেবা মধুর হাসি হাসিল।—যেন বসন্তের প্রথম প্রভাতে—তরুণ অরুণ-কিরণে মুকুলিত উপবন বিকশিত হইয়া উঠিল।

অজয় সিংহ অনিমেষ নয়নে সেই সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন।

ক্ষুদ্র।

কণা কণা জলে বিশাল সিন্ধু
কণা কণা ধূলি গিরি;
ক্ষণে ক্ষণে কাল বর্ষ ও যুগ,
অসীমেতে যায় ফিরি;
স্ফুলিঙ্গের কণা-সমষ্টি
বহ্নি ভীষণ মূর্ত্তি,
শৈশব হ'তে শিক্ষা যতেক
জ্ঞান হ'য়ে পায় স্ফূর্ত্তি;
এক এক করি' শত পরিমাণ
অসীম অনেক মহৎ,—
ক্ষুদ্র ত' কভু নহেক তুচ্ছ
ক্ষুদ্র হ'তেই বৃহৎ।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রাচীন ভারতে আর্য্য ও অনার্য্য-সভ্যতার কেন্দ্রস্থল।

(অযোধ্যা—কিষ্কিন্ধ্যা—লঙ্কা।)

রামায়ণ ভারতীয় আর্য্য ও অনার্য্য সভ্যতার বিরাট্ মানদণ্ড। আর্য্য সভ্যতার কেন্দ্রভূমি অযোধ্যা; অনার্য্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কা। প্রাচীন আর্য্য-সভ্যতার কেন্দ্রভূমি অযোধ্যা হইতে সেই সুদূর প্রাচীনতম যুগে যে জ্ঞান-গরিমা বিকীর্ণ হইয়াছিল, তাহার প্রভাবে আজও ভারতবর্ষ জগতের জ্ঞান-গুরুরূপে পূজিত হইতেছে।

যে অযোধ্যা এক দিন সভ্যতা ও জ্ঞান-গরিমার কেন্দ্রভূমি বলিয়া পরিচিত ছিল, সেই আদি-সভ্যতার লীলা-নিকেতন অযোধ্যা কিরূপ সম্পদশালী ছিল, মহাকবি বাল্মীকি তাহা তাঁহার অমর তূলিকায় চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা সর্ব্বাগ্রে সেই চিত্র উদ্ঘাটিত করিয়া আমাদের সেই অতীত বিভব মানস-নেত্রে প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করিব।

মহাকবি বাল্মীকি অযোধ্যার যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহা এইরূপ:—

"কোশলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্।
নিবিষ্টঃ সরযূতীরে প্রভূতধনধান্যবান্॥ ৫
অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীল্লোকবিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ যা পুরী নির্ম্মিতা স্বয়ম্॥ ৬
আয়তা দশ চ দ্বে চ যোজনানি মহাপুরী।
শ্রীমতী ত্রীণি বিস্তীর্ণা সুবিভক্তমহাপথা॥ ৭
রাজমার্গেণ মহতা সুবিভক্তেন শোভিতা।
মুক্তপুষ্পাবকীর্ণেন জলসিক্তেননিত্যশঃ॥ ৮
তাং তু রাজা দশরথো মহারাষ্ট্রবিবর্দ্ধনঃ।
পুরীমাবাসয়ামাস দিবি দেবপতির্যথা॥ ৯
কপাটতোরণবতীং সুবিভক্তান্তরাপণাম্।
সর্ব্বযন্ত্রায়ুধবতীমুষিতাং সর্ব্বশিল্পিভিঃ॥ ১০
সূতমাগধসম্বাধাং শ্রীমতীমতুলপ্রভাম্।
উচ্চাট্টালধ্বজবতীং শতঘ্নীশতসঙ্কুলাম্॥ ১১

বধূনাটকসঙ্ঘৈশ্চ সংযুক্তাং সর্ব্বতঃ পুরীম্।
উদ্যানাম্রবনোপেতাং মহতীং শালমেখলাম্॥ ১২
দুর্গগম্ভীরপরিখাং দুর্গামন্যৈর্দুরাসদাম্।
বাজিবারণসম্পূর্ণাং গোভিরুষ্ট্রৈঃ খরৈস্তথা॥ ১৩
সামন্তরাজসঙ্ঘৈশ্চ বলিকর্ম্মভিরাবৃতাম্।
নানাদেশনিবাসৈশ্চ বণিগ্ভিরুপশোভিতাম্॥ ১৪
প্রাসাদৈ রত্নবিকৃতৈঃ পর্ব্বতৈরিব শোভিতাম্।
কূটাগারৈশ্চ সম্পূর্ণামিন্দ্রস্যেবামরাবতীম্॥ ১৫
চিত্রামষ্টাপদাকারাং বরনারীগণাযুতাম্।
সর্ব্বরত্নসমাকীর্ণাং বিমানগৃহশোভিতাম্॥ ১৬
গৃহগাঢ়ামবিচ্ছিদ্রাং সমভূমৌ নিবেশিতাম্।
শালিতণ্ডুলসম্পূর্ণামিক্ষুকাণ্ডরসোদকাম্॥ ১৭
দুন্দুভীভির্মৃদঙ্গৈশ্চ বীণাভিঃ পণবৈস্তথা।
নাদিতাং ভৃশমত্যর্থং পৃথিব্যাং তামনুত্তমাম্॥ ১৮
বিমানমিব সিদ্ধানাং তপসাধিগতং দিবি।
সুনিবেশিতবেশ্মান্তাং নরোত্তমসমাবৃতাম্॥ ১৯ *

(আদি—৫ম সর্গ।)

---

* উদ্ধৃত অংশের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রদত্ত হইল—

"কোশল দেশে সরযূতীরে অযোধ্যা নগরী অবস্থিত। সেই নগরী বহু সুবিভক্ত রাজ-পথে সুশোভিত। রাজপথগুলি সর্ব্বদা সলিলসিক্ত ও প্রস্ফুটিত পুষ্পে বিকীর্ণ। এই সুবৃহৎ নগরী দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও ত্রিযোজন বিস্তৃত এবং বহু তোরণ ও কপাট-সমন্বিত। রাজ-পথগুলির উভয় পার্শ্ব পণ্য-পরিপূর্ণ আপণশ্রেণীতে পরিশোভিত। স্থানে স্থানে যন্ত্র ও অস্ত্রসমূহ শোভিত। কোন স্থলে শিল্পিগণের বাসস্থান। উন্নত-প্রাকার-শীর্ষে ধ্বজাবলি বায়ুবেগে উড্ডীন হইতেছে; প্রাকারের উন্নত স্থানে শত শত শতঘ্নী (কামান) স্থাপিত। নগরের স্থানে স্থানে উদ্যান ও আম্রকানন—তাহার চতুর্দ্দিকে সুবিন্যস্ত শালবৃক্ষশ্রেণী শোভিত। স্থানে স্থানে বধূদিগের নাট্যশালা। নগর চতুর্দ্দিকে গভীর-জল-পরিপূর্ণ-দুর্গ-পরিখা-বেষ্টিত সুতরাং দুর্গম এবং শত্রুরক্ষিত।

"নগরীর কোন স্থানে হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, গো, গর্দ্দভ, প্রভৃতি রক্ষিত হইয়াছে। কোন স্থানে সামন্ত রাজগণের বাসভবন। কোন স্থানে বিভিন্নদেশবাসী বণিক্‌সম্প্রদায় বাস করিতেছেন। কোথাও রত্ন-প্রাসাদসমূহ অত্যুচ্চ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কোথায়ও সূত ও মাগধগণ বাস করিতেছে। কোথায় বা বিহারার্থ গুপ্তগৃহ ও সপ্ততল গৃহরাজি অবস্থিত।

"নগরী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধনধান্য-পরিপূরিতা এবং ইক্ষুরসতুল্য সুস্বাদুপানীয়-জল-শালিনী। চতুর্দ্দিকে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, বীণা ও পণব-সমূহ ধ্বনিত হইতেছে। ইত্যাদি

এই অমরাবতীতুল্যা অযোধ্যাই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্রভূমি।

মহাকবির এই বর্ণনা হইতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ অনুভূত হইবে। প্রাচীন ভারতের সেই বিশাল রাজধানীর দৈর্ঘ্য ৯৬ মাইল ও প্রস্থ ২৪ মাইল ছিল। * ইহার পরিমাণফল বর্ত্তমান সময়ের একটি বৃহৎ জিলার সমান। এই রাজধানী দুর্গম দুর্গ ও জলপূর্ণ সুগভীর পরিখা-বেষ্টিত ছিল।

অযোধ্যার কতখানি স্থান প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ছিল, রামায়ণের উপর্য্যুক্ত বর্ণনা হইতে তাহা নিশ্চিত অবগত হওয়া যায় না।

আদিকাণ্ডের ৬ষ্ঠ সর্গের—

"সা যোজনে দ্বে চ ভূয়ঃ সত্যনামা প্রকাশতে।"

—শ্লোক হইতে দুই যোজন পরিমাণ স্থানই প্রকৃত অযোধ্যা বলিয়া পরিচিত ছিল, ইহা অবগত হওয়া যায়। এই দুই যোজন স্থানই সম্ভবতঃ দুর্গম পরিখায় ও প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল।

এই প্রাচীর কি উপকরণে নির্ম্মিত ছিল, রামায়ণে তাহার উল্লেখ নাই। তৎকালে প্রস্তরের ও ইষ্টকের প্রচুর ব্যবহার ছিল, তাহা উপর্য্যুক্ত বর্ণনা হইতেও জানা যায়; সুতরাং ঐ দুই সামগ্রীর সমন্বয়ে বা ইহার কোন একটির দ্বারা যে এই সুদৃঢ় দুর্গপ্রাচীর নির্ম্মিত ছিল; তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। †

---

* মুসলমান ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আইন-ই' আকবরিতে অযোধ্যার প্রাচীন রাজধানী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহার ইংরাজি অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"In ancient times this city is said to have measured 148 coss in length and 36 coss in Breadth. Upon shifting the earth which is round this City small grains of gold are sometimes found in it. The town is esteemed one of the most sacred places in antiquity."—H. Blockman.

† ঐতিহাসিক হুইলার তাঁহার History of India (Ramayana) গ্রন্থে অযোধ্যার প্রাচীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"His (Dasarath's) palace was magnificent and esplendent, but in discribing the walls the Brahmanical bard has indulged in a simile which furnishes a glimpse of the reality. They were so tall that the birds could not fly over them and so strong that no beast could force its way through them. From this it is evident that the walls could not have been made of brick or stone; for in that case the

এই প্রাচীরের ঊর্দ্ধ দেশে স্থানে স্থানে শতঘ্নী অস্ত্র সমূহ (কামান) * স্থাপিত থাকিত। দুর্গরক্ষার্থ আধুনিক কালেও এইরূপ প্রণালীতে কামান রক্ষিত হইয়া থাকে।

রাজধানী "কবাট ও তোরণবতী" ছিল। রাজধানীর কয়টি বহির্দ্বার ছিল, তাহার উল্লেখ রামায়ণে নাই। গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা হইতে নগরের চারিদিকে চারিটি দ্বার ছিল বলিয়াই অনুমান করা যায়। দ্বারগুলি বিশেষ বিশেষ নামে পরিচিত ছিল। পশ্চিমের "বৈজয়ন্ত দ্বার"-পথে ভরত রাজগৃহ হইতে আসিয়া নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন;—

---

attempt of a beast to force his way through them would never have entered the mind of the bard. In all probbability the palace was surrounded by a hedge which was sufficiently strong to keep out wild beasts or stray cattle."—অর্থাৎ "দশরথের রাজপ্রাসাদ সমৃদ্ধিশালী ছিল, কিন্তু পুরীর প্রাচীর বর্ণনায় কবি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে প্রকৃত সত্যের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। (কবি লিখিয়াছেন) "প্রাচীরগুলি এত উচ্চ ছিল যে, পক্ষী তাহার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে পারিত না, এবং এত দৃঢ় ছিল যে, কোন পশুই তাহার ভিতর দিয়া পথ করিয়া যাইতে পারিত না।" কবির এই উক্তি হইতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, অযোধ্যার এই প্রাচীর কখনই ইষ্টক কিম্বা প্রস্তরের নির্ম্মিত ছিল না। যদি তাহা হইত, তবে পশু ভাঙ্গিয়া পথ করিয়া যাইবার অলীক কল্পনা কখনই কবির মনে প্রবেশ করিত না। যাহা হউক, সম্ভবতঃ অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ বংশবৃতি-বেষ্টিত ছিল—অবশ্য খুব মজবুত বেড়া ছিল—তাহা ভাঙ্গিয়া কোন প্রকারের পশুই রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিত না।

হুইলারের রামায়ণ-জ্ঞান ভ্রান্তিসঙ্কুল; সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্ত নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। তিনি স্বয়ং সংস্কৃত জানিতেন না। অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট রামায়ণ ও মহাভারত শ্রবণ করিয়া উক্ত গ্রন্থদ্বয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি যে কিরূপে রামায়ণ হইতে এই সকল উদ্ভট তত্ত্ব বাহির করিয়াছেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। প্রাচীর এত উচ্চ ছিল যে, পক্ষী তাহার উপর দিয়া উড়িতে পারিত না, এত দৃঢ় ছিল যে, বন্য পশু ভাঙ্গিয়া পথ করিয়া যাইতে পারিত না। এই সকল উদ্ভট তত্ত্ব আমরা মহাকবির বর্ণনায় দেখিতে পাইতেছি না। আর্য্য রামায়ণে প্রাচীরের উল্লেখই অতি অস্পষ্টভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। "উচ্চাট্টালধ্বজবতীং শতঘ্নীশতসঙ্কুলাম্।" এই শ্লোক হইতে রামায়ণের টীকাকার রামানুজ প্রাকারের অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত রামায়ণের আর কোন স্থানে অযোধ্যার প্রাকারের উল্লেখ নাই। দুর্গ-পরিখার উল্লেখে লিখিত আছে "দুর্গগম্ভীরপরিখাং দুর্গামন্যৈর্দুরাসদাম্।"

* শতঘ্নী—যাহাদ্বারা শত সংখ্যক জীব একেবারে নিহত বা আহত হয় এইরূপ অস্ত্র। ইহা আধুনিক কামান না হইলেও কোনরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীসঙ্গত কামান জাতীয় দ্রব্য ইহাতে সন্দেহ নাই।

"দ্বারেণ বৈজয়ন্তেন প্রবিশাচ্ছ্যুন্তবাহনঃ।"

নগরী প্রশস্ত রাজপথে সুবিভক্ত ছিল। এই রাজপথগুলি প্রতিদিন জল-ধারায় সিক্ত ও পুষ্পগন্ধে আমোদিত থাকিত। সময় সময় ধূপ, চন্দন এবং অগুরু-গন্ধেও রাজপথগুলি আমোদিত করা হইত। এইরূপ ব্যবস্থা বোধ হয় দুর্গন্ধ-নাশের জন্যই হইত। বিশেষ উৎসব উপলক্ষে রাজপথসমূহে দীপবৃক্ষ প্রোথিত করিয়া তাহাতে আলোক প্রদান করিয়া রাজধানীকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করা হইত। রামাভিষেকের উৎসব-দিনে রাজপথে এইরূপ আলোক প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

প্রকাশীকরণার্থঞ্চ নিশাগমন-শঙ্কয়া।
দীপবৃক্ষাং স্তথা চক্রুরনুরথ্যাসু সর্ব্বশঃ॥ ১৮
(অযোধ্যা ; ৬ সর্গ।)

রাজপথের উভয় পার্শ্বে পণ্যবীথিকা। ঐ সকল পণ্যবীথিকায় নিচ্ছিদ্র মুক্তা, উত্তম স্ফটিক, পট্ট বস্ত্র, কৌষেয় বস্ত্র ইত্যাদি শোভা পাইত। (অযোধ্যা—১৭ সর্গ)

রাজধানীতে বিভিন্ন স্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজগণের অস্থায়ী বাসভবন ছিল। এরূপ ব্যবস্থা বর্ত্তমান সময়েও প্রত্যেক সভ্য দেশেই অনুষ্ঠিত হইতেছে। সামন্ত রাজগণ যে সকলেই অযোধ্যায় বাস করিতেন, তাহা নহে। তাঁহাদের বাস-ভবনে প্রতিনিধিগণ থাকিয়া রাজধানীর প্রত্যাহিক বিবরণ স্ব স্ব প্রভুদিগকে জানাইতেন।

রাজধানীর এক দিকে উদ্যান। উদ্যানে গুপ্ত গৃহ ও বধূ-নাট্যশালা ছিল। নাট্যশালায় নাটকাভিনয় হইত, ইহা বলাই বাহুল্য।

রাজধানীর ইহাই সাধারণ বর্ণনা। ইহার পর ব্যক্তিবিশেষের পৃথক্ পৃথক্ আবাসবলীরও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এবং চিত্র রামায়ণে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার দ্বারাও প্রাচীন রাজধানীর সভ্যতা-সম্পদ প্রকটিত হইবে। আমরা পাঠকগণকে লইয়া ক্রমে রাজধানীর সেই সকল বিচিত্র গৃহ ও কক্ষসমূহের চিত্র প্রত্যক্ষ করিব।

ঐ যে অদূরে শরৎকালীন নিবিড়-মেঘ-সদৃশ এবং কৈলাস-শৃঙ্গোপম প্রাসাদ-শিখর দেখা যাইতেছে, ইহাই অযোধ্যার রাজ-ভবন।

"তৎ পৃথিব্যা গৃহবরং মহেন্দ্রসদনোপমম্।"

এই ইন্দ্রপুরীতুল্য রাজভবন অষ্টাধিক বৃহৎ খণ্ডে বা কক্ষে বিভক্ত। প্রথম

কক্ষে সভাগৃহ। রাজগৃহে প্রবেশ করিতেই সুবিশাল দ্বার। এই দ্বার "রাজদ্বার" নামে পরিচিত। রাজদ্বার সশস্ত্র দ্বারপালগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। এই রাজদ্বার এত বিশাল যে, ইহার মধ্য দিয়া আরোহিসহ সুবৃহৎ হস্তী ও রথ অনায়াসে গমনা-গমন করিত।

প্রথম কক্ষের পর দ্বিতীয় কক্ষ। এই কক্ষ যজ্ঞশালা। রাজ্যাভিষেক-দিনে এই দ্বিতীয় কক্ষে জন-সাধারণ সমবেত হইয়া অভিষেক-ক্রিয়ার প্রতীক্ষা করিতেন। এই কক্ষ পর্য্যন্ত অন্তঃপুর-চারিকাগণ আগমন করিতে পারিতেন।*

অতঃপর তৃতীয় কক্ষ বা মহল। তৃতীয় কক্ষ পর্য্যন্ত অশ্ব-সংযোজিত রথ গমনাগমন করিবার ব্যবস্থা ছিল। এই সকল কক্ষের দ্বারগুলি ধানুষ্কিগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত থাকিত। রামের রথ তৃতীয় কক্ষে যাইয়া পঁহুছিলে রাম রথ হইতে অবতরণ করিয়া ৪র্থ ও ৫ম কক্ষ পদব্রজে অতিক্রম করতঃ শুদ্ধান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পঞ্চম কক্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুচরগণ তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল।

শুদ্ধান্তঃপুরে রাজমহিষীগণ বাস করিতেন। এই শুদ্ধান্তঃপুরে রাজ অনুচর ও কিঙ্করগণের প্রবেশাধিকার ছিল না। তথায় নপুংসক ও ধাতৃগণ কার্য্য করিত। (অযোধ্যা—৫৬সর্গ)

শুদ্ধান্তঃপুরও বহু কক্ষে বিভক্ত ছিল। এই বহু কক্ষমধ্যে আপাততঃ দুই শ্রেষ্ঠা মহিষীর দুইটি কক্ষের উল্লেখ রামায়ণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রাজা দশরথ রামাভিষেকের প্রিয় সংবাদ প্রিয়তমা পত্নীদিগের নিকটে জ্ঞাপন করিতে অন্তঃপুরে যাইতেছেন।

এই অন্তঃপুর মধ্যমা মহিষী কৈকেয়ীর।

ইহা লতাচিত্রিত মনোহর গৃহ, অশোক ও চন্দন-বৃক্ষ-শোভিত; স্বর্ণ ও গজদন্ত নির্ম্মিত বেদী শোভিত। অদূরে ক্রৌঞ্চ ও হংসরবে প্রতিধ্বনিত সরোবর। স্থানে স্থানে স্বর্ণ ও গজদন্তের আসন। বিবিধ ফল-পুষ্প-সম্বলিত শুক-ময়ূর-কূজিত অটবিশ্রেণী।† ইহাই ভরত-জননী কৈকেয়ীর অন্তঃপুর।

---

* রামের বনগমনের সময় মহিলাগণ ১ম কক্ষ পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন।

† লতাগৃহৈশ্চিত্রগৃহৈশ্চম্পকাশোক শোভিতৈঃ।
দান্তরাজতসৌবর্ণবেদিকাভিঃ সমাযুতম্॥ ১৩
নিত্যপুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈর্বাপীভিরুপশোভিতম্।
দান্তরাজত সৌবর্ণৈঃ সংবৃতং পরমাসনৈঃ। ১৪

এই অন্তঃপুরের গৃহ-চূড়ায় উঠিয়াই মন্থরা উৎসবময়ী নগরীর বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়া রামাভিষেকের সংবাদ অবগত হইয়াছিল। সুতরাং এই অন্তঃপুরের সৌধাবলী যে দ্বিতল, ত্রিতল বা সপ্ততল ছিল ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।*

কৈকেয়ীর অন্তঃপুরের পরেই অন্যান্য মহিলাগণের বাস-মহল। এই মহলে বোধ হয় দশরথের কোন কোন স্ত্রী বাস করিতেন। এই কক্ষের বিশেষ উল্লেখ রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় না। অতঃপর অষ্টম কক্ষ। এই অষ্টম কক্ষে রাম-জননী কৌশল্যা বাস করিতেন। সুমন্ত্র রামকে বনে রাখিয়া আসিয়া এই প্রকোষ্ঠে রাজা দশরথকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

"স প্রবিশ্যাষ্টমীং কক্ষ্যাং রাজানং দীনমাতুরম্।
পুত্রশোকপরিদ্যূনঃ পশ্যাৎপাণ্ডুরে গৃহে॥" ২।৫৭।২৪।

এই অষ্টম কক্ষের দ্বার বৃদ্ধ-মহিলাগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইত। রাম বন-গমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যখন জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, তখন দ্বাররক্ষী বালিকা ও বৃদ্ধাগণ যাইয়া কৌশল্যাকে রামের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিল।

এই অন্তঃপুরে যুবতী কৈকেয়ীর অন্তঃপুরের ন্যায় বিচিত্র লতা-পুষ্পে চিত্রিত গৃহাদি ছিল কি না তাহার উল্লেখ রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় না। এ স্থানে কয়েকটি অতিরিক্ত গৃহ ও দেব-গৃহ ছিল।

এই প্রকোষ্ঠের গৃহগুলিও দ্বিতল, ত্রিতল বা ততোধিক উচ্চতল-বিশিষ্ট ছিল। এই প্রকোষ্ঠ-প্রাসাদোপরিস্থিতা রামধাত্রীর নিকট হইতেই মন্থরা রামাভিষেক-বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং, কৈকেয়ীর ও কৌশল্যার প্রকোষ্ঠদ্বয় যে পাশা-পাশি ছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

অষ্টম প্রকোষ্ঠেই যে অন্তঃপুর শেষ হইয়াছে, এরূপ মনে করা যায় না। রাজা দশরথের তিন শত পঞ্চাশ জন পত্নী ছিলেন। এই সাড়ে তিনশত পত্নীর প্রত্যেকের দুই একটি করিয়া পরিচারিকাও ছিল। তাঁহাদের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ প্রকোষ্ঠ না হইলেও পৃথক্ পৃথক্ গৃহ ছিল। সুতরাং এই রাজঅন্তঃপুর যে একটি সুবিশাল অন্তঃপুর ছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

রাজ-প্রাসাদ ও রাজ-অন্তঃপুর ব্যতীত রাজকুমারদিগেরও পৃথক্ পৃথক্ ভবন ছিল। রামায়ণে রামভবনের উল্লেখ ও বর্ণনা আছে।

* অযোধ্যায় সপ্ততল গৃহ ছিল, তাহা রাজধানীর বর্ণনায় অবগত হওয়া যায়। সুতরাং, তাহা রাজঅন্তঃপুরে ছিল, ইহা অনুমান করা যাইতেছে।

ঐ যে অদূরে—

মহাকপাটপিহিতং বিতর্দ্দিশতশোভিতম্।
কাঞ্চনপ্রতিমৈকাগ্রং মণিবিদ্রুমতোরণম্॥ ৩১
শারদাভ্রঘনপ্রখ্যং দীপ্তং মেরুগুহাসমম্।
মণিভির্বরমাল্যানাং সুমহদ্ভিরলঙ্কৃতম্॥ ৩২
মুক্তামণিভিরাকীর্ণং চন্দনাগুরুভূষিতম্।
গন্ধান্ মনোজ্ঞান বিসৃজদ্দার্দ্দুরং শিখরং যথা॥ ৩৩
সারসৈশ্চ ময়ূরৈশ্চ বিনদ্ভির্বিরাজিতম্।
সুকৃতেহা মৃগাকীর্ণং সুৎকীর্ণং ভক্তিভি স্তথা॥ ৩৪
মনশ্চক্ষুশ্চ ভূতানামাদদত্তিগ্মতে জসা।
চন্দ্র ভাস্করসঙ্কাশং কুবেরভবনোপমম্॥ ৩৫

(অযোধ্যা ১৫ সর্গ)

ইহাই রাম-ভবন। পাঠক মহা কবির এই বর্ণনা হইতে রাম-ভবনের বিচিত্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। রাম-ভবনও শুদ্ধান্তঃপুরসহ চারি-কক্ষ-সমন্বিত ছিল।

ইহাই প্রাচীন আর্য্য ভারতের রাজধানীর চিত্র। এই চিত্র যে অতিশয়-উক্তি দোষ দুষ্ট নহে, একথা আমরা বলিতে পারি না। কবি-কল্পনার মধ্যেও বাস্তবের আভাস ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে; সমসাময়িক জাতির ও সমাজের আচার, ব্যবহার, রুচি ও সভ্যতার চিহ্ন প্রকটিত হয়। সেই আভাস ও চিহ্নই জাতীয় সভ্যতার পরিচায়ক। তাহার দ্বারাই জাতীয় সভ্যতার পরিমাণ করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

হাসি ও অশ্রু।

সংসারের চিত্রশালে,
জীবনের ছবিগুলি,
হাসি-অশ্রু দিয়ে লিখে—
অদৃষ্ট নিয়তি-তুলি।

হাসি দিয়ে লেখা ছবি,
মুহূর্ত্তে মিলায়ে যায়!
অশ্রুতে চিত্রিত ছবি,
চিরতরে দীপ্তাভায়!

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার।



By Courtesy of the DACCA REVIEW.

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু

Sreenath Press, Dacca.

ময়মনসিংহ সম্মিলনী।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া গত ২৯শে চৈত্র আমি ময়মনসিংহ যাত্রা করি।

রাণাঘাটে পহুঁছিবামাত্র কাশীমবাজারের মহারাজ মাননীয় মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী-প্রমুখ প্রতিনিধিবর্গ আমাদের সহিত মিলিত হইলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে রাজসাহীর প্রতিনিধিগণ আমাদের সহিত মিলিত হইলেন। আরও অনেক প্রধিনিধি নানাস্থান হইতে আসিয়া আমাদের সহযাত্রী হইলেন।

গোয়ালন্দে আমরা ষ্টীমারে উঠিলাম। তখন প্রভাত হইয়াছে। এই সকল প্রতিনিধিকে লইয়া পদ্মার বিশাল বক্ষ মথিত করিয়া ষ্টীমার গন্তব্য নারায়ণগঞ্জের পথে ছুটিয়া চলিল। পদ্মা একদিকে নানা নদ-নদীর সম্মিলনে যেমন মধুর, অন্য দিকে তেমনই ধ্বংসের মূর্ত্তি রূপে বড় কঠোর। এই পদ্মা অতিক্রম করিতে করিতে, এবং পদ্মার মিলনের নৃত্য ও ধ্বংসের ক্রীড়া অবলোকন করিতে করিতে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমে আমরা কীর্ত্তির ধ্বংসকারী পদ্মা যে স্থলে চাঁদরায়ের ও রাজবল্লভের কীর্ত্তিনাশে "কীর্ত্তিনাশা" নাম ধরিয়া অবস্থান করিতেছে তথায় আসিয়া পঁহুছিলাম। পদ্মা উভয়েরই সকল কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়াছে; কেবল চাঁদরায়ের প্রতিষ্ঠিত মাতৃশ্মশানের স্মৃতি স্তম্ভটি এখনও আপনার কুক্ষিগত করে নাই। পদ্মাতীরে এই প্রাচীন স্মৃতিমন্দিরটি চাঁদরায়ের লুপ্ত গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতিরূপে অবস্থান করিয়া পথিকের নিকট কীর্ত্তিনাশার কীর্ত্তিকাহিনী প্রচার করিতেছে। ক্রমে আমরা মেঘনা এবং পদ্মার সম্মিলনক্ষেত্রে—ব্রহ্মপুত্র ও ভাগীরথীর বিশাল সম্মিলন স্থলে আসিয়া পড়িলাম। মেঘদর্শনে, মেঘগর্জ্জনে ব্রহ্মপুত্র ভাগীরথীর সহিত নৃত্য করিতে থাকে বলিয়া এই স্থানে ব্রহ্মপুত্রের নাম "মেঘনাদ।" ক্রমশঃ "মেঘনাদ" শব্দ সংক্ষিপ্ত হইয়া "মেঘনা" নাম ধারণ করিয়াছে। আমরা গত ৩০শে চৈত্র সন্ধ্যা ৭৷৷০ টার সময় ময়মনসিংহ ষ্টেসনে পহুছিলাম।

ষ্টেসনে মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর এবং বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও অপর সাধারণলোক উপস্থিত থাকিয়া সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে ও অন্যান্য প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করিলেন।

শুভ ১লা বৈশাখের শুভ্র রবিরশ্মি ময়মনসিংহ নগরকে উদ্ভাসিত করিয়া দেখা দিল। আজ নববর্ষের নবীন আনন্দের দিনে কমলা এবং বাণীর বরপুত্রগণের সম্মিলনে ময়মনসিংহ বঙ্গের তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিণত। এই শুভ দিনে ব্রহ্মপুত্রের কূলে দাড়াইয়া বাঙ্গালী বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ এক-যোগে বাণীচরণে ভক্তিঅর্ঘ্য প্রদান করিতে সম্মিলিত। এ দৃশ্য বড় মধুর লাগিল।

প্রথম দিন বেলা ১১টা হইতে সভামণ্ডপে লোক-সমাগম হইতে লাগিল। বেলা ২টার সময় দেখা গেল, সভাস্থলে আর তিলধারণের স্থান নাই। সভার কর্ত্তৃপক্ষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন,—প্রতিনিধিবর্গের স্থানসঙ্কুলান কিরূপে হইবে ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন। এদিকে তিনটা বাজিয়া গেল। সভাপতি ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু, মাননীয় মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর আসিলেন ; আর অপেক্ষা করা চলে না, এ দিকে কোথায়ও স্থান নাই, তখন মহা বিপদ বুঝিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয় একজন বেদীস্থলে আসিয়া করজোড়ে ময়মনসিংহের অধিবাসীদিগকে আহ্বান করিয়া কার্য্যের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রায় ১০ মিনিট বক্তৃতার পর অনেক লোক তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন, কিন্তু স্থানসঙ্কুলানের কোনও সুবিধা হইল না। যিনি যে স্থানে পাইলেন, বসিয়া পড়িলেন।

বেলা ৩॥০ টার সময় সভার কার্য্য আরব্ধ হইল। কার্য্যারম্ভে কবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর রচিত একটি বন্দনা সঙ্গীত গীত হইল।

তৎপরে বিগত ভাগলপুর সম্মিলনীর সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের অভিভাষণ তাঁহার অনুপস্থিতি হেতু এবং মাননীয় মহারাজ মনীন্দ্র-চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের অনুমতিক্রমে অপর একজন প্রতিনিধি কর্ত্তৃক পঠিত হইল। সারদা বাবু শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন সভাস্থলে উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং গত বৎসরের বঙ্গ সাহিত্যের বিবিধ বিষয়ক উন্নতির কথা বলিয়া সাহিত্য পারিষদের নানা বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও এ কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ইহার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী মহাশয় গীত গোবিন্দের ছন্দে

স্বরচিত একটি সংস্কৃত শ্লোকে সমাগত প্রতিনিধিবর্গকে অভিনন্দন করিলেন। কবিতাটি ভাষায়, লালিত্যে ও অলঙ্কার-মাধুর্য্যে জয়দেবের পদানুসরণসাফল্য প্রমাণ করিয়াছিল। ইহার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সুসঙ্গাধিপতি মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা বাহাদুর তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। মহারাজ বাহাদুরের জ্ঞানগর্ভ অভিভাষণে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।* তিনি বলিলেন—"মহাকবি জয়দেবের মধুর কোমল কান্ত পদাবলী হইতেই যে চিরকোমলতাময়ী সুললিত বঙ্গভাষা ক্রমে উন্মেষিত হইতে আরব্ধ হইয়াছে এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের অপরিসীম প্রতিভাদ্বারা যে তাহা ক্রমে পুষ্টিলাভ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতঃপর কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস, ভারতচন্দ্র, দাশরথী রায়, নিধুবাবু প্রভৃতি কবিগণ এবং রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ সরকার, অক্ষয় কুমার দত্ত, রঙ্গলাল, ভূদেব মুখোধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, হেমচন্দ্র, রজনীকান্ত, নবীনচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রবীন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি মহামনস্বী বঙ্গসন্তানগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং প্রতিভাবলে বঙ্গভাষা আজ মোহন-মূর্ত্তীতে আমাদের নয়নপথবর্ত্তিণী হইয়াছেন, এবং তাঁহার এই মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া জগৎবাসী বিমুগ্ধ হইয়াছে, এবং আমাদের আশা আছে, তিনি অচিরাৎ ভাষাজগতে অতি বরণীয় স্থান অধিকার করিবেন।" এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে কি? মহারাজ বাহাদুর সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া উপসংহারে বলিলেনঃ— "বঙ্গসাহিত্যের তরুমূলে সুশীতল বারি সেচন-মানসে যে সমস্ত মহাজন সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহে এবং প্রযত্নে এই তরু শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতঃ অচিরে মুকুলিত হউক, এবং তাহা সুদৃশ্য পুষ্পে বিশোভিত এবং সুমধুর ফলভরে অবনত হইয়া তাহার স্নিগ্ধ ছায়া দানে বঙ্গসন্তানকে অপার শান্তি প্রদান করুক ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা। বাণীচরণাশ্রিত বাণীপুত্রগণের মনোবাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে আমাদের অধিকারমাত্র, ফলাফল তাঁহারই হাতে।"

* এই অভিভাষণ নবপ্রকাশিত 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

মহারাজ বাহাদুর উপবেশন করিবার পর ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্ল্যাকউড্ এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলেন:—সাহিত্য সম্মিলনের এই সুন্দর দৃশ্যে আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। ভদ্রমহোদয়গণের উপস্থিতিতে ও সাহিত্য আলোচনায় অনেক উপকার সাধিত হইবে। আমি আশা করি, আপনারা এ কার্য্যে সম্পুর্ণ কৃতকার্য্য হইবেন। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে মহারাজকৃত প্রস্তাবে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

তৎপরে সুসঙ্গাধিপ মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ অনেকগুলি বিশিষ্ট ব্যক্তির সহানুভূতিসূচক টেলিগ্রাম ও পত্র পাঠ করিলেন এবং পরিশেষে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। কাশীমবাজারের মহারাজ মাননীয় মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ইহার পর সভাপতি মহাশয়ের আদেশ লইয়া শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়, শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র কুমার দত্ত মহাশয়ের রচিত একটি কবিতা পাঠ করেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় তাঁহার "বিজ্ঞানে সাহিত্য" নামক গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

অতঃপর ময়মনসিংহের দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ও স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ময়মনসিংহবাসী এই দুই মাহাত্মার স্মৃতিরক্ষা করিবেন।

ইহার পর ভাগলপুরের শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্ত মহাশয় ভাগলপুর সম্মিলনীর কার্য্যবিবরণ উপস্থিত করিয়া তাঁহাদের প্রতি যে সকল কার্য্যভার অর্পিত করা হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করেন। তাঁহার বিবরণে জানা যায় যে, ভাগলপুর সম্মিলনীর কার্য্যবিবরণী নানা বাধাবিঘ্ন হেতু তাঁহারা মুদ্রিত করিতে না পারায় বদান্যপ্রবর মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর নিজ ব্যয়ে ময়মনসিংহ সম্মিলনীর অধিবেশনের দশ দিন মাত্র পূর্ব্বে উহার প্রকাশের ভার লইয়া কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত করিয়া দিয়াছেন। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে এই সুবৃহৎ কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করিয়া দেওয়ার কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে মহারাজ বাহাদুরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিলেন। ভাগলপুরের উপর আর যেসকল ভার ছিল, তাহা আগামী



By Courtesy of the DACCA REVIEW.

মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ

Sreenath Press, Dacca.

সম্মিলনে অনেক পরিমাণে সম্পাদিত হইবে বলিয়া মন্মথবাবু আশ্বাস দিলেন।

ইহার পর রাজসাহীর শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় রাজসাহী সম্মিলনীতে অর্পিত তাদের আলোচনা করিয়া বলিলেন যে, তাবার ক্রমবিকাশ জানিবার পক্ষে নানা অসুবিধায় পড়িয়া তাঁহারা বিলাতে পত্র লিখেন, তদুত্তরে তাঁহারা কতকগুলি ফরম পাঠাইয়া দিয়াছেন। সেই অনুসারে কার্য্য চলিতেছে। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়গণ ইতিহাসে ও পুরাতত্ত্বে মৌলিক গবেষণা করিতেছেন। আরব্ধ কার্য্য আগামী বর্ষে অনেক দূর অগ্রসর হইবে।

ইহার পর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় তৃতীয় অধিবেশনে প্রস্তাবিত রমেশচন্দ্র সারস্বত ভবনের কথার উল্লেখ করিয়া বরোদার গায়কবাড়ের অভিভাবকত্ব গ্রহণ ও মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর এই ভবন নির্ম্মাণের উপযোগী ভূমিদানের কথা জানাইয়া ময়মনসিংহবাসীকে ইহার সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন এবং তৎপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা পাঠ্য পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত সম্বন্ধে নানা কথা বলেন।

ইহার পর মাননীয় মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ভাগলপুর সম্মিলনে প্রস্তাবিত সম্মিলনীর নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন। বরিশালের শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় এই নিয়মের পাণ্ডুলিপি সমর্থন করিলে তাহা সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।* তৎপরে বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির গঠন হইল, এবং শ্রীযুক্ত বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়ের রচিত একটি গীত গীত হইলে প্রথম দিনের কার্য্য শেষ হইল।

দ্বিতীয় দিন পূর্ব্বাহ্ন ৭—৪৫ মিনিটের সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। এই দিন কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়প্রমুখ কয়জন প্রতিনিধি আসিয়া উপস্থিত হয়েন।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃতে মঙ্গলাচরণ পাঠ করেন, এবং সভাপতি মহাশয় কতকগুলি সহানুভূতিসূচক টেলিগ্রাম প্রাপ্তির কথা প্রকাশ করেন। পরে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত

ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় অন্যান্য অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির কার্য্য—যথা বাঙ্গালার মানবতত্ব সংগ্রহ, বাঙ্গালার ভাষাতত্ব প্রভৃতি,—করিবার জন্য ময়মনসিংহবাসীকে অনুরোধ করেন। এই সময় ময়মনসিংহের প্রতিনিধি এবং শিল্প প্রদর্শনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় কতকগুলি আপত্তি উত্থাপন করেন।

ইহার পর শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী মহাশয় দরিদ্র সাহিত্যসেবী-দিগের সাহায্যের জন্য ভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া বলেন যে, "দরিদ্র সাহিত্যিক সংস্থান ভাণ্ডার নামে একটি ভাণ্ডার স্থাপিত করা হউক। তাহা হইতে অসমর্থ গ্রন্থকারদিগকে সাহায্য করা হইবে। আমি এই ভাণ্ডারে এক হাজার টাকা দিব। উপস্থিত পাঁচ শত টাকা দিতেছি। এই টাকা লইয়া এখন কার্য্য আরম্ভ করা হউক। এই ভাণ্ডার জমীর ভাণ্ডাররূপে পরিণত হইবে বলিয়া আমি আশা করি। এই ভাণ্ডার হইতে লেখকদিগকে সাহায্য করিতে হইবে,—জাতিনির্ব্বিশেষে সাহায্য করিতে হইবে। আমার গ্রন্থ—'দশানন বধ' কাব্যের স্বত্ব এই ভাণ্ডারের সাহায্যার্থ দিতেছি; কার্য্যপরিচালনের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ একখানি গ্রাম দিতেছি। আমি নিজেও কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি। ইহার ব্যবস্থার ভার ন্যাসরক্ষকের হস্তে দিতে হইবে।" রঙ্গপুরের শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এই ভাণ্ডারে নগত ২৫৲ টাকা ও তাঁহার প্রণীত কবি রজনীকান্ত সেনের জীবনী গ্রন্থ এক শত খণ্ড প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন।

ইহার পর ময়মনসিংহ শাখা পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় "ময়মনসিংহে সাহিত্য চর্চ্চা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। কেদার বাবু ময়মনসিংহে ধীরে ধীরে কেমন বঙ্গসাহিত্যের বিকাশ ঘটিয়াছে তাহা বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বিবরণে জানা যায় যে, ৪৫ বৎসর ধরিয়া বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা ময়মনসিংহে চলিয়া বর্ত্তমান উন্নতির পথে ইহাকে অগ্রসর করিয়াছে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় "আধুনিক নাট্য সাহিত্য" প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহার পর রাজা শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুরের গবাদি পশু সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক পঠিত হইল। রাজা বাহাদুর এই প্রবন্ধে চারণ ভূমির উন্নতির কথায় এই সকল পশুর সাহায্য কত আবশ্যক তাহা বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এই গবেষণাপূর্ণ

প্রবন্ধে অনেক উপকার হইবে সন্দেহ নাই। তৎপরে কবিরাজ শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "আয়ুর্ব্বেদের ক্রমবিকাশ", শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের "পূর্ব্ববঙ্গের নদী-পরিবর্ত্তন" শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের "পল্লী কাহিনী ও পল্লী বিষয়ক কথা" ব্যোমকেশ বাবু পাঠ করেন ও মহম্মদ সহিতুল্লা মহাশয়ের "আরবী ও পারসী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও অক্ষরান্তরীকরণ" প্রবন্ধ পঠিত হয়। সহিতুল্লা মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় অক্ষরান্তরীকরণ বিষয়ে পরিষদ কিরূপ কার্য্য করিতেছেন তাহা বুঝাইয়া দিয়া সহিতুল্লা মহাশয়ের চেষ্টায় হৃষ্ট—তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর তরফদার মহাশয় "জ্যোতিষিক প্রমাণ "প্রবন্ধ পাঠ করেন।

অতঃপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ব্যাকরণ বিভীষিকা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ব্যাকরণ কিরূপ ভীষণ মূর্ত্তিতে আধুনিক বঙ্গসাহিত্যকে কম্পিত করিয়া তুলিয়াছে তাহা অতি মধুর অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সুবিস্তৃত ভাবে সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে ললিত বাবু বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ও ইন্দ্রনাথের পর আর কেহ এরূপ কশাঘাতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া আমার জানা নাই। ললিত বাবুর এই প্রবন্ধ শ্রবণে কেহ কেহ বিরক্ত হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষ উপকার বোধ করিবে। ললিত বাবুর প্রবন্ধ পাঠের পর পূর্ব্বাহ্নের কার্য্য শেষ হয়।

অপরাহ্নে পুনরায় সভার কার্য্য আরব্ধ হইল। পূর্ব্বদিনের শেষ গানখানি গীত হইবার পর শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় ললিত বাবুর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কতককগুলি কথা বলেন ও ললিত বাবু কৈফিয়ৎ দেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের কবিতা শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত শশিমোহন বসাক মহাশয়ের "অদ্বৈত বাদ" পঠিত হয়। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি তাবার ক্রমবিকাশের কথা অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দেন। ইহার পরে 'ভারত মহিলা' সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সরযুবালা দত্ত মহাশয়ার "বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গ নারী" বিষয়ক প্রবন্ধ পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের সমর্থনে এই প্রবন্ধ পাঠের পর সভাস্থলে মহিলার প্রবন্ধ পাঠের জন্য সভাপতি মহাশয় সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে দণ্ডায়মান হইয়া এই মহিলার প্রতি সম্মান প্রদান করিতে বলেন। সকলেই

আনন্দমহকারে এই অনুরোধ র করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত সেন মহাশয়ের "সমাজ ও সাহিত্য" প্রবন্ধ পঠিত হইল। ইহার পর শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় জাতীয় উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের "পৌণ্ড্র বর্দ্ধন", শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালিদাসের গ্রন্থে "বাঙ্গালা ও বাঙ্গলার প্রভাব", শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "মাইকেল"; শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের "ময়মনসিংহে মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদ পত্র" এবং প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত মহাশয়ের "সূতিকা গৃহ" পঠিত হইল। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বেদের উৎপত্তি বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

তৃতীয় দিন পূর্ব্বাহ্ণ ৭-৩০ মিনিটের সময় সভার কার্য্য আরব্ধ হয়। প্রথমে একটি সঙ্গীতের পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের রচিত "সম্মিলন" নামক কবিতা শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপিত করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় সাহিত্য ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া বলিলেন, বঙ্গ ভাষায় অন্যান্য ভাষা হইতে গ্রন্থাদি অনুবাদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ধনভাণ্ডার স্থাপন করা কর্ত্তব্য। কোনও শিশুকে মানুষ করিতে হইলে পিতাকে আদর্শ অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে হয়। শিশু বাঙ্গলা ভাষাকেও সেইরূপে গড়িতে হইবে।

মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন, বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গভাষার অবস্থা দেখিলে বুঝা যায়, ইহার অনেক অভাব আছে। তাহা পূরণ করা সাহিত্যসেবীদিগের ও উৎসাহদাতাদিগের কর্ত্তব্য। আমাদের অভাব যাহা আছে তাহার সংশোধন সময়সাপেক্ষ। জগতের যে সকল ভাষা উন্নত তাহাদের উপাদান লইয়া স্বদেশীয় ভাষার পুষ্টি করিতে হয়। বিনয় বাবুর প্রস্তাবানুযায়ী নীতি অবলম্বন করিয়া ভাষার উন্নতি করিতে হইবে। ভাষাকে আকার দিতে একজনের চেষ্টা কিছুই নহে। দশজনে মিলিয়া কার্য্য করিতে হইবে। যাঁহারা যাহা ভাল জানেন তাঁহারা সেগুলি লিখিয়া মুদ্রিত করিলে ভাষা উন্নত হইবে। শুধু লোকের চেষ্টায় হইবে না; অর্থ চাহি। যত দিন ভাষা সমৃদ্ধিশালী না হয়,ততদিন ভাষায় যে যে বিষয়ে অভাব সেই সকল বিষয়ে দুই তিনখানি পুস্তক বৎসরে বাহির করিয়া

তাহার পুষ্টিসাধন করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

বরিশালের প্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে উঠেন। তিনি বলিলেন, "কয়েকদিন পূর্ব্বে যখন এস্থানে আসিতেছিলাম তখন চড়ক পূজার সময়। এই পূজার পূজার্থীরা গাহিতেছিল—'তুমিই আত্মা, তুমিই কর্ত্তা, তুমিই পৃথিবীর বাণী'। শিবকে সম্মুখে রাখিয়া অশিক্ষিতরা এইরূপ গাহিতেছিল। যে দেশের অশিক্ষিতরা এইরূপ অনাদিকাল হইতে গাহিয়া আসিতেছে সে দেশে বাণীর সেবকের এত অভাব কেন? এ দেশে বাণী আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। পাশ্চাত্য দেশ দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি রূপে ভগবানকে প্রকটিত করিয়া তুলিতেছে। আমরা সব ভুলিয়া বাজে কাযে সময় নষ্ট করিতেছি। সকল পতনের যেমন শেষ সীমা আছে, বাণীর সেবায় অবহেলারও পতনের চরম সীমায় আমাদের উন্নতিসময় আসিয়াছে। পতনের পর উত্থান অবশ্যম্ভাবী। তাই আজ মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর তাঁহার সমগ্র শক্তি নৈবেদ্যের মত উৎসর্গ করিয়া এস্থানে আসিয়াছেন, সুসঙ্গের মহারাজ উপস্থিত, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র পুরোহিতের কার্য্য লইয়া বাণীচরণে অর্ঘ্য দিতে প্রস্তুত। সমগ্র বঙ্গের সুধীমণ্ডলী আজ উপস্থিত। কেবল নিম্নশ্রেণীর লোক নহে, আজ সকল শ্রেণীর লোক একত্র গাহিতেছে—'তুমিই আত্মা, তুমিই কর্ত্তা, তুমিই পৃথিবীর বাণী।' এ সঙ্গীত বাঙ্গালী জাতিকে, বাঙ্গালীর ভাষাকে ঊর্দ্ধে তুলিবে; ভাবে, পুণ্যে, সংযমে শীলতায়, স্বদেশ-হিতৈষণায় সেবায় আমাদিগকে উদ্‌বুদ্ধ করিবে। এ সঙ্গীতের তালে তালে নাচিয়া আমরা সাহিত্য গড়িয়া তুলিব। ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা বলিবে, আমরা সেবকের বংশে জন্মিয়াছি। এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য আমি দেখিতেছি। বাণীর সেবায় এ দেশ ধন্য হইবে। আমি আশা করি, এই বর্ত্তমান উৎসর্গ উদ্দীপনা কেবল আতিথ্যেই শেষ হইবে না। মহারাজরা এ স্থানে উপস্থিত; সকলেই উৎসাহদাতা; আশা হয় আমরা এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারিব।"

ইহার পর শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "অন্ন সংস্থাপন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তিনি এই প্রবন্ধে যে গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় আয়ুর্ব্বেদে আধুনিক রসায়ন

সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বৃক্ষের সহিত ভূমির উচ্চতার সম্বন্ধ, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গালায় দ্রাবিড় ভাষা, শ্রীযুক্ত বিধুকিরণ বটব্যাল মহাশয়ের ময়মনসিংহে মুসলমান প্রবেশ এবং বঙ্গ ইতিহাসের একটু ভুল সংশোধন, প্রবন্ধ সকল পঠিত হইল! তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালা অক্ষরের উৎপত্তি দেখাইতে আরম্ভ করেন। তিনি ২২০০ বৎসরের অক্ষর ধরিয়া তাহার ক্রমবিকাশ ও পরিবর্ত্তন দেখাইতে থাকেন। তিনি আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের নাম লইয়া লিখিয়া দেখাইতে লাগিলেন।

২২০০ বৎসর পূর্ব্বে—

জ গ দী শ

যুক্ত অক্ষর ছিল না— চন, দ্র

ইহার পর খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে—

যুক্ত অক্ষরের ব্যবস্থা আরম্ভ হয়—

চ ন্দ্র

বৌদ্ধ আন্দোলনের সময় অক্ষরের পরিবর্ত্তন দ্রুত হয়—

জ গ দী শ

কণিকের সময়—

জ গ দী শ

প্রথম চন্দ্র গুপ্তের সময় আবার দ্রুত পরিবর্ত্তন হয়—

জ গ দী শ

ইহার পর দেশ অশান্তিপূর্ণ থাকায় অনেক দিন অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় ভাষা রহিয়া যায়—

জ গ দী শ

ধর্ম্মপাল দেবের তাম্রশাসন অনুসারে—(৬০৯—৬৩০ খৃঃ)

জ গ দী শ

নারায়ণ দেবপালের সময়—

জ গ দী শ

এই সময় মৈথিল ও বঙ্গভাষা দুই ভাগ হইয়া যায়।

লক্ষণ সেনের সময়—

জগদীশ

জ গ দী শ

ইহার পর কতকগুলি প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। তৎপরে শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় সম্মিলনপরিচালন সমিতির গঠনের প্রস্তাব করিলেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রমোহন ঠাকুর এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের ৬০ জন সভ্যকে লইয়া এই পরিচালন সমিতি গঠিত হইল।

তৎপরে শ্রীশচন্দ্র চন্দ মহাশয় ময়মনসিংহবাসীর পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয়কে, মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে এবং সমাগত প্রতিনিধি-বর্গকে ও দর্শকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ইহার সমর্থন করিলেন। স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে আজল জব্বর মহাশয় ধন্যবাদ দিলেন। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যা-বিনোদ মহাশয় গৌহাটীর পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাইলেন। তৎপরে মহা-রাজ মণীন্দ্রচন্দ নন্দী বাহাদুর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় পরিষদের কার্য্যবিবরণ সবি-স্তারে বর্ণনা করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সাহিত্যিকগণকে আগামী বৎসর সম্মিলনের নিমন্ত্রণের জন্য আহ্বান করেন। কেহ নিমন্ত্রণ না করায় সভাপতি মহাশয় তিন মাস সময় স্থির করিয়া সম্পাদক মহাদয়কে ইহার মধ্যে সম্মিলনের স্থান নির্দ্দেশের ব্যবস্থা করিতে বলেন। ইহার পর এই বৎসরের সম্মিলনের কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত।

অশোক-চরিত।

(মহাবংশ ও দীপবংশ অবলম্বনে।)

['মহাবংশ' ও 'দীপবংশ' সিংহলের দুইখানি সুপ্রাচীন ইতিহাস। উভয় গ্রন্থই পালি ভাষায় লিখিত। সিংহলস্থিত "মহাবিহার" নামক বৌদ্ধ বিহারে "অট্‌ঠকথা" অভিধেয় যে সকল বৌদ্ধ উপাখ্যান পুরাকালে প্রচলিত ছিল, উক্ত গ্রন্থদ্বয় সেই 'অট্‌ঠকথা' অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে 'দীপবংশ' এবং পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে 'মহাবংশ' লিখিত হইয়াছিল। উভয় গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় প্রায়ই এক, তবে 'দীপবংশে' অধিকাংশ বিষয়ই সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে।

মৌর্য্যরাজ অশোকের জীবনী 'মহাবংশে' ও 'দীপবংশে' বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 'মহাবংশ' অবলম্বনে অশোক-চরিত বিবৃত করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। 'মহাবংশে' ও 'দীপবংশে' বর্ণিত ঘটনাসমূহের মধ্যে যে সকল স্থলে অনৈক্য ঘটিয়াছে অথবা অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইয়াছে, কেবল সেই সকল স্থলে, প্রবন্ধের পাদ-টীকায় 'দীপবংশ'-লিখিত বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।]

মোরিয়-বংশ-সম্ভূত চন্দ্রগুপ্ত ৩৪ বৎসর * রাজত্ব করেন; তৎপরে তাঁহার পুত্র বিন্দুসার ২৮ বর্ষ রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। বিন্দুসারের বিভিন্ন মহিষীর গর্ভে ১০১ জন পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে অশোক স্বীয় পুণ্য চরিত্রবলে ও অসামান্য জ্ঞানপ্রভাবে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন। বিন্দুসার অশোকের হস্তে উজ্জয়িনী রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

বিন্দুসার মৃত্যুশয্যায় শায়িত, এই সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র, অশোক উজ্জয়িনী পরিত্যাগ করিয়া পুষ্পপুর (পাটলিপুত্র) যাত্রা করিলেন। পিতার মৃত্যু হইলে, তিনি রাজধানী অধিকার করেন এবং সেই প্রসিদ্ধ নগরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুমনকে হত্যা করিয়া বলপূর্ব্বক সিংহাসন লাভ করেন। তৎ-

* "চতুত্তো রজ্জং কারেসি বসসানি চতুবীসতি।"

দীপবংশ ৫।১০০।

পরে অশোক স্বীয় ৯৯ জন ভ্রাতাকে বিনাশ করিয়া জম্বুদ্বীপের একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন।*

রাজ্যলাভের পর চতুর্থ বর্ষে, এই মহাযশস্বী রাজা পাটলিপুত্র নগরে মহা সমারোহের সহিত স্বীয় অভিষেক কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। বুদ্ধ-নির্ব্বাণের পর হইতে তাঁহার অভিষেক কাল পর্য্যন্ত ২১৮ বৎসর অতীত হইয়া ছিল। † এই অভিষেকসময়ে তাঁহার আধিপত্য যোজন হইতে যোজনমাত্র পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইয়াছিল। রাজ্যাভিষিক্ত অশোক তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রাজকুমার তিষ্যকে "উপরাজ" উপাধিদ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন।‡

অশোকের পিতা ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন এবং (প্রত্যহ) ষষ্টিসহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন। অশোকও পিতার ন্যায় তিন বৎসর তদ্রূপ করিয়া ছিলেন। কিন্তু অবশেষে একদিন রাজপ্রসাদ হইতে ব্রাহ্মণের ঘৃণিত কার্য্য-কলাপ দর্শন করিয়া, অশোক আমাত্যবৃন্দকে আদেশ করিলেন, যেন তাঁহারা ভবিষ্যতে পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া ভিক্ষা প্রদান করেন। অশোক আপনার নিকট সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মাবলম্বী আচার্য্যগণকে আহ্বান করিতেন এবং তাঁহাদিগের সহিত বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিয়া সকলকে যথোপযুক্ত ভিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক বিদায় দিতেন।

অশোক যখন স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুমনকে হত্যা করেন, তৎকালে তাঁহার পত্নী গর্ভবতী ছিলেন। (স্বামী মৃত্যুমুখে পতিত হইলে) তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া কোন এক চণ্ডাল:পল্লীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তথায় নিগ্রোধ নামে তাঁহার একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। (অনন্তর) চণ্ডালপতি মাতাপুত্রকে সাত বৎসর রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিল।

তদনন্তর বৌদ্ধাচার্য্য মহাবরুণ, সেই বালককে অর্হত্ব লাভের উপযুক্ত সদ্‌গুণ-শোভিত দেখিয়া, মাতার নিকট হইতে তাহাকে চাহিয়া লইলেন।

* "হত্বা একশতে ভাতে বংসম্ কথান একতো।
মহিলচুদ্দসমে বস সে অশোকম্ অভিবিঞ্চয়ুং॥"
দীপবংশ ৬।২২।

† 'মহাবংশের' ও 'দীপবংশের' মতে ৫৪৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত করিয়াছিলেন; সুতরাং ৩২৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে মহারাজ অশোকের অভিষেক সম্পন্ন হইয়াছিল।

‡ অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিষ্য সম্বন্ধে কোন কথা 'দীপবংশে' লিখিত হয় নাই; কারণ, পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, 'দীপবংশের' মতে অশোক স্বীয় একশত ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনলাভ করেন। মোরিয় বংশীয় রাজকুমারগণের মধ্যে কেবলমাত্র অশোক জীবিত ছিলেন।

তাহাকে ভিক্ষুশ্রেণীভুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে যখন তিনি তাহার মস্তক মুণ্ডন করিতেছিলেন, তখনই বালক অর্হত্ব প্রাপ্ত হইল।

এক দিবস নিগ্রোধ মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে, দক্ষিণ দ্বার দিয়া রাজধানীতে প্রবেশপূর্ব্বক রাজোদ্যানের মধ্য দিয়া চণ্ডাল পল্লীর অভিমুখে গমন করিতেছিলেন। তৎকালে মহারাজ অশোক প্রাসাদোপরি বায়ুসেবন করিতেছিলেন। তিনি নিগ্রোধের দেবতুল্য কান্তি অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং সাতিশয় প্রীত হইয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। নিগ্রোধ প্রশান্ত অন্তঃকরণে রাজার নিকটবর্ত্তী হইলে, রাজা তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস, তোমার উপযুক্ত আসনে উপবেশন কর।" তথায় অন্য কোন ভিক্ষু উপস্থিত নাই দেখিয়া, নিগ্রোধ সিংহাসনাভিমুখে অগ্রগামী হইলেন। তাঁহাকে সিংহাসনাভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এই স্থবির অদ্যই আমার প্রাসাদের প্রভু হইবেন"। ক্রমে নিগ্রোধ রাজার বাহুর উপর ভর দিয়া অবলীলাক্রমে সিংহাসনের উপর উপবেশন করিলেন। অশোক তদবস্থায় তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং তাঁহার পুণ্য তেজঃ প্রভাবে অভিভূত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলেন। তাহার পর রাজা স্বীয় খাদ্য ও পানীয় দিয়া নিগ্রোধকে ভোজন করাইয়া তাঁহাকে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকটে বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তদনন্তর নিগ্রোধ রাজসমীপে বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্বসমূহ বিবৃত করিয়া রাজা ও তাঁহার প্রজাবৃন্দকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। *

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অশোকের অনুরাগ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এক্ষণে তিনি ষষ্টি সহস্র ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে ষষ্টি সহস্র বৌদ্ধ শ্রমণকে প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতি দিন চারি লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইতে লাগিল। এক দিন তিনি এই ষষ্টি সহস্র শ্রমণকে নিজ প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পানীয় দ্বারা তাঁহাদিগের সেবা করিয়া তাঁহাদিগকে উপহারাদি প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি সমাগত শ্রমণগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বুদ্ধদেব কোন্ ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছেন ?" মৌদ্গলিপুত্র তিষ্য উত্তর করিলেন যে, বৌদ্ধধর্ম্মে ৮৪০০০ বিভিন্ন উপদেশ বিদ্যমান আছে।

* অশোকো রজ্জং কারেসি পাটলিপুত্তে পুরুত্তমে।
অভিসিত্তো তীনি বসসানি পসন্নো বুদ্ধসাসনে॥"
দীপবংশ—৬।১৮।

এই কথা শুনিবামাত্র রাজা কহিলেন,—"আমি প্রত্যেকের জন্ম এক একটি বিহার উৎসর্গ করিব।" তাহার পর তিনি জম্বুদ্বীপের ৮৪০০০ রাজার হস্তে ৯৬০০০ কোটি মুদ্রা প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের নিজ নিজ নগরে বিহার নির্ম্মাণ করাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং পুষ্পপুরে "অশোকারাম" নামে একটি বিহার নির্ম্মাণ করিবার ভার লইয়াছিলেন।

একদা উপরাজ তিষ্য মৃগয়া করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন, অরণ্যে হরিণযূথ ক্রীড়া করিতেছে। তাহাদিগকে আনন্দে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, "হরিণগুলি অরণ্যে তৃণাহার করিয়াও প্রফুল্লচিত্তে কেমন ক্রীড়া করিতেছে; কিন্তু ভিক্ষুগণ বিহারে সুখসেবিত হইয়াও কেন আনন্দে মগ্ন নহেন?" গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি রাজাকে স্বীয় মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। রাজা এই সমস্যার মীমাংসা করিবার নিমিত্ত, সাত দিনের জন্য তাঁহাকে রাজ্যভার প্রদান করিলেন এবং উপরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"কুমার, সপ্ত দিন তুমি এই রাজ্য পরিচালনা কর, তাহার পর আমি তোমাকে বধ করিব।"

দেখিতে দেখিতে সাত দিন কাটিয়া গেল। রাজা উপরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি হেতু এতাদৃশ কৃশ হইয়া গিয়াছ?" উপরাজ উত্তর করিলেন, "মহারাজ, একমাত্র মৃত্যুভয়ে!" উপরাজের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"বৎস,'সাত দিন পরে আমার মৃত্যু হইবে' —এই চিন্তায় তুমি আমোদ-আহ্লাদে উৎফুল্ল হইতে পার নাই, কিন্তু যতিগণ—যাঁহারা সদাসর্ব্বদাই মৃত্যু-চিন্তা করিতেছেন—তাঁহারা কিরূপে সামান্য আমোদপ্রমোদে যোগদান করিবেন।"

রাজার কথা শুনিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি উপরাজ তিষ্যের চিত্ত আকৃষ্ট হইল, তিনি অবিলম্বে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর আর একদিন মৃগয়া করিতে যাইয়া উপরাজ দেখিলেন যে, পুণ্যাত্মা মহাধর্ম্মরক্ষিত বৃক্ষমূলে বসিয়া আছেন, একটি হস্তী শালবৃক্ষের শাখাদ্বারা তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া উপরাজ চিন্তা করিলেন, "আমিও ইঁহার ন্যায় প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া বনে বাস করিব।" মহাধর্ম্মরক্ষিত তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া সেই সময়ে তাঁহাকে কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করিলেন। উপরাজ তিষ্য সেই সকল অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলী অবলোকন করিয়া আনন্দে আত্মহারা

হইলেন এবং রাজসমীপে উপনীত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাঁহার বাসনায় বাধা না দিয়া, বহুতর অনুচর সমভিব্যাহারে তাঁহাকে বিহারে লইয়া গেলেন। তথায় তিষ্য মহাধর্ম্মরক্ষিতার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সহিত রাজার জামাতা অগ্নিব্রহ্ম এবং তাঁহার পুত্র সুমনও একই দিনে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পন্থানুসরণ করিয়া উক্ত দিবসে সহস্র সহস্র লোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। উপরাজের এই মহা জনহিতকর প্রব্রজ্যা-অবলম্বন, অশোকের রাজত্বের চতুর্থ বর্ষে সংঘটিত হইয়াছিল।

তিন বৎসরে ৮৪০০০ সুরম্য বিহার নির্ম্মিত হইল। এই সকল বিহারে মহোৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল। রাজাদেশে সাম্রাজ্যের যাবতীয় লোক দানধ্যানে নিযুক্ত হইল, নগরের ও পল্লীর পথগুলি এবং বিহারসকল নানাবিধ পুষ্পমাল্যপতাকাদিদ্বারা সুশোভিত হইয়া রাজ্যে এক অভিনব সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া দিল; সুমধুর গীতবাদ্যে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইল, প্রজাগণ একমনে শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইল। মহারাজ অশোক এইরূপে তাঁহার পুণ্যচরিত্রপ্রভাবে ধর্ম্মাশোক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

অশোক বিন্দুসারের জীবদ্দশায় পিতার আদেশে অবন্তি প্রদেশ শাসন করিতেন। সেই সময়ে একদিন অবন্তি হইতে উজ্জয়িনী যাইবার পথে, তিনি চেতিয় * নগরে উপনীত হয়েন এবং দেবী নামে একটি পরম সুন্দরী শেট্‌ঠি রাজকন্যার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া,তাঁহাকে বিবাহ করেন। দেবীর গর্ভে মহেন্দ্র (মহিন্দো) নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া ছিল এবং ইহার দুই বর্ষ পরে, দেবী সঙ্ঘমিত্রা নামে একটি কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন।

উপরাজ তিষ্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে অশোকের পুত্র মহেন্দ্রের ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রার প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবার বাসনা হইল। তিষ্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে, অশোক মহেন্দ্রকে উপরাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু ধর্ম্মমাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবার মানসে মৌদ্গলিপুত্র তিষ্যের পরামর্শানুসারে তিনি প্রিয় পুত্র মহেন্দ্রকে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন। ধর্ম্মাশোকের রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে পিত্রাদেশে ভ্রাতা ও

* 'দীপবংশে' লিখিত আছে, অশোক বেদিশ্‌গ্রা নগরে উপনীত হইয়াছিলেন। বুদ্ধনির্ব্বাণের ২০৪ বৎসর পরে মহিন্দোর জন্ম হইয়াছিল।

ভগিনী উভয়েই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তৎকালে মহেন্দ্রের বয়স ২০ বৎসর এবং সঙ্ঘামিত্রার ১৮ বৎসরমাত্র। স্থবির মহাদেব মহেন্দ্রকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং মধ্যান্তিক তাঁহার জন্য "কর্ম্মবচন" অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। স্থবিরী ধর্ম্মপতি সঙ্ঘামিত্রার উপাধ্যায়া এবং আয়ুপালি তাঁহার আচার্য্যা হইয়াছিলেন। মহাসমারোহে এই ধর্ম্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিষ্য ও সুমিত্র নামে দুই ভ্রাতা অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়া বনে বাস করিতেছিলেন। একদা ঘটনাক্রমে কণ্টক বিদ্ধ হইয়া তিষ্যের চরণে ক্ষত হইল এবং ক্ষত ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুমিত্র, এই রোগের প্রতিকার জিজ্ঞাসা করিলে, তিষ্য উত্তর করিলেন যে, ক্ষতস্থানে মাখন লেপন করিতে পারিলে, রোগের উপশম হইতে পারে। সুমিত্র দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াও মাখন সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। ক্রমে এই রোগে তিষ্যের আসন্ন কাল উপস্থিত হইলে, তিনি যোগবলে স্বীয় দেহ ভস্মীভূত করিয়া নির্ব্বাণলাভ করিলেন।

অর্হৎ তিষ্য নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া ভূপতি তাঁহার আবাসস্থলে গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর কারণ অবগত হইয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। অনন্তর অশোক, পীড়িত ভিক্ষুগণ ইচ্ছামত ঔষধ ব্যবহার করিতে পারে—এই উদ্দেশ্যে তাঁহার রাজধানীর প্রতি দ্বারের নিকট এক একটি কুণ্ড প্রস্তুত করাইয়া ভেষজাদির দ্বারা পরিপূর্ণ করাইয়াছিলেন।

রাজা তীর্থিকগণের প্রতি বীতরাগ হইয়াছেন, এক্ষণে আর পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদিগকে প্রতিপালন করেন না দেখিয়া, তীর্থিকগণ বৌদ্ধ ভিক্ষুর ন্যায় কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া ভিক্ষুদিগের সহিত একত্র বিহারে বাস করিতে লাগিল এবং ক্রমে তাহারা নিজ ধর্ম্মকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে তাহারা দলে পুষ্ট হইলে, তাহাদের অনাচারে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ শাস্ত্রীয় কার্য্য সকল যথাবিধানে সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হইলেন। এই কারণেই জম্বুদ্বীপের সর্ব্বত্র বৌদ্ধারামে সাত বর্ষ যাবৎ "উপোষথ" ও "প্রাবরণ" ব্রত আচরিত হইল না।

ক্রমে এই সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হইল। "অশোকারামে যে সকল ভিক্ষু থাকেন, সকলেই যেন উপোষথ ব্রত পালন করেন"—এই আদেশ প্রচার করিবার জন্য অশোক একজন দূতকে অশোকারামে প্রেরণ

করিলেন। দূত অবিলম্বে রাজাদেশ পালন করিলে, ভিক্ষুসঙ্ঘ উত্তর করিলেন যে, তাঁহারা তীর্থিকের সহিত কোন মতেই উপোষধ ব্রত পালন করিবেন না। রাজদূতের কেমন মতিভ্রম হইল, সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"উপোষধ ব্রত পালন করিতে আমি তোমাদিগকে বাধ্য করাইব;" এবং তৎক্ষণাৎ স্বীয় তরবারি দ্বারা নিজ হস্তে কতিপয় ভিক্ষুকে হত্যা করিল। এই ঘটনা অবলোকন করিয়া রাজভ্রাতা তিষ্য দূতের পার্শ্ব দিয়া বেগে ধাবিত হইয়া ভিক্ষুর আসনে উপবেশন করিলেন। দূত তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া হত্যাকাণ্ড হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল এবং রাজসমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে সকল কথা জ্ঞাপন করিল। দূতমুখে এই ঘটনার বিষয় শ্রবণ করিয়া রাজা মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইলেন।

অশোক উদ্বিগ্নমনে অশোকারামে উপনীত হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই নৃশংস কার্য্যের জন্য কে পাপগ্রস্ত হইবে?" অজ্ঞ ভিক্ষু ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়াই উত্তর করিল, "এ পাপ তোমারই।" আবার কেহ কেহ বলিলেন,—"তোমাদের উভয়েরই।" কিন্তু বিজ্ঞ জনে উত্তর করিল,—"ইহাতে আপনার কোন পাপ হয় নাই।"

এইরূপ বিভিন্ন অভিমত শ্রবণ করিয়া রাজার সন্দেহ জন্মিল। তিনি মৌদ্‌গলিপুত্র তিষ্যের নিকটে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আপনার মনোবেদনা জানাইলেন। তিষ্য মহারাজকে "তিত্তির-জাতক" শুনাইয়া, সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন,—"প্রতীচ্ছা না থাকিলে পাপ হয় না।" রাজা আশ্বস্ত হইলেন। অতঃপর, সাত দিন তিষ্য সম্রাটকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

ইতোমধ্যে রাজা সংবাদ পাঠাইয়া ভারতের যাবতীয় ভিক্ষুকে অশোকারামে সমবেত করিলেন এবং সপ্তম দিবসে তথায় গমনপূর্ব্বক তিষ্যের সহিত একান্তে উপবেশন করিয়া একে একে প্রত্যেক ভিক্ষুকে আহ্বান করিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের উত্তরে, যে সকল ভিক্ষু ভণ্ডবৌদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, সম্রাট তাঁহাদিগকে বৌদ্ধারাম হইতে বিদূরিত করিয়া দিলেন এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে উপোষধ ব্রত আচরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারাও নির্ব্বিঘ্নে সেই ব্রত পালন করিতে লাগিলেন।

মৌদ্‌গলিপুত্র তিষ্য, সমবেত ভিক্ষুগণের মধ্য হইতে ত্রিপিটক-বিশারদ,

ধর্ম্মজ্ঞ এক সহস্র ভিক্ষুকে নির্ব্বাচন করিলেন এবং এই নির্ব্বাচিত ভিক্ষুগণ এক মহাসভায় মিলিত হইলেন। মহারাজ অশোকের রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষে, মৌদ্গলিপুত্র স্থবির তিস্যের অধিনায়কতায় পাটলিপুত্রের অশোকারামে এই তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল। এই সঙ্গীতিতে সভাপতি তিস্য শাস্ত্রীয় উপদেশাদি দ্বারা এবং "কথাবথ" নামে বৌদ্ধ শাস্ত্র প্রবৃত্তি করিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানাবিধ সন্দেহসমূহের অপনোদন করিয়াছিলেন। নয় মাস কাল এই সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল।

তৃতীয় সঙ্গীতি সমাপ্ত হইলে বিদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ, কাশ্মীর, গান্ধার, মহীষমণ্ডল, বনবাসী, অপরন্তক, মহারাষ্ট্র, হিমাবন্ত, সুবর্ণভূমি ও যবন (যোন) দেশে শাস্ত্রজ্ঞ স্থবিরগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে সম্রাট চারিজন শিষ্য সমভিব্যাহারে স্বীয় পুত্র স্থবির মহেন্দ্রকে লঙ্কায় পাঠাইয়াছিলেন।

তখন দেবানাম্পিয় তিস্য সিংহলের রাজা। তিনি তাঁহার প্রজাবৃন্দের সহিত মহেন্দ্রের নিকট বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তৎপরে সিংহল-রাজনন্দিনী অনুলা-প্রমুখ রাজমহিলাগণ তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে আগ্রহান্বিতা হইলে, মহেন্দ্র তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"স্ত্রীলোককে দীক্ষিত করিবার আমার অধিকার নাই। আমার কনিষ্ঠা ভগিনী স্থবিরী সঙ্ঘমিত্রা পাটলিপুত্রে বাস করিতেছেন। তাঁহাকে এই স্থানে প্রেরণ করিবার জন্য, মহারাজ তিস্য আমার পিতৃদেবকে সংবাদ পাঠাইলে, তিনি এই স্থানে শুভাগমন করিয়া আপনাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন।"

মহেন্দ্রের উপদেশানুসারে মহারাজ তিস্য সম্রাট অশোকের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। অশোক সিংহলরাজের মনোভাব অবগত হইয়া, স্বীয় প্রিয়তমা কন্যা সঙ্ঘমিত্রা ও একাদশ জন ভিক্ষুণীকে সিংহল দূতের সহিত লঙ্কায় পাঠাইয়া দিলেন। বোধিদ্রুমের একটি শাখাও সেই সঙ্গে প্রেরিত হইয়াছিল। সঙ্ঘমিত্রা লঙ্কায় পঁহুছিয়া রাজমহিলাগণকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা উভয়েই লঙ্কায় নির্ব্বাণলাভ করেন। অশোক-প্রেরিত বোধিবৃক্ষের শাখা তাঁহার রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে সিংহলস্থ "মহামেঘবন" নামক প্রমোদ উদ্যানমধ্যে রোপিত হইয়াছিল।

এই ঘটনার দ্বাদশবর্ষ পরে অশোকের প্রিয়তমা মহিষী অসন্ধিমিত্রা পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর চতুর্থ বর্ষে অশোক পূর্ব্ব মহিষীর এক-

জন সহচরীকে পাটরাণী করিয়াছিলেন। তৎপরে ২ বৎসর গত হইলে সেই আত্মরূপমানিনী দুষ্টা রাণী ভাবিলেন,—"এই রাজা আমাকে হতাদর করিয়া, কেবলমাত্র বোধিদ্রুমের সেবা করিতে ব্যস্ত।" অতঃপর তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বিষপ্রয়োগে বোধিবৃক্ষের বিনাশ সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর চতুর্থ বর্ষে, ৩৭ বৎসর রাজত্ব করিবার পর মহাযশঃ অশোকের মৃত্যু হইল। সব ফুরাইল।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

কোথায় ?

(হায়েন)

একান্ত এ শ্রান্ত পান্থ কোথা পা'বে তা'রে
শেষের শয়নখানি মরণের কূলে ?
তালিবনশ্যাম কূলে সুদূর গঙ্গার
অথবা রাইনতীরে শ্যাম তরু মূলে !
একান্ত অপরিচিত রচিবে কি কেহ
মোর শেষ শয্যাখানি মরু যেথা তায় ;
শেষের শয়ন তা'র লভিবে এ দেহ
বালুতলে জনহীন সাগর-বেলায় ?
কিবা তাহে আসে যায় ? উদার আকাশ
সর্ব্বত্র সমান ঘিরি' রহিবে আমায় ;
নিশি নিশি তারাকুল পাইবে প্রকাশ
আমার সমাধি' পরে মৃত্যু-দীপ প্রায়।

কাচের চুড়ী।

—:•:—

১

আষাঢ়ের শেষ। গগনে ঘনঘটা; প্রভাতের দিবালোক ম্লান; রবিকর মেঘাবরণ বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। মধ্যে মধ্যে বারিপাতও হইতেছে। 'সেনাপতির' নেতৃত্বে মাতৃনাম কীর্ত্তন করিয়া 'বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়ের' সভ্যগণ ফিরিতেছিলেন।

জীতেন্দ্রনাথ ও নির্ম্মলকুমার কলিকাতার পটলডাঙ্গা পল্লীতে কোন ছাত্রাবাসে থাকিত। আজ রবিবার, কলেজ নাই; প্রভাতে তাহারা কেবল চা-পান শেষ করিয়াছে, এমন সময় রাজপথে মাতৃনাম শুনিয়া উভয়ে নামিয়া আসিয়াছিল—তাহার পর যেন কোন অজ্ঞাত আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সম্প্রদায়ের সভ্যগণের সঙ্গে সঙ্গে শ্যামপুকুর পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। শ্যামপুকুরে আসিয়া নির্ম্মল ঘড়ী দেখিল,—দশটা বাজিয়া গিয়াছে। সে সঙ্গীকে সে কথা বলিল। উভয়ে ফিরিয়া চলিল। পথের দূরত্ব হ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে তাহারা বড় রাস্তা ত্যাগ করিয়া গলিতে ঢুকিল।

গলিতে ঢুকিয়াই বামে একখানি ক্ষুদ্র গৃহ। গৃহদ্বারে কয়টি বালক-বালিকা দাঁড়াইয়া সম্প্রদায়ের সুরে 'বন্দে মাতরম্' গাহিবার চেষ্টা করিতেছিল। সহসা একটি বালক একটি বালিকাকে বলিল, "দিদি, তোর হাতে ও কাচের চুড়ী বিদেশী।" বালিকা বলিল, "কখনও না। চুড়ীওয়ালী বলিয়াছে, এ বোম্বাই চুড়ী।" বালক যুবকদ্বয়কে মধ্যস্থ মানিয়া বলিল, "আচ্ছা, আপনারা দেখিয়া বলুন,—এ চুড়ী বিদেশী কি স্বদেশী।"

বালকের কথা শুনিয়া জীতেন্দ্রনাথ ও নির্ম্মলকুমার হাসিল। জীতেন্দ্রনাথ অগ্রসর হইয়া বালিকার চুড়ীগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিল, "এ চুড়ী বিদেশী।"

বালিকার চক্ষু দুইটি জলে পূরিয়া আসিল। দেখিয়া জীতেন্দ্রনাথ বলিল, "তুমি কাঁদিতেছ কেন? তুমি ত জানিতে না যে, এ চুড়ী বিদেশী।"

জীতেন্দ্রনাথের কথা শেষ হইতে না হইতে বালিকা আপনার দক্ষিণ মণিবন্ধ দিয়া গৃহপ্রাচীরে আঘাত করিল। কাচের চুড়ী ভাঙ্গিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বালিকার কোমল দেহ কাটিয়া রক্তধারা বহিতে লাগিল।

যুবকদ্বয় একান্ত লজ্জিত হইল। নির্ম্মলকুমার ব্যস্ত হইয়া রুমাল বাহির করিয়া নিকটস্থ কলের জলে ভিজাইয়া আনিল ও বালিকার হাত বাঁধিয়া দিল।

এমন সময় গৃহমধ্য হইতে রমণীকণ্ঠ শ্রুত হইল, "সু-র, কত দিন তোকে বাহিরে যাইতে বারণ করিয়াছি। আবার বাহিরে গিয়াছিস্?"

"মা, রাগ করিয়াছেন" বলিয়া বালিকা গৃহে প্রবেশ করিল।

দ্বাদশবর্ষীয়া দুহিতাকে 'পর্দ্দানশীন' করিবার জন্য বাঙ্গালী জননীর এই একান্ত চেষ্টার বিষয় আলোচনা করিতে করিতে যুবকদ্বয় ছাত্রাবাসে ফিরিয়া চলিল।

২

অগ্রহায়ণের মধ্যভাগ। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঘন ধূসর ধূম-রাশি কলিকাতা আচ্ছন্ন করিয়া আছে। রাজপথে অল্পদুরবর্ত্তী বস্তুও লক্ষ্য করা কষ্টসাধ্য। মধ্যে মধ্যে আলোকমালা সেই ধূমাবরণ ভেদ করিতে বৃথা প্রয়াস পাইতেছে।

ছাত্রাবাসে আপনার কক্ষে বসিয়া নির্ম্মলকুমার আপনার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেছে। নির্ম্মলকুমারের বাস হুগলী জিলায় কোন পল্লীগ্রামে। তথায় তাহার পিতা জমীদারীর ও তেজারতীর আয়ে 'গৃহস্থ' ও 'বড় মানুষ' এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী সীমারেখায় উপনীত হইয়াছেন। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিহারে কোন জিলা আদালতে উকীল; একমাত্র ভগিনীর স্বামী মুন্সেফ। নির্ম্মলকুমার প্রবেশিকা হইতে এম, এ, পর্য্যন্ত সব পরীক্ষায়ই বিশেষ দক্ষতা সহকারে উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাহার পর সে আইন পড়িতেছিল ও ষ্টুডেণ্টসিপ্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, এমন সময়ে বাঙ্গালার রাজনীতিক ব্যাপারে একটা বিপ্লব ঘটিয়া গেল। সরকার পদ্মাকে মধ্যসীমা করিয়া বাঙ্গালাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন; ফলে বাঙ্গালার 'মরা গাঙ্গে' পদ্মার স্রোতেরই মত প্রবল ভাবের স্রোত বহিল। বাঙ্গালার ঊষর ভূমি সহসা যেন উর্ব্বর হইয়া উঠিল, বাঙ্গালায় শিল্প ও শিক্ষা উভয়ের উন্নতিসাধনচেষ্টা প্রকট হইল।

নির্ম্মলকুমার যুবকসুলভ উত্তেজনার বশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসৃত পথ পরিত্যাগ করিল। এখন তাহার পর বর্ষাধিক কাল কাটিয়া গিয়াছে। এখন আরম্ভের আবেগ অন্তর্হিত হইয়াছে। তাই আজ

সন্ধ্যায় আপনার কক্ষে বসিয়া নির্ম্মলকুমার ভাবিতেছে,—এখন কি করি? পিতা ও জ্যেষ্ঠ এখনও সব কথা জানিতে পারেন নাই। কিন্তু না জানাইলে আর ত চলে না।

নির্ম্মলকুমার ভাবিতেছিল; আর পার্শ্বেই আর একখানা তক্তপোশে বসিয়া জীতেন্দ্রনাথ গৃহপ্রাচীরবদ্ধ দীপের আলোকে রসহীন রসায়ন-পাঠে রসসন্ধান করিতেছিল। সহসা সে বলিয়া উঠিল "এই যে শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র। স্বাগত!"

নির্ম্মলকুমার ফিরিয়া দেখিল,—জীতেন্দ্রনাথের সতীর্থ ও তাহার বন্ধু হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্চন্দ্রকে একান্ত চিন্তাক্লিষ্ট ও অত্যন্ত উত্তেজিত দেখাইতেছিল।

নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল, "কি হরিশ, আজ যে বড় চিন্তিত দেখিতেছি!"

হরিশ্চন্দ্র নির্ম্মলকুমারের তক্তপোশে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া বলিল, "আর, ভাই, বড় বিপদ।"

নির্ম্মলকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি?"

হরিশ্চন্দ্র বলিল, "ব্যাপার এই যে, আমার এক দিদি আছেন। আমার ভগিনীপতি ৫০৲ টাকা বেতনে একটা 'হাউসে' চাকরী করেন। তাও 'স্বদেশীর' ফলে ব্যবসায় মন্দ পড়ায় বেতন ৪০৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার একটি কন্যা বিবাহযোগ্য। সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। আগামী কল্য পাত্র-হরিদ্রা হইবার কথা। এমন সময় সব উল্টাইয়া যায়।"

জীতেন্দ্রনাথ বলিল, "কেন?"

হরিশ উঠিয়া বসিল, বলিল, "কেন? আসল কথা টাকা। গরীব গৃহস্থ —বহু দিনের চেষ্টায় কন্যার খানকতক গহনা করিয়াছিল। তাহার পর জামাতার ঘড়ী, ঘড়ীর চেন ইত্যাদি বাবদে আর খরচের জন্য কোন রূপে আর ও ৫০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। আজ বরের পিতা বলিয়া পাঠাইলেন, নগদ ৫০০৲ টাকা ব্যতীত পুত্রের বিবাহ দিবেন না।"

নির্ম্মলকুমার বলিল, "তোমরা কি করিবে?"

"কি আর করিব? আমার ভগিনীপতি বলিতেছেন, 'অমন ছেলে আমি ছাড়িব না, যেমন করিয়া হউক বিবাহ দিব।' যেমন করিয়াই হউকের অর্থ—বাড়ীখানি বন্ধক দিয়া। আমরা সকলে নিষেধ করিতেছি, তিনি কিছুতেই শুনিবেন না।"

"ছেলেটি কি করে ?"

"বি, এ, পাস করিয়াছে।

"ছেলেটি কি এই ব্যবহারে আপত্তি করে নাই।"

"আপত্তি সকলেই করে। এ দিকে ত দেখি 'স্বদেশীর' মহা হল্লা; গরিবের গলায় ছুরী দিবার সময় দেখি, ছেলে বুড়া সবই সমান।":

এই কথাটা নির্ম্মলকুমারের হৃদয়ে তীব্র তিরস্কারের মত বিদ্ধ হইল।

হরিশ বলিল, "তোমরা ত 'স্বদেশীর' পাণ্ডা, কই একটা ছেলে দাও দেখি যে কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতাকে উদ্ধার করে।"

জীতেন্দ্রনাথ বলিল, "এ সব বড় বিপদ। পথে পথে গান করা, বক্তৃতা-স্থলে করতালি দেওয়া—এ সব সহজসাধ্য। কিন্তু মতটাকে কার্য্যে পরিণত করা—সে বড় কঠিন কথা।"

নির্ম্মল বলিল, "সে কি বড় কঠিন কথা ?"

জীতেন্দ্রনাথ বলিল, "তাই ত দেখি। কই—মতের মত কায করিবার যোগ্যতা ত বড় কাহারও দেখি না।"

নির্ম্মল বলিল, "তুমি কি মনে কর, হরিশের ভগিনেয়ীকে বিবাহ করিয়া কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে দায়মুক্ত করে—বাঙ্গালীর কলঙ্ক পাত্রের পিতার ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করে এমন লোক বাঙ্গালায় নাই ?

জীতেন্দ্রনাথ বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "কোন্ বাঙ্গালায়—পূর্ব্ব না পশ্চিম ?"

নির্ম্মলকুমার বলিল, "ঠাট্টা নহে।"

জীতেন্দ্রনাথ বলিল, "লোক কোথায় ?"

"হেথায় ?"

"কে ?"

"আমি।"

মুহূর্ত্তকাল সকলেই নীরব হইয়া রহিল। নির্ম্মলকুমার ভাবিল, "কি বলিলাম ?" জীতেন্দ্রনাথ ও হরিশ্চন্দ্র ভাবিল, "নির্ম্মল কি বিদ্রূপ করিতেছে ?"

জীতেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল," "তুমি কি বিদ্রূপ করিতেছ ?'

নির্ম্মলকুমার গম্ভীরভাবে বলিল, "না।"

"তবে তুমি বালিকাকে বিবাহ করিবে ?"

"হাঁ।"

"বাস্"—বলিয়া জিতেন্দ্রনাথ লাফাইয়া উঠিল। তাহার মস্তকে লাগিয়া গৃহপ্রাচীরবদ্ধ দীপ হইতে কাচের আবরণ পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল। কাচখণ্ডগুলি ঝাড়িতে ঝাড়িতে জীতেন্দ্রনাথ বলিল, "দেখ সৎকার্য্যে কত বাধা। নির্ম্মল একটা সাধু সংকল্প করিতে না করিতে আমার ছয় পয়সা লোক্সান।"

৩

ছাত্রাবাস হইতে বিবাহ; সুতরাং প্রচলিত আচারের বার আনাই অসম্পন্ন রহিয়া গেল, কেন না—সে বার আনাই 'মেয়েলী শাস্ত্রের' বিধান। কিন্তু ছাত্রাবাসে উৎসবের অন্ত ছিল না--ছাত্রদলে উৎসাহের অবধি ছিল না।

নির্দ্ধারিত দিনে সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পরেই বরকে লইয়া ছাত্রগণ হরিশ্চন্দ্রের গৃহে উপনীত হইল।

বিবাহ হইয়া গেল।

'শুভদৃষ্টির' সময় নির্ম্মলকুমারের বোধ হইল যেন—বধূর মুখখানি পরিচিত অথচ সে কোথায় সে মুখ দেখিয়াছে,—কোথায় বালিকাকে দেখিবার সম্ভাবনা সে ভাবিয়া কিছুতেই স্থির করিতে পারিল না। সে মনে মনে হাসিয়া বলিল—বুঝি জন্মান্তর স্মৃতি।

৪

নির্ম্মলকুমারের এই বিবাহের সংবাদ পাইয়া তাহার পিতা ও ভ্রাতা উভয়েই বিরক্ত হইলেন। এই সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মলকুমার তাঁহাদিগকে তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংসর্গ ত্যাগের কথাও জানাইয়াছিল। এই যুগল সংবাদে তাঁহাদের বিরক্তি—ক্রোধে পরিণতি লাভ করিল।

বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ পিতা পুত্রকে লিখিলেন—"তুমি বিদ্যালয়ত্যাগ ও বিবাহ কোন কার্য্যেই আমার অনুমতি গ্রহণ কর নাই। বুঝিলাম, তুমি স্বাধীন হইয়া আর আমার সহিত সহিত সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা কর না। ভাল। আমার কায আমি করিয়াছি। তুমি খুঁটিয়া খাইতে শিখিয়াছ; স্বয়ং পরিবার প্রতিপালন কর—সুখে থাক।"

নির্ম্মলকুমার পিতার পত্রের সঙ্গে সঙ্গে মাতার এক পত্র পাইল। মা লিখিয়াছেন,—"বাবা, তোর পত্র পাইয়া কর্ত্তা বড় রাগ করিয়াছেন। তুই আমাকে না লিখিয়া প্রথমেই তাঁহাকে এ সব কথা লিখিতে গেলি কেন?

যাহা হইবার হইয়াছে ; এখন তুই বৌমা'কে লইয়া বাড়ী আয়। আমার মাথা খাস্, অন্যথা করিস না। আমি বৌমা'র জন্য বালা গড়াইতে দিলাম।"

মাতার পত্র পাঠ করিয়া নির্ম্মলকুমারের হৃদয় গৃহের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল— তাহার নয়ন-পল্লব সিক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু পিতার পত্রের ভাবে সে গৃহে যাইতে সাহস করিল না,—সে বাসনা তাহার হৃদয়ে উত্থিত হইয়া হৃদয়েই বিলীন হইয়া গেল। অভাগিনী সুরবালার ভাগ্যে, শাশুড়ীর আশীর্ব্বাদলাভ ঘটিল না।

এ দিকে নির্ম্মলকুমারের চিন্তার অবধি রহিল না। সহসা তাহার স্কন্ধে সংসারের ভার পড়িল। এখন আপনার ভরণপোষণের উপায় করিতে হইবে—সঙ্গে সঙ্গে পত্নীর ভারও লইতে হইবে। সে কি করিবে?—সে যেরূপ প্রশংসার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে তাহার পক্ষে অধ্যাপকপদ প্রাপ্তি সহজ হইতে পারে, কিন্তু যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রবত্যাগ করাই সে কর্ত্তব্য মনে করিয়াছে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুবকদিগের ঘনিষ্ঠতাসংস্থাপনে সে সহায় হইতে পারিবে না। এখন সে ঠেকিয়া শিখিল—দেখিল, তাহার লব্ধ শিক্ষা সত্যই তাহাকে কঠোর জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করে নাই। সে এখন কি করিবে?

এইরূপ ভাবনায় এক মাস কাটিয়া গেল ; সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

৫

এই সময় একদিন হরিশ্চন্দ্র আসিয়া নির্ম্মলকুমারকে তাহার শ্বশুর-বাটী নিমন্ত্রণ করিল। ইতঃপূর্ব্বে সে দুইবার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল —এবার ও প্রত্যাখ্যান করিতে চাহিল। কিন্তু জীতেন্দ্রনাথ তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল, "সে হইতে পারে না। তুমি পুনঃ পুনঃ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলে সকলে মনে করিবে, তুমি বিবাহ করিয়া এখন অনুতপ্ত হইয়াছ।"

নির্ম্মলকুমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল।

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল, সে যাহাকে জীবন-সঙ্গিনী করিয়াছে— তাহার ভবিষ্যৎ কার্য্য সম্বন্ধে তাহার মত গ্রহণও আবশ্যক। সুরবালা এখনও বালিকামাত্র—তা' হউক ; সে তাহার মত লইবে।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া নির্ম্মকুমার শ্বশুরালয় গেল।

শ্বশুরালয়ে শ্বশুর মহাশয় নির্ম্মল কুমারকে সংবাদ দিলেন, তাঁহার আফিসে মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে একটি কেরাণীর কার্য্য খালি আছে, নির্ম্মলকুমার

চেষ্টা করিলে সে কার্য্য তাহার হইতে পারে। নির্ম্মলকুমার কথাটা কেবল শুনিল, কোন উত্তর করিল না।

তাহার পর নির্ম্মলকুমারের সহিত সুরবালার সাক্ষাৎ হইল। বিবাহের পর স্বামীস্ত্রীতে আর একবারমাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছে। সুমধুর লজ্জার আবরণ তখনও মুক্ত হয় নাই। অথচ নির্ম্মলকুমার আজ জীবনের ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে পত্নীর সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছে। সে দুই একবার ভাবিল,—কেমন করিয়া সুরবালাকে জিজ্ঞাসা করিব; শেষে সে বলিল "সুর, আমি একটা আবশ্যক বিষয়ে তোমার সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছি।"

সুরবালা বিস্ফারিত নয়নে স্বামীর দিকে চাহিল। তেমন করিয়া নিঃসঙ্কোচে সে সে-ই প্রথম স্বামীর দিকে চাহিল। বিবাহের সম্বন্ধ হইতে এ পর্য্যন্ত যে সব অসাধারণ ঘটনা তাহাতেই কেন্দ্র করিয়া আবর্ত্তিত হইয়াছে —সে সব তাহার যৌবন-চাপল্যে বিজ্ঞতার গাম্ভীর্য্য দান করিয়াছিল।

নির্ম্মলকুমার বলিল, "আমার কার্য্যে পিতা আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমি আর তাঁহার গলগ্রহ হইয়া থাকিতে চাহি না। সুতরাং এই, বিশাল বিশ্বে আজ আমরা দুইজন আলয়—আশ্রয়হীন। আমাকে আমাদের আত্মরক্ষার উপায় করিতে হইবে।"

সুরবালা মুগ্ধ হইয়া স্বামীর কথা শুনিতে লাগিল।

নির্ম্মলকুমার বলিল, "এখন কি করি? দুই পথ মুক্ত—এক শিক্ষকের কার্য্য, চেষ্টা করিলে সে কায পাইতে পারি। কিন্তু মনুষ্যত্বের পরিণতির পক্ষে অন্তরায় বুঝিয়া যে পথ পরিত্যাগ করিয়াছি, কেমন করিয়া সেই পথের পথ-প্রদর্শক হইব? আর এক পথ দাসত্ব। সে কার্য্য করা কি যুক্তিযুক্ত?"

সুরবালা দৃঢ়স্বরে বলিল, "না।"

নির্ম্মলকুমার পত্নীকে বক্ষে ধরিয়া তাহার ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধরে চুম্বন দান করিল। এবার লজ্জায় সুরবালার নয়ন মুদিয়া আসিল।

তাহার পর স্বামীস্ত্রীকে কত কথা হইল—তখন লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে রাত্রিতে কেহই ঘুমাইল না। নির্ম্মলকুমার দুই চার বার স্ত্রীকে বলিল, "তুমি ঘুমাও"; কিন্তু পরক্ষণেই আবার একটা কথার অবতারণা করিল।

কথায় কথায় সুরবালা স্বামীকে বলিল, "যেমনই হউক—'স্বদেশী' জিনিসের কোন কায হয় না?"

প্রভাতে নির্ম্মলকুমার যখন প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছে, তখন শ্বশুর বলিলেন, "গত কল্য যে কাযের কথা বলিয়াছি, সেটার কথা ভাবিয়া যাহা হয় জানাইও।" নির্ম্মলকুমার ছাত্রাবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিল—তাহার সঙ্কল্প স্থির হইয়া গিয়াছে।

৬

কলিকাতা-প্রবাসী আত্মীয়দিগের ও কয়জন বন্ধুর সাহায্যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া নির্ম্মলকুমার স্বদেশী দ্রব্যের একখানা ক্ষুদ্র দোকান খুলিল। এ কার্য্যে তাহার অসাধারণ উৎসাহ লক্ষিত হইল। সুরবালার সেই কথা অহরহঃ তাহার হৃদয়ে জাগিতে লাগিল—"'স্বদেশী' জিনিসের কোন কায হয় না?"

সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞ যুবক বুঝিল না, এই বিষম প্রতিযোগিতার দিনে—সামান্য মূলধনে ব্যবসায় চালান অসাধ্য-সাধন। দুই মাস পরে খতাইয়া দেখিয়া নির্ম্মলকুমার বুঝিল, ব্যবসায়ে লাভ হইতেছে না; পরন্তু ছিদ্র-কুম্ভে বারির মত মূলধন বাহির হইয়া যাইতেছে। এখন উপায় কি?

নির্ম্মলকুমার চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। সে কি করিবে?

ভাবিতে ভাবিতে মাসাধিক কাল কাটিয়া গেল; নির্ম্মলকুমারের উৎসাহ-প্রফুল্ল, উদ্যমসমুজ্জ্বল হৃদয়ে ক্রমে নিরাশার অন্ধকার ব্যাপ্ত হইতে লাগিল।

এই সময় সহসা একটা অঘটন ঘটিয়া গেল। ভারতের রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে সহসা বোমার আবির্ভাব হইল; ভারতবাসী শুনিল, বিহারে বোমার দুইটি নিরপরাধ ইংরাজ রমণী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাহার পর একদিন বৈশাখের প্রভাতে কলিকাতাবাসীরা জাগিয়া শুনিল, কলিকাতায় পুলিশ বিপ্লবতন্ত্রীদিগের গুপ্তগৃহ পাইয়াছে। সংবাদ-পত্রে শত জিহ্বায় শত কাহিনী প্রচারিত হইতে লাগিল। শেষে অসত্যের ও অতিরঞ্জনের ফেন-পুঞ্জের নিম্নে সত্যের স্বচ্ছ ধারা দৃষ্ট হইল।

প্রথমেই যাহারা ধৃত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন নির্ম্মলকুমারের পরিচিত। পুলিশ তাহার বাক্সে নির্ম্মলকুমারের পত্র পাইল। পত্রে বিপ্লবের গন্ধমাত্র ছিল না। কিন্তু পুলিশের সন্দেহ হইল। বিশেষ নির্ম্মলকুমারকে সন্দেহ করিবার কারণও ছিল; পুলিশ মনে করিল, যখন হুগলী জিলার

ধনবান গৃহস্থের পুত্র হইয়া সে সহসা 'স্বদেশীর' জন্ত অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়াছে এবং সামান্ত দোকান উপলক্ষ করিয়া বসিয়া আছে—তখন তাহাকে পরীক্ষা করা আবশুক।

সুতরাং এক দিন প্রত্যুষে পুলিশ কর্ম্মচারীরা নির্ম্মলকুমার যে ছাত্রাবাসে বাস করিত সেই ছাত্রাবাস ঘিরিল।

নির্ম্মলকুমার নিদ্রাভঙ্গে দেখিল, সে অজ্ঞাত অপরাধে বন্দী হইয়াছে। পুলিশ তাহাকে লইয়া গেল।

৭

এই বিপ্লবতন্ত্রিষড়যন্ত্র প্রকাশে বাঙ্গলার বহুগৃহে অপ্রত্যাশিত বিপদের ছায়াপাত হইল—অনেক অঘটন ঘটিয়া গেল। পুত্রের বিপদে নির্ম্মল-কুমারের পিতার বিরক্তিবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল—পিতৃ-হৃদয় পুত্রের দিকে আকৃষ্ট হইল। নির্ম্মলকুমারের পিতা ও ভ্রাতা উভয়েই কলিকাতায় আসিয়া মোকর্দ্দমার তদ্বির করিতে লাগিলেন।

নির্ম্মলকুমারের জননী অশ্রুবর্ষণ—প্রায়োপবেশন প্রভৃতি নারীজনসুলভ উপায় অবলম্বন করিয়া স্বামীকে তাঁহাকে সঙ্গে কলিকাতায় আনিতে বাধ্য করিয়াছিলেন;—তিনি একবার পুত্রকে দেখিবেন।

মোকর্দ্দমার কাযে পিতা ও ভ্রাতা যখন আর সব ভুলিয়াছিলেন; মা তখন ভুলেন নাই যে, নির্ম্মলকুমার বিবাহ করিয়াছে। তাহার সেই দুঃখাতুরা পত্নীর—তাঁহার সেই অনাদৃতা পুত্রবধুর জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি সন্ধান লইয়া এক দিন নির্ম্মলকুমারের শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন।

দুর্দ্দিনে দুইজনে সাক্ষাৎ হইল। নির্ম্মলকুমারের জননী সুরবালার মলিন মুখে আপনার দারুণ দুঃখের প্রতিচ্ছবি দেখিলেন। তিনি পুত্রবধূকে কোলে লইয়া কাঁদিলেন—তাঁহার অশ্রুধারা সুরবালার মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিল। শাশুড়ীর কাছে কাঁদিয়া সুরবালার মনে হইল, যেন সে অকূলে কূল পাইল। সেই দিন হইতে দুইজনে প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত।

কারাগারে পুত্রের সহিত সাক্ষাতের অনুমতি পাইয়া নির্ম্মলকুমারের জননী পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া যাইলেন। নির্ম্মলকুমার বুঝিল, সুরবালার আশ্রয় জুটিয়াছে; তাহার হৃদয় হইতে একটা ভার নামিয়া গেল।

বাস্তবিক কারাগারে আসিয়া সুরবালার চিন্তাতেই সে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কি হইবে? শ্বশুর দরিদ্র। পিতা তাহার

গম্ভীর ভার লইবেন না। সে কারাবদ্ধ। সুরবালার কথা ভাবিয়া তাহার হৃদয়ে দারুণ দুশ্চিন্তা ও বিষম বেদনা অনুভূত হইত। তাহাকে বিবাহ করিয়াই সুরবালার আজ এই দুর্দ্দশা। কাযেই সে যখন দেখিল, তাহার জননী পুত্রবধূকে সস্নেহে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাহার মনের একটা ভার দূর হইল।

সুদীর্ঘ এক বৎসর কাল নির্ম্মলকুমার কারারুদ্ধ রহিল ; মোকর্দ্দমা আর শেষ হয় না। এই সময় তাহার নির্জ্জন কারাকক্ষে সে সুরবালার কথা ভাবিত ; তাহার দুই চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু ঝরিত।

এক বৎসর পরে মোকর্দ্দমার রায় প্রকাশিত হইল। তাহার বিরুদ্ধে কোন রূপ প্রমাণের অভাবে বিচারক নির্ম্মলকুমারকে মুক্তি দিলেন।

নির্ম্মলকুমারের জননী এত দিন কলিকাতাতেই ছিলেন। এবার তিনি পুত্রকে ও পুত্রবধূকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন। গত বর্ষকাল মধ্যে সুরবালা শাশুড়ীর হৃদয় অধিকার করিয়াছিল।

অপ্রত্যাশিত বিপদের অবসানে নির্ম্মলকুলমার দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ হইতে মুক্তি লাভ করিল। প্রেমের যে প্রবাহ নানা বিঘ্নের উপলমধ্যে অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না, এখন তাহা পূর্ণতা লাভ করিল—অনায়াসে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সুরবালার প্রেম তাহার নানাদুঃখকাতর হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব স্নিগ্ধ শান্তির ও সুখের সঞ্চার করিতে লাগিল। কিন্তু নির্ম্মলকুমারের এক সন্দেহ কিছুতেই মিটিল না ; তাহার কেবলই মনে হইত, সুরবালার মুখ তাহার পরিচিত ; সে পূর্ব্বে কোথাও তাহাকে দেখিয়াছে। অথচ সে পূর্ব্বে কোথায় তাহাকে দেখিয়াছে, তাহা কিছুতেই স্থির করিতে পারিত না।

* • * * *

কারাক্লেশে নির্ম্মলকুমারের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। মাসাধিককাল গৃহে থাকিয়াও যখন সে নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল না, তখন তাহার ভ্রাতা তাহাকে কিছু দিনের জন্য তাঁহার নিকট যাইয়া থাকিতে অনুরোধ করিলেন। পিতাও সেই মতে মত দিলেন। নির্ম্মলকুমার জ্যেষ্ঠের কর্ম্মস্থানে গেল। সুরবালা সঙ্গে গেল।

নির্ম্মলকুমার জ্যেষ্ঠের কর্ম্মস্থানে আসিবার পর কয় দিন কাটিয়া গেল। তাহার পর একদিন রাত্রিকালে শয়ন গৃহে আসিয়া নির্ম্মলকুমার দেখিল,

নিদাঘের দারুণ তাপে কক্ষে থাকা কষ্টকর। সে কক্ষসংলগ্ন অলিন্দে আসিল। উপরে আকাশ নক্ষত্র-খচিত,জ্যোৎস্নালোকে আলোকিত ; নিম্নে উদ্যান হইতে প্রস্ফুটিত বেল ফুলের সৌরভ কোমল ও মধুরতর হইয়া আসিতেছে।

নির্ম্মলকুমার কক্ষমধ্য হইতে একখানা মাদুর ও বালিস আনিয়া সেই অলিন্দে শয়ন করিল ; আকাশে তারকার স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি দেখিতে দেখিতে যেন স্বপ্ন-সাগরে ভাসিতে লাগিল। এই আকাশ সে বর্ষাধিক কাল দেখিতে পায় নাই।

সুরবালা কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষমধ্যে নির্ম্মলকুমারকে না পাইয়া সে-ও অলিন্দে আসিল, আসিয়া স্বামীর পার্শ্বে উপবেশন করিল।

সুরবালার হস্তে কি ছিল দেখিয়া নির্ম্মলকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি ?"

সুরবালা বলিল, "কাচের চুড়ী"।

"আনিয়াছ কেন" ?

"আজ বাড়ীতে এক চুড়ীওয়ালী চুড়ী বেচিতে আসিয়াছিল। দিদি চুড়ী পরিয়াছেন, আমাকেও পরিতে বলিয়াছিলেন ; আমি পরি নাই, তাই আমার জন্ম এই কয়গাছি রাখিয়া দিয়াছেন।

"তুমি পরিলে না কেন ?

"দিদি বলিলেন, এ চুড়ী স্বদেশী, কিন্তু আমার সন্দেহ ঘুচিল না। তুমি একবার দেখ। কাচের চুড়ীকে আমার বড় ভয়" ।—শেষ কথা কয়টা সুর-বালা কেমন বাধ বাধ ভাবে বলিল।

নির্ম্মলকুমার চুড়ী কয়গাছি লইয়া কক্ষে গেল, দীপশিখা উজ্জ্বল করিয়া পরীক্ষা করিল। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া সে চুড়ী কয়গাছি সুরবালাকে দিয়া বলিল, "এ চুড়ী স্বদেশী। কিন্তু কাচের চুড়ীতে তোমার ভয় কেন ?"

মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ করিয়া সুরোবালা বলিল, "প্রায় দুইবৎসর পূর্ব্বে আমি কাচের চুড়ী পরিয়াছিলাম। চুড়ীওয়ালী বলিয়াছিল, চুড়ী স্বদেশী। পর দিন আমরা গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া 'বন্দে মাতরম' গান শুনিতেছিলাম, এমন সময় আমার ছোট ভাই চুড়ী বিদেশী বলে। আমি লজ্জায় চুড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিতে যাইয়া হাত কাটিয়া ফেলি। তাহার পর এক জন পথযাত্রী যুবক আমার হাত বাঁধিয়া দেন।"

জ্যোৎস্নালোকে নির্ম্মলকুমার পত্নীর মুখে লজ্জারক্তরাগাভা দেখিতে পাইল না বটে, কিন্তু সুরবালার কণ্ঠস্বর যে লজ্জাজড়িত হইতেছিল, তাহা

সে বুঝিতে পারিল। সুরবালা বলিল "সে দিন মা'র কাছে বড় বকুনি খাইয়াছিলাম।"

তখন অপগতমেঘাবরণ আকাশে জ্যোৎস্নার মত নির্ম্মলকুমারের হৃদয়ে বিস্মৃত কথা জাগিয়া উঠিল। এত দিনের সন্দেহ মিটিল।

পত্নীর মুখচুম্বন করিয়া নির্ম্মল কুমার বলিল,"আমি এত দিন চেষ্টা করিয়া কিছুতেই মনে করিতে পারি নাই,বিবাহের পূর্ব্বে কোথায় তোমাকে দেখিয়াছিলাম। আমিই তোমার তিরস্কার লাভের কারণ।"

সুরবালা মৃদু মৃদু হাসিতেছে দেখিয়া নির্ম্মলকুমার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলে?"

পতির মুখচুম্বন করিয়া সুরবালা বলিল, "দেখিবামাত্র।"

বর্ষ-বিদায়।

—:০:—

১

সন্ধ্যার সুবর্ণ রেখা মিশে গেল ধীরে
পশ্চিম গগনে,
শ্রান্তিহারা সুপ্তিভরা তরল তিমিরে
ঘিরিয়া ভুবনে।
কেগো ওই ম্লান মুখে দাঁড়াইয়া দ্বারদেশে
অপরাধীপ্রায়!
পুরাতন বর্ষ ও যে অশ্রুধারে মাগিছে এসে
নীরব বিদায়।

২

একদিন এসেছিলে জাগায়ে অন্তরে
কত নব আশা,
অযাচিত দিয়াছিলে ঢালি সবা'পরে
কত ভালবাসা;
উঠেছিল প্রতি গৃহে-হেরি তোমা জয় রথে
হর্ষ গীতি গান,
আজি উপেক্ষিত তুমি—নীরবে অজ্ঞাত পথে
করিব প্রয়াণ?

৩

হে বন্ধু, দাঁড়াও তবে, দেখি ভাল করে'
বিদায়ের ক্ষণে,
চাহিয়া তোমার পানে জল আসে ভরে'
আমার নয়নে।
দলিয়াছ কত সাধ—সুখের স্বপন কত
দিয়াছ ভাঙ্গিয়া,
তবুও ছাড়িতে তোমা চির জনমের মত
কাঁদে মোর হিয়া।

৪

আঁধারে বিদ্যুৎসম জ্বালিয়াছ কভু
কোথা সুখ-আলো,
কতগৃহে নিবায়েছ দীপশিখা, তবু
বাসি তোমা ভালো।
কর্ণধারী এ জীবনশত দুখ শোক ভরা,
জানি নিরন্তর
পতনে উত্থানে মহাপরিণতি তারে মোর
হই অগ্রসর।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

সমালোচনা।

সনাতনী। *

অক্ষয়বাবু প্রবীণ সাহিত্যিক। বঙ্গদেশে সাহিত্য পরিষদ ও সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠিত হইবার বহুপূর্ব্বে, সাহিত্য-সম্মিলনের শুভ কল্পনা কল্পিত হইবার অগ্রে যাঁহারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত জ্ঞানসম্পদে বাঙ্গালা সাহিত্যকে গৌরবান্বিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন—অক্ষয়বাবু তাঁহাদের একজন। তাঁহাদের অনেকেই এখন কর্ম্মময় জীবনের অবসানে চিরশান্তি উপভোগ করিয়াছেন; কেবল তাঁহাদিগের যশঃসৌরভে বঙ্গসাহিত্য-মন্দির সুরভিত। আমাদের সৌভাগ্য অক্ষয়বাবু আজও সাহিত্যচর্চা করিতেছেন; ভারতের চিরাচরিত প্রথায় শিষ্যদিগকে বিদ্যাদান করিতেছেন। অক্ষয়বাবু এক হিসাবে বাঙ্গালীকে হতাশ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' যে পণ্য লইয়া বাঙ্গালীর ঘাটে ভিড়িয়াছিল—সে পণ্যের মধ্যে যাঁহার রচনা অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল, যাঁহার রচনা কমলাকান্ত সাদরে আপনার দপ্তরে বান্ধিয়াছিলেন, যাঁহার 'সাধারণী' ভাবগাম্ভীর্য্যের ও ভাবালালিত্যের অপূর্ব্ব সমাবেশে বাঙ্গালীকে মোহিত করিয়াছিল, তাঁহার নিকট বাঙ্গালী অনেক আশা করিয়াছিল। সে আশা পূর্ণ করা দূরে থাকুক, অক্ষয়বাবু তাঁহার ইতস্ততবিক্ষিপ্ত বহুমূল্য রচনাগুলির সংগ্রহও করেন নাই। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বড় দুঃখে লিখিয়াছিলেন—"আমাদের শেষ পয়ার-প্রিয় ছিলেন অক্ষয় ভায়ার সর্ব্বজন-সম্মানিত স্বর্গীয় পিতা গঙ্গাচরণ সরকার। তাঁহার কবিতা পড়িতে পড়িতে মনে হয়, আমাদের ঘরের লোকের দ্বারা লিখিত আমাদের ঘরের ও মরমের কথা পড়িতেছি। আর মনে করিলে সেই রকম কবিতা লিখিতে পারেন অক্ষয় ভায়া নিজে। বিশেষ,বঙ্গ ও বাঙ্গালী তিনি যেমন জানেন ও বোঝেন ও ভালবাসেন,তেমন আর কেহ নহে। সুতরাং মনে করিলে তিনি বঙ্গের কথা অতুলনীয় কবিতায় লিখিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু তিনি মনে করি-বেন বলিয়া আমার আশা নাই। এ জন্মটা তিনি ঘটি ঘটি জল খাইয়া এবং লম্বা লম্বা ঢেঁকুর তুলিয়াই কাটাইয়া দিলেন।" কেবল পদ্যে নহে, অক্ষয়বাবু ইচ্ছা

* সনাতনী—শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত। কলিকাতা ২৮।৪, অখিল মিস্ত্রীর লেন হইতে শ্রীকেদারনাথ বসু বি, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

করিলে গদ্যে ও পদ্যে সাহিত্যে যে শক্তির ও সৌন্দর্য্যের সঞ্চার করিতে পারিতেন—তাহা তিনি করেন নাই। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য। 'সনাতনী' অক্ষয়-বাবুর পরিণত বয়সের রচনা। যাঁহারা ইহাতে "উদ্দীপনা"র উদ্দীপনা বা "ভাই হাততালি"র কশাঘাৎ পাইবেন আশা করিবেন, তাঁহারা হতাশ হইবেন। বিষয়গুণে এ রচনা অতুরূপ। 'সনাতনী' ধর্ম্মের কথা। বিশেষ, ইহা যেন প্রবীণ লেখকের জীবনব্যাপী জ্ঞানার্জ্জনের ফল—বক্তব্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি—note মাত্র। ইহার রচনার সহিত হার্বার্ট স্পেন্‌সারের Facts and Comments গ্রন্থের রচনায় বিশেষ সাদৃশ্য বিদ্যমান। উভয় গ্রন্থই অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক; উভয় গ্রন্থই সংক্ষিপ্ত, উভয় গ্রন্থেই যেন বক্তব্য বিষয় অতিরিক্ত সংক্ষেপে ব্যক্ত।

ধর্ম্মের ধারণাও দেশকালপাত্রভেদে ভিন্ন। যুরোপে ধর্ম্ম বাহিরের, ভারতে অন্তরের। যুরোপে ধর্ম্মের জন্য স্বতন্ত্র স্থান ও স্বতন্ত্র সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। ভারতে সমাজ, সংসার, সবই ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত; ধর্ম্ম নহিলে হিন্দুর এক প্রহর চলে না। অক্ষয় বাবু এই ধর্ম্মের কথা বুঝাইয়াছেন। "ধর্ম্মের নানাভাব, ধর্ম্মের নানা মূর্ত্তি। * * ধর্ম্মবিষয়ে নানা দেশে নানা মত আছে; এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত হইয়াছে।"—প্রকৃত পক্ষে "ধর্ম্মই সমাজের বন্ধন। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিব এইরূপ বিশ্বাসে, যে অতি বিস্তীর্ণ কারবার চলিতে থাকে, তাহার নাম সমাজ। পরস্পরের সাহায্যও যাহাকে বলে, পরস্পরের উপকারও তাহাকেই বলে; সুতরাং পরস্পরের উপকারেচ্ছু সম্প্রদায়ের নাম সমাজ। * * উপকারই ধর্ম্মের সাধন; তাহাতেই বলি, একমাত্র ধর্ম্মই সমাজের বন্ধন।"

অক্ষয়বাবু বুঝাইয়াছেন, "মনুষ্যত্বই যদি ধর্ম্ম হইল ও ধর্ম্মের ক্ষয়ে যদি মনুষ্যত্বের ও মনুষ্যাকারের হানি হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। যে পর্য্যন্ত মনুষ্য মনুষ্য থাকিবে, সে পর্য্যন্ত মানবধর্ম্ম অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে। ধর্ম্মের প্রকৃতি সনাতনী। তুমি সবলই থাক, আর দুর্ব্বলই থাক, তুমি স্বাধীন থাক আর পরাধীন থাক, ধর্ম্ম তোমার অবস্থার দিকে চাহিবে না!"

সনাতন ধর্ম্ম উদার।—গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

"সনাতন ধর্ম্মের সার কথা এই যে, প্রকরণ পদ্ধতি, ধ্যান ধারণা, আলম্বন বিভাবন—পৃথক্ হইলেও সকল শ্রেণীর ঐশ্বরিক সাধনাই ধর্ম্ম। দেশ, কাল, পাত্র—জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা—প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, রুচিভেদে যাজনার তারতম্য হয় মাত্র। কোন ধর্ম্মে হিংসা করিতে নাই। যে, যে পথে পার, ধর্ম্মের উজ্জ্বল বিমল বিমানব্যাপী পতাকা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হও। এই সকল সনাতন ধর্ম্মের সার কথা।"

সনাতন ধর্ম্ম যে যেমন ও যে ভাবে পারে, পালন করিবে ;—

"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥"

ধর্ম্মই ধার্ম্মিকের সর্ব্বস্ব।—"ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন। হিন্দু ও য়ুদী বহু নির্য্যাতনেও কেবল ধর্ম্মবলে এখনও জীবিত আছেন। ধরিয়া লইলাম, আপনার অগৌরব করাই পরম পুরুষার্থ। সুতরাং হিন্দুর কথা এখানে নাই বলিলাম ; কিন্তু একবার য়ুদীর প্রতি দৃষ্টিপাত কর দেখি ! য়ুদী কোন্ কালে বাস্তদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, তাহার উপর, কত উৎপীড়ন উপপ্লব মাথায় বহিয়াছে, এখন ও বহিতেছে, তবু মরে নাই ! কেবল মরে নাই নহে, জগতের মধ্যে সুন্দর, সুশ্রী, উন্নতদেহ, দীর্ঘজীবী, বলিষ্ঠ, প্রফুল্ল, ধনশালী, কলানিপুণ জাতি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কেন ? তাহারা স্বধর্ম্মপরায়ণ ও সদাচারনিষ্ঠ বলিয়া। চৌরঙ্গীর এজ্রা, গব্বয়দিগকে দেখিবার প্রয়োজন নাই, একবার ক্যানিং ষ্ট্রীটের মুর্গীহাটার সামান্য পণ্যজীবী য়ুদীদিগকে দেখিয়া আইস—দেখিবে, অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ কেমন তৎপরতার সহিত কার্য্য-কুশলতা দেখাইতেছে—ইহাদের দেখিয়া, তাহার পর য়ুদীনির্য্যাতনের ইতিহাস স্মরণ কর, তাহার পর এই জাতিকর্ত্তৃক সদাচার ও স্বধর্ম্ম পালনে কথা পাঠ কর,—নিশ্চয়ই বুঝিবে, ধর্ম্মই সমাজকে ধারণ করিয়া থাকে, ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করে।" ভারতের কথায় পরলোকগত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও একবার এমনই ভাবে বলিয়াছিলেন যে, রোমের সৈন্যপদভরে ধরাতল কম্পিত হইত, যে গ্রীস শিল্পে ও সাহিত্যে নূতন শ্রীসঞ্চার করাইয়াছিল, যে মিশর একদিন সভ্যতার নূতন আদর্শ আনিয়াছিল—সে রোম, গ্রীস, মিশর আজ মৃত কিন্তু ভারত আজ জীবিত—ভারতের আধ্যাত্মিকতাই তাহার এই জীবনের কারণ।

'সনাতনী' এইরূপ আলোচনায় পূর্ণ।

বলিয়াছি, 'সনাতনী' notes। গ্রন্থকার অতি সংক্ষেপে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন তাহার এক একটির আলোচনায় এক একখানি পুস্তক রচিত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে গ্রন্থের একাদশ পরিচ্ছেদের (জাতি ভেদে ব্যবসায় ভেদ) উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই বিষয় লইয়া বহু তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে এবং এ সম্বন্ধে সে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সম্যক আলোচনা অল্প স্থানে হয় না।

যাঁহারা উদ্‌ভ্রান্ত হিন্দুকে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন ও বহু-পরিমাণে সফল-প্রযত্ন হইয়াছেন অক্ষয় বাবু তাঁহাদিগের নেতৃসম্প্রদায়ভুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র 'নবজীবনেই' প্রথম হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন। অক্ষয় বাবুর এই পুস্তক—হিন্দু ধর্ম্ম তিনি যে ভাবে বুঝিয়াছেন তাহার কথা আমাদের অবশ্যপাঠ্য।

এই পুস্তকে অক্ষয় বাবু যে ধীরতার, গাম্ভীর্য্যের ও উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বঙ্গ সাহিত্যে সুলভ নহে; পরন্তু একান্ত দুর্লভ।

সংগ্রহ।

—•—

ইতিহাস

—•—

ফরাসী চিত্রে মীরকাশিম।

জান ব্যাপ্টিষ্ট জোসেফ জেণ্টিল নামক জনৈক ফরাসী সৈনিক মীর কাশিমের দরবারে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বিখ্যাত গুর্গণ খাঁর অধীনেই তিনি কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার স্মারক পুস্তকে মীর কাশিমের দরবার সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে। 'হেরাল্ড' নামক নব প্রকাশিত সচিত্র মাসিক পত্রে জনৈক লেখক সেই পুস্তক হইতে কয়েক পৃষ্ঠা অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্য নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা মিঃ জেণ্টিলের জীবন কথা ও তাঁহার স্মারক পুস্তকে উল্লিখিত কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনার কথার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিয়ে প্রদান করিলাম।

১৭২৬ খৃষ্টাব্দে ২৫ জুন তারিখে জান ব্যাপ্টিষ্ট জোসেফ জেণ্টিল ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ফ্রান্সের একটি প্রাচীন অভিজাত বংশেই তাহার জন্ম। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি একদল ফরাসী পদাতিক সেনার সহিত ভারতে আগমন করেন। ডুপ্লে, বুসি, কনফ্ল্যা এবং লালির অধীনে তিনি সেনা-বিভাগে কার্য্য করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ পণ্ডিচারী অধিকৃত করেন। তাহার পর জেণ্টিল ল অব্ লরিষ্টান নামক ফরাসী সেনানায়কের সন্ধানে ভারতের বহু স্থানে পর্য্যটন করেন। পণ্ডিচারী-পতনের সময় লরিষ্টানও ইংরাজদিগের করে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, জেণ্টিল তাহা জানিতে পারে নাই। এই সময় বঙ্গের নবাব কাশিম আলি খাঁর সহিত ইংরাজদিগের বিবাদ বাধিয়া উঠে। জেণ্টিল এই সময় নবাবের সেনাপতি গুর্গন খাঁর সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার সেনাদলে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষুর সম্মুখেই গুর্গন খাঁর হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হয়। মীরকাশিম কর্ত্তৃক বন্দী ইংরাজগণের প্রাণনাশ ইনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া নবাবের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি মীর কাশিমের দরবার পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার দরবারে প্রবেশ লাভ করেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৬ শে জানুয়ারী উক্ত নবাবের মৃত্যু হইলে তাঁহার পরবর্ত্তী নবাব আসফ্ উদ্দৌলা ইংরাজদিগের পরামর্শে ইঁহাকে পদচ্যুত করেন। অতঃপর ইনি ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়।

লেখকের পরিচয়।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে মীরকাশিমের সহিত ইংরাজের বিবাদ বাধিয়া উঠে। বিবাদের দুইটি কারণ। প্রথম কারণ, মীরকাশিম ইংরাজদিগকে বর্দ্ধমানের মালিকত্ব দিতে অসম্মত হইয়াছিলেন; দ্বিতীয় কারণ,—যে সকল বণিক এদেশে বাণিজ্য করিতেন, নবাব তাঁহাদের সকলকেই শুল্কের দায় হইতেই অব্যাহতি দিয়াছিলেন। ইংরাজের সহিত বিবাদ বাধিলেই নবাব জগতশেঠ এবং তাহার ভ্রাতাকে মুঙ্গেরে লইয়া আইসেন। ইঁহারা নবাবের সহিত মিত্রতা করিবেন এবং নবাবের অনুরক্ত হইয়া থাকিবেন,—এইরূপ প্রতিশ্রুতি করিলে নবাব ইঁহাদিগকে ব্যবসায়ের জন্ম প্রভূত অর্থপ্রদান করেন এবং ইঁহাদের বাসার্থ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

ইংরাজ ও মীর কাশিম।

জেণ্টিল লিখিয়াছেন,—ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিয়ালদিগের উদ্ধত ব্যবহারে মীর-কাশিম ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠেন। ইংরাজ কুঠিয়াল মিঃ ইলিস এবং মিঃ আমিয়ট নবাবের লোকদিগকে যেরূপ ভাবে অপমানিত করিয়াছিলেন,—জেণ্টিল তাহা স্বয়ং দেখিয়াছিলেন। ভ্যান্সিটার্ট এবং হেষ্টিংস নবাবকে শান্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করাইবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ ইংরাজ কুঠিয়ালই শান্তিপথের পরিপন্থী ছিলেন। ইতোমধ্যে ইলিস অকস্মাৎ পাটনা অধিকৃত করেন। মীরকাশিমের সেনাপতি গুর্গন খাঁ ক্ষিপ্রহস্তে নবাবের অন্যতম সেনানী মার্কারকে পাটনায় নবাব মেহীআলী খাঁ'র সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন। মার্কার অবিলম্বে পাটনা দখল করেন এবং ইংরাজ সেনানী

বিবাদের কারণ ও সূত্রপাত।

ইল্লিস দুইশত সৈনিক ও ৪০ জন সেনানীর সহিত নবাব সেনাপতি সমার্সের করে আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়ে। এই সকল বন্দী ইংরাজকে নানা স্থানে অবরুদ্ধ রাখা হয়।

বিবাদ।

বিবাদ বাধিয়া উঠিবার কিছুদিন পূর্ব্বে দুইজন দূত সুপ্রীম কাউন্সিল কর্ত্তৃক নবাবের নিকট প্রেরিত হয়েন। নবাব যে বাণিজ্য শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছিলেন,—তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব লইয়াই ঐ দুইজন দূত নবাবের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমিয়ট ঐ দূতদ্বয়ের অন্যতর ছিলেন। আমিয়ট নবাবকে স্পষ্টই বলিলেন যে, ইংরাজগণ অর্দ্ধ হারে শুল্ক দিতে সম্মত আছেন, নবাব অন্যান্য জাতীয় বণিকগণের নিকট হইতে পূর্ণ হারে শুল্ক আদায় করুন। এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য না করাতে নবাবের ১ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু নবাব কোনও কথাতেই কর্ণপাত করিলেন না। আমিয়ট অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া সেই রাত্রিতেই গোপনে মুঙ্গের হইতে পলায়ন করেন। আমিয়টের সহচর নবাবপক্ষীয় কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক বন্দী হয়েন। নবাব ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ফৌজদারের আদেশে নবাব সেনা মুর্শিদাবাদে আমিয়টকে নৌকার উপরেই হত্যা করে।

ইংরাজ ও ফরাসী।

যুদ্ধ বাধিল। ইংরাজ আর কাল বিলম্ব না করিয়া মীরকাশিমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। ইংরাজরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তাঁহাদের নিকট অনেক ফরাসী বন্দী ছিল। তাঁহারা তাহাদিগকে মুক্তি দিলেন এবং তাঁহাদিগকে সেনানী মেজর আডাম্‌সের অধীনে কার্য্য করিতে বাধ্য করিলেন। মেজর আডাম্‌স্ আর কাল বিলম্ব না করিয়া মুর্শিদাবাদ যাত্রা করেন এবং ফৌজদারকে পরাজিত করিয়া মুর্শিদাবাদ অধিকৃত করেন। নবাব ভীত হইয়া তাঁহার উৎকৃষ্ট সেনাদল সমভিব্যাহারে রাজমহল যাত্রা করিলেন। এ দিকে ম্যাডেক নামক ইংরাজ পক্ষীয় জনৈক ফরাসী সেনানী অন্য পথ অবলম্বন করিয়া সমার্সের অধীনস্থ নবাব সেনার একটি ঘাটির সম্মুখে উপনীত হয়েন। নবাব সেনা অকস্মাৎ তাহাদের আগমনে ভীত ও ছত্রভঙ্গ হয়। ম্যাডেক সমার্সের কামানগুলি হস্তগত করেন। জেন্টিল লিখিয়াছেন, সুতরাং ফরাসীদিগের বলবীর্য্য প্রভাবে ইংরাজ বঙ্গদেশ অধিকার করেন।

নবাবের ভীষণ প্রতিজ্ঞা।

সমার্স পাটনায় যে সমস্ত ইংরাজকে বন্দী করিয়াছিলেন, তাহাদের নিকট হইতে মীর কাশিম কতকগুলি আবশ্যক চিঠিপত্র প্রাপ্ত হয়েন। জগৎশেঠ এবং তাহার ভ্রাতা মিঃ ইল্লিসকে নবাবের সহিত যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন এইরূপ পত্র ও নবাবের হস্তগত হইয়াছিল। নবাব ইহাদের বিশ্বাসঘাতকতায় বিস্মিত হইয়া পড়েন। এ দিকে ইংরাজ সেনাপতি রাজমহল অধিকৃত করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকেন। মীর কাশিম ধন সম্পত্তি পাটনায় পাঠাইয়া দিলেন এবং ইংরাজ সেনানীকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, যদি তিনি আর একপদ অগ্রসর হয়েন, তাহা হইলে মীরকাশিম সমস্ত বন্দী ইংরাজকে হত্যা করিবেন। মেজর আডাম্‌স ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

গুর্গন্ খাঁই নবাবের কৃতী মন্ত্রী ছিলেন। নবাবের শত্রুগণ নানা উপায়ে তাঁহার উপর নবাবের অবিশ্বাস উৎপাদন করিতে লাগিল। গুর্গন খাঁ এই ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত ছিলেন। নবাবের নিকট হইতে প্রত্যহ তাঁহার খাবার আসিত। জেন্টিল তাঁহার সহিত ভোজন করিতেন। একদিন খাবার আসিলেই জেন্টিল তাহা খাইতে আরম্ভ করেন। গুর্গন খাঁ বলেন, "কর কি, খাদ্যে বিষ থাকিতে পারে। আমার পদে পদে শত্রু তাহা তুমি জান না? আমার ভ্রাতার এবং আমার কত কুৎসা ও নিন্দাবাদ করা হইতেছে, তাহা কি তুমি অবগত নহ?" তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ সমস্ত খাদ্য দ্রব্য দূর করিয়া দিলেন এবং বিশ্বস্ত লোক দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য লইয়া আসিলেন।

গুর্গন খাঁ।

মুঙ্গের ও পাটনার মধ্যপথে গুর্গন খাঁকে হত্যা করিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু গ্রীষ্মাতিশয্য নিবন্ধন জেন্টিল গুর্গন খাঁর শিবিরের বাহিরে প্রহরীর নিকট শয়ন করিয়াছিলেন। হত্যাকারীরা মনে করে যে তাহাদের ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ পাইয়াছে; সেই জন্য তাহারা পরদিনের জন্য ঐ কার্য্য স্থগিত রাখে। পরদিন সেনাদল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে। গুর্গন খাঁর ছাউনিতে উপস্থিত হইতে একটু বিলম্ব ঘটে। তিনি আসিয়াই আহার করেন। তাহার পর গ্রীষ্মের ক্লান্তি অপনোদনার্থ জেন্টিলকে সঙ্গে লইয়া খত্রির শিবিরে গমন করেন। শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ছিলেন। পথিমধ্যে মোগল সেনাদলের শিবির সন্নিবিষ্ট ছিল। যখন তিনি ঐ সেনাদলের সম্মুখ দিয়া আসিতেছিলেন, তখন একজন অশ্বারোহী সেনা তাঁহার নিকট আসিল; এবং তাহার নিকট অর্থ চাহিল। বিরক্ত হইয়া সচিব-প্রধান তাঁহার দফাদারকে আহ্বান করিলেন। সেনাটি চলিয়া গেল। সেই সময় গুর্গন খাঁ অন্য বিষয়ে কথা কহিতেছিলেন। জেন্টিল কয়েকপদ অগ্রসর হইলেন। অকস্মাৎ কলরব উঠিল। জেন্টিল ফিরিয়া দেখিলেন,—জনৈক অশ্বারোহী সচিবকে উপর্য্যুপরি তিনবার তরবারির আঘাত করিয়া ধরাশায়ী করিল। সকলে ধরাধরি করিয়া গুর্গন খাঁকে তাঁহার শিবিরে লইয়া গেল। গুর্গন অচিরেই পঞ্চত্ব পাইলেন।

হত্যা।

জেন্টিল লিখিয়াছেন,—গুর্গন খাঁ নবাবের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। নানা প্রলোভনেও তিনি নবাবের পক্ষ পরিত্যাগ করিতে সম্মত হয়েন নাই। তিনি স্পষ্টই বলিতেন,—"আমি নবাবের নিমক খাইয়াছি; মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমি তাঁহার স্বার্থ অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু তাঁহার শত্রুপক্ষ তাঁহার বৃথা কলঙ্ক রটাইয়া নবাবকে তাঁহার শত্রু করিয়া তুলিয়াছিল।

বিশ্বাসী অমাত্য।

মীর কাশিম অতঃপর শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা করিতে সঙ্কল্প করেন। ভ্রাতৃদ্বয় নবাবের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া এক প্রস্তাব করিয়া পাঠান। শেঠদ্বয় বলেন, নবাব যদি তাঁহাদিগকে ক্ষমা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা নবাবকে চারি কোটী টাকা দান করিবেন। এই প্রস্তাব যখন উপস্থিত হয়, তখন জেন্টিল ভিন্ন নবাবের নিকট অন্য কেহ ছিল না। নবাব জেন্টিলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"দুই ভ্রাতার জন্য চারি কোটী টাকা দিতে চাহিতেছে; উঃ! ওমরাহগণ একথা শুনিলে উহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য ছুটিবে এবং আমাকে উহাদের করে সমর্পণ করিবে। উঃ।" তিনি তখন

জগৎশেঠের পরিণাম।

বলিলেন,—"কেহই এখন এ শিবির পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।" তখন নবাব শমরুকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং বলিলেন "অবিলম্বে জগৎশেঠ ও তাহার ভ্রাতাকে হত্যা কর।" কিছুক্ষণ পরে শমরু আসিয়া সংবাদ দিল হত্যাকাণ্ড শেষ হইয়া গিয়াছে। পিস্তলের গুলিতে উঁহাদিগকে নিহত করা হয়। উঁহারা শিরশ্ছেদ দণ্ড প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু শমরু সে প্রার্থনায় কর্ণপাতও করে নাই। কেহ কেহ বলেন মুঙ্গের দুর্গের চূড়া হইতে উঁহাদিগকে গঙ্গা বক্ষে নিক্ষিপ্ত করা হয়। জেন্টিল এই ব্যাপারের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না; কিন্তু নবাবের সম্মুখে শমরু যাহা বলিয়াছিল, তাহা তিনি স্বয়ং শুনিয়াছিলেন।

বন্দী ইংরাজগণ প্রথমতঃ মেহদি আলির তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহারা শমরুর অধীনস্থ কতকগুলি সিপাহির অধীনে রক্ষিত হয়েন। মুঙ্গের অধিকৃত করিবার পর মেজর আডামস্ পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন শুনিয়া নবাব জেণ্টিলকে ডাকিয়া পাঠান। জেণ্টিল আসিলে নবাব কাশীম আলি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন,—"আমি মেজর আডাম্‌স্‌কে লিখিয়াছিলাম যে তিনি যদি রাজমহল অতিক্রান্ত করিয়া আর একটু অগ্রসর হয়েন, তাহা হইলে বন্দী ইংরাজগণকে নৃশংসরূপে নিহত করা হইবে। আমি কোরাণ স্পর্শ করিয়া ঐরূপ শপথ করিয়াছি। মেজর আডাম্‌স্ আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। সুতরাং আমার কি সে প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য নহে?" জেণ্টিল মীর কাশিমকে এই নৃশংস কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্ত নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মীর কাশিম সে কথায় কর্ণপাতও করেন নাই।

ভীষণ প্রতিজ্ঞা।

শমরুর হস্তে এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের ভার ন্যস্ত হইল। সে সাটু নামক জনৈক ফরাসীকে এই কার্য্য-ভার অর্পণ করে। সাটু তাহাতে অসম্মত হয়। তখন সে স্বয়ং ঐ কার্য্য করিতে যায়। এই সময় বন্দী ইংরাজগণ একটি গৃহপ্রাঙ্গণে আহার করিতে বসিয়াছিলেন। শমরু উঁহার সম্মুখস্থ গৃহের ছাদে সেনা সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখে। তাহার ইঙ্গিতমাত্রেই সেনাদল সেই আহারে নিযুক্ত বন্দী ইংরাজদিগের উপর গুলি চালাইতে আরম্ভ করে। দ্বার দিয়া যাহারা পলায়ন করিতে চেষ্টা করে, তাহাদিগকে হত্যা করা হয়। একজন পয়ঃনালার মধ্যে পলায়ন করিয়াছিল; তিন দিন পরে তাহাকে তথায় পাওয়া যায়; নবাবের লোক ইহাকেও হত্যা করে। এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডে পয়তাল্লিশ জন পদস্থ ইংরাজ নায়ক এবং দুই শত সেনা নিহত হয়।

নৃশংস নরহত্যা।

জেণ্টিল তিনজন ইংরাজের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি আর দুইজন ইংরাজ ও একজন জর্ম্মণের প্রাণরক্ষা করেন। ইংরাজদিগকে নিহত করিয়া মীর কাশিম পাটনাপরিত্যাগ করেন। পথে তিনি একদিন জেণ্টিলকে ডাকিয়া বলেন,—ইংরাজদিগের সহিত আমি যুদ্ধ করিতেছি না বলিয়া সর্দ্দারগণ আমার বিরুদ্ধে নানা কথা বলিতেছে। ইহারা ভীরু, ইহাদের উপর আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। পাটনা হইতে আগমনের পর আমি উঁহাদিগকে প্রায় ২৪ কোটী টাকা দিয়াছি। উঁহারা এখন ধনাঢ্য হইয়া উঠিয়াছে।"

অবিশ্বাস।

বিবিধ।

পৃথিবীর উদ্দেশ্য ও মানবজাতি।

এই পৃথিবীর উদ্দেশ্য কি, ও মানবজাতির সহিত ইহার সম্বন্ধ কিরূপ, এই সমস্যা বোধ হয় স্মরণাতীত কাল হইতে মনস্বীদিগের মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিয়া আসিতেছে। ভারতের প্রাচীন মনস্বিগণ এ সমস্যার একরূপ সমাধান করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে প্রণালী অবলম্বনে এই সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন, সে প্রণালীর নাম যোগ। এখন যোগ দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধে আত্মশক্তিকে পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ করিয়া জগৎ রহস্যের উদ্ভেদ করিবার পদ্ধতি লোক বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। এখন নূতন যুগে নূতন পদ্ধতি অবলম্বিত। এ পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক। য়ুরোপখণ্ডেই এই পদ্ধতির উদ্ভব। এত দিন বিজ্ঞান কেবল জড়জগৎ লইয়াই ব্যস্ত ছিল। এখন উহার অনুসন্ধান জড়জগৎ ছাড়িয়া অধ্যাত্ম জগতের দিকে ধাবিত। সুতরাং জীবনরহস্য ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিষয়গুলি ধীরে ধীরে উহার আলোচনায় বিষয়ীভূত হইয়া পড়িতেছে। সম্প্রতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস নামক বিলাতের একজন অসাধারণ-মনীষা-সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক The World of Life (জীবজগৎ) নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক সমাজে ডাক্তার ওয়ালেসের অসামান্য প্রতিষ্ঠা বর্ত্তমান। বিলাতের 'পাব্লিক্ ওপিনিয়ন্' নামক পত্রে তাহার কয়েকটি বিষয়ের সামান্য মাত্র আলোচনা করা হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহার দুই একটি কথার সার সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

জড় ও চৈতন্য শক্তি। প্রকৃতির প্রশস্ত ক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণকালে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই মানবজাতিকে বিস্মৃত হইয়া যায়েন। ডাক্তার ওয়ালেস বলেন যে, তাঁহার মতে জগতে মানবের স্থান সকলের শীর্ষস্থানে অবস্থিত।—মানুষই এই ধরা-নৈবেদ্যের চূড়া-মণ্ডন মোণ্ডা। পৃথিবীর চরম পরিণতি মানবেই সপ্রকাশ। বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান এই বিশ্বচরাচরের সকল ব্যাপার অনুসন্ধান করিয়া যে সকল সার সত্যে উপনীত হইয়াছে—তাহা লইয়াই ডাক্তার ওয়ালেস "জীবন কি" সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তনবাদের বিবিধ পর্য্যায়ের আলোচনা করিয়া ডাক্তার ওয়ালেস স্পষ্টই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এই বিশ্বের অন্তরালে একটি সৃজনকারিণী শক্তির লীলা স্পষ্টই প্রকট ; এবং বিবর্ত্তিনী শক্তিবিকাশের প্রতি পর্য্যায়ে কোনও অজ্ঞাত বুদ্ধি সেই শক্তিকে পরিচালিত করিতেছে ; সেই বুদ্ধি একই উদ্দেশ্য সাধনে-ব্যাপৃত।

মানব। ডাক্তার ওয়ালেসের মতে মনুষ্য-সৃষ্টিই এই পৃথিবীর চরম উদ্দেশ্য, বিবর্ত্তনবাদ হইতে ইহা স্পষ্টই অনুভূত ও প্রতিপন্ন হয়। মনুষ্য চিৎশক্তি বিকাশের পরম পরিণতি। মনুষ্যই কেবল প্রকৃতির রহস্যোদ্ভেদে সমর্থ। প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করিবার অন্য কাহারও সাধ্য নাই।

ডাক্তার ওয়ালেস ডার্ব্বিনের বিবর্ত্তনবাদের প্রসারবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, বিবর্ত্তনবাদের দ্বারা প্রকৃতির সমস্ত রহস্তের উচ্ছেদ করা সম্ভব। কিন্তু ডার্ব্বিন বিবর্ত্তনবাদের ক্ষেত্র হইতে অনেক বিষয় বাদ দিয়া গিয়াছেন। চিৎশক্তির কারণ এবং স্বরূপ ডার্ব্বিন কর্ত্তৃক এইরূপে বিবর্ত্তনবাদের আলোচ্য ক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে। ডার্ব্বিনের এই স্বেচ্ছাকৃত বহিষ্কার ওয়ালেসের অনুমত নহে। এই চিৎশক্তি লইয়াই প্রকৃতির লীলা। সুতরাং ইহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে বিজ্ঞান অপূর্ণ থাকে। ওয়ালেস পদার্থকে অনাদি ও অনন্ত বলিয়া স্বীকার করেন না। তিনি বলেন সর্ব্বশক্তির ও সর্ব্বনিয়মের অতীত সেই অক্ষর ও অব্যয় (The Absolute Unconditioned) ব্যতীত আর সকল পদার্থেরই প্রারম্ভ আছে। অর্থাৎ সকল পদার্থেরই প্রাগ্‌ভাব ছিল। পদার্থ সৃষ্ট হইলেই সেই প্রাগ্‌ভাবের ধ্বংস হইয়াছে।

ডার্ব্বিন ও ওয়ালেস।

এই অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক স্থির করিয়াছেন যে,ধরিত্রী দেবী মানবের সৃষ্টির ও তুষ্টির জন্ম সৃষ্টা হইয়াছেন। কালের মধ্য দিয়া বিবর্ত্তনের যে প্রবাহ প্রবাহিত, তাহা হইতেই তিনি এই সত্য সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ-নিচয় এবং আকাশের গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা প্রভৃতি চিৎশক্তি বিকাশের সহায়তা করিতেছে। মানব সেই চিৎশক্তির চরম পরিণতি। পৃথিবী তাহার উচ্চতর অধ্যাত্ম জীবনের জন্য প্রস্তুত হইবার শিক্ষা-মন্দির। এই জগতের কতকগুলি ভূত (element) অনাবশ্যক ও অতিরিক্ত বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু উহারই প্রভাবে মানব বন্য, অসভ্য ভাব পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ জড় সভ্যতায় (material civilization) উন্নীত হইয়াছে। উহারই প্রভাবে মানব জগতের অন্তমূলস্থ দুইটি অজ্ঞেয় রহস্তের উচ্ছেদ করিতে প্রয়াস পাইতেছে। একটি অসীম ও বিরাট্ আর একটি সসীম ও ক্ষুদ্র।

ধরার উদ্দেশ্য।

ডাক্তার ওয়ালেস বলেন,—জগতের সর্ব্বত্র মানব যে সমস্ত গভীর রহস্য দেখিতে পাইতেছে, তাহাই পরিণামে তাহাকে ভগবানের সত্তাও উপলব্ধি করিতে ও তাঁহার সম্বন্ধে উচ্চতর ধারণা করিতে সমর্থ করিবে, ধর্ম্মকে বিজ্ঞানময় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে। সে ধর্ম্ম অতীত যুগের ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইবে। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, "জীবজগতের মূল কারণ অজ্ঞেয়, কিন্তু উহার নাস্তিত্ব চিন্তা করা যায় না।" ডার্ব্বিন বলিয়াছেন, "বিশ্বের মূলে একজন বুদ্ধিমান কর্ত্তা না থাকিলে উহা কখন থাকিতে পারিত না সত্য,—কিন্তু সেই কর্ত্তার সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করা মানবীয় ধীশক্তির অতীত।" এই সকল মতের সহিত ডাক্তার ওয়ালেসের সহানুভূতি আছে। কিন্তু তিনি বলেন, মানবজাতি ক্রমশঃ সেই স্রষ্টাকে ধারণা করিতে সমর্থ হইবে।

মানবের ভবিষ্যৎ।

ওয়ালেসের মতে যে বুদ্ধিমান কার্য্যতঃ জীব জগতের বিকাশ সাধন করিতেছেন,—তিনি যে অসীম বিভূতিসম্পন্ন এরূপ মনে করিবার কারণ নাই,—আমরা যাঁহাকে ঈশ্বর বা পরমাত্মা বলিয়া বুঝি, তিনিই যে ঐ কার্য্য করেন, তাহা অনুমান যায় না। এইস্থানেই বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের বিবাদ।

দেবতা, কর্ত্তা, পরমাত্মা, স্রষ্টা।

বিজ্ঞান বলিতেছেন যে, জড় শক্তি ভিন্ন অন্য কেহই বিশ্বের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছে না ; ধর্ম্ম বলেন অনন্ত, অক্ষয়, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরই বিশ্বের পরিচালক। ওয়ালেস বলেন, যদি আমরা অনন্ত শক্তিমান ঈশ্বরকে স্বীকার করিতে বাধ্য হই, তাহা হইলে মানব ও ঈশ্বর এই উভয়ের মধ্যে যে অসীম শূন্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, এরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত নহে। মানব ও ঈশ্বরের মধ্যে ক্রমশঃ অধিকতর শক্তি সম্পন্ন জীব বিদ্যমান আছে। উহারাই বিশ্বের কার্য্য পরিচালিত করিতেছে। এই স্থলে ওয়ালেস বৈজ্ঞানিক যুক্তিবলে হিন্দুর দেবতার ন্যায় আধ্যাত্মিক শক্তিধরগণের কল্পনা করিয়াছেন। এই দেবতা অ্যামিবা হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমগ্র জীব জগতের বিকাশ সাধন করিতেছেন। কেবল জগতের কল্পনা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরে উদ্ভূত এবং ঈশ্বরই বিশ্বের স্রষ্টা মাত্র।

জগৎ কর্ম্মভূমি।

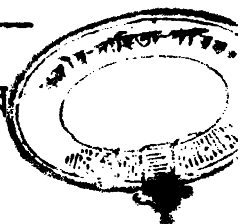
ডাক্তার ওয়ালেস আরও বলিয়াছিলেন, ভবিষ্যৎ অধ্যাত্ম জীবনের উন্নতি-সাধন উদ্দেশ্যে মানব পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিলে মানবের এই সংসার কর্ম্মভূমি (অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা উন্নততর অধ্যাত্ম জীবনের জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিবার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র) বলিয়াই মনে হয়। বিশ্বে ক্রমশঃ অধিকতর আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ প্রশস্ততর রহিয়াছে।

'পাবলিক ওপিনিয়ন' শেষে বলিয়াছেন,—"বিংশ শতাব্দীর এই যুগা প্রজ্ঞা-প্রোজ্জ্বল দৃষ্টি অব্যাহত রাখিয়া বিজ্ঞানের মেঘ চুম্বিত শৈলশিখরে সমারূঢ় এবং তিনি সেইখানে দণ্ডায়মান হইয়া প্রজ্ঞা দৃষ্টির প্রভাবে সাধারণ মানবের অগোচর বিস্তৃত ক্ষেত্র প্রত্যক্ষ করিতেছেন।" আমাদের মনে হয় হিন্দুর নিকট এই সিদ্ধান্ত নূতন নহে। ইহার অধিকাংশই হিন্দুর দ্বৈতবাদের এবং সামান্য কতকটা অদ্বৈত বাদের সিদ্ধান্তের অনুরূপ। তবে তাঁহার বৈজ্ঞানিক যুক্তি অবশ্য সম্পূর্ণ মৌলিক ও অভিনব।

৬৪।১ ও ৬৪।২ সুকীয়া ষ্ট্রীট, 'লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস' হইতে
শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

আর্য্যাবর্ত্ত।



শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

সম্পাদিত।

—০—

সূচী।

প্রকাশক—শ্রীদুর্গানাথ বসু।

১০৬।২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রতি সংখ্যা ।।০ আনা] [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।

এল, এন, প্রেস, ৪৩ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

পুরাতন প্রসঙ্গ।



——:*:——

(৭)

৩রা বৈশাখ, ১৩১৮।

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—"সম্প্রতি একটি হিন্দু মহিলা 'সৃষ্টি রহস্য' নামক একখানি গ্রন্থ আমাকে উপহার দিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি পাইয়া আমি যার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। রচনা একটি অল্পবয়স্কা বঙ্গমহিলার। ইহাতে যে সকল প্রতিপাদ্য বিষয় বিবৃত হইয়াছে তাহা অতি উচ্চ অঙ্গের। আত্মানন্দ, ত্রিতত্ত্ব, সচ্চিদানন্দ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ইত্যাদি দুরবগাহ বিষয় লইয়া গ্রন্থকর্ত্রী শতাধিক পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছেন। যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে গেলে সাধারণ ব্যক্তির মাথা ঘুরিয়া যায়, বুদ্ধি পক্ষাঘাতপ্রাপ্তবৎ হইয়া উঠে, সেই সমস্ত বিষয় লইয়া বিশেষ আনন্দের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। রচনার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে, লেখিকা বিশেষ রসাস্বাদন করিতে করিতে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আমি পূর্ব্বে জানিতাম যে, যদিচ অর্দ্ধশতাব্দী কাল হইল এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষা এক প্রকার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তথাপি এখন পর্য্যন্ত সাধারণতঃ স্ত্রীলোকরা গল্পের বহি বা নাটক অথবা বড় জোর দু'দশখানি কাব্যগ্রন্থ অধ্যয়নে রত থাকেন। তাঁহাদিগের বিদ্যা-চর্চ্চা ইহার উপর বড় বেশী উঠে না। কিন্তু উপস্থিত গ্রন্থ দর্শন করিয়া আমার সেই ভ্রম অপসারিত হইতেছে। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহারাজচক্রবর্ত্তী দার্শনিকগণ যে সকল বিষয়ের অনুশীলন করিয়া যাবজ্জীবন ক্ষেপন করিয়াছেন এবং ভূমণ্ডলে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, রচয়িত্রী সেই সমস্ত লইয়া আন্দোলন করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। আমার নিজের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, আমি এ সকল বিষয়ের আন্দোলনে নিতান্ত অপটু, একেবারেই অক্ষম, এবং ইহার দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র—"

পণ্ডিত মহাশয়ের কথায় বাধা দিয়া আমি বলিলাম—"সে কি মহাশয়? আপনার এ কথা শুনিয়া লোকে মাথা নাড়িবে; বলিবে, স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়া আপনি সমালোচনা করিতে বিরত হইলেন।"

তিনি বলিলেন—"না। আমাকে ভুল বুঝিও না, আমি যে বেদান্তে পারদর্শী এ ধারণা লোকের হইতে পারে না।"

আমি বলিলাম—"অবশ্যই আমাদের সকলেরই পক্ষে ইহা একটি বিস্ময়ের বিষয় যে, আপনি সংস্কৃতশাস্ত্রে এত বড় পণ্ডিত হইয়া আপনার spiritual consolation পাশ্চাত্য positivism এ কেমন করিয়া পাইলেন! না হয়, আপনি এই পুস্তিকাখানি উপলক্ষ করিয়া ধ্রুবদর্শনের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া আপনার বক্তব্য বলিয়া যাউন।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"সেটা উচিত নহে। আর আমার পাণ্ডিত্যের কথা যখন তুমি তুলিলে, তখন কয়েকটি কথা আজ বলিব; প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইও না। আমি একটা বিষয়ে আপনাকে কিঞ্চিৎ সৌভাগ্যবান্ জ্ঞান করি। আমার যে সকল গুণ অথবা বিদ্যাবুদ্ধি সংক্রান্ত যোগ্যতা অথবা বিশেষ পারদর্শিতা নাই, অনেক সময়ে আমি লোকের নিকট সেই সকল বিষয়ে প্রশংসাবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা এক প্রকার আমার যশোভাগ্য বলিতে হইবে। আমার একটি বন্ধু ছিলেন, ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র তলাপাত্র. লোকটি খুব "মস্করা" ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে যে সময়টা কাটান যাইত, বড়ই হাসি খুসিতে কাটিত। তিনি এক দিন আমাকে আধ্ তামাসার ছলে বলিলেন, 'আরে কৃষ্ণকমল, জ্ঞান কি বল ত? কেবল ভোগা দিয়ে খাও বৈ ত নয়।' কথাটা বেশ আমার মিষ্ট লাগিল; এবং কতকটা মনে বদ্ধমূল হইল। ভাবিলাম—বলেছে মন্দ নহে। সেই হরিশ্চন্দ্র আবার আর একদিন আর একটা ব্যাপার দেখিয়া কিছু তাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় যখন "শব্দস্তোম মহানিধি' নামক ক্ষুদ্র সংস্কৃত অভিধানখানি—ইহা 'বাচস্পত্য' অপেক্ষা অনেক ছোট—মুদ্রিত করিতেছিলেন, তখন আমাকে একটা করিয়া প্রুফ দেখিতে বলিতেন। আমিও দেখিয়া দিতাম; এবং যদিচ তাঁহার লেখার উপর আমার কলম চালান এক প্রকার ধৃষ্টতামাত্র, তথাপি সময়ে সময়ে আমি একটু আধটু বদল করিয়া দিতাম। সে সমস্ত এই ভাবের পরিবর্ত্তন যে, তিনি হয় ত বড় কঠিন সংস্কৃত লিখিয়াছেন. আমি একটু সহজ করিয়া দিলাম। তিনি হয় ত লিখিয়াছেন, 'কোকিলস্ত পরপুষ্টত্বাৎ' আমি হয় ত করিয়া দিলাম 'কোকিলো হি পরপুষ্টঃ'। তিনিও বুঝিতেন যে, ছেলেদের জন্য অভিধান হইতেছে, যত সহজ হয় ততই ভাল, অতএব তিনি আমার এ প্রকার পরিবর্ত্তন গ্রাহ্য করিয়া লইতেন। একদিন হরিশ্চন্দ্র তথায় উপস্থিত। এই

ব্যাপার দেখিয়া তিনি একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন, বলিলেন, 'অ্যাঁ, তুমি কাটিয়া দিয়াছ; আর তারানাথ তাহা মঞ্জুর পর্য্যন্ত করিয়াছেন! তাই ত, তুমি বড় কম লোক নও।' এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলিতে পারি। কায়স্থদিগের একটা চিরস্থায়ী গ্লানি তর্কবাচস্পতি মহাশয় তাঁহার অভিধানে 'কায়স্থ' এই শব্দ উপলক্ষ করিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের একটা উদ্ভট অনুষ্টুভ্ শ্লোক কায়স্থজাতির লোভ ও অর্থকার্পণ্য সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। তাঁহার অভিধানে সেই শ্লোকটি দেখিয়া আমি তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া উঠাইয়া দিতে কহিলাম, প্রথমে তিনি রাজি হইলেন না, পরে অনেক করিয়া বলাতে শেষ কালে রাজি হইলেন। আমার বোধ হয়, সেই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বহুবিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার তর্কবিতর্ক চলিতেছিল। শ্যামাচরণ বিশ্বাস বিদ্যাসাগরের ভক্ত ছিলেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সহিত শ্যাম বিশ্বাসের কিছু তীব্র ভাবে সেই উপলক্ষে তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। সেই জন্য পণ্ডিত মহাশয় সমস্ত কায়স্থ জাতির উপর চটিয়া গিয়াছিলেন, এবং কায়স্থ শব্দের ব্যাখ্যা লিখিতে বসিয়া রাগ সামলাইতে পারেন নাই। এটি কিন্তু আমার সম্পূর্ণ অনুমানমাত্র।

"যাহা হউক, হরিশ আমাকে যে ভোগা দিয়া খাইবার দোষারোপ করিয়াছিল সে কথাটি আমার সর্ব্বদাই মনে পড়ে, এবং আমি আপনা আপনি হাসি। আমি মনে মনে বেশ জানি যে, সাধারণতঃ লোকে আমাকে সংস্কৃতশাস্ত্রে যতদূর পারদর্শী ও পণ্ডিত মনে করে, আমি তাহার কিছুই নহি। ফলতঃ আমার নিজের বিশ্বাস যে, আমার সংস্কৃতজ্ঞান কতকটা পল্লবগ্রাহিতা যাহাকে বলে তদ্রূপমাত্র। সুগভীর পাণ্ডিত্য কোনও বিষয়েই আমার নাই, এটি আমার আন্তরিক অমায়িক বিশ্বাস। কিন্তু এই বিশ্বাসের বিষয় আমি আমার পূর্ব্বতন ছাত্র অবিনাশ চন্দ্র ঘোষের নিকট বলিবার উপক্রম করিয়াছিলাম। অবিনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.; এখন গভর্মেণ্টের পেন্সন ভোগ করিতেছেন। তাঁহার পিতা ৺গিরিশ চন্দ্র ঘোষ 'বেঙ্গলি' নামক সুপ্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র সংস্থাপিত করিয়া যায়েন, এবং আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। এই পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্যের কথা বলায় অবিনাশ অত্যন্ত চটিয়া গেলেন এবং আমার মুখের উপরে বলিলেন—'এটা কি হচ্চে? এটা কি affectation নাকি?' আমি থামিয়া গেলাম। আমি জানি যে, অবিনাশ আমার খুব ভক্ত, আমার বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা। আমি কোন্ কালে

সংস্কৃত কোন কোন পাঠ্য গ্রন্থ অধ্যাপনার সময় উহার কি ইংরাজি অনুবাদ তাঁহাদিগকে বলিয়া দিতাম, এখনও পর্য্যন্ত অবিনাশ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে তাহার তারিফ করিতে ছাড়েন না। অবিনাশের মত সুবিদ্বান ব্যক্তির মুখে ঐ সকল প্রশংসাবাক্য শুনিয়া আমিও মনে মনে খুসী হই সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি আমার নিজের সংস্কৃতজ্ঞতা বিষয়ে আমার নিজের যাহা মত আছে, আমি জানি যে সেইটাই ঠিক।

"অধিক দিন নহে, আমি ও মহেশ ন্যায়রত্ন ও নীলমণি ন্যায়লঙ্কার, আমরা তিন জন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত প্রবেশিকা গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলাম। জানি না, কি গতিকে by some irony of fate, তাহাতে এত ভুল বাহির হইয়াছিল, যে আমাদের তিন জনকে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। এই ঘটনা লইয়া সংবাদপত্রওয়ালারা দিন কতক খুব আমোদ করিয়াছিল। একজন লিখিয়াছিল—একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়। আর একজন আমার নাম করিয়া লিখিয়াছিল—'নামে তালপুকুর ঘটি ডোবে না'। যাহা হউক, প্রবেশিকার সেই সংস্করণে যতদূর মূর্খতা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, ততদূর মূর্খ নহি বটে; কিন্তু সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা বলিতে গেলে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর রামকমলের প্রকৃতপক্ষে ছিল। আমার তাহা কিছুই নাই। তিনি সংস্কৃত কলেজে যে ১০।১১ বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সেই কয় বৎসরের মধ্যে সংস্কৃতশাস্ত্রের এমন কোনও অংশই নাই যাহা তিনি প্রগাঢ়রূপে এবং সুগভীর আলোচনার সহিত অনুশীলন করেন নাই,—কি সাহিত্য, কি অলঙ্কার, কি দর্শন যখন যাহা পড়িয়াছিলেন, তাহাতেই এরূপ পারিপাট্য ও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে তাঁহার অধ্যাপকগণ উত্তরকালের ছাত্রদিগের নিকট তাঁহাকে দৃষ্টান্তের স্বরূপ উপন্যাসিত করিতেন। আমার বেশ মনে আছে, আমি যখন প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের শ্রেণীতে অলঙ্কার পাঠ করি, তখন আমাদের পাঠশৈথিল্যের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তিনি বলিতেন 'যথার্থ শিখিবার উদ্যম কেবল রামকমলের দেখিয়াছি।'

"যাঁহারা নিজে সংস্কৃতজ্ঞ নহেন, তাঁহারা আমার বিষয়ে ভাবেন যে, সংস্কৃত শাস্ত্রের কোনও অঙ্গই আমার অবিদিত নাই; দর্শন, স্মৃতি, সকল বিষয়েই যেন আমার মতামত বলিবার ক্ষমতা আছে। আমি অজ্ঞতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহি; কিন্তু অনেক সময়ে মনে হয় ওরূপ করিতে গেলে লোকে বিপরীত বুঝিবে, আমাকে অহঙ্কারী বিবেচনা করিবে।

"আমার এই প্রকার যশোভাগ্যের যে কারণ কি তাহাও আমি এক প্রকার ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। কলেজে অধ্যয়ন না করিয়া আমি এণ্ট্রান্স পাসের দুই আড়াই বৎসরের মধ্যে ঘরে পড়িয়া বি. এ. পাস দিয়াছিলাম, সেই জন্য আমার একটু নাম বাহির হইয়াছিল, এবং আমি উপযাচক না হইয়াও প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকের পদ পাইয়াছিলাম। আমাদের দেশের লোকের একটা অভ্যাস এই যে, যিনি গভমেণ্টের নিকট প্রতিষ্ঠালাভ করেন, তিনি দেশের লোকের নিকটও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েন; এই কথা ৺নগেন্দ্র নাথ ঘোষ তাঁহার রচিত কৃষ্ণদাস পালের জীবনীতে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমি অল্প বয়সে প্রেসিডেন্সি কলেজের সিনিয়র প্রফেসর হওয়াতে সাধারণে ভাবিলেন যে, আমি না জানি কত বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিত।

"তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় যেন কতকটা ভিতরের ব্যাপার বুঝিয়া রাখিয়াছিলেন, কারণ তিনি একদিন আমাকে স্পষ্ট বলিলেন,—'তোরা দুইয়ের বার হয়ে রইলি, না ইংরাজিও তেমন লিখ্‌তে পারিস, না সংস্কৃততেও পণ্ডিত হলি।' তিনি তখন বিধবা 'বিবাহ' বাদানুবাদে মগ্নপ্রায় হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিলাষ ছিল যে, তাঁহার যুক্তিবিন্যাসগুলি ইংরাজিতে উত্তমরূপে প্রতিপাদিত হয়। কিন্তু সংস্কৃতও ভাল বুঝে, ইংরাজিও ভাল লিখিতে পারে এরূপ লোক না পাওয়ায় নিরস্ত হইয়াছিলেন।

"প্রসঙ্গক্রমে নিজের কথা অনেক বলিলাম, বোধ হয় এখন সংস্কৃতজ্ঞান সম্বন্ধে আর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। একটু মোড় ফিরাইয়া লওয়া যাউক্,—বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা একটু আলোচনা করিলে ক্ষতি কি?

"বোধ হয় তোমরা জান না যে, তারানাথ তর্কবাচস্পতি বাঙ্গালায় 'বাক্য-মঞ্জরী' নাম্নী একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। It is an excellent work on syntax,—আমার মনে হয়, সে ধরণের পুস্তক আমাদের আর নাই। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ও বাঙ্গালা লিখিতেন; ঈশ্বর গুপ্তের 'প্রভাকরে' নাকি তিনি একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। প্রভাকরের motto দু দফা তিনি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম দফা :—

সতাং মনস্তামরস প্রভাকরঃ
সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ।

ইত্যাদি।

দ্বিতীয় দফা :—

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেম্বিন্দীবরেষু কচিৎ
ভ্রামং ভ্রামমতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরা।
অদ্যোদ্যৎ বিমল প্রভাকরকরপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে
সচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তি চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃ রসং॥

আবার তিনি 'ভাস্করে'র motto ও লিখিয়া দিয়াছিলেন।—

ভ্রাতর্বোধহরোজ কিং চিরয়সে। মৌনস্য নায়ং ক্ষণঃ।
দোষধ্বান্তদিগন্তরং ব্রজ ন তেঽবস্থানমত্রোচিতং।
ভোঃ ভোঃ সৎপুরুষা কুরু ঋমধুনা সৎ কৃষমত্যাদরাৎ,
গৌরীশঙ্করপর্ব্বতমুখাৎ উজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

"ঈশ্বর গুপ্তের 'প্রভাকর' দৈনিক পত্র, কিন্তু কয়েক বৎসর গতে তিনি প্রতি মাসে একখানি মাসিক সংস্করণ মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে বিবিধ গদ্য পদ্য থাকিত এবং যথেষ্ট গুণপনা প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহা ব্যতীত কবির গান ইত্যাদি রচনা করিবার শক্তি তাঁহার সামান্য ছিল না। তাঁহার সময়ে 'কবির' লড়াই বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল এবং তিনি একজন উৎকৃষ্ট বাঁধনদার বলিয়া প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। তিনি নিজে কোথাও গান বড় একটা গাহিতেন না, তাঁহার গলাটাও ভাঙ্গা ভাঙ্গা গোছ ছিল। কিন্তু সেকালে তাঁহার গান বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে গীত হইত। একটি গান তোমাকে বলিতেছি, এই গানটি এখনও আমার দেহে পুলক সঞ্চার করাইয়া দেয়, জানি না এ গানটি মুদ্রিত হইয়াছে কি না। গানটি এই : —

পুরবাসী বলে, রাণী, তোর তারাহারা এলো ঐ।
অমনি পাগলিনী প্রায়, এলোকেশে ধায়,
বলে, কই আমার উমা কই।
স্নেহে রাণী বলে, আমার উমা কি এলে,
একবার আয়, মা, আয় গো করি কোলে।
অমনি দুবাহু পসারি, মায়ের গলা ধরি,
অভিমানে কেঁদে মায়েরে বলে,
কৈ দে ও পাষাণ, কই মেয়ে বোলে আনতে গিয়েছিলি,
পরের ঘরে মেয়ে দিয়ে, মা, মায়া কি পাসরিলি।
কৈলাসেতে সবাই বলে, উমা তোর কি মা নাই,
অমনি সরমে মরে যাই।
আমি বলি আমার পিতে, এসেছিলেন নিতে,
শিবের দোষ দিয়ে কাঁদি বিরলে।
তুমি গেলে না কো নিতে, জেনে এলেম আপনাহ'তে,
র'ব না কো, যা'ব দু দিন গেলে।

গানটি বোধ হয় আমার সম্পূর্ণ মুখস্থ নাই, কিন্তু ইহার রচনার লালিত্য ও চমৎকারিতা চিন্তা করিয়া মোহিত হইতে হয়। আজিকার কালে এরূপ রচনা কাহারও লেখনী হইতে বাহির হওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। মেকলে অ্যাডিসনের চমৎকার ইংরাজি গদ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, অ্যাডিসনের রচনা দ্বিতীয় চার্লসের আমলের আধা-ফরাসি রচনা হইতে যেমন সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তেমনই এখনকার আধা-জর্ম্মান রীতি হইতে স্বতঃ স্বতন্ত্র। যথার্থ ইংরাজি রীতি যদি দেখিতে হয় তাহা হইলে অ্যাডিসনের গদ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব্বোক্ত গানটির বিষয়েও সেইরূপ বলা যাইতে পারে। উহাতে বামুন পণ্ডিতি সংস্কৃত শব্দের ছড়াছড়ি নাই, এবং এখনকার ইংরাজিতর্জ্জমাবাঙ্গালার ভঙ্গিও নাই। ফলতঃ যদি প্রকৃত বাঙ্গালা ভাষার রীতির নমুনা দেখিতে হয় তাহা হইলে দু পাঁচ জন পুরাতন গ্রন্থকারের রচনা ভিন্ন আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যাইবে না। একজন দাশুরায়, একজন ভারতচন্দ্র, আর এ কালের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত।

"উত্তরকালে অনেকগুলি লেখকের ওস্তাদ ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন। বঙ্কিম বাবু আপনাকে তাঁহার একজন সাকরেদ্ বলিয়া জানিতেন, এবং অক্ষয় দত্তেরও বাঙ্গালা রচনাতে ঈশ্বর গুপ্তের নিকট হাতে খড়ি হয়। তবে অক্ষয় দত্ত যে বরাবর গুরুর রচনা পদ্ধতি নকল করিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি অনেকটা বিদ্যাসাগরি রীতির দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বলিয়া বিদ্যাসাগরের ও মাছিমারা গোছের নকল করেন নাই। অক্ষয় দত্ত যেরূপ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন, তিনি যে কাহারও নকলে চলিবেন, ইহা কোনও মতেই সম্ভবপর ছিল না। তাঁহার রচনার ঔদার্য্য, ওজস্বিতা, অকপট আন্তরিকতা, এবং মনের ভাব অকাতরে ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা বাঙ্গালার অতি অল্প লেখকেই প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি স্বরচিত 'বাহ্যবস্তুর' প্রথম ভাগের শেষে আমিষ ভক্ষণের বিরুদ্ধকল্পে এক সতেজ প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, এবং উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের শেষ অংশে সুরাপানের বিরুদ্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গুরু ঈশ্বর গুপ্ত ইংরাজি লেখক অ্যাডিসনের মত মদিরার বিষয়ে কিঞ্চিৎ চিত্ত-দৌর্ব্বল্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, উভয়েরই পেটে একটু পড়িলে মাথাটা খুলিত ভাল। এই কারণেই বোধ হয় ঈশ্বর গুপ্ত সুরাপান সম্বন্ধে শিষ্য অক্ষয় কুমারের কটাক্ষপাত দর্শন করিয়া

কিছু দিন পরে বিলক্ষণ দাদ তুলিবার অবসর পাইয়াছিলেন। তাহার বৃত্তান্ত এই—

'বাহ্যবস্তুর' রচনার কয়েক বৎসর পরে অক্ষয় কুমারের মস্তিষ্ক বোধ হয় অতিরিক্ত-চালনা-দোষে এত নিস্তেজ ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার লেখা পড়ার ব্যাপার ত্যাগ করিয়া বালিগ্রামে যাইয়া একটি নিভৃত স্থানে গাছপালা রোপণে অনন্যমনস্ক হইয়া জীবনের শেষ কয়েক বৎসর ক্ষেপণ করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে শুনিতে পাই তিনি মাংসও ধরিয়াছিলেন; Port wine ও ধরিয়াছিলেন। তাঁহার এই শেষাবস্থা উপলক্ষ করিয়া গুরু ঈশ্বর গুপ্ত পরিহাসগর্ভ একটি পদ্য লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই ছত্রটি ছিল :—

'মাথামুণ্ডু ঘুরে গেল, মাথামুণ্ডু লিখে।'

"বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিসাধন সম্বন্ধে যে সকল ব্যক্তির গুণকীর্ত্তন করা আমাদিগের অভ্যাস হইয়াছে তন্মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের নাম যে সর্ব্বোচ্চশ্রেণীতে কীর্ত্তিত হওয়া উচিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেন যে তাহা হয় না, কেন যে তাঁহার স্মরণার্থ একখানি ছবি পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত করিবার কোনও উদ্যোগ কখনও প্রকাশ্যরূপে হয় নাই, ইহা শুদ্ধ যে অনাকলনীয় (inconceivable, unaccountable) তাহা নহে, ইহাতে বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতাবৃত্তি যে নিতান্ত ক্ষুদ্র কলেবর তাহাও প্রকাশ পায়। সে বিষয়ে জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দিতে গেলে অধিক দূর যাইতে হয় না, লর্ড রিপণের নাম করিলেই যথেষ্ট হইবে। রিপণের স্মৃতিরক্ষাবিষয়ে আমরা যে ভঙ্গি প্রদর্শন করিয়া বসিয়া আছি, তাহাতে বোধ হয় কিঞ্চিৎ চিন্তাপ্রবণতা থাকিলে প্রত্যেক বাঙ্গালীরই অধোবদন হইয়া থাকা উচিত। ঈশ্বর গুপ্ত আর লর্ড রিপণ এই দুই জনের নাম এক প্রস্তাবে উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। একজন যেমন রাজনৈতিক বিষয়ে অত্যুদারমতি ছিলেন, আর একজন তেমনই একটি অল্পবয়স্ক সাহিত্যশাস্ত্রের উন্নতিকল্পে আপনার জীবন সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আমার বোধ হয়, ঈশ্বর গুপ্তের বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকের যে উদাসীন্য তাহার একটি প্রধান কারণ এই যে, তিনি গভর্মেণ্টের নিকট বড় একটা জানিত ছিলেন না। আর আমরা বাঙ্গালী যতই আস্ফালন করি না কেন, গভর্মেণ্ট আঙ্গুল না বাড়াইলে আমরা কে ভাল কে মন্দ বড় বুঝিয়া উঠিতে পারি না॥



গিরিশ চন্দ্র ঘোষ।

"প্রকৃত বাঙ্গালাভাষায় রীতি-বিশুদ্ধ (idiomatic) রচনা-বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের যে প্রকার পারিপাট্য ছিল, তাহাতে দাশুরায়ের ততোধিক ক্ষমতা দেখা যায়। দাশুরায়ের রচিত একটি গান আমার মুখস্থ আছে, সেটি হাটে বাজারে ভিখারীরা গাহিয়া দু' এক পয়সা উপার্জ্জন করে। সেই ১০।১২ পংক্তির মধ্যে প্রকৃত বাঙ্গালা রীতির এত নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় যে, এখনকার তর্জ্জমাকরা আধা-ইংরাজি লেখা যাঁহাদিগের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাঁহাদের সর্ব্বদা সেই ১০।১২ পংক্তি চক্ষুর সম্মুখে রাখা মন্দ নহে! গানটি এই:—

কি আনন্দের কথা, উমে, ও মা লোকমুখে শুনি,
সত্য বল শিবানি, অন্নপূর্ণা নাম কি তোর কাশীধামে।
অপর্ণা যখন তোরে অর্পণ করি,
ভোলানাথ ছিলেন মুষ্টিকের ভিখারী,

আজ কি আনন্দের কথা বল্‌লি, শুভঙ্করি,
বিশ্বেশ্বরী না কি বিশ্বেশ্বরের বামে।
ক্ষ্যাপা, ক্ষ্যাপা সবে বল্‌ত দিগম্বরে.
গঞ্জনা পেয়েছি কত ঘরে পরে,
আজ দ্বারি নাকি আছে বিশ্বেশ্বরের দ্বারে,
দর্শন পায় না ইন্দ্র চন্দ্র যমে।
হিমালয়ে বাস হর করিয়াছে,
কুবের ধনেতে কাশীনাথ হয়েছে.
ভিক্ষায় দিন রক্ষা সে দিন গিয়েছে,
ফলেছে কি ফল তোমার কপালক্রমে।
বিষয় বুদ্ধি বটে বিশ্বাস হয় যে মনে,
তা না হলে গৌরীর এত গৌরব কেনে.
চেয়ে দেখে না আপন সন্তানে,
মুখ বাঁকাও কেন দাশরথি নামে।

এমন সরল ভক্ত খাঁটি বাঙ্গালী কবি এখন আর জন্মে না কেন? বহু দিন ধরিয়া আমরা পশ্চিমের দিকে তাকাইয়া আছি, সমস্ত বিষয়েই পশ্চিম হইতে inspiration লইয়া আপনাদিগকে সার্থক মনে করিয়াছি। আপনাদের শব্দসম্পদের দিকে লক্ষ্য না করিয়া বিদেশী কথার তর্জ্জমা করিয়া বিদেশী সুরে গান গাহিয়াছি, নহিলে ভিত্তিহীন, বিশেষত, সহানুভূতি প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গীভূত হইল কেন? এই গুলির

কি খাঁটি দেশী প্রতিশব্দ পাওয়া যায় নাই? আমাদের এই নবজাগ্রত স্বদেশভক্তি যদি বাস্তবিকই আমাদের দেশের দিকে আমাদের মন আকর্ষণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যে ভক্ত দাশুরায়ের স্থান নির্দ্দেশ করিতে আমাদের কষ্ট পাইতে হইবে না।

শুনিয়াছি ম্যাক্স মুলার যখন ঋগ্বেদের ভাষ্যের ইংরাজি অনুবাদরূপ বিরাট ব্যাপারে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, তখন পানিনির প্রায় চার হাজার সূত্র সর্ব্বদাই চক্ষুর সম্মুখে রাখিবার জন্য, সূত্রগুলি আগাগোড়া ঘরের দেওয়ালে এমন করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলেন যে, যখনই যে সূত্রের আবশ্যক হয় তখনই তাহা দেখিবার সম্ভাবনা থাকে। আমার মনে হয়, আমাদের সাহিত্যের পর্ণকুটীর হইতে বৈদেশিক 'ভিত্তিহীন' প্রভৃতি শব্দ বহিষ্কার করিয়া খাঁটি দেশী কথায় সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে হইলে হয় ত প্রথম প্রথম কুটীর-গাত্রে খাঁটি বাঙ্গালা শব্দগুলি লিখিয়া রাখিতে হইবে। হয় ত তখন আবার ঈশ্বর গুপ্ত দাশুরায়ের মত বাঙ্গালী সাহিত্যিক খাঁটি বাঙ্গালায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবে।

"ইংরাজি-ভাঙ্গা বাঙ্গালা ভাষার প্রতি যে কটাক্ষপাত করা হইল তাহার অভিপ্রায় এরূপ নহে যে, বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষাকে ইংরাজি ভাষা কিম্বা তাদৃশ সম্পূর্ণবিকাশপ্রাপ্ত অন্য কোনও য়ুরোপীয় ভাষা হইতে শব্দ ও ভাব ও "ধরতা" ইত্যাদি বিষয়ে সাহায্য লইতে হইবে না, বা অনুকরণ করিতে হইবে না। ইহাতে ভাষা দোঁয়াশলা হইয়া আইসে বটে, কিন্তু ভাষা দোঁয়াশলা হইলে যে তাহার পূর্ণতাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোনও ব্যাঘাত ঘটে এ প্রকার বোধ হয় না। ইংরাজির মত দোঁয়াশলা ভাষা আর নাই। একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ গ্রন্থকার (ডি ফো) কোনও স্থলে বলিয়া গিয়াছেন,—আমরা ইংরাজ জাতি বর্ণশঙ্কর-বিষয়ে নাক তুলি কেন? আমাদের মত শঙ্কর জাতি—mongrel race আর কোথায় আছে? দিনেমার, জর্ম্মান, কেল্ট, টিউটন প্রভৃতি কত জাতির রক্ত আমাদের শিরায় বহিতেছে তাহার ইয়ত্তা করা ভার। ডি ফো ইংরেজ জাতির বিষয়ে যে শঙ্করের কথা কহিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের ভাষাতেও সেরূপ নানা দোষ—দোষই বল আর গুণই বল আরোপ করা যাইতে পারে। তথাপি কিন্তু ইংরাজি অপেক্ষা সমধিক পূর্ণতাপ্রাপ্ত আর কোন্ ভাষা পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে?

মেকলে আপনার ইতিহাসের একস্থলে সাহঙ্কারে বলিয়াছেন আর সে

অহঙ্কার অমূলক নহে,—যে কবির কার্য্যই বল, গদ্য লেখকের কার্য্যই বল, বক্তৃতার ব্যাপার বল, পরিহাসরসিকতা ইতিহাস রচনা ইত্যাদি যে কোন ব্যাপারে ভাষার উপযোগিতা আছে, তাহার কোনটিতেই পূর্ণতা লাভ করিতে ইংরাজি ভাষা অক্ষম বা অনুপযুক্ত নহে, এবং পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষার নিকট এ সম্বন্ধে ইংরাজিকে হীনতাস্বীকার করিতে হইবে না। তবে যদি হয়, বোধ হয় প্রাচীন গ্রীক ভাষার নিকট চাই কি হীনতা স্বীকার করিতে হইলেও হইতে পারে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে 'আঁশ'—hybridism, mongrel character,—বেশী সংখ্যায় থাকিলে যে ভাষাকে হীন থাকিতে হয়, একথা ঠিক নহে। তবে আমার বোধ হয়, বাঙ্গালার ভবিষ্যতে পূর্ণতালাভ সম্বন্ধে একটা ব্যাঘাত রহিয়াছে,—সেটা আমাদের রাজনীতিক অবস্থা। পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ, বহুকাল পরাধীন কোনও জাতির ভাষা কস্মিনকালে বিশিষ্ট উন্নতি লাভ করে নাই। এসিয়া মাইনর সেইরূপ একটি দেশ, ইহার কোনও ভাষা কখনও গা তুলিতে পারে নাই। ইটালীর ভাষাকে এ বিষয়ের বিরুদ্ধ প্রমাণ বলা যায় না; কারণ, ইটালির মধ্যে কেবল সিসিলি ও নেপল্‌স অনেক দিন স্পেনের অধীন ছিল, এবং উত্তরে লম্বার্ডি কিছুকাল অষ্ট্রীয়ার অধীন থাকে। কিন্তু অন্যান্য অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল, সে সকল রাষ্ট্রে স্বদেশীয় লোকেরই প্রাধান্য। তাঁহাদের অনেকেই অত্যাচারী ও উৎপীড়ক ছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহারা ইটালির লোক। অতএব ডান্টে, টাসো, আরিয়ষ্টো, পেট্রার্ক ইঁহাদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সপ্রমাণ করা যাইতে পারে না যে, এরূপ অবস্থা ভাষা বিকাশের গুরুতর বিঘ্ন নহে। আরও একটা দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে, প্রাচীন গ্রীক ভাষা ও আধুনিক রোমেক (romaic) ভাষা। কই, রোমেক ভাষাতে কে কোথায় বড় গ্রন্থকার জন্মিয়াছে? যে অবধি গ্রীসের স্বাধীনতা গেল, সেই অবধি তাহার সাহিত্যও গিয়াছে। অতএব আমার ত বোধ হয়, উন্নতি সম্বন্ধে যতই চেষ্টা কর, বাঙ্গালা 'আধেঙ্গা' গোছ হইয়া থাকিবে। তবে আমি এ কথা বলি না যে, বাঙ্গালার ৪।৫ কোটি লোকের বিদ্যা শিক্ষার জন্য ভাষাটাকে কতকটা গড়িয়া তুলিতে হইবে না। উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা না হউক, মধ্য অঙ্গের শিক্ষা পর্য্যন্ত সাধন করিতে তর্জ্জমার দ্বারাই হউক, স্বাধীন রচনার দ্বারাই হউক, গ্রন্থাদি রচনা চলিতে থাকিবে। কিন্তু মাথার উপরে ইংরাজির

যে দাপট আছে সেটা ঘুচিবার কোনও সম্ভাবনা দেখি না। অধিকাংশ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বাঙ্গালী ইংরাজির দিকেই আকৃষ্ট ও ধাবিত হইবেন। যদি কখনও তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করিতে উন্মুখ হয়েন, সেটা যেন তাঁহারা ভাবিবেন বাঙ্গালাকে অনুগ্রহ করিতেছেন।

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

ওমরের পথে।

—:*:—

হের, ফুটে রবি কর দিক আলো করি',
আঁধার অম্বর তা'য় যতনে সম্বরে'
জড়িত চরণ চারু কম্পিত হৃদয়—
অতৃপ্ত পিপাসা লয়ে যায় বিভাবরী।

শিথিল কবরী হ'তে খসে পড়া তারা
ধূসরগগনে লুটে—বিবর্ণ—শ্রীহারা,
কি বেদনা বুকে নিয়ে কেঁদেছে মানিনী,
তৃণপথে হিমবিন্দু শোভে অশ্রুধারা।

বেপমান হৃদয়ের ব্যাকুল উচ্ছ্বাস,
এখনো গগনে ভাসে উষার বাতাস;
কুণ্ডলের মৃদুগন্ধ—মধুর সৌরভ—
এখনো ভরিয়া আছে ধরণী আকাশ।

বিরহ-বর্দ্ধিত একা ব্যাকুলা মানিনী,
মিলনে বাঞ্ছিত বুকে কেঁদেছে কামিনী;
যখন ক্রন্দন স্নিগ্ধা তুলিল আনন
এসেছে বিদায় কাল পোহায় যামিনী!

ভবিষ্যত সুখ আশা নিশার স্বপন,
অতীত বেদনা স্মরি' নিষ্ফল ক্রন্দন;
বর্ত্তমান আসিয়াছে—সুধাপান করে—
কর পান। ক্ষণস্থায়ী মানব জীবন।

মৃত্যু-মিলন।

—:*:—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

———o———

মন্ত্রণা-গৃহে।

—:o:—

প্রভাতে প্রতিহারী আসিয়া অজয় সিংহকে সংবাদ দিল, রাজা তাঁহাকে মন্ত্রণাগৃহে যাইতে আদেশ করিয়াছেন। অজয় সিংহ তখন উপবনে কুসুমিত কদম্বের শোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন; প্রতিহারীর কথা শুনিয়া গৃহে ফিরিলেন। তিনি কিছু বিস্মিত হইলেন,—মন্ত্রণাগৃহ এখন আর তেমন ব্যবহৃত হয় না। যখন রাজায় রাজায় বিরোধ হইত—সামাজিক সম্বন্ধে বিদ্বেষ বিষ বাহির হইত—রাজ্যজয় ও রাজ্যরক্ষার জন্য সংগ্রাম হইত—তখন গোপন মন্ত্রণার জন্য মন্ত্রণাগৃহ ব্যবহৃত হইত। এখন সে সকল নাই। রাজপুতরাজ্য এখন কর্ম্মকোলাহলহীন; সহসা আজ মন্ত্রণাগৃহে কিসের মন্ত্রণা? পূর্ব্বদিন সেতু-পরিদর্শনের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি?

ভাবিতে ভাবিতে অজয়সিংহ গৃহে ফিরিলেন এবং বেশপরিবর্ত্তন করিয়া মন্ত্রণাগৃহাভিমুখগামী হইলেন।

তিনি মন্ত্রণাগৃহে উপনীত হইয়া দেখিলেন,—গৃহ শূন্য। প্রতিহারী নিবেদন করিল, রাজা মন্ত্রণাগৃহের পার্শ্ববর্ত্তী গুপ্ত-মন্ত্রণাগৃহে। অজয় সিংহ আরও বিস্মিত হইলেন। গুপ্ত-মন্ত্রণাগৃহ এমন ভাবে গঠিত যে, একটিমাত্র দ্বার রুদ্ধ করিলে বাহিরের সহিত সে গৃহের আর কোন সম্বন্ধ থাকে না; যে মন্ত্রণা মন্ত্রণাকারী কয়জন ব্যতীত আর কাহারও নিকটে ঘুণাক্ষরে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে—পরন্তু বিপজ্জনক, সেই মন্ত্রণা গুপ্তগৃহে নির্ব্বাহিত হয়। রাজা সেই গৃহে!

ভাবিতে ভাবিতে অজয় সিংহ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন—সে কক্ষ প্রাসাদমধ্যবর্ত্তী হইলেও অন্যান্য গৃহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—বিচ্ছিন্ন—আপনার নিঃসঙ্গবাসে আপনি দণ্ডায়মান। তাহার দৃঢ়-গঠিত প্রস্তর-প্রাচীর দুরারোহ—উর্দ্ধে ক্ষুদ্রায়তন বাতায়নপথে আলোক প্রবেশ করে। গৃহে একটিমাত্র প্রবেশ দ্বার; তাহার কপাট লৌহগঠিত।

অজয় সিংহ দেখিলেন, শঙ্কর সিংহ কক্ষমধ্যে উপবিষ্ট। রাজা পাদচারণ করিতেছেন—তাঁহার ললাটে চিন্তারেখা—ভ্রূযুগল পরস্পর সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। অজয় সিংহ ভ্রাতাকে অভিবাদন করিলেন। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। অজয় সিংহ উপবেশন করিলেন।

অল্পক্ষণ পরে সেনাপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজা তখনও অস্থির ভাবে দ্বারের দিকে চাহিতে লাগিলেন—যেন তিনি আরও লোকের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

এই সময় বৃদ্ধ মন্ত্রী কক্ষে প্রবেশ করিয়া রাজাকে অভিবাদন করিলেন।

রাজা দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন, স্বহস্তে বৃহৎ লৌহ কপাট বন্ধ করিয়া দ্বারে অর্গল দিলেন; তাহার পর আসিয়া আসনে উপবেশন করিলেন।

গৃহ নিস্তব্ধ—এমন নিঃশব্দ যে দ্রুত-আগমন-শ্রান্ত মন্ত্রীর ঘন নিশ্বাস-প্রশ্বাস-শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। মন্ত্রী, সেনাপতি ও অজয় সিংহ এ উহার মুখে চাহিতে লাগিলেন, অজ্ঞাত আশঙ্কায় কয়জনই কেমন চঞ্চল হইতে লাগিলেন। শঙ্কর সিংহ এক একবার রাজার মুখে চাহিতে লাগিলেন।

কক্ষের গভীর নিস্তব্ধতা যেন ক্রমেই ভীষণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

তাহার পর সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রাজার কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল—"মন্ত্রী, সেনাপতি, ভ্রাতঃ, আমি আজ বিশেষ প্রয়োজনে এই মন্ত্রণা-সভার অনুষ্ঠান করিয়াছি।"

কেহ কোন কথা কহিলেন না।

রাজা পুনরায় বলিলেন, "আমাদের সম্মুখে বিপদ। রাজ্য অচিরে বিপন্ন হইবে—সেই জন্য এ মন্ত্রণা।"

এ উহার মুখে চাহিতে লাগিলেন। মেঘলেশহীন সুনীল গগনে বজ্রপাতের সম্ভাবনা কোথায়?

কেবল শঙ্কর সিংহ স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন।

রাজা বলিলেন, "মোগলের অত্যাচারে রাজপুত প্রতাপ ক্ষুণ্ণ হইতেছে। যত দিন প্রবল মোগলের সহিত রাজপুতের শত্রুতা ছিল—তত দিন ছিল ভাল; ব্যবহারে তরবারি পরিষ্কৃত থাকে, তীক্ষ্ণ হয়। কূটবুদ্ধি আকবর তাহা বুঝিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি কাহাকেও সখ্যতাসূত্রে বদ্ধ করিয়া—কাহাকেও কুটুম্বিতায় জড়িত করিয়া স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মোগলের প্রতাপ-ছায়ায় রাজপুতবীর্য্য উর্ব্বর ক্ষেত্রে সযত্ন-

সিক্ত কোমল লতার মত প্রাচুর্য্যপূর্ণ দেখাইতেছে। কিন্তু তাহা আতপতাপ সহিতে পারিবে না। রাজপুতকে কষ্টসহিষ্ণু করিবার জন্য বিধাতা রাজপুতানা মরুময় করিয়াছেন, রাজপুতের জীবন অবিশ্রাম সংগ্রাম। তাহাকে রাজ্য-রক্ষার জন্য যেমন সংগ্রাম করিতে হয়—জীবিকা অর্জ্জনের জন্যও তেমনই সংগ্রাম করিতে হয়। এই অবিশ্রাম সংগ্রামেই রাজপুতের বীর্য্য পুষ্ট ও পূর্ণ। মোগলের কৌশলে তাহা ক্ষুণ্ণ হইতেছে। রাজপুত ধ্বংসমুখগামী হইতেছে। ইহার নিবারণ আবশ্যক।"

বৃদ্ধ মন্ত্রীর নয়নদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাঁহার পাণ্ডু গণ্ডে রক্ত-চিহ্ন দেখা দিল—যেন জীর্ণ বনস্পতির কাণ্ডে অস্তগমনোন্মুখ তপনের রক্তাভ কিরণ পতিত হইল। ভস্মাস্তরণে যেমন অঙ্গারে অগ্নি সংরক্ষিত থাকে বার্দ্ধক্যে তেমনই যৌবনের ভাব সুরক্ষিত রহে। মন্ত্রী যৌবনে রাজপুতের গৌরবদীপ সমুজ্জ্বল দেখিয়াছেন। রাজপুতের সংগ্রাম-প্রিয়তা—রাজপুতের উৎসাহ—রাজপুতের উদ্যম তাহার হৃদয়ে নিহিত ছিল। আজ রাজার কথায় তাঁহার মনে সেই পূর্ব্বভাব জাগিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন,—"আমি রাজপুতের এই ধ্বংস নিবারণ কল্পে সচেষ্ট হইয়া রাজপুত-সঙ্ঘ সংগঠনের চেষ্টা করিয়াছি।"

মন্ত্রী সেনাপতির দিকে চাহিলেন,—অজয় সিংহ বিস্মিতভাবে ভ্রাতৃমুখে চাহিয়া রহিলেন।

রাজা অল্পক্ষণ নীরব রহিলেন তাহার পর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"আমি বিফলমনোরথ হইয়াছি।"

মন্ত্রীর মুখ ম্লান হইয়া গেল। তিনি সর্ব্বাগ্রে বুঝিলেন,—বোধ হয় রাজাকে অসাফল্যের বিষফল আহার করিতে হইবে।

রাজা বলিলেন,—"আমি রাজপুত শক্তিসঙ্ঘ গঠনের প্রস্তাব করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রাজার নিকট শঙ্কর সিংহকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম।"

সকলে শঙ্কর সিংহের দিকে চাহিলেন। শঙ্কর সিংহ মৃত্তিকাসংলগ্ন দৃষ্টি হইয়া বসিয়াছিলেন।

রাজা বলিলেন "শঙ্কর সিংহের দৌত্য-বিবরণ আপনারা তাহার নিকট শ্রবণ করুন। রাজপুতের সর্ব্বনাশ হইতেছে।"

তখন রাজাদেশে শঙ্কর সিংহ আপনার দৌত্য-বিবরণ বিবৃত করিতে

লাগিলেন। আর সকলে শুনিতে লাগিলেন, কেবল মন্ত্রী মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিয়া সে বিবরণ আরও বিশদ করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

বিবরণ শেষ করিয়া শঙ্কর সিংহ বলিলেন, "আমার কার্য্য নিষ্ফল হইয়াছে। রাজপুত রাজাদিগের মধ্যে কয়জনমাত্র এ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে সম্মত হইয়াছেন। আর সকলেই অসম্মত। কেহ আশঙ্কায় শঙ্কিত। কেহ মোগলের প্রসাদভিক্ষার্থী। কেহ বা আমাদের রাজাকে অগ্রণীর সম্মান দিতে অনিচ্ছুক—কেবল হিংসাবশতঃ এ কার্য্যে যোগ দিতে চাহেন না"

সেনাপতি আত্মবিস্মৃতভাবে বলিলেন, "সে সকল নীচাশয় শাস্তির উপযুক্ত।"

রাজা বলিলেন, "সত্য। কিন্তু শাস্তি দিবে কে? রাজপুতদিগের মধ্যে তাহারাই যে এখন প্রবল পক্ষ। তাহা না হইলে কি আজ রাজপুতের এমন দুর্দ্দশা! তাহা না হইলে কি আজ রাজপুতের অম্বরচুম্বিনী গৌরব-পতাকা কর্দ্দমে পতিতা—মোগলের পদদলিতা?"

সেনাপতি উত্তর করিতে পারিলেন না।

রাজা বলিলেন, "বিপদ আসন্ন।"

অজয় সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

মোগলের বিপুল বলের সঙ্গে আমরা কতক্ষণ পারিব?

সেনাপতি বলিলেন, "কেন, মোগল কি আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেছে?"

রাজা বলিলেন, "আসিবে। মোগল বাহিনী এক দিন আমাদের সম্মুখীন হইত। এখন আর বিলম্ব করিবে না।"

সেনাপতি বলিলেন, "মোগল সংবাদ পাইবে কিরূপে?"

"যাহারা আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারে নাই—তাহারাই মোগলের প্রসাদলাভের আশায় সংবাদ দিবে।"

সেনাপতির আননে ক্রোধ যেন ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "মোগল সংবাদ পাইবার পূর্ব্বেই আমরা বল বৃদ্ধি করিব।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "কবে আর করিবে, সেনাপতি? মোগল কি এখনও সংবাদ পায় নাই, ভাবিতেছ?"

সেনাপতির মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। সেই ঈষন্মাত্র রবিকরে আলোকিত কক্ষে তাঁহার পাণ্ডুমুখে যেন মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে মনে হইতে লাগিল।

রাজা মন্ত্রীর দিকে চাহিলেন। মন্ত্রীর চিন্তারেখাঙ্কিত ললাটে রেখাগুলি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মুখে চিন্তার নিবিড় ছায়া। তিনি তন্ময় হইয়া এই বিপদে উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন।

রাজা বলিলেন, "মন্ত্রী রাজ্য-রক্ষা দুষ্কর কার্য্য। দুষ্কর হইলেও কর্ত্তব্য-পালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছি, শেষে এ দুর্নামের ভাগী হইতে না হয়—তাহার উপায় করিতে হইবে।"

মন্ত্রী ভাবিতে লাগিলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

রাজা পুনরায় বলিলেন "আমি আমার জন্য দুঃখিত বা শঙ্কিত নহি। আমি যাহা ভাল বুঝিয়াছি—কর্ত্তব্য বুঝিয়াছি, তাহাই করিয়াছি। পশুর মত জীবন যাপন না করিয়া মঙ্গল-সাধন-চেষ্টায় প্রাণপাত—সেও সুখের—সেও অভিলষিত—সেও স্পৃহনীয়। কিন্তু যে প্রজার রক্ষার ভার আমার তাহাদিগকে রক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে।"

মন্ত্রী বলিলেন, "সে চেষ্টা আমরা অবশ্যই করিব।"

কিন্তু মন্ত্রী বুঝিয়াছিলেন চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, তাই তিনি বলিলেন, "আপনি মহৎ অনুষ্ঠানের চেষ্টা করিয়াছেন—যদি সফলকাম না হইয়া থাকেন, আপনার দোষ কি? কর্ত্তব্য-পালনই ধর্ম্ম। আপনি সে ক্ষেত্রে যাহা কর্ত্তব্য বুঝিয়াছেন করিয়াছেন—এ ক্ষেত্রেও আপনি আপনার কর্ত্তব্যপালন করিবেন। ফলাফলের জন্য আপনি দায়ী নহেন।"

রাজা মন্ত্রীর কথার প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন, "ক্ষত্রিয় বিনা বাধায় মোগলকে পিতৃপুরুষাগত—ন্যাসরূপে সংরক্ষিত—রাজ্য দিবে না। আমরা যথাসাধ্য তাহা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব।"

সেনাপতি বলিলেন, "তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য।"

রাজা সেনাবলবৃদ্ধির বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি তাহা বিবৃত করিলেন। মন্ত্রী ও সেনাপতি তাহার সম্যক্ আলোচনা করিলেন—অজয় সিংহ ও শঙ্কর সিংহও সে প্রস্তাব সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিলেন।

যখন সভাভঙ্গ হইল, তখন প্রায় মধ্যাহ্ন।

রাজা আসন ত্যাগ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলে উঠিলেন।

ভ্রাতার মুখ মলিন দেখিয়া রাজা সস্নেহে তাঁহার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া

বলিলেন, "চিন্তা কিসের, ভাই? ক্ষত্রিয়ের সংগ্রামে ভয় নাই—মৃত্যুতেই বা তাহার ভয় কি?"

রাজা স্বহস্তে বৃহৎ লৌহদ্বারের অর্গল মোচন করিলেন; মধ্যাহ্নের দীপ্ত দিবালোক কক্ষে প্রবেশ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

মুগ্ধা।

রজনীর তিমিরাবশেষ দিবালোকে অপসৃত হইতেছে। পূর্ব্বগগনে স্তর-বিন্যস্ত স্বচ্ছ লঘু মেঘের বিচিত্র শোভায় রক্তরাগ ফুটিয়া উঠিতেছে। শুষ্ক শোণিতের মত কৃষ্ণাভ প্রগাঢ় লোহিত হইতে ক্রমে উৎপলের শ্বেতাভ লোহিত শেষে ধূসরে মিশাইয়া গিয়াছে। পশ্চিম গগন গাঢ় ধূসর—দূরে বৃক্ষ-শাখায় স্বচ্ছ অন্ধকার হৃদয়ে অতীত দুঃখস্মৃতির মত জড়াইয়া আছে। নগরে জনকোলাহল শ্রুত হয় না, তখনও নগরের নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। রাজপথে ধূলিরাশি নিশার শিশিরপাতে সিক্ত বোধ হইতেছে। রাজপথ গত দিবসের কর্ম্মবাহুল্যস্মৃতি বক্ষে লইয়া সুপ্তিমগ্ন। তাহার বক্ষে দিবসের কর্ম্মচিহ্ন—রথচক্রের রেখা, অশ্বক্ষুরের প্রতিচ্ছবি, গোমহিষের বিভক্ত ক্ষুরের প্রতিকৃতি, মানবের পাদুকার ও পদের অঙ্কন। এখন কেবল দুই চারিটি বিহগ সেই পথে পতিত শস্য-কণার বা গমনশীল কীটপতঙ্গের সন্ধানে চলিয়াছে—তাহারা নিঃশঙ্ক সাহসে লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতেছে—ধূলির উপর আপনাদের চরণ-চিহ্ন চিত্রিত করিতেছে।

নগরোপকণ্ঠ আরও নিঃশব্দ। নদীতীরে আশ্রমে পার্শ্ববাহিনী তরঙ্গিনীর জল-কল্লোল, গর্ভস্থ শিলাখণ্ডে আহত জলের উচ্ছ্বাসশব্দ স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হইতেছে। আশ্রমে তরুশাখায় লুপ্তসুপ্তি বিহগ বিরাব আরম্ভ করিয়াছে; দিবালোকবিকাশে—কর্ম্মকোলাহলকলয়িত জীবনের আরম্ভে বিহগের সেই প্রথম আনন্দধ্বনি—জীবনসংগ্রামে আহ্বানের প্রথম তূর্য্যনিনাদ।

আশ্রম-প্রাঙ্গণ-সীমায় নদীতটে শিলাসনে বসিয়া পার্ব্বতী কি ভাবিতেছিল। ভাবনা কিসের তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু সে ভাবনা যে তাহাকে অভিভূত করিয়াছিল তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। পার্ব্বতী স্থির—নিশ্চল। নদীর

পরপার হইতে কেহ যদি তাহাকে লক্ষ্য করিত—তবে সে মনে করিত, কৃষ্ণ-শিলাসনে শ্বেতমর্ম্মরমূর্ত্তি বিরাজিত। প্রভাতের প্রথম আলোক তাহার আনন উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। শ্বাসপ্রশ্বাসে তাহার বক্ষের বসন কেবল ঈষৎ কম্পিত হইতেছে—তাহাই জীবনের পরিচায়ক। নহিলে পার্ব্বতী—স্থির—নিশ্চল। বিহঙ্গম তাহাকে জড়মূর্ত্তিমাত্র বোধ করিয়া নির্ভয়ে তাহার পার্শ্বে বসিয়া চঞ্চুপুটে পক্ষ পরিষ্কৃত করিতেছে। একটি সরীসৃপ তাহার চরণপ্রান্তে আসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল,—সরীসৃপের পাণ্ডুকণ্ঠে দেখিতে দেখিতে রক্তবর্ণের বিকাশ দেখা দিল; এমন সময় পবনস্পর্শে পার্ব্বতীর বসন ঈষৎ কম্পিত হইল—সরিসৃপ আপনার ভ্রম উপলব্ধি করিয়া দ্রুতবেগে শিলাখণ্ড হইতে শিলাখণ্ডে যাইয়া ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল। পার্ব্বতী সে সকল লক্ষ্য করিতেছিল না।

স্বভাবের শোভা—পূর্ব্বগগনে দিবালোক-বিকাশ—পার্শ্বে বিহগের অবস্থান—পার্ব্বতী এ সকল কিছুই লক্ষ্য করিতেছিল না। সে কি ভাবিতেছিল। আর তাহার দৃষ্টি অদূরে সেতুতে বদ্ধ হইয়া ছিল।

আজ কয়দিন লইতে সে লক্ষ্য করিতেছে, প্রতিদিন প্রত্যুষে—রাজধানীতে কর্ম্মকোলাহল উত্থিত হইবার পূর্ব্বে রাজা একাকী এই সেতু পরীক্ষা করেন, সেতু অতিক্রম করিয়া পরপারে ভুমি, পথ—এ সকল বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করেন, যষ্টি দিয়া রাজপথে ধূলির উপর কি চিত্র অঙ্কিত করেন—সে দেখিতে পায় না,—বুঝিতে পারে না; তাহার পর আবার নগরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সে লক্ষ্য করে, রাজার মুখ নিদাঘ দিনান্তের মত অন্ধকার; সে মুখে যেন তেমনই আসন্ন প্রলয়ের প্রবল আভাস।

রাজা এত নিকটে আইসেন, কিন্তু এক দিন আশ্রমে আইসেন না। কেবল এক এক দিন গমনের বা প্রত্যাবর্ত্তনেয় সময় আশ্রমের দিকে চাহিয়া থাকেন। সে আশ্রম তাঁহার কত যত্নের—কত প্রিয় ছিল, এখন তিনি বুঝি আর তাহার কথা মনেও ভাবেন না। সে কথা মনে করিয়া পার্ব্বতী হৃদয়ে বেদনা অনুভব করে। কিন্তু কেন সে বেদনা অনুভব করে, তাহা সে আপনি বুঝিতে পারে না। সে ভাবে, সে ত সন্ন্যাসিনী; সে যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে সুখ দুঃখ উভয়ই সমভাবে উপেক্ষা করিতে হইবে। তবে এ বেদনা কেন? সে আপনার মন আপনি জানে না—আপনাকে আপনি চিনিতে পারে না। যাঁহারা বলেন, সংসারসংস্পর্শবিরহিতা সরলা যুবতীর হৃদয়

অলিখিত গ্রন্থ-পত্রের সহিত উপমেয়, তাঁহারা ভ্রান্ত; অদৃষ্ট সে হৃদয়ে বিচিত্র কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে, সে লেখা অদৃশ্য—সহানুভূতির স্নিগ্ধ উত্তাপে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। পার্ব্বতীর হৃদয়ে সেই লেখা কেবল সহানুভূতির স্নিগ্ধ উত্তাপের অভাবে ফুটিয়া উঠিতে পায় নাই। সে আপনি তাহা জানিত না—বুঝিতে পারিত না। তাহার সেই মুগ্ধ নারী হৃদয়ে কি আকুল ভালবাসা, কি অসীম স্নেহ, কি গভীর প্রেম সুপ্ত ছিল! হায়! যদি কাহাকেও অবলম্বন করিয়া সে সকল বিকশিত হইতে পারিত তবে তাহার সাহায্যে ও সাহচর্য্যে মনুষ্যত্বের কি সমুন্নত আদর্শ সৃষ্ট হইত! সে আজ অনাথ, অনাশ্রয়, আতুর—ইহাদিগকে সেই স্নেহ ভালবাসা দিতেছিল; যে কুসুমের সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে গৃহ সুন্দর ও সুরভিত হইত—সে কানন-পবনকে সুরভিত করিয়া শুকাইয়া ঝরিতেছিল।

আজ সে কি আশায় পথ চাহিয়া ছিল?

পুরুষ যেমন সহজে রমণীর গুণরাশি দেখিতে পায়, রমণী তেমনই সহজে পুরুষের গুণরাশি উপলব্ধি করিতে পারে। স্বভাব পরস্পরকে পরস্পরের গুণগ্রাহী বৃত্তি দিয়াছেন—তাহাই স্বভাবের নিয়ম। তাই পার্ব্বতী সহজে রাজার গুণরাশি বুঝিতে পারিয়াছিল—তাহার বালিকানয়নে তাঁহার অনন্য-সাধারণ গুণজ্যোতিঃ দিব্যদীপ্তিদৃপ্ত প্রতিভাত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার বালিকা হৃদয় ভক্তিপূর্ণ, শ্রদ্ধাসিক্ত হইয়াছিল—রাজার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল।

তাহার পর? তাহার পর—প্রেম বিদ্যুদ্দীপ্তির মত সহসা প্রকাশ পায়। বন্ধুত্ব—সখ্য বিচার-বিবেচনা-সাপেক্ষ—তাহা দীর্ঘ পরিচয়ের ফল—প্রেমের প্রথম প্রকাশ অতর্কিত—প্রেম সহসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।

কিন্তু যে দিন পার্ব্বতী আপনার হৃদয়ের সে অনুভূতি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল, সেই দিন হইতেই সে সাবধান হইয়াছিল। পুণ্য পূতাচারে পরিবর্দ্ধিতা—পুরোহিতদুহিতা পার্ব্বতী ধর্ম্মাচরণের মধ্যে লালিতা পালিতা হইয়াছিল—পিতার পুণ্য আদর্শ সর্ব্বদা তাহার সম্মুখে বিদ্যমান ছিল। তাই সে কঠোর ধর্ম্মের জন্য আত্মনির্য্যাতনে বিমুখ হইতে পারিল না। সে মনে করিল, যে যুবতী বিবাহমন্ত্রপূত প্রেম ব্যতীত—অন্য প্রেমকে হৃদয়ে স্থান দান করে সে কীটদষ্ট ফলের দশাগ্রস্ত; তাহার যতই বাহ্য সৌন্দর্য্য থাকুক না কেন কেহ তাহার আদর করে না—করিতে পারে না; কারণ, তাহার

সারাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেই বিশ্বাসহেতু আপনার অনুভূতি উপলব্ধি করিবামাত্র সে একান্ত সাবধান হইয়াছিল। সংসারে তাহার একমাত্র অবলম্বন—সহোদরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে শোকতাড়িতা হইয়া সে যে কার্য্যে সান্ত্বনা ও সুখ পাইবে মনে করিয়াছিল – সে সেই কার্য্যে আপনার মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিল; ভাবিয়াছিল—অবলম্বনহীন হৃদয় অবলম্বন পাইলে আর উদ্ভ্রান্ত হইবে না। তাহার আত্মসংযম—ও মানসিক বলই হৃদয়কে সংযত রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল; তাহার উপর এই ব্রত পাইয়া সে পরম পুলকিত হইল। কিন্তু হৃদয়ে আকর্ষণের ছায়া পড়িলে—তাহা সহজে দূর হয় কি?

দেখিতে দেখিতে রাজপথে রাজার মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল। আজ রাজার আসিতে সামান্য বিলম্ব হইয়াছিল, তাই বুঝি তিনি বেগে অশ্বচালনা করিয়া আসিতেছিলেন। পবনে প্রতিহত হইয়া অশ্বের গ্রীবার ও পুচ্ছের কেশরাশি উড়িতেছিল—আর আসনের কারুকার্য্যখচিত বিলম্বিত অংশ কম্পিত হইতে-ছিল। নবোদিত রবিকরে রাজার শিরস্ত্রাণমধ্যবর্ত্তী হীরকখণ্ড জ্বলিতেছিল। অশ্বারোহীকে লইয়া অশ্ব সেতু পার হইয়া গেল। পার্ব্বতী দেখিতে লাগিল।

ক্রমে অশ্ব দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল—যেন ধূসর পথে মিশাইয়া গেল। পার্ব্বতীর নয়ন ফিরিল না, সে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে অদূরে আবার অশ্ব দৃষ্ট হইল। ক্রমে রাজা সেতুর উপর আসিয়া উপনীত হইলেন—অশ্বের প্রাবৃট্‌ঘনশ্যাম অঙ্গে স্থানে স্থানে শ্বেত ফেন সঞ্চিত হইয়াছে। রাজা রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পার্ব্বতীর বোধ হইল, তিনি যেন একবার আশ্রমের দিকে চাহিলেন। কিন্তু কই তিনি ত আশ্রমে প্রবেশ করিলেন না! তিনি কত দিন আশ্রমে আইসেন নাই! পার্ব্বতী মনে করিল,—তিনি রাজকার্য্যে ব্যস্ত—তাঁহার অবসর নাই; বিশেষ কয়দিন তাঁহাকে দেখিয়া তাহার মনে হইয়াছে, তিনি চিন্তাকাতর। নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কারণে তিনি চিন্তিত। পার্ব্বতী মনকে এমনই বুঝাইতে চেষ্টা পাইল। তবুও—কি জানি কেন—গভীর দীর্ঘশ্বাসে তাহার কুসুমকোমল দেহ কাঁপিয়া উঠিল।

পার্ব্বতী উঠিল। আত্মীয়-আননের মত পরিচিত আশ্রমদৃশ্য আজ তাহার নিকট ভাল লাগিতে ছিল না। তাহার মন যেন ভারাক্রান্ত।

প্রবল মানসিক বলে সে অবসাদ অতিক্রম করিয়া পার্ব্বতী আশ্রম-গৃহাভি-মুখগামিনী হইল। গৃহে আসিয়া সে কার্য্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্তা হইল।

একটি বালক কয়দিন প্রবল জ্বরে কাতর ছিল, পার্ব্বতী প্রথমে তাহাকে দেখিতে গেল। শেষ রাত্রি হইতে তাহার চাঞ্চল্য বর্দ্ধিত হইয়াছে—বালক মাতৃঅঙ্কে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।

পার্ব্বতী আর সব ভুলিয়া গেল, জননীর মত স্নেহে ও আগ্রহে তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল কিছুক্ষণ পরেই বৈদ্য আসিলেন। তিনি বালককে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলেন—স্বয়ং তাহাকে ঔষধ সেবন করাইলেন। বালকের জননী কাতরকণ্ঠে বৈদ্যের নিকট সন্তানের জীবন প্রার্থনা করিতে লাগিল। হায় শঙ্কিতা জননী! সে তখন ভুলিয়া গিয়াছিল,—বৈদ্যও তাহারই মত মনুষ্যমাত্র—মৃত্যুর উপর তাঁহার কোন অধিকার নাই।

মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে বৈদ্য বিদায় লইলেন; যাইবার সময় তিনি পার্ব্বতীকে ডাকিয়া বলিলেন,—বালকের জীবনের আশা নাই। বৈদ্য আশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। পার্ব্বতী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার আসিয়া বালকের পার্শ্বে বসিল।

পার্ব্বতী সমস্ত দিন বালকের নিকটে রহিল। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় বালকের অবস্থান্তর ঘটিতে লাগিল; নয়নের জ্যোতিঃ নিবিয়া আসিল—মুখে কালিমা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। পার্ব্বতী বুঝিল, অন্তিমকাল উপস্থিত। দেখিতে দেখিতে জননীর উচ্ছ্বসিত বক্ষে সন্তানের সকল জীবনচাঞ্চল্য ফুরাইয়া গেল।

পার্ব্বতী যেন আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেছিল না, আজ এই বালকের মৃত্যুতে তাহার ভ্রাতৃশোক যেন জাগিয়া উঠিল। তথাপি সে আপনার সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিল—তাহার পর সন্তানশোকাতুরা জননীর আত্মীয়ারা আসিয়া তাহার ভার লইলে সে দীর্ঘদিনব্যাপী দারুণ উদ্বেগের পর আপনার কক্ষে প্রবেশ করিল।

সে রাত্রিতে পার্ব্বতী ঘুমাইতে পারিল না—সে কাঁদিয়া সে রাত্রি কাটাইল। যখন প্রভাত হইল, তখন সে আবার আপনার কার্য্যে প্রবৃত্তা হইল।

য়ুরোপ ভ্রমণ।

—:*:—

(যাত্রা)

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯১০। বেলা ১১টার সময় বন্ধুবর সু—, চু—ও মি—বাবুদিগের সহিত ভিক্টোরিয়ায় চড়িয়া বোম্বাইয়ের রাজপথে বাহির হইলাম। পথে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল; বোধ হয়, সূর্য্যদেব য়ুরোপের আবহাওয়ার পূর্ব্বভাস দিলেন। জেটীতে পৌঁছিয়া শুনিলাম, জাহাজ কুলে আসিতে পারে নাই, দূরে সমুদ্রে দাঁড়াইয়া আছে, কারণ তরঙ্গ বড় ভীষণ। কিছুক্ষণ পরে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী সমস্ত ভারতবর্ষীয় যাত্রীদিগের নাম, ধাম, গম্যস্থান ও য়ুরোপ-যাত্রার কারণ লিখিয়া লইল। অনেক পার্শি যাত্রী দেখিলাম, কাহারও কাহারও গলায় বন্ধুরা ফুলের মালা দোলাইয়া দিতেছেন। বাঙ্গালীও অনেক দেখিলাম, কিন্তু সকলেই তরুণবয়স্ক। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তারের পরীক্ষা আরব্ধ হইল। ডাক্তার এক টেবলের সম্মুখে বসিয়া আছেন, পার্শ্বে একজন ভারতবাসী, বোধ হয় কম্পাউণ্ডার। ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র প্রশ্ন হইল, নাম কি? নাম বলিবার সময়ে "সাহেব" সম্মুখস্থিত একখানা chartএ নাম মিলাইয়া লইলেন; ভারতীয় ভদ্রলোকটি কব্জির কাছে হাত দিয়া বলিলেন, "All right" ইহারই নাম পরীক্ষা!

লঞ্চে উঠিলাম, ঠিক ১২টা ১৫ মিনিটের সময় লঞ্চ ছাড়িল। বন্ধুরা তীরে দাঁড়াইরা রুমাল ঘুরাইতে লাগিলেন। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে গিয়া জাহাজে পৌঁছিলাম। জাহাজে উঠিবামাত্র একজন লোক (পরে জানিলাম chief steward) আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোন্ শ্রেণী?" আমি বলিলাম "প্রথম",। সে পথ দেখাইয়া তাহার-কক্ষে লইয়া গিয়া বলিল, "একটু অপেক্ষা করুন, কামরা দেখাইয়া দিতেছি।" সে জাহাজের একখানা চিত্র ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। দেখিলাম, প্রথম শ্রেণীতে ৮৮ জনের স্থান আছে; আমরা মাত্র ছয়জন যাত্রী এবং দুইটি ছেলে মেয়ে। আমার কামরায় তিন জনের স্থান হয়; অধিকারী আমি একাকী। আর একটি স্থানে বন্ধু মন্মথনাথের নাম লিখা ছিল; কিন্তু তিনি যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে গৃহিণীর মনোকষ্টের দোহাই দিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছিলেন।

জাহাজে উঠিবার পূর্ব্ব হইতেই সমুদ্রের মূর্ত্তি দেখিয়া চিন্তিত হইতে হইয়াছিল। জাহাজ ঠিক ২টার সময় ছাড়িল, আমিও কেবিন ছাড়িয়া ডেকে আসিলাম। আসিয়া দেখি, ডেকে খুব গোলমাল, জিনিসপত্র তখনও কামরায় কামরায় পৌঁছে নাই, সবই প্রায় স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। আমি ডেক চেয়ারটি খুঁজিয়া লইয়া বিছাইয়া ফেলিলাম। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই বেশ মাথা ঘুরিতে লাগিল ও এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাব অনুভূত হইতে লাগিল। বুঝিলাম সমুদ্র পীড়ার উপক্রম। পেটে নাড়িভুঁড়ি যেন গলায় উঠিতেছে, মস্তিষ্ক প্রভৃতি যেন উদরে প্রবেশ করিতেছে ইত্যাদি। বড় চমৎকার ভাব! আমি গিয়া কেবিনে চক্ষু মুদিয়া শুইয়া পড়িলাম, আর ভাবিতে লাগিলাম, কেন ইচ্ছা করিয়া এ বিপদ টানিয়া আনিলাম। এখন যদি জাহাজ ফিরায়, লক্ষ্মীটির মত ঘরের ছেলে ঘরে যাই, আমার আর বিলাত বেড়াইয়া কায নাই।

অপরাহ্ন ৪টার সময় চায়ের ঘণ্টা দিল, চা পান করিয়া আবার যাইয়া শুইলাম। সুবিধা এই যে, আমার কেবিনের দরজা খুলিলেই আহারের ঘর। চিরকাল পুস্তকে পড়িয়াছি যে, সমুদ্র পীড়ার সময় ঘরে থাকা বিধেয় নহে; ডেকে যাওয়া ভাল। কিন্তু আমি ত দেখিলাম উল্টা, ঘরে আমি খুব ভাল থাকিতাম। বৈকালে একবার ডেকে গেলাম কিন্তু থাকিতে পারিলাম না।

৭টায় ডিনার। কি কষ্টে যে সেদিন আধঘণ্টা টেব্‌লে বসিয়া ছিলাম তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহই বুঝিবে না। তাড়াতাড়ি কোনও রকমে ফিরিয়া যাইয়া শয়ন করিলাম। ঘুমটা চিরকালই আমার খুব সাধা আছে। বোধ হয় ৮টার মধ্যেই ঘুমাইয়াছিলাম। যখন উঠিলাম, তখন ভোর ৫৷৹টা। উঠিয়াই ডেকে যাইলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, দুই বৎসর হইতে পাঁচ বৎসরের ৪।৫টি বালক বালিকা খুব ছুটাছুটি করিতেছে। দেখিয়া মনে মনে বড় ঘৃণা হইল; ভাবিলাম, কি আমার নিজের ছেলে মেয়ের চেয়ে ছোট, উহারা খেলা করিয়া বেড়াইতেছে আর আমি এত কাতর! ইহাই মনে করিয়া আমি হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম, আধ ঘণ্টার মধ্যে অনেকটা ভাল বোধ হইল। বৈকাল পর্য্যন্ত সুস্থ হইলাম। যাইবার সময় আর অসুখ বোধ হয় নাই।

দ্বিতীয় দিন বৈকালে ডেকে চেয়ারে শুইয়া আছি, এমন সময় একজন বাঙ্গালী যুবক আসিয়া আলাপ করিলেন; বলিলেন, তাঁহাদের সকলেরই খুব

অসুখ হইয়াছে। যাইয়া দেখি, ৮।৯ জন বাঙ্গালী যুবক যাত্রী। সকলেই প্রায় তৃতীয় শ্রেণীতে যাইতেছেন। অসুখ প্রায় সকলেরই হইয়াছে। একজন তৃতীয় বার যাইতেছেন, কেবল তিনি ভাল আছেন ও সকলের সেবা করিতেছেন। সমুদ্র আমাদের উপর বড় নির্দ্দয়; প্রায় সমস্ত রাস্তাই অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ছিলেন। প্রায় পাঁচ ছয় দিন সকলেই অসুস্থ ছিলেন। প্রথম শ্রেণীতে তিন দিন আমি একা আহারের টেব্‌লে উপস্থিত ছিলাম।

ক্রমে বাঙ্গালী যুবকদিগের সঙ্গে আলাপ হইল। দেখিলাম, তাঁহারা সকলেই খুব সৎস্বভাব। কেহ কেহ আমাকে চিনিতেন। সকলেই আমাকে যথেষ্ট খাতির ও যত্ন করিতে লাগিলেন। এমন কি আমার জন্য সকলেই ব্যস্ত— কিসে আমার সুবিধা করিবেন। বাড়ীর বাহিরে এত আদর ও যত্ন অপ্রত্যাশিত ভাবে পাইয়া যে কি আনন্দ বোধ করিলাম, তাহা আর বলা যায় না। সকলেই আমাকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় দেখিতেন।

জাহাজে সমস্ত দিনের কায ছিল এই, সকালে ৬টার সময় উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সারিয়া কফি পান (কফি বা চা কোকো, রুটি, মাখন, বিস্কুট ও ফল দিত) তাহার পরে উপরে যাইয়া কিছুক্ষণ পায়চারি ও গল্প। ১০ টায় স্নান; ১১ টায় ভোজন (প্রায় দশ বারটা ডিস্‌ ও ফলমূল)। ৪টায় চা (সমেত কেক বিস্কুট প্রভৃতি)। পুনরায় পায়চারি ও গল্প। ৬৷৷০ টায় ডিনার (প্রায় ১২।১৩টা ডিস্‌ ও অপর্য্যাপ্ত ফলমূল)। পরে পুনরায় গল্প ও পায়চারি এবং ৯টায় কফি বা চা। ৩।৪ দিন পর থেকেই আমরা সময়ে অসময়ে তাস খেলা আরম্ভ করিয়াছিলাম। ইংরাজ সহযাত্রীদের মধ্যে কাহারও কাহারও সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল বটে, কিন্তু অনেকগুলি বাঙ্গালী পাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে বড় ভিড়িতাম না। ৮।১০টি ফরাসী মহিলা ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গেও সামান্য আলাপ হইয়াছিল।

এডেন পর্য্যন্ত সমুদ্র অতিশয় চঞ্চল ছিল। প্রায়ই মাঝে মাঝে জাহাজের ডেকের উপর ঢেউ আসিয়া কাহাকেও না কাহাকেও ভিজাইয়া দিত। পোর্টহোল খুলিবার উপায় ছিল না। টেব্‌লে দড়ি বাঁধিয়া প্লেট রাখিয়া খাইতে হইত? আর জাহাজ ক্রমাগত roll ও pitch করিত, পাশাপাশি দোলার নাম roll করা, লম্বালম্বি দোলার নাম pitch করা। জাহাজ যখন pitch করে তখন হাঁটা বড় কষ্টকর; ক্রমাগত পড়িবার সম্ভাবনা, কিন্তু

২।১ দিন অভ্যাস করিলে বেশ সহজ হইয়া যায়; কিছু কষ্ট হয় না। আমি প্রত্যহ নিয়মিত ৩।৪ মাইল হাঁটিতাম।

বাঙ্গালী যুবকদিগের মধ্যে একজন বড় ভাল মানুষ, তাঁহাকে আর সব ছেলেরা ভারি ক্ষেপাইত, আর তিনি আসিয়া আমার কাছে অভিযোগ করিতেন, বলিতেন, "ওদের বলিছি 'বাস্, ও হবে না' তবু আমায় বিরক্ত ক'চ্ছে"। তাঁহার বিশ্বাস, যে জিনিসে "বাস্" বলা গেল, তাহা সেই স্থানেই শেষ হওয়া উচিত। ইনি বড় সুকণ্ঠ; মধ্যে মধ্যে গান শুনাইয়া আমাদের মোহিত করিতেন। ১০ই তারিখে বেলা ৬টায় এডেনে পৌছিলাম। কয়দিন পরে জমী দেখিয়া যে আহ্লাদ হইল তাহা লিখিয়া জানান দুঃসাধ্য। দেখিলাম ডাঙ্গায় গাড়ি চড়িয়া পার্শি ভদ্রলোকরা বায়ু সেবন করিতেছেন।

আমি এডেনে নামি নাই। সন্ধ্যার পর ভয়ানক গরম বোধ হইল। কিছুমাত্র হাওয়া ছিল না, এত ঘাম হইতে লাগিল যে, সমস্ত কাপড় ভিজিয়া গেল। কেবিনে থাকা অসম্ভব। ডেকে অনেক মহিলা,—অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় তথায় যাওয়া যায় না। বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল।

প্রায় ১২টার সময় খাওয়ার ঘরে বৈদ্যুতিক পাখা খুলিয়া একটা টেব্‌লের উপর শুইয়া পড়িলাম।

সকালে উঠিয়া দেখি, জাহাজ বাবেলমাণ্ডেল প্রণালী পার হইতেছে। কি চমৎকার দৃশ্য! অতি সঙ্কীর্ণ জলপথ, বোধ হয় কয়েক শত গজ মাত্র। পাহাড়ের চূড়ায় আলোক-গৃহ,—দুই এক জন লোক দেখা যাইতেছে। কি বর্ণবৈচিত্র্য! আমি সমুদ্রে ও গিরিগাত্রে পাঁচটি বিভিন্ন বর্ণ লক্ষ্য করিলাম।

লোহিত সাগরে প্রবেশ করিয়া লোহিতত্ব কিছুই দেখিতে পাইলাম না। এক পার্শ্বে ডাঙ্গা দেখা যায়, এবং মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড় এবং তাহার উপর আলোকগৃহ। সমুদ্র অনেক শান্ত ছিলেন এবং একটু একটু হাওয়া ছিল; কাযেই গরমে অত্যন্ত অধিক কষ্ট হয় নাই।

এডেন ছাড়ার পর দিন একটা মজা হইয়াছিল। একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আমাকে বলিতেছেন যে, তিনি এডেন নামিয়াছিলেন, তথায় হোটেলে একটা ভারতবর্ষীয় ভৃত্য টুপি মাথায় দিয়াই তাঁহাদের খাদ্য বণ্টন করিতেছিল। তিনি হিন্দীতে গালি দিলে সে টুপি খুলিল। আমি তখন কথা বলিলাম না। বিধির বিধানে, সেই দিনই বৈকালে তাঁহার ভৃত্য (ক্যাবিন বয়) তাঁহার সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা বলিয়া তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া দিল। আমি সেস্থানে উপস্থিত।

ভৃত্য চলিয়া যাইলে আমি বলিলাম, "কি মশায়, কোনও ভারতবাসী চাকর আপনার পিঠ চাপড়ালে আপনি কি কর্ত্তেন?" তিনি আর কোন কথা বলিলেন না।

বাস্তবিক এডেনের পূর্ব্বে আর পশ্চিমে ইংরাজ একেবারে দুই বিভিন্ন জাতি।

১৫ই তারিখে বেলা প্রায় ১২টার সময় জাহাজ সুয়েজ খালের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে একজন ডাক্তার আসিলেন। তিনি আসিয়া একবার আমাদের ঘরে দাঁড় করাইয়া "thank you" বলিলেন। ইহার নাম প্লেগ-পরীক্ষা!

কিছুক্ষণ পরে জাহাজ খালে প্রবেশ করিল। খালের দৃশ্য বড় চমৎকার। বামে এসিয়া; একেবারে মরুভূমি ধু ধু করিতেছে। দক্ষিণে আফরিকা প্রশস্ত পথ, পাইন গাছের সারি। খাল প্রায় ১০০ মাইল লম্বা, চওড়া খুব কম; একখানা জাহাজ যাইতে পারে। মধ্যে মধ্যে এক এক স্থানে চওড়া করিয়া ষ্টেসন করিয়াছে, সম্মুখে জাহাজ আসিলে বিপরীতগামী জাহাজ দাঁড় করায় এবং ২ জন লোক কাছি লইয়া ডাঙ্গায় বসিয়া থাকে, একখানা পার হইয়া গেলে অপরখানি ছাড়ে; ঘণ্টায় ৫ মাইলের অধিক গতিতে জাহাজ যাইবার নিয়ম নাই; কারণ, কূল বাঁধান নহে, পাছে ধসিয়া যায়। প্রায় সকল ষ্টেসনেই মাটিকাটা কল আছে, ক্রমাগত মাটি কাটিতেছে। আফরিকার দিকে খালের ধারে রেলপথ। ট্রেণ চলিবার সময় আরোহীদের মুখ পর্য্যন্ত দেখা যায়। চন্দ্রালোকে খালের দৃশ্য বড় চমৎকার। তদ্ভিন্ন জাহাজের মাথায় search light দেয়, তাহাতে বাহার আরও বাড়ে। মধ্যে মধ্যে ২।৩টি বড় বড় হ্রদ আছে, তথায় জাহাজ দ্রুত যাইতে পারে। এই খাল য়ুরোপের স্থপতি বিদ্যার এক বিস্ময়কর উদাহরণ।

প্রভাতে পোর্টসৈয়দে পৌঁছিলাম। কিং কোম্পানীর লোক আসিয়া আমার চিঠি পত্র দিলেন ও কিছু করিতে হইবে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় করিলাম।

আমরা কয়জন বাঙ্গালী মিলিয়া সহর দেখিতে গেলাম। ক্ষুদ্র স্থান, কেবল কতকগুলি দোকান, হোটেল ও গণিকাগৃহ ব্যতীত আর কিছুই নাই। ভাল বাড়ীর মধ্যে এক কেনাল কোম্পানীর কার্য্যালয়। আর দ্রষ্টব্য কেনালের স্থপতি লেসেপসের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি। গ্রামটি খুব সর্ব্বজনীন, এস্থানে সব

দেশের বদমায়েস লোকের আড্ডা। দূরে আরবী গ্রাম;—আমাদের পশ্চিমের গ্রামের মত অপরিচ্ছন্ন ও কদর্য্য। ভালর মধ্যে সিগারেট খুব সস্তা; কলিকাতার দামের প্রায় এক তৃতীয় দাম।

বেলা ১২টায় জাহাজ ছাড়িল। এইবার আমরা য়ুরোপে প্রবেশ করিলাম। শুনিয়াছিলাম, ভূমধ্য সাগর এ সময়ে খুব প্রশান্ত থাকে, কিন্তু বড় প্রশান্ত দেখিলাম না। আমাদের কপাল! তবে আজ সূর্য্যাস্ত বড় চমৎকার। পর দিন সূর্য্যোদয়ও দেখিলাম। ইহার পূর্ব্বে একদিনও আকাশ মেঘমুক্ত ছিল না।

একটা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। মানুষ যেমন আমাদের দেশে শ্যাম ও য়ুরোপে গৌর; সি-গাল পক্ষীও সেইরূপ! আরব সাগরে যেগুলি দেখা যায় সেগুলি একেবারে ধূসর বর্ণ, ক্রমে সাদা হইয়া ইংলিশ চ্যানেলে দেখি, একেবারেই সাদা, কেবল ডানার একটু একটু ধূসর আভা।

পোর্ট সৈয়দ পার হইবার পর দিন সমুদ্র আবার বড় চঞ্চল হইয়াছিল। অনেকে পুনরায় অসুস্থ হইয়া পড়েন।

তাহার পর দিন বৈকালে মেসিনা প্রণালী পার হইলাম। বড় সুন্দর দৃশ্য। ইতালির দিকে গ্রামগুলি বড় সুন্দর। পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট সাদা সাদা গ্রাম দেখা যায়। মাঝে মাঝে নদী আসিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। গ্রামের লোকও দেখা যায়। ট্রেণ চলিতেছে, কখনও সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিতেছে, দেখিতে চমৎকার। সিসিলির দিকে মেসিনার ভয়ঙ্কর ভূকম্পের চিহ্ন স্পষ্ট বুঝা যায়। অনেক সংস্কার হইয়াছে, এখনও সংস্কার চলিতেছে, তবে ধ্বংশাবশেষও অনেক।

প্রণালীটা খুব সরু; বোধ হয় ২৫০ গজ হইবে। জল খুব চক্‌চকে—পরিষ্কার। আর অনেক আবর্ত্ত ও ঢেউ নানা রকমের। এই সময় আবার একরাশ শুশুক আমাদের জাহাজের পার্শ্বে পার্শ্বে জাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়া প্রায় এক মাইল গেল। বড়ই চমৎকার দৃশ্য।

রাত্রিকালে নিপারী দ্বীপপুঞ্জ পার হইলাম। বিশেষ কিছু দেখা গেল না লোকের বসতি অতি সামান্য বলিয়া মনে হইল।

জাহাজে আমরা জনদশেক বাঙ্গালী ব্যতীত আরও ৩০।৪০ জন ভারতবর্ষীয় ছিলেন, অধিকাংশই পঞ্চনদবাসী। ইঁহাদের মধ্যে একজন একদিন ধুতি পরিয়া গেঞ্জি গায় দিয়া ডেকে উপস্থিত। তথায় মহিলারা পলায়নপরা,

য়ুরোপীয়গণ "মারমুখো"। অনেক কষ্টে ভদ্রলোকটিকে নিয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

মেসিনা পার হইবার পর একজন হিন্দুস্থানী যুবক বলিলেন যে, তাঁহার নিকট গড়গড়া ও তামাক আছে। বাহির করিয়া তামাক সাজিয়া ধূমপান করা গেল। কলিকাতা ছাড়িবার পর এই প্রথম ধূমপান যে কত ভাল লাগিয়াছিল তাহা ওই পথের পথিকরাই বুঝিবেন।

২১শে বেলা ২॥০ টার সময় মার্শেল বন্দরের বাহিরে জাহাজ থামিল। সমুদ্র তখনও বিরূপ, বন্দরে যাওয়া গেল না। শেষবার তামাক টানিয়া লইলাম। এই নামি এই নামি করিয়া সন্ধ্যা ৬॥০ টায় নৌকায় নামাইয়া দিল। জেটীতে পৌঁছিতে ঠিক ৭টা বাজিল। তথায় কিং কোম্পানীর লোক আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন; চিঠিপত্র দিয়া, জিনিষগুলি Customs পার করিয়া ষ্টেসনে লইয়া গেলেন। তথায় বাড়ীতে টেলিগ্রাম করিলাম। তাহার পর আমাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া লোকটি বিদায় হইলেন।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু।

সন্ধ্যা ও কুসুম।

কহিল সোণালী সন্ধ্যা, চাহি ফুলবনে—
"প্রেমোন্মত্ত কুসুমের নাহি কোন জ্ঞান,
কোন্ প্রভাতের পর আসিবে ভ্রমর—
এখনি উঠিল ফুটি করিতে ধেয়ান!"
শ্যামশষ্প আড়ে পুষ্প আনন আবরি'
আধ লাজে আধ হাসে ধীরে ধীরে কয়,—
"কি বুঝিবে সন্ধ্যা তুমি প্রেম-পুণ্য-কথা ?
প্রেম জীবনের ভুল—জ্ঞান হরি' লয়।"

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

সমুদ্রবক্ষে।

—:*:—

(গী দে মোপাঁসা)

—০—

[এই পুস্তকখানি দৈনিক লিপির সমষ্টিমাত্র। ইহাতে কোন গল্প বা লোমহর্ষক ঘটনার কথা নাই। গত বসন্তে ভূমধ্যসাগরের উপকুলসান্নিধ্যে নৌবিহারকালে আমি প্রত্যহ যাহা দেখিতাম বা যে সকল বিষয় চিন্তা করিতাম তাহা সমস্তই অবসর-বিনোদনার্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। সূর্য্য, মেঘমালা, পাহাড় এবং সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি ইহাই কেবল আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত আমার বর্ণনার সামগ্রী আর কিছুই নাই। আমার চিন্তার বিষয়ও অকিঞ্চিৎকর, বস্তুতঃ সেগুলি সমুদ্রতরঙ্গের তন্দ্রা উৎপাদনকারী আন্দোলনপ্রসূত।]

৬ই এপ্রিল।

আমি গভীর নিদ্রামগ্ন ছিলাম, আমার পোতাধ্যক্ষ বার্ণার্ড বাতায়নে এক মুষ্টি বালুকা নিক্ষেপ করিয়া আমাকে জাগরিত করিল। আমি বাতায়ন উন্মুক্ত করিলাম। মুখমণ্ডলে, বক্ষোদেশে নিশীথ বায়ুর শীতল স্পর্শ অনুভব করিয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আমার হৃদয় মগ্ন হইল। আকাশ নীলাভ ধূসরবর্ণ; নক্ষত্রপুঞ্জ কম্পমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপশিখার ন্যায় সর্ব্বত্র ঝিকিমিকি করিতেছে। প্রাচীরের প্রান্তভাগে একজন নাবিক দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল,—"মহাশয়, আজ আকাশ বেশ-পরিষ্কার," আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। "বাতাসের গতি কোন্ দিকে ?" সে বলিল, "উপকূল-বিমুখে"। আমি কহিলাম, "আচ্ছা, আসিতেছি"।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে আমি দ্রুতপদে সমুদ্রতীরে যাইতেছিলাম, দিক্‌চক্রবাল ঊষার রক্তিমচ্ছটায় উদ্ভাসিত। আমি দেআঙ্গে উপসাগরের পশ্চাদ্‌ভাগে নাইস নগরীর আলোকমালা এবং বহুদূরে ভিনাক্রঁসের আলোকস্তম্ভের ঘূর্ণ্যমান দীপাধার দেখিতে পাইলাম। অপগতপ্রায় অন্ধকারের ভিতর দিয়া চূড়াকৃতি অন্তীবস নগরী সম্মুখে স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল। সহরটি সমুচ্চ বুরুজে সুশোভিত।

রাস্তায় কেবলমাত্র দুই একটা কুকুর বিচরণ করিতেছিল এবং জনকয়েক মজুর তাহাদের দৈনিক কার্য্যারম্ভের উদ্দেশে আপন আপন কর্ম্মস্থলে যাইতেছিল। বন্দরে তটনিবদ্ধ নৌকাগুলির ঈষৎ আন্দোলন এবং স্থিরপ্রায় জলরাশির মৃদুমন্দ কল্লোলধ্বনি শুনা যাইতেছিল। মধ্যে মধ্যে নৌকার সহিত হালের সংঘর্ষণের শব্দ ও রজ্জুতে টান পড়ায় রশারশির বিচিত্র ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শুনা যাইতেছিল। বন্দরস্থ পোতশ্রেণী, প্রস্তরাচ্ছাদিত সমুদ্রতট এমন কি চির-বিক্ষুব্ধ মহাসিন্ধুও যেন সেই সুবর্ণখচিত আকাশের তলে ঘুমাইতেছে বলিয়া বোধ হইল। জেটীর প্রান্তভাগে একটি ক্ষুদ্রায়তন আলোকস্তম্ভ; যেন সতর্ক প্রহরীর ন্যায় এই ক্ষুদ্র বন্দরটির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত।

কিয়দ্দূরে অর্দ্রীনের পোত-নির্ম্মাণের কারখানার সন্নিকটে ব্যস্ততার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। আমি দূর হইতে একটি স্তিমিতপ্রায় আলোক দেখিতে পাইলাম ও কথাবার্ত্তার শব্দ শুনিতে পাইলাম; বুঝিতে পারিলাম, তাহারা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমার ক্ষুদ্র অর্ণবপোত 'বেলামী' যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিল। আমি পোতকক্ষে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে দুইটি বর্ত্তিকা জ্বলিতেছিল। দোদুল্যমান বর্ত্তিকাধার এরূপ কৌশলের সহিত রক্ষিত হইয়াছে যে, জাহাজ আন্দোলিত হইলেও সহসা কেন্দ্রচ্যুত হয় না। আমি নাবিকগণের চর্ম্মনির্ম্মিত অঙ্গরাখা পরিধানান্তর একটি গরম টুপিতে মস্তক আবৃত করিয়া পাটাতনের উপর ফিরিয়া আসিলাম। জাহাজের দড়িদড়া ইতোমধ্যে খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং দুইজন নাবিক নোঙ্গর উত্তোলনে নিযুক্ত ছিল। তাহার পর তাহারা দড়িদড়া টানাটানি করিয়া কপিকলে একঘেয়ে শব্দ করিয়া জাহাজের প্রকাণ্ড পাইলটি তুলিয়া দিল। এই ঈষৎ কম্পমান বস্ত্রখণ্ডের পাণ্ডুর বিস্তৃতি সমস্ত আকাশ ও তারাগুলিকে যেন আবৃত করিয়া ফেলিল! অদৃশ্যপ্রায় পর্ব্বতশ্রেণী হইতে শীতল বায়ু আসিয়া জানাইয়া দিল যে, পর্ব্বতশিখর তখনও সম্পূর্ণরূপে তুষার-মুক্ত হয় নাই। বাতাস বড় ধীরে বহিতেছিল, এবং মধ্যে মধ্যে একেবারে বন্ধ হইয়া যাইতেছিল; বোধ হইতেছিল, যেন বায়ুদেবতা তখনও ঘুমাইয়া আছেন, শয্যাত্যাগ করিয়া আপন কার্য্যে মনঃসংযোগ করেন নাই।

নাবিকরা নোঙ্গর উত্তোলন করিল। আমি হাল ধরিয়া বসিলাম এবং তরীখানি প্রকাণ্ড প্রেতমূর্ত্তির ন্যায় অনায়াসে নিস্তব্ধ জলরাশির উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। বন্দর হইতে বাহির হইবার জন্য আমাদিগকে

বিভিন্ন জাতীয় নিদ্রামগ্ন পোতশ্রেণীর মধ্য দিয়া সন্তর্পণে জাহাজখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইল। আমরা বন্দরের এক পোস্তা হইতে আর এক পোস্তায় ঘুরিয়া যাইতেছিলাম। তরীখানির পশ্চাতে একখানি ডিঙ্গি বা জালিবোট বান্ধা। সদ্যোজাত হংসশাবক যেরূপ জলক্রীড়াকালে মাতার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে, ডিঙ্গিখানিও সেইরূপ আমাদের জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। আমরা যখন জেটী ও সমুদ্রতীরস্থিত চতুরস্র দুর্গের মধ্যবর্ত্তী অল্প-পরিসর সাগরে আসিয়া পড়িলাম তখন তরীখানি যেন অধিকতর সজীব ও চঞ্চল হইয়া উঠিল; বন্দরের বদ্ধজল অতিক্রম করিয়া সমুদ্রের সজীব স্পর্শে আমার ক্ষুদ্রকায় অর্ণবপোত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালার উপর নাচিয়া নাচিয়া রঙ্গেভঙ্গে চলিতে লাগিল; যেন সে সহসা কোনও কারণে আনন্দে অধীর হইয়া পড়িয়াছে। তখন তুফানের চিহ্নমাত্র ছিল না। আমি নগর-প্রাচীর ও পঞ্চশত ফাঙ্ক নামধেয় সমুদ্রের গভীরতা পরিচায়ক ভাসমান বয়ার মধ্যবর্ত্তী জলপথে আমাদের তরীর গতি নির্দ্দেশ করিলাম। বাতাস পশ্চাদ্দিক হইতে বহিতে থাকায় আমরা পাইলের সাহায্যে সম্মুখস্থ অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া যাইতে লাগিলাম। তখন উদয়াচলে উষার আবির্ভাব সূচিত হইতেছিল। তারাগুলি একে একে নিবিয়া গেল এবং ভিনাক্রাসের আলোস্তম্ভ তাহার ঘূর্ণ্যমান চক্ষুটি সে দিনকার মত মুদিত করিল। আমি এতাবৎ অদৃশ্য নাইস নগরীর উপরিভাগে নভোমণ্ডল গোলাপী আভায় রঞ্জিত হইয়াছে, দেখিতে পাইলাম। আল্পস্‌পর্ব্বতশ্রেণীর তুষারনদীনিচয় অরুণালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমি বার্ণার্ডকে হাইল ছাড়িয়া দিয়া নিবিষ্টমনে সূর্য্যোদয় দেখিতে লাগিলাম। বায়ুর বেগ-বৃদ্ধি হওয়ায় আমাদের তরীখানি ধূমলাভ সমুদ্রবক্ষ যেন ভালরূপ স্পর্শ না করিয়াই প্লুত গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। উপর্য্যুপরি তিনবার এঞ্জেলাসের ঘণ্টানিনাদ বায়ুরাশি আন্দোলিত করিয়া দিল। কি জানি কেন রাত্রি অপেক্ষা প্রভাতে ঘণ্টাধ্বনি অধিকতর আনন্দপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। স্নিগ্ধ উষাকাল আমার নিকট বড়ই প্রীতিকর! মানব তখনও সুষুপ্তিমগ্ন কিন্তু প্রকৃতি সতী নিশীথ নিদ্রার জড়তা পরিত্যাগ করিয়াছেন। বায়ুমণ্ডলের অলৌকিক পুলকস্পন্দন অনুভূত হয়। যাঁহারা বিলম্বে শয্যাত্যাগ করেন তাঁহাদের সে সুখের কখনও উপলব্ধি হয় না। আমি তখন শুধু শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করিয়া ক্ষান্ত থাকি না; আমি সেই নির্ম্মল বায়ু সানন্দে পান করি। আমি প্রতিপ্রভাতে জড়জীবনের

পুনরাবর্ত্তন দেখিতে পাই। যে শক্তির দ্বারা গ্রহতারকা উজ্জীবিত, ইহা সেই জীবনীশক্তি—মানব সমাজের সেই চিরন্তন অনুভূতির রহস্য।

রেমণ্ড বলিল "এবার বাতাস পূর্ব্ব হইতে বহিবে।" বার্ণার্ড বলিল "না পশ্চিম হইতে।" পোতাধ্যক্ষ বার্ণার্ড কৃশকায় কর্ম্মঠ ও অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। লোকটি বড় হিসাবী ও সাবধান। তাহার শ্মশ্রুরাজী আচক্ষু বিস্তৃত কিন্তু তাহার দৃষ্টি সরল এবং কণ্ঠস্বর কোমল ও স্নেহপূর্ণ। বস্তুতঃ এরূপ বিশ্বাসী লোক সহসা দেখা যায় না। কিন্তু সমুদ্রবক্ষে সে সামান্য কারণেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। সমুদ্রবাত্যাসূচক তুফান, ইষ্টেরণ পর্ব্বতের শিরোদেশে প্রবল পশ্চিমবাতাস-পরিচায়ক লম্বমান মেঘমালা বা পূর্ব্ব হইতে দমকা বাতাসের আবির্ভাবজ্ঞাপক বায়ুমান যন্ত্রের উর্দ্ধগামী পারদস্তম্ভ ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি তাহায় উৎকণ্ঠার ও অধৈর্য্যের কারণ হইয়া পড়ে।

সে যাহা হউক, বার্ণার্ড সুদক্ষ নাবিক, সর্ব্বদা পরিদর্শনকার্য্যে নিরত এবং অতীব পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়। সে জাহাজের পিত্তলাংশে জলবিন্দুমাত্র পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহা মুছিয়া না ফেলিয়া ক্ষান্ত হয় না।

বার্ণার্ডশ্যালক রেমণ্ড বলিষ্ঠকায় পুরুষ। তাহার বর্ণ কিঞ্চিৎ মলিন এবং বদনমণ্ডল গুম্ফস্মশোভিত। সাহসে, প্রভুপরায়ণতায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে সে বার্ণাডের সমকক্ষ, কিন্তু ভগিনীপতির ন্যায় সে অস্থিরমতি নহে এবং সহজে ভীত হইয়া পড়ে না। সমুদ্রের আকস্মিক বিশ্বাসঘাতকতায় সে অধিকতর অভ্যস্ত।

বার্ণার্ড, রেমণ্ড ও বায়ুমান যন্ত্র এই তিনে প্রায়ই বিরোধ উপস্থিত হইয়া এক অপূর্ব্ব কৌতুক নাট্যের অভিনয় হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে বিজ্ঞতম অভিনেতাটি বাক্‌শক্তি-বিরহিত।

নাবিক-সুলভ শপথবাক্য উচ্চারণ করিয়া রেমণ্ড বলিল,—"মহাশয়! আমাদের জাহাজখানি বেশ চলিতেছে।" 'আমরা ইতোমধ্যে লে সালেশ উপসাগর এবং লে গেরূপ অতিক্রম করিয়া জলপৃষ্ঠের সহিত সমতল গ্রো নামক অবন্ধুর প্রস্তরময় অন্তরীপের নিকটবর্ত্তী হইতেছিলাম। এখন সমগ্র আল্পস্ পর্ব্বতশ্রেণী আমাদের নয়নপথে পতিত হইল। দেখিয়া মনে হইল, যেন প্রস্তরীভূত বিপুলকায় তরঙ্গরাশি সাগর গ্রাসে সমুদ্যত। তুষারমণ্ডিত চূড়াগুলি বাস্তবিকই ঘনীভূত শ্বেতবর্ণ ফেনপুঞ্জের ন্যায় মনে হয়। পশ্চাদ্ভাগে

দিবাকর এই তুষাররাশির উপর তাঁহার রজতশুভ্র অমল আলোক বিকীর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে আকাশমার্গে আরোহণ করিতেছিলেন।

অন্তরীপ বেষ্টন করিবামাত্র আমরা লেরিন্‌স দ্বীপপুঞ্জ দেখিতে পাইলাম এবং তৎপশ্চাতে কিয়দ্দূরে এষ্টেরেল পর্ব্বতমালার কুটিল বাহু রেখা প্রতিভাত হইতে লাগিল। এষ্টেরেল পর্ব্বতটিকে ক্যানে রঙ্গমঞ্চের চিত্রশালা বলা যাইতে পারে। বর্ণ ঈষৎ নীলাভ, ক্রীড়া-শৈলের ন্যায় সুন্দর ও সুঠাম গঠনভঙ্গি যেন বিলাস-রসিকার হাবভাব-পরিচায়ক। ইংরাজ মহিলা চিত্রকারিণীদিগের প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনে আদর্শরূপে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া বা অলস ও যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত রাজন্যবর্গের প্রশংসার জন্যই যেন বিশ্বনির্ম্মাতা খোসমেজাজে এই পর্ব্বতের গগন-চন্দ্রাতপটি নাট্যশালার সৌসাদৃশ্যে বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন।

প্রতি ঘটিকায় এষ্টেরেল নিপুণা নটীর ন্যায় বেশ ও আকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া অভিজাতবংশীয় দর্শকগণের নয়নরঞ্জন করিয়া থাকে।

দিবাগমে শৈলশ্রেণীর একখানি বিশুদ্ধ চিত্র সুনীল আকাশপটে সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠে। সেই পেলব নির্ম্মল নীলিমা দক্ষিণ দেশীয় আকাশবর্ণের আদর্শ-স্বরূপ। সায়াহ্নে শ্যামায়মান বনরাজী অগ্নিময় গগনতলে খণ্ডীকৃত অন্ধকার-রাশি বলিয়া মনে হয়। সেরূপ জবাকুসুমসন্নিভ বিচিত্র রক্তিমাভা নভোমণ্ডলে কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমি অন্যত্র এরূপ স্বপ্নরাজ্যসুলভ মনোহর সূর্য্যাস্ত-সুষমা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যেন সমগ্র দিঙ্মণ্ডল অগ্নিশিখা-পরিব্যাপ্ত।

মেঘমালার ঈদৃশ মধুর দীপ্তি, এরূপ নিপুণ বর্ণসমাবেশ, প্রাকৃতিক বৈভব-প্রাচুর্য্যের এরূপ দৈনিক পুনর্ব্বিকাশ স্বতঃই মনে বিস্ময়ের ও প্রীতির উদ্রেক করে। কিন্তু এই চিত্র মনুষ্য-তুলিকা-সম্ভূত হইলে হাস্যকর বলিয়া বিবেচিত হইত, সন্দেহ নাই।

লেরিন্‌স দ্বীপপুঞ্জ ক্যানে উপসাগরের পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত এবং ক্যানে ও জুয়ান উপসাগরের মধ্যবর্ত্তী। দ্বীপ দুইটি নাট্যশালার দৃশ্যপটে অঙ্কিত কৃত্রিম দ্বীপের ন্যায় মনোমুগ্ধকর; যেন রোগী ও শীত-প্রবাসীদিগের চিত্তবিনোদনার্থ তথায় স্থাপিত হইয়াছে।

তৎকালে আমাদের অর্ণবপোত যে স্থানে ছিল সেই উন্মুক্ত সাগরবক্ষ হইতে দর্শন করিলে দ্বীপদ্বয় সমুদ্রোত্থিত গাঢ় হরিদ্বর্ণ উদ্যান বলিয়া প্রতীত হয়।

সেণ্ট হনরাটের শেষ প্রান্তে বেলাভূমি-প্রভঙ্গ তরঙ্গরাশি-বিধৌত একটি প্রাচীন দুর্গের বিচিত্র ধ্বংশাবশেষ রহিয়াছে। দেখিলে স্কটের বর্ণিত দুর্গগুলির কথা মনে পড়ে; প্রাচীরসমূহ সমুদ্রের বীচিমালা ভেদ করিয়া এখনও ঋজুভাবে দণ্ডায়মান। পুরাকালে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসিগণ স্যারাসেন নামে অভিহিত মুসলমান আততায়ীদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ এই দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ফরাসী বিদ্রোহের সময় ব্যতিরেকে সেণ্ট হনরাট চিরকালই খৃষ্টীয় সন্ন্যাসিগণের অধিকারভুক্ত ছিল। উক্ত বিপ্লবকালে জাতীয় নাট্যালয়ের জনৈক অভিনেত্রী এই দ্বীপটি ক্রয় করিয়া লয়।

সেই দুর্ভেদ্য দুর্গ, সন্ন্যাসী যোদ্ধৃমণ্ডলী, বনাঙ্গ নীলগিরিমালাবেষ্টিত দ্বীপখণ্ডের নিবিড় তরুগুল্মান্তরালে প্রণয়াভিলাষিণী নায়িকার গোপনাভিসার এ সমস্তই যেন অপূর্ব্বভাবপ্রণোদক, সুন্দরী-সুলভ চাপল্য-ব্যঞ্জককাব্যকথার ও কাহিনীর সুখস্মৃতি-বিজড়িত। কিন্তু ক্যানে উপকূলের সান্নিধ্যবশতঃ উহা সেরূপ চিত্তাকর্ষক বলিয়া মনে হয় না।

সেণ্ট হনরাটের প্রান্তভাগে বপ্রশোভিত একটি প্রাচীন দুর্গ আছে। ঋজুসমুত্থিত, লঘুকায় সৌধশিখরস্থিত সেই দুর্গটির সহিত যেন সমঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্যই সেণ্টমার্গারেট দ্বীপের শেষভাগে অপর একটি স্থলাভিমুখ কেল্লা অবস্থিত। এই বিখ্যাত দুর্গকারায় Bazaine এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেই "লৌহমুখাবরণ বিশিষ্ট ব্যক্তি"—(man with the iron mask) অবরুদ্ধ ছিলেন।

প্রায় অর্দ্ধক্রোশ বিস্তৃত একটি সমুদ্র-প্রণালী এই কেল্লা ও ক্রোইজেট অন্তরীপের মধ্যভাগে অবস্থিত। কেল্লাটি আড়ম্বরশূন্য ও বিশেষত্ববর্জ্জিত; দেখিলে একটি অনুচ্চ ও অনতিপ্রশস্ত প্রাচীন গৃহ বলিয়া মনে হয়। ইহা স্বতঃই অবসাদ আনয়ন করে; দেখিলে মনে হয়, যেন একটি আক্রমণোন্মুখ ধূর্ত্ত শ্বাপদ ভূমির উপর বসিয়া আছে। বাস্তবিকই এই কারাগৃহটি যেন কয়েদিধরা ফাঁদবিশেষ।

এখন তিনটি উপসাগরই আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে। সম্মুখে দ্বীপপুঞ্জের অগ্রভাগে ক্যানে উপসাগর—তদপেক্ষা অধিকতর সন্নিকটে জুয়ান উপসাগর এবং তৎপশ্চাতে উর্দ্ধোত্থিত তুষারকিরীটী আল্পস্‌শ্রেণীসীমাবদ্ধ ডেস্ আন্‌জেস উপসাগর। দূরে—অতি দূরে ইতালী-সীমান্ত অতিক্রম করিয়াও

অবিচ্ছিন্ন লম্বমান উপকূলরেখা নয়নগোচর হইতেছে। আমি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে একটি উচ্চান্তরীপের অন্তভাগে অবস্থিত বর্ডিঘেরার শ্বেত হর্ম্ম্যশ্রেণী দেখিতে পাইতেছি।

সেই সীমাবিহীন উপকূলে সমুদ্রতীরস্থ নগরীসমূহ, পর্ব্বতক্রোড়ে নিষণ্ণ পল্লীসমুদায়, হরিৎশোভা—বৃক্ষবল্লরীবেষ্টিত উপবন গৃহনিচয়—দেখিলে মনে হয় যেন অতিকায় পক্ষিবৃন্দ উর্দ্ধাবস্থিত তুষার ক্ষেত্র হইতে নিশাযোগে অবতরণ করিয়া সমুদ্রসৈকতে দেবদারু-বনে কঙ্করাকীর্ণ পর্ব্বতবক্ষে,—সর্ব্বত্রই অগণ্য শ্বেত অণ্ড প্রসব করিয়া রাখিয়াছে।*

অ্যাণ্টিবস্ অন্তরীপও অনেকগুলি উদ্যান বাটিকায় পরিশোভিত। সমুদ্র-দ্বয়মধ্যস্থ এই লম্বমান ভূখণ্ডের উদ্ধতাংশে যেন এক অত্যাশ্চর্য্য উদ্যান প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এস্থানে য়ুরোপ মহাদেশের যাবতীয় নয়নাভিরাম কুসুমনিকর প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। অন্তরীপের অগ্রভাগে খাম-খেয়ালি ধরণে নির্ম্মিত একটি আবাস গৃহ। এই হর্ম্ম্যের আকৃতিগত মৌলিকতায় আকৃষ্ট হইয়া ক্যানে ও নাইস নগরী হইতে বহুসংখ্যক দর্শক আসিয়া থাকে।

বাতাস থামিয়াছে। পোতের গতি এখন রুদ্ধপ্রায়, নিশাব্যাপী স্থলবায়ুর স্থৈর্য্যাবলম্বনে আমরা এক দমকা সমুদ্র হাওয়ার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতে-ছিলাম, উহা যে কোনও দিক্ হইতে প্রবাহিত হউক না কেন আমাদের নিকট সাদরে অভ্যর্থিত হইত সন্দেহ নাই।

বার্ণাডের এখনও বিশ্বাস যে, "পশ্চিমে বাতাস" বহিবে। রেমণ্ডের "পূবে হাওয়ায়" সমধিক আস্থা। আর বায়ুমান যন্ত্রের পারদরেখা বট্ সপ্ততি ডিগ্রি (বিভাগ) অতিক্রম করিয়াই নিশ্চলভাবে অবস্থিত।

এক্ষণে মরীচিমালীর দীপ্ত কিরণজালে ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। শুভ্র-বর্ণ গৃহপ্রাচীরসমূহ ইতস্ততঃ স্ফুরৎপ্রভ হিমানীপুঞ্জের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে-ছিল। বিচ্ছুরিত আলোক-সম্পাতে সমুদ্র-জলরাশি যেন নীলাভ অনুলেপনে অনুলিপ্ত। ক্রমে ক্রমে আমরা লেশমাত্র বায়ুর সাহায্যে অন্তরীপের শেষসীমা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলাম। গন্ধবহের মৃদুল আশ্লেষ অঙ্গে অনুভূত হইতে ছিল না বটে; কিন্তু তৎসাহায্যে যে কোনও ক্ষিপ্রগামী সুসজ্জিত তরণী সেই নিস্তব্ধ জলরাশি ভেদ করিয়া অনায়াসেই মৃদুগতিতে অগ্রসর হইতে পারে।

* পাঠক, আরব্য উপন্যাসবর্ণিত রকপক্ষীর ডিম্বের কথা স্মরণ করুন।

সমগ্র জুয়ান উপসাগর ও তন্মধ্যবর্ত্তী নৌসেনার বহর ঠিক আমাদের সম্মুখভাগে বিস্তৃত রহিয়াছে। দূর হইতে লৌহময় যুদ্ধপোতগুলি শুষ্কতরু-বেষ্টিত পাহাড়, দ্বীপ বা শিলা সমুচ্চয় বলিয়া ভ্রমোৎপাদন করে।

ক্যানে ও জুয়ান নগরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রতীরের উপকূলাংশের অনুমার্গে ধাবমান বাষ্পীয় শকটোদ্গারিত ধূমরাশি দেখা যাইতেছিল। উপকূলসন্নিহিত প্রদেশমধ্যে এই স্থানটিই বোধ হয় ভবিষ্যতে সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম হইয়া উঠিবে।

চারি দিক্ নিস্তব্ধ। দক্ষিণাঞ্চলের এই নীরব প্রান্তে মধুঋতুর সুখোষ্ণ কোমল আশ্লেষ হৃদয়ে পুলকসঞ্চার করিতেছিল।

এই অল্প সময়ের মধ্যেই আমার বোধ হইতেছিল, যেন সদাব্যস্ত বাক্য-বহুল সংসারক্ষেত্র হইতে আমি বহু দিন—বহু বৎসর আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছি; নিভৃত বাসের অপূর্ব্ব মাদকতায় আমি ক্রমে ক্রমে আবিষ্ট হইয়া-পড়িতেছি। কোন আকস্মিক বিশৃঙ্খলতা আমার এই নিরবচ্ছিন্ন মধুর বিশ্রামে অতর্কিত বিঘ্ন উৎপাদন করিবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই।

শ্বেত বর্ণের ডাকের চিঠি বা নীল বর্ণের তারের খবর বা সাক্ষাৎ-প্রয়াসী বন্ধুবর্গের দ্বারদেশে ঘণ্টাধ্বনি বা আমার পালিত কুক্কুরের চীৎকারশব্দ এই কয়দিন আর কিছুতেই আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে পারিবে না। এখন আর কেহ আমাকে ডাকিয়া পাঠাইবে না—নিমন্ত্রণ করিবে না বা আমার অনিচ্ছা সত্বেও আমাকে লইয়া যাইবে না। আর আমাকে শিষ্ট হাসিতে প্রপীড়িত বা ভদ্রতায় ভারাক্রান্ত হইতে হইবে না। আমি আমার পক্ষবিশিষ্ট দোদুল্যমান গৃহে সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া চলিয়াছি। আমার বাতবস্ত্রশোভিত জাহাজখানি পক্ষিনীর ন্যায় সুন্দর, পক্ষিনীড়ের ন্যায় ক্ষুদ্র এবং প্রলম্বিত, সৌশয্যাপেক্ষাও কোমল ও আরামপ্রদ। বায়ুর ইচ্ছামত সেই অনন্ত জল-রাশির উপর যথাতথা বিচরণ করিতেছি। এখন আমি সম্পূর্ণরূপে নিরালম্ব ও নিরঙ্কুশ। নৌচালনার ও আমার পরিচর্য্যার জন্য আজ্ঞাবহ দুই জন নাবিক সর্ব্বদা উপস্থিত রহিয়াছে। আমি যে পরিমাণ পুস্তক ও আহার্য্য সামগ্রী আনাইয়াছি, তাহাতে দুই সপ্তাহ নির্ব্বিবাদে কাটিয়া যাইবে। চতুর্দ্দশ দিবস—বৃথা বাক্য অপচয় করিতে হইবে না। কি আনন্দের কথা!

শ্রীগুরুদাস সরকার।

কায়া ও ছায়া।*

(১)

এই পরিবর্ত্তনশীল ও বৈচিত্র্যময় জগৎ দুইটি স্বতন্ত্র জগতের সমষ্টি; একটি কায়া,—অপরটি ছায়া। দুইটিই বিচিত্র, দুইটিই সম্পূর্ণ, দুইটিই আশ্চর্য্য, দুইটিই সুন্দর। জগৎকে দেখিতে হইলে, জগৎকে বুঝিতে হইলে এই দুইটি স্বতন্ত্র জগৎকে দেখিতে হইবে ও বুঝিতে হইবে। ইহার কোনটিকে বাদ দিলে সমগ্র জগৎকে দেখা হয় না। কি বিশাল, কি ক্ষুদ্র প্রকৃতির প্রতি পদার্থই এই দুইটি জগতের সমবায়ে সৃষ্ট। একটি বৃক্ষকে দেখিতে হইলে শুধু তাহার বিশালতা বা প্রকাণ্ড কাণ্ডটি দেখিলেই চলিবে না;—সেই বৃক্ষের ছায়াস্বরূপ তাহার ফুল ও তজ্জাত ছায়াটিকেও দেখিতে হইবে। সেইরূপ একটি ফুল্ল ফুলকে বুঝিতে হইলে, তাহার পলাশগুলি গণিলেই হইবে না;—তাহার কোমলতা, তাহার সৌন্দর্য্য, তাহার সৌরভ ও তজ্জাত ফলটিকেও বুঝিতে হইবে। একটি রমণীকে জানিতে হইলে, তাঁহার যত্নশোভিত দেহলতা ও তাঁহার আকার দেখিলেই হইবে না;—তদীয় ছায়াস্বরূপ তাঁহার গুণগ্রাম ও তাঁহার অঙ্কস্থ শিশুটিকেও জানিতে হইবে। প্রকৃতির প্রতি পদার্থেই এইরূপ; সুতরাং জগতের যে কোন জিনিসই দেখি না কেন,—যে দুইটি পৃথক্ জগতের সমবায়ে তাহাদের সৃষ্টি,—সেই দুইটিকে বুঝিলেই জিনিসটিকে বুঝা হইবে।

এই দুইটি জগৎ—কায়া ও ছায়া,—স্বতন্ত্র হইলেও প্রথমতঃ এক হইয়া থাকে। ভাল করিয়া না দেখিলে মনে হয়—দুইটি নহে,—একটি,—এমনই ওতপ্রোতভাবে একটি আর একটির ভিতর নিহিত হইয়া থাকে। কায়ার ভিতর থাকে ছায়া। দুইটি জগৎ স্বতন্ত্র হইলেও আংশিকভাবে একটি অপরটির উপর নির্ভর করে। কায়া ও ছায়া—দুইটী লইয়া পদার্থ। ফুল শুধু তাহার আকার লইয়া নহে;—তাহার ছায়া—তাহার সৌরভ ও ফল প্রথমে তাহারই ভিতর নিহিত থাকে; সময়ে তাহারা আত্মপ্রকাশ করে। ফুলটি কুঁড়ি হইতে যখন "ফুট ফুট" হইয়া ফুটিয়া উঠে, তখনই তাহার ছায়া—তাহার সৌরভ দশ দিক আমোদিত করে। আবার আরও একটু ফুটিয়া উঠিয়া সে আপনার অস্তিত্বকে স্থায়ী করিবার জন্য প্রধান ছায়া ফলকে প্রসব করে। সেইরূপ

* 'চুঁচুড়া হিন্দু-সমিতি'র অধিবেশনে পঠিত।

একটি বৃক্ষের ভিতর তাহার ছায়াস্বরূপ ফুল ও ছায়া (shadow) নিহিত থাকে। প্রথমতঃ ছায়া কায়ার উপর আংশিকভাবে নির্ভর করিলেও দুইটি বস্তুতঃ স্বতন্ত্র। নিদাঘের মধ্যাহ্নকালে যখন আকাশে প্রখর রবি, পৃথিবী সূর্য্যের শুভ্র আলোকে আলোকময়, তখন পথের ধারে একটি বৃক্ষের ছায়ায় গিয়া বসিও, নিশ্চয় মনে হইবে যে, যে স্থান ব্যাপিয়া সেই ছায়া—সে একটি স্বতন্ত্র স্থান, সেই ছায়া-রেখার পরেই একটি স্বতন্ত্র স্থান, একটি স্বতন্ত্র জগৎ। যখন মনের মধ্যে একটি আলোড়ন, একটি বিপ্লব উপস্থিত হইবে, যখন খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে কিছুই ভাল লাগিবে না, তখন বৃক্ষের ছায়ায় গিয়া বসিও,—ভাল লাগিতেও পারে, নাও লাগিতে পারে; কিন্তু সেই বৃক্ষেরই একটি ফুল হাতে লইয়া দেখিও, তাহার "সকল জ্বালা জুড়ানো" সৌরভ গ্রহণ করিও;—মনের সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়া যাইবে, সমস্ত কালিমা মুছিয়া যাইবে। তাই বলিতেছিলাম,—কায়া ও ছায়া দুইটি স্বতন্ত্র জগৎ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কায়ার ভিতর থাকে ছায়া এবং কায়া ছায়াকে প্রসব করে। কায়া তাহার আকার ও তাহার দেহ লইয়া স্বতন্ত্র হইলেও, ছায়ার জননী বলিয়া তাহার গৌরব। ফুল যদি সৌরভের ও ফলের প্রসূতি না হইত, তাহা হইলে তাহার এত আদর হইত না। ক্ষণকালের জন্য একটি সৌরভহীন পুষ্পের পলাশগুলি, তাহার বর্ণটুকু ও তাহার আকারটি দেখিতে পারি;—অধিকক্ষণ কি তাহা ভাল লাগে? কিন্তু একটি সুরভি কুসুমকে কাহারও কখনও মন্দ লাগিয়াছে কি? সে ফুলটিকে কত যত্ন করি, কত মূল্যবান বলিয়া মনে করি। কিন্তু সৌরভহীন ফুলটিকে হীন বলিয়া ত্যাগ করিয়া থাকি। ছায়ার জননী নহে বলিয়াই তাহার প্রতি মানবের এইরূপ অনাদর। সকল বিষয়েই এইরূপ দেখিতে পাই। যে পুরুষের গুণ নাই, বিদ্যা নাই, কীর্ত্তি নাই, যশঃ নাই,—তাহাকে কি কেহ সম্মান করে? যে নারীর গুণ নাই এবং যে নারী ছায়া বা সন্তানপ্রসূতি নহেন, তাঁহাকে কি কেহ আদর যত্ন করিয়া থাকে? তাহা করে না। কিন্তু হিন্দুর ঘরে নববধূর আদর দেখিও। দেখিবে,—সেই ক্ষুদ্র চেলজড়িতা বালিকা, সেই পৃথিবীর প্রায় সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞা বালিকা, কত যত্নে রক্ষিতা হইয়া থাকে! সেই ক্ষুদ্র বালিকার কি গৌরব, কি মহিমা! কর্ত্তা হইতে বাড়ীর দাসদাসীগণ পর্য্যন্ত—গৃহের সকলেই সেই ক্ষুদ্র বালিকার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত, তাহারই জন্য ব্যস্ত। "হিন্দুর বধূর অসীম গৌরব। কেন না হিন্দুর বধূ ভূত ও ভবিষ্যতের

প্রহিছল। বধূ বিনা হিন্দুর উত্তরপুরুষের অভাব হয়, এবং উত্তরপুরুষের অভাব হইলেই পূর্ব্বপুরুষেরও অভাব হয়। বধূ বিনা বংশের ধারা অবিচ্ছিন্ন থাকে না, সমস্ত কুলস্মৃতি ব্যর্থ ও লুপ্ত হইয়া যায়—বর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তনশীল শক্তি ছারখার হইয়া ঐকান্তিক অকর্ম্মণ্যতায় পরিণত হয়। পারিবারিক স্থিতি ও ও বংশাবলীর ধারাবাহিকতা পুণ্যরূপ মহাশক্তির ফল। সেইজন্যই পারিবারিক স্থিতি ও পুরুষের ধারাবাহিকতা হিন্দুদিগের মধ্যে এত প্রার্থনীয় ও এত গৌরবের জিনিস। হিন্দুর বধূ সেই পারিবারিক স্থিতি ও ধারাবাহিকতার হেতু বলিয়া তাঁহার গৌরব অসীম।" সেই জন্যই হিন্দু বধূকে দেবীবৎ পূজা করিয়া থাকে।

কায়ার স্বরূপ—তাহার রূপ-রস-গন্ধ—ছায়ার ভিতর থাকে না। কায়ার নিকট হইতে তাহার কিছু না লইয়াই ছায়া সম্পূর্ণ। বৃক্ষের আকার, বৃক্ষের বিশালতা বা ক্ষুদ্রতা বৃক্ষের ফুলে বা ছায়ায় থাকে না। বৃক্ষের আপনার কোন কিছু না লইয়াই ফুল ও ছায়া সম্পূর্ণ,—একেবারে পৃথক্। বৃক্ষের কিছু না থাকিলেও, বৃক্ষের ছায়ার "আকার বড়ই বিশুদ্ধ, বড়ই সূক্ষ্ম, যেন একখানি ছায়া, একখানি স্বপ্ন, একটি কল্পনাময় কল্পনা, আত্মার ন্যায় শুদ্ধ ও সূক্ষ্ম। বৃক্ষের ছায়া বৃক্ষের কাম-ক্রোধ লোভ মোহ-মাৎসর্য্য-বিবর্জ্জিত—বৃক্ষের সূক্ষ্ম, সুন্দর, শুদ্ধ, স্বপ্নবৎ বৃক্ষত্বমাত্র।" বৃক্ষের কিছু না লইয়াই ছায়া সম্পূর্ণ এবং তাহাতেই তাহার গৌরব।

কায়ার অপেক্ষা ছায়ার গৌরব অধিক; কায়া অপেক্ষা ছায়া বড়। বৃক্ষের কাণ্ড বা তাহার ডালপালা অপেক্ষা বৃক্ষের ফুল ও ছায়াকেই আমরা সমধিক মূল্যবান মনে করি। ফুলের ক্ষুদ্রত্ব বা বৃহত্ত্ব অথবা তাহার পলাশগুলির দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা তাহার সেই মনোমুগ্ধকর ও হৃদয়হারী সৌরভটুকু এবং তাহার সমস্ত সফলতা ফলটিকেই অধিক গৌরব করি। ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র, দীন দুর্ব্বাগুলির এত আদর কিসের জন্য? তাহার আকারের ক্ষুদ্রতার জন্য এ আদর কখনই হইতে পারে না; আকার অপেক্ষা আরও একটি বড় জিনিস আছে—সেটি তাহার বিনয় ও প্রফুল্লতা এবং শ্যামল সৌন্দর্য্য। এই গুণগুলির জন্যই দুর্ব্বাগুচ্ছকে এত পূজার দৃষ্টিতে দেখি,—এত মূল্যবান্ মনে করি। বসন্তের আগমনে তাহার সেই ক্ষুদ্র অঙ্গে বিরাট্ ছায়ার উদ্গম হইয়া থাকে এবং তাহা "বিচিত্রকুসুমশিখায় উজ্জ্বল হইয়া—সফলা শক্তির কোমল গভীরতায় আন্দোলিত হইতে হইতে সমস্ত ধরণীর সহিত আনন্দোৎসবে যোগদান করে" ("It rejoices

with all the earth—glowing with variegated flame of flowers—waving in soft depth of fruitful strength.") এই দূর্ব্বাকে দেখিয়া কবি বলিয়াছেন—"তাহা ঈশ্বরের দান ("Heavenly gift."); তাহার এই দিব্য সৌন্দর্য্য এত অনন্ত যে যদিও তাহা আমাদের নয়নে ক্ষেত্র-মাধুর্য্যের অনন্ত ভাণ্ডার, সেক্সপিয়রের বিশেষ হর্ষ; তথাপি আমরা তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই না, আংশিক দেখি।"*

কবি আবার বলিয়াছেন,—"Go out, in the spring-time among the meadows that slope from the shores of Swiss lakes to the roots of their lower mountains. There, mingled with the taller gentians and the white narcissus, the grass grows deep and free; and as you follow the winding mountain paths, beneath arching boughs all veiled and dim with blossom—paths that for ever droop and rise over the green banks and moulds sweeping down in scented undulation, steep to the blue water, studded here and there with new-mown heaps, filling all the air with fainter sweetness—look up towards the higher hills, where the waves of everlasting green roll silently into their long inlets among the shadows of the pines; and we may perhaps, at last know the meaning of the 147 Psalm, 'He maketh grass to grow upon the mountains.,†" এই যে স্তব, এই যে পূজা—ইহা কিসের স্তব, কিসের পূজা? দূর্ব্বার ক্ষুদ্র দেহের পূজা কখনই নহে; দূর্ব্বার যে শক্তি, যে সৌন্দর্য্য বিশাল সৌন্দর্য্যের সহিত ছন্দরক্ষা করিয়া চলিতে পারে,—এ সেই শক্তিরই পূজা। ইহা কায়ার স্তব নহে,—ছায়ার আরাধনা। আবার, সুনীল আকাশের কোল-

* "We may measure to the full depth of this heavenly gift in our own land; though still, as we think of it longer, the infinite of what meadow sweetness, Shakespeare's pecular joy, would open on us more and more, yet we have it but in part."

Ruskin's "Modern Painters."

† Ibid.

কলায় পরিপূর্ণ রাকাপতির সুগোল, সুডৌল আকার অপেক্ষা তাহার শুভ্রোজ্জল জ্যোৎস্নারাশির বিশাল হাস্যতরঙ্গকেই আমরা অধিক আদরের বলিয়া গ্রহণ করি। যদি কেহ একখানি প্রকাণ্ড, উজ্জল কাঞ্চন থাল লইয়া বলে,—"এই চাঁদ লও",—তবে আমরা কি তাহা এত আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি? তাহা করি না। আমরা সুধাকরের সুগোল আকারের অপেক্ষা, তদীয় জ্যোৎস্না-রাশিকেই চাহি। সেই জ্যোৎস্নাই আমাদিগের কাছে একটি স্বপ্ন, একটি মহিমান্বিত জ্যোতিরুৎসব, একটি "কচি ছেলের দুধের হাসি" বলিয়া বোধ হয়। আমরা চাঁদ অপেক্ষা জ্যোৎস্নাকেই মূল্যবান জ্ঞান করি। মানব জগতের পক্ষেও এ কথা বলা যায়। এই যে সে দিন দয়ার প্রতিমা, পরোপ-কারের মহীয়সী মূর্ত্তি কুমারী নাইটিঙ্গেল ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন, আর কবি তাঁহার তিরোধানে আকুল হইয়া গাহিলেন,—

"নিবিড়-নদীর কোলে অপরূপ ইন্দ্রধনু সম
মলিন এ মহীমাঝে অভিরাম, চির-অনুপম,
তুমি ফুটেছিলে দেবি, আপনার স্বর্গীয় প্রভায়
শুচি-স্নাত করি' এহি পাপে পূর্ণ পঙ্কিল ধরায়।"

এ কাহার জন্য রোদন বল দেখি? কুমারীর ক্ষীণ-দীর্ঘ দেহ যষ্টির জন্য ত এ রোদন নহে। তাঁহার যে করুণাময়ী মূর্ত্তি দীন-আর্ত্তজনগণের শুশ্রূষার জন্য নিয়ত নিরত থাকিত, যে কল্যাণী প্রতিমা দুইটি ক্ষুদ্র হস্তে পৃথিব্বীর সমস্ত কালিমা, সমস্ত দৈন্য, সমস্ত দুঃখ, সমস্ত যাতনা মুছিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল,—এ সেই মূর্ত্তির জন্য মর্ম্মভেদী ক্রন্দন; ইহাতে তাঁহার দেহের হ্রস্ব-দীর্ঘত্বের, ক্ষীণ-স্থূলত্বের অনুমাত্র উল্লেখ নাই। ইহা কায়ার জন্য আক্ষেপ নহে,—মঙ্গলময়ী ছায়ার জন্যই হৃদয়ভরা আকুল উচ্ছ্বাস! মানুষ কায়ার পূজা করে না, ছায়ারই পূজা করিয়া থাকে।

কায়া ক্ষণিক, ছায়া শাশ্বত'। কায়া দুইদিন পরে চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ছায়া চিরদিন থাকিয়া যায়। ছায়ার বিনাশ নাই। আজ এই বিশাল বৃক্ষ আপনার প্রকাণ্ডত্বে গর্ব্ব অনুভব করিতে পারে, কিন্তু তাহার বিনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু ফুলটি তাহার ছায়ার সাহায্যে জগতে ধ্রুব স্থান অর্জ্জন করিতে পারে। রমণী আজ যতই সুন্দরী হউন, যতই লাবণ্যবতী হউন না কেন, তাঁহার তিরোধান আছেই। কিন্তু তাঁহার ছায়া উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করিয়া বিশাল ছায়ায় পরিণত হয়। তাঁহার ছায়ারূপী সন্তান উত্তরবংশের

উদ্ভবে প্রসারলাভ করে। ছায়া পবিত্র, ছায়া সুখকর ছায়া আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন। একটি লাবণ্যবতী ললনার মুখকমল অপেক্ষা, শিশুর দিব্যদীপ্তিপূর্ণ কচি মুখের সরল হাসি কত মধুর, কত প্রীতিপ্রদ, কত পবিত্র, বল দেখি? রমণীর বিলোল কটাক্ষের উদ্দাম চাঞ্চল্য এই ভোগভূমি পৃথিবীর কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়; কিন্তু শিশুর ঢলঢল চোখের ছলছল শান্ত চাহনি সেইরূপ শান্তিপূর্ণ একটি লোকের ছবি মনোমধ্যে উদ্ঘাটিত করে। জ্যোৎস্নালোকে বৃক্ষের ছায়া দেখিলে পাগল হইয়া যাইবে—সে ছায়া জ্যোৎস্নালোকে এতই কল্পনারূপী—এতই ভাবরূপী—এতই আত্মরূপী। সে আলোকে, সে ছায়া কোন কিছুর ছায়া বলিয়া মনে হয় না—মনে হয়, সে ছায়া বুঝি ইচ্ছাময়ের সাধের একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি! সে ছায়া দেখিলে বাহ্যজগৎ ভুলিয়া যাইতে হয়। সে ছায়া না দেখিলে আধ্যাত্মিকজগৎ কাহাকে বলে বুঝিতে পারা যায় না।

শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

প্রকাশ-পীড়ন।

লৌহবর্ম্ম দিয়া পাপে কর আবরণ,
সে শুধু যাতনারাশি বাড়িবে শরীরে।
ন্যায়ের শাণিত অসি করি বিদারণ,
শোণিতস্রাবের সনে আনিবে বাহিরে।
ছিন্নবাস দিয়া শুধু রাখিলে ঢাকিয়া
কুশাগ্র ছিঁড়িয়া আনে সেই আবরণ।
আবরিতে হয় যদি, ছিন্ন বাস দিয়া
আবরিও; কমে তাহে প্রকাশ-পীড়ন।

শ্রীকালিদাস রায়।

প্রাচীন ভারতে আর্য্য ও অনার্য্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল।

—:*:—

[২]

সাময়িক উন্নতি ও রুচি একস্থানে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। যে সময় উত্তর ভারত সভ্যতার পূর্ণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছিল, সেই সময় দাক্ষিণাত্যের পার্ব্বত্য সমাজেও উত্তর ভারতের সভ্যতার এবং রুচির স্রোত ধীরে ধীরে প্রবেশলাভ করিতেছিল।

উত্তর ভারতে যখন রাজা দশরথ রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময় দাক্ষিণাত্যের কিষ্কিন্ধ্যা নামক স্থানে অনার্য্য রাজা বালী প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া স্বীয় স্বাভাবিক বলবুদ্ধিতে অরণ্যচর অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিদিগকে শাসন করিতেছিল।

বিলাসিতা উন্নতির ও সভ্যতার লক্ষণ। যে জাতি যত উন্নত ও সভ্য, তাহার বিলাসিতার মাত্রা তত প্রবল। অসভ্য বর্ব্বর জাতি সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বল্কল পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, গিরিগহ্বর পরিত্যাগ করিয়া কুটীরের অনুসন্ধানে ফিরে; ভূশয্যা উপেক্ষা করিয়া পর্য্যঙ্কের জন্য লালায়িত হয়; স্বাভাবিক খাদ্য ফলমূলে বীতশ্রদ্ধ হইয়া কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত আহার্য্যদ্বারা ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিতে প্রয়াস পায়। ইহা ক্রমোন্নতির লক্ষণ। কিষ্কিন্ধ্যার অসভ্য সমাজ তখন আর্য্য ভারতীয় সমাজের অনুকরণে এইরূপভাবে বিলাসিতার দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

কিষ্কিন্ধ্যাবাসী এই সময় বল্কল পরিত্যাগ করিয়া কার্পাস বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিত, ভূমি-শয্যা ও বৃক্ষ-কোঠর-বাস ত্যাগ করিয়া পর্য্যঙ্কের ব্যবহার করিত। তখন ইহারা আর্য্য সমাজের অনুকরণে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল তাহাদের রাজধানীর গঠন-প্রণালী হইতেই তাহা উপলব্ধ হইবে।

কিষ্কিন্ধ্যা একটি পর্ব্বত-গহ্বর। পর্ব্বত-গহ্বর কিষ্কিন্ধ্যা অনার্য্যরাজা বালীর রাজধানী—ইহা অতি স্বাভাবিক। কিন্তু ইহা সাধারণ পর্ব্বত-গুহা নহে; একটি সুবৃহৎ দ্বার-বিশিষ্ট, কাঞ্চন-ভূষিত যন্ত্র ও ধ্বজাবলীসমাকীর্ণা পুরী।*

* ———তদা কাঞ্চনভূষণাম্।
প্রাপ্তাঃ স্ম ধ্বজযন্ত্রাঢ্যাং কিষ্কিন্ধ্যাং বালিনঃ পুরীং ॥
(কিঃ ১৪।৬)

কিষ্কিন্ধ্যার প্রবেশদ্বার অতি বৃহৎ। গুহা রত্নময় এবং কুসুমিত-কানন-সমন্বিত। গুহার পরম্পর নিকটবর্ত্তী হর্ম্ম্য এবং প্রাসাদমালার দ্বারে দিব্য বস্ত্রপরিহিত সশস্ত্র বানর-সৈন্য অবস্থান করিয়া দ্বার রক্ষা করিতেছে। চারি দিক অগুরু ও চন্দনগন্ধে সুবাসিত। পথসমূহ মৈরেয় মধুগন্ধে আমোদিত। প্রাচীরগাত্র বিচিত্র স্ফটিক ও মণিখচিত। পাঠক, ঐ দেখুন, লক্ষ্মণ সেই বিচিত্র দ্বার অতিক্রম করিয়া কিষ্কিন্ধ্যার অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। লক্ষ্মণ ক্রমে সপ্ত কক্ষ অতিক্রম করিয়া আসিয়া সুবর্ণ ও রজত নির্ম্মিত মহামূল্য পর্য্যঙ্ক ও উৎকৃষ্ট আসন-শোভিত সুগ্রীবের একান্ত গুপ্ত অন্তঃপুর দেখিতে পাইলেন। (কিঃ—৩৩)

লক্ষ্মণ অন্তঃপুর-দ্বারে উপনীত হইয়া সুর-তাল-লয়-সম্পন্ন সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন এবং উত্তম মাল্য ও বেশভূষা সম্পন্না সুন্দরী প্রমদা-গণকে দেখিতে পাইলেন। (কিঃ—৩৩)

ইহাই অনার্য্য অর্দ্ধ সভ্যতার কেন্দ্রভূমি কিষ্কিন্ধ্যার চিত্র। এই চিত্র অস্বাভাবিক নহে। কিষ্কিন্ধ্যার বর্ণনা পাঠ করিলে স্বভাবতঃই মনে হয়, কিষ্কিন্ধ্যা একটি পর্ব্বতগহ্বর এবং সুগ্রীবের গুপ্ত বিলাসকক্ষ আরও আভ্যন্তরীণ গুপ্ত স্থান। লক্ষ্মণ যে সপ্ত কক্ষ অতিক্রম করিয়াছিলেন তাহা পর্ব্বতের বিভিন্ন অংশ ও গহ্বর ব্যতীত আর কিছুই নহে; কেন না, লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যার প্রবেশদ্বার অতিক্রম করিয়া গুপ্ত অন্তঃপুরে যাইতে যাইতে পথে অন্যান্য বানরগণের বাসস্থান (গৃহ) ও গিরি নদী সকল দেখিয়া গিয়াছিলেন। (কিঃ—৩৩)

কিষ্কিন্ধ্যায় অনেক প্রাসাদ ও প্রাচীরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"বিন্ধ্যমেরু গিরি প্রখ্যৈঃ প্রাসাদৈর্নৈক ভূমিভিঃ।"

এইগুলি পর্ব্বতের স্বাভাবিক প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাসাদাকার গুহা ও প্রস্তর-প্রাচীর। এই সকল প্রাচীর ও গুহাপ্রাসাদের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, এগুলি সুবর্ণ, স্ফটিক ও মণিময় ছিল। অসভ্য অরণ্যচরদিগের পক্ষে রত্নসংগ্রহ দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হয় না।

দাক্ষিণাত্যের বানর-সমাজ তখন এইরূপ আর্য্য সমাজের অনুকরণে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে ছিল।

যাঁহারা ইলোরা, অজন্তা প্রভৃতি গুহাবলীর বিচিত্রতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা কিষ্কিন্ধ্যার প্রাসাদ-প্রাচীর কল্পনানেত্রে দর্শন করিতে সমর্থ হইবেন।

এইবার আমরা অনার্য্য পূর্ণ সভ্যতার চিত্র প্রত্যক্ষ করিব। সেই অনার্য্য পূর্ণ সভ্যতার কেন্দ্রভূমি লঙ্কা। লঙ্কায় অনার্য্য সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ও বিলাসিতার পূর্ণ চিত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে।

কাঞ্চনেনাবৃতাং রম্যাং প্রাকারেণ মহাপুরীম্।
গৃহৈশ্চ গিরিসঙ্কাশৈঃ শারদাম্বুদসন্নিভৈঃ॥ ১৬
পাণ্ডুরাভিঃ প্রতোলীভিরুচ্চাভিরভিসংবৃতাম্।
অট্টালকশতাকীর্ণাং পতাকাধ্বজ শোভিতাম্॥ ১৭
তোরণৈঃ কাঞ্চনৈর্দিব্যৈর্লতাপংক্তি বিরাজিতৈঃ। (সুন্দরা—২)

ইহাই লঙ্কা। হনুমান দূর হইতে এই লঙ্কা দর্শন করিলেন।

কবিগুরু বাল্মীকি এই লঙ্কাকে "কনক লঙ্কা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কনক লঙ্কা দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত একটি নগরী, ত্রিকুট পর্ব্বতের শীর্ষদেশ-সংস্থাপিত এবং চতুর্দ্দিকে পরিখাবেষ্টিত।

আমরা কবির লেখনী-মুখে বর্ণিত লঙ্কার বর্ণনা সংক্ষেপে এইস্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

লঙ্কার চারিদিকে চারিটি দৃঢ় কপাটবদ্ধ বৃহৎ দ্বার। দ্বার সকলের মধ্যদিকে বাণ, শিলা ও শত শত লৌহময় শতঘ্নী স্থাপিত রহিয়াছে। পুরীর চারিদিকে দুর্লঙ্ঘ্য স্বর্ণ প্রাচীর, প্রাচীরের পর ভয়ানক কুম্ভীরসমাকুল ও অগাধ বারি-রাশিপরিপূর্ণ পরিখা। পরিখার উপর চারিদ্বারে চারিটি সুপ্রশস্ত কৃত্রিম সেতু, এই কৃত্রিম সেতু প্রাকারোপরি যন্ত্রদ্বারা রক্ষিত, শত্রুসৈন্য কোন প্রকারে সেতুতে উঠিলে তাহাদিগকে যন্ত্রসাহায্যে সেই নক্রকুম্ভীরসঙ্কুল পরিখাজলে নিমজ্জিত করা হয়। লঙ্কার নদীদুর্গ, পর্ব্বতদুর্গ, বনদুর্গ ও কৃত্রিম দুর্গ এই চারি প্রকারের দুর্গ আছে। (লঙ্কা—৩)

নগরীর রাজপথসমূহ অতি বিস্তৃত ও প্রাসাদমালাশোভিত। সেই প্রাসাদা-বলী সুবর্ণনির্ম্মিত স্তম্ভ ও গবাক্ষ সকলে শোভিত। স্থানে স্থানে স্ফটিকাদি রত্নসমূহে খচিত সপ্তভৌম ও অষ্টভৌম গৃহ বিরাজিত। (সু—২)

নগর বেদীকাসমূহে শোভিত। বেদিকাসমূহ স্ফটিক, মণিমুক্তা, বৈদূর্য্য-মণি প্রভৃতি বিবিধ রত্নে জড়িত। বেদীর উপর কোথাও বৃক্ষশ্রেণী, কোথাও ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি শোভিত ছিল। প্রাচীরের কুট্টিমসমূহ মণিময়, উপরিভাগ রৌপ্যের ন্যায় পাণ্ডুর বর্ণ। সোপানশ্রেণী বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত। স্থানে স্থানে গোষ্ঠ ও যন্ত্রালয়সমূহ স্থাপিত। (সু—৩)

রাজপথগুলি কুসুমাকীর্ণ, সেই রাজপথের পার্শ্বে হীরকখচিত বাতায়নসমন্বিত বজ্রাকার ও অঙ্কুশাকার মেঘস্পর্শী গৃহাবলী শোভিত। ইতস্ততঃ পদ্মাকার * ও স্বস্তিকাকার† গৃহসমূহ বিরাজিত। (সু—৪)

এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে পানগৃহ, পুষ্পবাটী, চিত্রশালিকা, ক্রীড়াভূমি, বিমান, দিবাবিহার গৃহ, রতিগৃহ, কাষ্ঠনির্ম্মিত কৃত্রিম ক্রীড়া পর্ব্বত, গুপ্ত গুল্ম, চৈত্যপ্রাসাদ, যজ্ঞভূমি প্রভৃতি বিরাজিত। লঙ্কার রাজগৃহও বহুকক্ষসমন্বিত ছিল।

ইহাই লঙ্কার সংক্ষিপ্ত চিত্র। অযোধ্যার ন্যায় লঙ্কারও বিভিন্ন গৃহের পৃথক পৃথক বর্ণনা আছে। কিন্তু লঙ্কার চিত্র অযোধ্যার চিত্র অপেক্ষা বহু পরিমাণে উন্নত ও ঐশ্বর্য্যশালী।

পাঠক এইবার রাবণের শয্যাগৃহের বিচিত্রতা অবলোকন করুন। রাবণের শয়নগৃহে স্ফটিক-নির্ম্মিত বিচিত্র বেদী। ঐ বেদী স্থানে স্থানে রত্নখচিত ও একান্ত রমণীয়। বেদীর উপর নীলকান্ত মণিময় পর্য্যঙ্ক। পর্য্যঙ্কের পদসমূহ হস্তীদন্তে রচিত ও স্বর্ণমণ্ডিত। পর্য্যঙ্কের উপর মহামূল্য আস্তরণ। সেই মহামূল্য আস্তরণের উপর সুচিক্কণ আস্তরণ আস্তীর্ণ। পর্য্যঙ্কের এক স্থানে উজ্জ্বলশ্বেত ছত্র—অন্যত্র বালব্যজনহস্ত অবিরাম ব্যজন করিতেছে। শয্যা বিবিধ সৌরভে সুবাসিত। অদূরে স্বর্ণ প্রদীপের উজ্জ্বল শিখা জ্বলিতেছে।

লঙ্কার রাজপথগুলি ও শয়ন কক্ষের ন্যায় সমস্ত রাত্রি দীপালোকে আলোকিত থাকিত।

"তাং নষ্টতিমিরাং দীপৈর্ভাস্বরৈশ্চ মহাগৃহৈঃ।"

এই আলোক তৈল প্রদীপের কি তাড়িতালোকের তাহার কোন উল্লেখ নাই। রাবণের শয্যাগৃহে বাল-ব্যজন-হস্তে সমস্ত রজনী অনবরত ব্যজন হইত। রামায়ণের টীকাকাররা ইহা যন্ত্রপুত্তলিকার কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। লঙ্কার প্রায় প্রতি স্থানেই যন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যন্ত্রের সাহায্যে বহু কৃত্রিম পদার্থের নির্ম্মাণের উল্লেখও লঙ্কার বিভববর্ণনায় দেখা যায়। কৃত্রিমতা সভ্যতার উন্নত পর্য্যায়ের আর একটি লক্ষণ। ইহা ধর্ম্মোন্নত জাতির পক্ষে না হইলেও বিলাসোন্নত জাতির পক্ষে উন্নতির লক্ষণ সন্দেহ নাই।

* পদ্মাকার গৃহ—দক্ষিণদ্বাররহিত পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দ্বারযুক্ত গৃহ।

† স্বস্তিকাকার গৃহ—পূর্ব্বদ্বাররহিত উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম দ্বারযুক্ত গৃহ।

লঙ্কার বিচিত্র চিত্রশালিকা ব্যতীত একটি কৃত্রিম যাদুকর (museum) ছিল। ঐ গৃহের এক পার্শ্বে নানারূপ পুষ্প ও বৃক্ষলতাদিপূর্ণ কৃত্রিম শৈল, একস্থানে বিচিত্র গৃহ, একস্থানে উৎপলশোভিত কৃত্রিম সরোবর, কোথাও বৈদূর্য্যমণিখচিত কৃত্রিম বিহঙ্গ—রৌপ্য ও প্রবাল নির্ম্মিত পক্ষী, রত্নময় ভুজঙ্গ, কৃত্রিম অশ্ব, সুবর্ণ ও প্রবালখচিত বিচিত্রপক্ষ পতঙ্গ। একস্থানে সরোবরে হস্তিসমূহ-অভিষেক-নিযুক্ত কমলার মূর্ত্তি নির্ম্মিত ছিল। এই যাদু-গৃহের চিত্র অত্যুন্নত সভ্যতার নিদর্শন।

আমরা বাহুল্য বিবেচনায় লঙ্কার সভাগৃহ, সৈন্যাবাস, অপরাপর রাজপুত্র-গণের বাসভবন ও অশোক বন প্রভৃতির উল্লেখ হইতে বিরত রহিলাম।

লঙ্কার চিত্র বিলাসিতার ও ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ চিত্র প্রকটিত করিয়া দেয়।

যাঁহারা মোগল ঐশ্বর্য্যের ক্ষীণ অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—তাজমহল—মতি মসজিদ, সীসমহল—যাহারা দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা লঙ্কার এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের ও বর্ণনার ক্ষীণ আভাস হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

তফাত।

সবার জীবন দিয়া, তুমিই কেবল
কোথায় রহিলে পড়ি' মৃতের মতন ;
সবারি মূরতি সৃজি', হে শুদ্ধ নিম্মল!
আপন মূরতি কোথা করিলে গোপন ?
কত খুঁজিয়াছি, কভু পাই নাই দেখা ;
কত ডাকিয়াছি, কভু পাই নাই সাড়া ;
চকিতে ফুটিছে তবু রামধনু-রেখা!
হৃদাকাশে ; ঝরে তবু করুণার ধারা!
কেমনে জাগ্রত, এই বিশ্ব চরাচর
অনন্ত অসীম শূন্যে চির নির্ব্বিকার ?
তারি মাঝে তুমি নাই ? ওগো প্রাণেশ্বর।
করিছ না খেলা তবে তুমিই তোমার ?
বল;—দেব! মোরে আর করোনা নিরাশ.
—এই প্রাণ, তুমি ; দেহ, তোমারি আবাস।

শ্রীধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী।

অশোকের রাজকার্য্য ও শাসন-পদ্ধতি।

———:*:———

মহারাজ অশোকের অনুশাসন হইতে তাঁহার রাজকার্য্য ও শাসন-পদ্ধতি সবিশেষ অবগত হওয়া যায় না; রাজ-কার্য্য পরিচালনার্থ অশোক যে সকল নূতন পদ্ধতি বা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, কেবলমাত্র সেই সকলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের রাজ সভায় বহুদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি যে অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন, তাঁহার লিখিত ভারতের বিবরণীই তাহার প্রমাণ। যদিও তিনি তাঁহার রচিত বিবরণীর কোন কোন স্থলে অনবধানতার পরিচয় দিয়াছেন, তথাপি তাঁহার বিবরণী হইতে তৎকালে রাজকার্য্যের ও শাসন-পদ্ধতির যে বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য। মেগাস্থিনিস্ বিদেশীয়; তিনি বহু দূর হইতে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। বিদেশীর দৃষ্টিতে, বিদেশীর নিকটে পাটলিপুত্রের রাজকার্য্য এবং জনসাধারণের রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার,—সকলই নূতন বোধ হইয়াছিল। তাই এই সকল বিষয় অতি বিশদ ভাবে তাঁহার বিবরণীতে স্থান-লাভ করিয়াছে।

মৌর্য্য সম্রাট অশোকের রাজকার্য্য ও শাসন-প্রণালী জানিতে হইলে, আমাদিগকে প্রথমতঃ এই বিবরণীর সাহায্য লইতে হইবে। তদ্ভিন্ন ইদানীং মহীশূর হইতে চাণক্য প্রণীত অর্থ-শাস্ত্র অভিধেয় একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। চাণক্যই চন্দ্র গুপ্তকে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের প্রধান অমাত্য ছিলেন। শুধু রাজকার্য্যে নহে, সকল বিষয়েই চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই বহুদর্শী, বিচক্ষণ, রাজনীতিজ্ঞ চাণক্যের অর্থ-শাস্ত্র পাঠে তৎকালের রাজকার্য্য-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অবগত হওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, চন্দ্রগুপ্তের শাসন-প্রণালী সেই সময়ের দুই জন প্রধান বিজ্ঞ ব্যক্তি লিখিয়াছেন; তন্মধ্যে এক জন বিদেশীয়, বিধর্ম্মী গ্রীক; বিদেশীর দৃষ্টিতে যেমন দেখিয়াছেন, যেমন বুঝিয়াছেন সেইরূপ লিখিয়াছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি স্বদেশীয়, স্বধর্ম্মী—রাজ্যের প্রধান অমাত্য। তিনি স্বয়ং শাসন-প্রণালীর বিশেষ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, অনেক নূতন বিধি-নিষেধ প্রচলিত করিয়াছিলেন—সুতরাং তাঁহার

প্রণীত পুস্তক যে প্রামাণিক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা—এই উভয় পুস্তকের বিবৃত বিবরণীর মধ্যে অনেক স্থলেই মিল আছে, অনেক বিষয় উভয় পুস্তকেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

আমাদের বিশ্বাস, চাণক্যের বা মেগাস্থিনিসের সময়ে মৌর্য্য সম্রাজ্যের যেরূপ শাসন-প্রণালী ছিল, অর্দ্ধ শতাব্দী পরে মহারাজ অশোকের রাজত্ব কালেও তাহা সমভাবে চলিয়া আসিয়াছিল,—তাহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে অশোক তাঁহার বিশাল সম্রাজ্য সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত করিবার জন্য এবং স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, শাসন-প্রণালীর যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ও সংস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুশাসনসমূহ এই বিষয়ে সাক্ষ্য-প্রদান করিতেছে।

৫ম গিরি লিপিতে প্রকাশ, পাটলিপুত্র অশোকের রাজধানী ছিল। এই নগর পুষ্পপুর, কুসুমপুর, পালিবোথ্রা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামেও অভিহিত হইয়াছে। মেগাস্থিনিস্ লিখিয়াছেন,—গঙ্গা ও হিরণ্যবাহু বা শোন নদের সঙ্গমস্থলের কিঞ্চিৎ দূরে গঙ্গাসৈকতে পাটলিপুত্র অবস্থিত ছিল। এই নগর দৈর্ঘে ৮০ ষ্টাডিয়া বা প্রায় ৯ মাইল এবং প্রস্থে ১৫ ষ্টাডিয়া বা দেড় মাইল; নগরের আকৃতি একটি সমান্তরৈখিক ক্ষেত্রের ন্যায়। নগরের চারিধার পরিখা-বেষ্টিত ছিল। এই পরিখার বিস্তার ৪০০ হস্ত এবং ইহার গভীরতা ৩০ হস্ত। পরিখার পরে আবার একটি সুদৃঢ় কাষ্ঠময় প্রাচীর দ্বারা নগর রক্ষিত হইত। প্রাচীরের চারিদিকে ৬৪টি তোরণ ও ৫৭০টি বুরুজ ছিল এবং বাণনিক্ষেপের জন্য প্রাচীর-গাত্রে নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র ছিল। মেগাসথিনিস্ লিখিয়াছেন, নগরের মধ্যস্থলে নানা বৃক্ষলতাদিপরিপূর্ণ একটি সুরম্য উদ্যানের মধ্যে কাষ্ঠনির্ম্মিত রাজপ্রসাদ শোভা পাইত।

ফার্গুসন্ প্রমুখ পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদগণের বিশ্বাস যে, আলেকজাণ্ডার ভারতে আগমন করিবার পূর্ব্বে, ভারতে প্রস্তর-স্থাপত্য প্রচলিত ছিল না। ভারতবাসী ব্যাকট্রিয়ান গ্রীকগণের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদিগের নিকটে প্রস্তর-স্থাপত্য শিক্ষা করে এবং অশোকের সময় হইতে ভারতে প্রস্তর-নির্ম্মিত অট্টালিকার প্রচলন হয়। এখনও ব্রহ্মে, শ্যামে ও জাপানে কাষ্ঠদ্বারা যেরূপ অট্টালিকা ও প্যাগোডা নির্ম্মিত হয়, তৎপূর্ব্বে সেইরূপ কাষ্ঠময় হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইত।

'Cave Temples of India' নামক পুস্তকে ফার্গুসন্ লিখিয়াছেন—"No stone building is known to exist or any cave

possessing any architectural character whose date can be extended back to the time when Alexander the Great visited India............that nothing that can properly be called architecture is to be found there (in India) till considerably after Alexander's time...........that the history of Art in India begins with..............the introduction of Buddhism as a state religion under Asoka in the middle of the 3rd century B. C............that stone architecture commenced in India only 250 years before Christ"

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় তাঁহার প্রণীত 'Antiquities of Orissa' নামক গ্রন্থে এই মত খণ্ডন করিয়াছিলেন। তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, ভারতীয় প্রস্তর স্থাপত্য যত দিনেরই পুরাতন হউক না কেন, ইহা গ্রীক বা এসিয়ার স্থাপত্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভারতীয় স্থাপত্যের নিয়ম, প্রকার ও গঠন-প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন; ইহা সম্পূর্ণ স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় প্রভাব-বর্জ্জিত। স্থানভেদে ও কালভেদে এই স্থাপত্যের রূপভেদ হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার মৌলিক বিষয়ত্ব বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সুতরাং আমরা যে গ্রীকগণের নিকট প্রস্তর স্থাপত্য শিক্ষা করিয়াছি, এই কথা স্বীকার করা যায় না। আবার মিঃ ফার্গুসন্ ও ক্যানিংহাম স্বীকার করিয়াছেন যে, উড়িষ্যার খণ্ডগিরির ও উদয়গিরির হস্তিগুম্ফ এবং বিহারের রাজগৃহস্থিত 'রাজা জরাসন্ধের বৈঠক' অভিধেয় প্রস্তর-দুর্গ শাক্য বুদ্ধের জন্মের পূর্ব্বে নির্ম্মিত। সুতরাং, অশোকের অন্ততঃ দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও যে ভারতে প্রস্তরগৃহ নির্ম্মিত হইত, তাহা তাঁহারাও একরূপ স্বীকার করিয়াছেন। পুরাতত্ত্ববিদ্ ৺পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় নেপালের তরাই প্রদেশে গোরক্ষপুর জিলায় কপিলাবস্তুর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন। তথায় বুদ্ধদেবের সময়ের ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের প্রস্তর হর্ম্ম্যের ভগ্নাবশেষ বাহির হইয়াছে। এই সকল কারণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রস্তর স্থাপত্য বহুকাল হইতে ভারতে প্রচলিত ছিল; তবে হইতে পারে যে, অশোকের সময় হইতে ইহার প্রচলন বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদ কাষ্ঠনির্ম্মিত হইলেও, বৃহৎ সুবর্ণরঞ্জিত স্তম্ভসকল তাহার শোভা বর্দ্ধন করিত। সেই সকল স্তম্ভে সুবর্ণের লতাপত্রের মধ্যে

ময়ৌপ্যের পক্ষীসকল অঙ্কিত ছিল। এই প্রাসাদের বিচিত্র কারুকার্য্য ও চিত্র-নৈপুণ্য দর্শন করিয়া মেগাস্থিনিস্ বিমোহিত হইয়াছিলেন।

অশোক নিজ বাসস্থানের নিমিত্ত সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত একটি মনোহর প্রস্তরময় রাজপ্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান্ যখন পাটলিপুত্রে আগমন করিয়াছিলেন, তখনও এই অশোক-নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদ বিদ্যমান ছিল। সেই প্রাসাদের বৃহৎ আকৃতি ও গঠন-নৈপুণ্য দেখিয়া তৎকালের লোকে বলিত যে, উপদেবতায় এই অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছে ;—নতুবা মনুষ্যের এমন সাধ্য নাই যে, এইরূপ প্রস্তরময় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে। এইরূপ জনশ্রুতিহেতু ফাহিয়ান্ লিখিয়াছেন,—

"The royal palace and halls in the midst of the city which exist now—as of old, were all made by spirits which he employed and which piled up the stones, reared the walls and gates and executed the elegant carving and inlaid sculpture-work in a way which no human hands of this world could accomplish." *

এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। বহুকাল যাবৎ কালের কঠোর নিষ্পেষণ সহ্য করিয়া সেই পাটলিপুত্র নগর ও 'রাক্ষস-নির্ম্মিত' রাজপ্রাসাদ কোথায় বিলীন হইয়াছে! "সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।"—আছে কেবল স্মৃতি। যে রাজপ্রাসাদ একদিন 'দীয়তাম্, ভুজ্যতাম্' শব্দে মুখরিত হইত, আজ সেইস্থানে পাটনার "কুমরাহা" পল্লীবাসী দরিদ্র কৃষকগণ নিদাঘের প্রচণ্ড সূর্য্য-কিরণ এবং বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিপাত মস্তকোপরি অকাতরে বহন করিয়া, এক মুষ্টি অন্নের জন্য শস্যক্ষেত্রে হলচালনা করিতেছে!

বিহারের আধুনিক পাটনা সহর আজকাল যে স্থানে অবস্থিত, পূর্ব্বে সেইস্থানে মৌর্য্যরাজধানী পাটলিপুত্র ঐশ্বর্য্যভরে স্ফীতবক্ষে বিরাজ করিত। যে শোন নদ তৎকালে রাজধানীর পাদ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত, বহুকাল হইতে তাহার গতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক্ষণে দানাপুরের ৮।১০ মাইল উত্তরে শোন, গঙ্গার সহিত মিলিত হইতেছে। কিন্তু নদীতীরস্থিত ঘাট ও সোপানের ভগ্নাবশের লক্ষ্য করিয়া এখনও শোনের পূর্ব্বগতি নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। পাটনা, বাঁকিপুর ও তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি

* Buddhist Records of the Western World by S. Beal.

যে ভূমিখণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছে, সেই স্থানের উপরেই পূর্ব্বে পাটলিপুত্র বিরাজিত ছিল।

এই ভূখণ্ডের নানাস্থান খনন করিয়া ভূমধ্য হইতে বড় বড় কাঠগড়া বাহির করা হইয়াছে। এই সকল কাঠগড়াদ্বারা প্রাচীন পাটলীপুত্র সুরক্ষিত ছিল। অশোক-নির্ম্মিত প্রস্তরস্তম্ভের ভগ্নাংশও বিভিন্ন স্থান হইতে উত্থিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন পাটনার নিকটস্থ কমলদা নামক স্থানের জৈন মন্দির হইতে একখানি উৎকীর্ণ প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ফলকে খোদিত আছে,—

"সংবৎ ১৮৪৮ বর্ষং মার্গশির বদি ৫ সোমবাসরে শ্রী পাটলীপুর বাস্তব্য শ্রী সকল সংঘ সমুদায়েন শ্রীস্থূলভদ্র স্বামিজী প্রসাদস্য কারাপিতং কার্য্যস্যাগ্রং স্থরীশ্রীতপাগচ্ছীয় শ্রাদ্ধৈঃলোড়া শ্রী গুলাবচংদজী প্রতিষ্ঠিতং সকলস্থরিভিঃ।"

এই প্রস্তরলিপি হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ১৮৪৮ সম্বতে অর্থাৎ ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎকালে পাটনার নিকটবর্ত্তী স্থান পাটলীপুর নাম অভিহিত হইত। সুতরাং বর্ত্তমান পাটনাতেই যে প্রাচীন পাটলিপুর বা পাটলিপুত্র অবস্থিত ছিল, এই ফলকও তাহার অন্যতম প্রমাণ।

পাটনা ও বাঁকিপুর আজ কাল সুবৃহৎ অট্টালিকা ও পণ্যবীথিকা পরিপূর্ণ বহু জনাকীর্ণ সমৃদ্ধিশালী জনপদ। কাযেই ঐ স্থানের মৃত্তিকা খনন করিয়া ভূগর্ভ হইতে পাটালিপুত্রের ভগ্নাবশেষ ও ভিত্তি উদ্ধৃত সহজসাধ্য নহে। রেল পথের দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত কুমরাহা নামক ক্ষুদ্র পল্লীর সন্নিকটস্থ স্থান কয়েক বৎসর পূর্ব্বে খনন করা হইয়াছিল। যে সকল নিদর্শন মাটীর ভিতর হইতে বাহির হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই মনে হয় যে, এই পল্লীর নিকটে অশোকের রাজপ্রাসাদ বিদ্যমান ছিল। এই স্থান পুনরায় খনিত হইলে, অশোকের বহুতর কীর্ত্তিকলাপের চিহ্ন আবিস্কার দ্বারা হইয়া ভারত-ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত করিতে পারে।

তখন ভারতবর্ষ আজকালকার মত দরিদ্র ছিল না; ভারত মাতা তখন প্রকৃতই রত্নগর্ভা ছিলেন। তাই, রাজার অতুল ঐশ্বর্য্য এবং রাজ সভার বিপুল ধনরত্ন বিদেশীয় মেগাস্থিনিসের নয়নে ধাঁধা লাগাইয়াছিল। কারুকার্য্য-শোভিত সিংহাসন, সুবৃহৎ স্বর্ণময় পান-পাত্র, বহুমূল্যমণিমুক্তখচিত বস্ত্রা-লঙ্কার রাজসভার শোভা বর্দ্ধন করিত। রাজা সুবর্ণ-যানে আরোহণ করিয়া নগর-ভ্রমনে বহির হইতেন; শত শত সভাসদও সুবর্ণ-শিবিকায় তাঁহার অনুগমন করিত। বস্ত্রালঙ্কারভূষিতা মহিষীও স্বীয় সখিগণপরিবৃতা হইয়া

রাজার সহিত গমন করিতেন। বিদেশীর চক্ষুতে এই সকল বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল।

চাণক্য লিখিয়াছেন, রাজা সিংহাসনে, রথে বা অন্য কোন স্থানে—যে স্থানেই অবস্থান করুন না কেন—সকল সময়েই রাজপরিচারিকাগণ, ছত্র চামর, ও সুবর্ণময় পান-পাত্র ধারণ করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত। ইহা ভারতে প্রাচীন প্রথা। কারণ মনুসংহিতায় লিখিত আছে,—

"পরীক্ষিতাঃ স্ত্রিয়শ্চৈনং ব্যজনোদকধূপনৈঃ।
বেশাভরণসংশুদ্ধাঃ স্পৃশেয়ুঃ সুসমাহিতাঃ॥"

সুপরীক্ষিতা, নিয়মিতবেশাভরণভূষিতা স্ত্রী লোকরা চামর ব্যজন, পানীয় জল এবং ধূপন দ্বারা নৃপতির পরিচর্য্যা করিবে।

মল্লযুদ্ধ, পশুযুদ্ধ প্রভৃতি নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুকে রাজা যোগদান করিতেন; কিন্তু মৃগয়াই তাঁহার প্রধান ব্যসন ছিল। রাজা মৃগয়ায় বহির্গত হইবার পূর্ব্বে রাজপথে জনতা রুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে পথের দুই পার্শ্ব রজ্জু দিয়া ঘেরা হইত। মহিলাগণ ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া যোদ্ধৃবেশে রাজার সহিত গমন করিতেন। ইহারা পথের জনতা নিবারণ করিয়া মৃগয়াযাত্রীদিগের পথ সুগম করিত। যদি কোন ব্যক্তি ঘটনাক্রমে রজ্জু অতিক্রম করিয়া রাস্তার মধ্যে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে তাহার আর নিস্তার নাই;—তখন প্রাণদণ্ডই তাহার একমাত্র শাস্তি। অন্যান্য আরও দুই চারিটি বিষয়ে এইরূপ লঘুপাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

অশোক রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়া কয়েক বৎসর এইরূপ মৃগয়াদি আমোদ প্রমোদে সময়াতিপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণান্তর তাঁহার মতিগতি পরিবর্ত্তিত হয়। অভিষেকের দশ বৎসর পরে তিনি সুখ-সম্ভোগের জন্য এই "বিহার-যাত্রা" স্থগিত করিয়াছিলেন এবং ইহার পরিবর্ত্তে "ধর্ম্ম যাত্রা" প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ৮ম গিরিলিপিতে লিখিত আছে,—

"পূর্ব্বে রাজগণ যখন বিহার যাত্রা করিতেন, তখন মৃগয়া এবং অন্যান্য অভিরমণীয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত। ... ... এক্ষণে ধর্ম্মযাত্রা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। উহাতে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দান, বৃদ্ধগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সুবর্ণ দান, রাজ্যের লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধর্ম্মাদেশ প্রচার এবং ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা সম্পন্ন হইয়া থাকে।"

অশোকের বিশাল সাম্রাজ্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। সম্রাট পাটলি-

পুত্রে অবস্থান করিয়া স্বয়ং সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলবর্ত্তী রাজ্য-শাসন করিতেন। তদ্ভিন্ন উজ্জয়িনী, তক্ষশিলা, তোসলি ও সুবর্ণগিরি—এই চারিটি নগর অপর চারিটি বিভাগের প্রধান নগর ছিল। কলিঙ্গ গিরিলিপিদ্বয়ে এবং মহীশূরের ব্রহ্মগিরি শৈললিপিতে সম্রাট উক্ত চারিটি বিভাগের শাসনকর্তৃগণকে কয়েকটি আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি এই সকল বিভাগের শাসনকর্ত্তাদিগকে আযপুত (আর্য্যপুত্র) বা কুমার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাজকুমারগণ এই চারিটি বিভাগের শাসন কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। অশোকের অনুশাসন-সমূহের মধ্যে কেবলমাত্র একজন রাজকুমারের নাম দেখিতে পাওয়া যায়; তাঁহার নাম তীবর। তবে সপ্তম স্তম্ভলিপিলিখিত "দালকাণাম্ পি চ মে" আমার পুত্রগণেরও —এই বাক্যে অনুমিত হয় যে, অশোকের অনেকগুলি সন্তান ছিল।

বোধ হয়, তক্ষশিলার রাজকুমার পঞ্জাব ও কাশ্মীর শাসন করিতেন। আফগানিস্থান প্রভৃতি সিন্ধুর পশ্চিমভাগবর্ত্তী রাজ্যসকল হয় ত অন্য কোন বিভিন্ন কর্ম্মচারীর অধীনস্থ ছিল। মালব, গুজরাট, সুরাষ্ট্র সম্ভবতঃ উজ্জয়িনীর শাসন-কর্ত্তার অধীনে থাকিত। 'অশোকাবদানে' ও 'দিব্যাবদানে' লিখিত আছে, বিন্দুসারের রাজত্বকালে অশোক তক্ষশিলার শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং 'মহাবংশে' লিখিত আছে, পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি উজ্জয়িনীর অধিপতি ছিলেন। সুতরাং বিন্দুসারের সময়েও রাজকুমারগণ তক্ষশিলা এবং উজ্জয়িনী শাসন করিতেন। পুরী জিলার ধাউলিতে যে কলিঙ্গ লিপিদ্বয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, কেবলমাত্র সেই দুই অনুশাসনে তোসলির উল্লেখ আছে। সেই জন্য অনুমান হয়, তোসলি ধাউলির নিকটে অবস্থিত ছিল। অশোক নব-বিজিত কলিঙ্গের শাসনভার তোসলির রাজকুমারের হস্তে অর্পিত করিয়াছিলেন। সুবর্ণগিরির রাজকুমার দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য রাজ্য শাসন করিতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার।

মিলনে মৃত্যু।

—:*:—

সাত বৎসর,—সুদীর্ঘ সাত বৎসর কারাগৃহে অবস্থিতির পর একদিন পুণ্য প্রভাতে জেসেক পিটার কারাগৃহের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মুক্ত গগনতলে আপনাকে মুক্ত অনুভব করিয়া তাহার আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য!

বহুদিন অবরোধের পর স্বাধীনতার রসাস্বাদন করিতে না করিতে তাহার হৃদয় ভেদ করিয়া একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস নির্গত হইল। তাহার সজল চক্ষু বিশুষ্ক হইয়া গেল। মনে হইল, তাহার অবরোধের কারণ,—মনে হইল, একখানি মুখ!

পিটার সওদাগর আফিষে কর্ম্ম করিত। সে ফিস্ কোম্পানীর "ছোট সাহেব" ছিল। জাতিতে বর্ণশঙ্কর হইলেও য়ুরোপীয় সমাজে তাহার সম্মান ছিল। এমন কি, এক সময় সে লাটসভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইবে এরূপ কথাও শুনা গিয়াছিল।

মেরী পিটারের মাতুল-তনয়া, মেরী আশৈশব তাহার সঙ্গিনী। মেরী যখন দুই বৎসরের—সে তখন পাঁচ বৎসরের শিশু। তাহার অল্পবয়সে পিটারের পিতামাতার কাল হইয়াছিল, সেইজন্য তাহার শৈশব এবং যৌবন মাতুলগৃহে অতিবাহিত হইয়াছিল। উভয়ের একত্র বাস, একত্র আহার, একত্র ভ্রমণ, একত্র শয়ন ছিল। বড় সুখেই পিটারের শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল। তাহার মাতুলানী ধর্ম্মভীরু মহিলা ছিলেন; সুতরাং, পিতৃমাতৃহীন পিটারকে তিনি পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

তাহার পর যখন যৌবন-প্রারম্ভে পিটার এবং মেরী উভয়ে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইল, তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। মেরী তাঁহার একমাত্র সন্তান ও পিটার পুত্রাপেক্ষা প্রিয়তর—সুশীল, সচ্চরিত্র এবং বিনয়ী।

লিখাপড়া সমাপ্ত হইলে পিটারের মাতুল তাহাকে ফিস্ কোম্পানীতে কর্ম্ম করিয়া দিলেন। পিটারকে তখন বাধ্য হইয়া পৃথক থাকিবার ব্যবস্থা করিতে হইল। হিন্দু পরিবার হইলে এমনটি ঘটিতে পারিত না; কিন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতা স্বতন্ত্র;—স্বাবলম্বন তাহার মূল মন্ত্র।—উপার্জ্জনক্ষম হইয়া পিটার আর মাতুলের আশ্রয়ে থাকা যুক্তিসঙ্গত মনে করিল না। তবে সেই গৃহের

আলোক আসিয়া একদিন যে তাহার গৃহ আলোকিত করিবে, সে কিম্বা মেরী একদিনের জন্যও সে বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারে নাই। যতদিন সেই সময় না উপস্থিত হইতেছে ততদিন পৃথক থাকা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং পিটার পৃথক বাসা লইল।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় আফিস হইতে ফিরিয়া মাতুলগৃহে গমন করা পিটারের ব্রত ছিল। দৈবাৎ কোন দিন তাহার আসিতে বিলম্ব ঘটিলে মেরী দ্বারদেশে আসিয়া সাগ্রহে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিত।

মেরীর স্নিগ্ধোজ্জ্বল চক্ষু, তাহার মুক্তাসদৃশ শুভ্র দন্তপংক্তি, তাহার প্রশান্ত মুখাকৃতি, তাহার সুবর্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশদাম এবং সুন্দর গঠন পিটারের হৃদয়ে প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের সৃষ্টি করিত। পিটার দুই হাতে তাহার কুসুমকোমল হস্ত মর্দ্দন করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিত; অন্যের অলক্ষ্যে তাহার বিম্বাধরে চুম্বন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিত।

এমনই করিয়া কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। পিটারের অবস্থা তখনও এত স্বচ্ছল হয় নাই যে, সে বিবাহের প্রস্তাব করিতে পারে। আবার বিবাহের কল্পনা মনে হইলে, তাহার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় এতাদৃশ অভিভূত হইত যে, সে কেমন করিয়া মাতুলের নিকট সে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না।

যখন পিটার ক্রমোন্নতির শিখরে আরোহণ করিল—যখন সুপ্রতিষ্ঠিত ফিস্ কোম্পানীর সে "ছোট সাহেব" হইল এবং অধ্যবসায় এবং যত্নসহকারে বর্ণশঙ্কর সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিল—তখন বিধাতার অলক্ষ্য অঙ্গুলীসঙ্কেতে তাহার ভাগ্যাকাশে কৃষ্ণ মেঘের সঞ্চার হইল!

* * *

টমাস মেরীর খুল্লতাতপুত্র। পিটার যখন প্রত্যহই মনে করিতেছে, আজ যেমন করিয়াই হউক মাতুলের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিব, তখন এক দিন অপরাহ্ণে টমাস সিভিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে রাজ্যশাসনার্থ আগমন করিল। টমাস খাঁটি য়ুরোপীয়ান্; মেরীর সে গৌরব ছিল না। মেরীর পিতা কার্য্যব্যপদেশে এ দেশে আগমন করিয়া এক য়ুরেসিয়ান রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। সেই রমণী মেরীর জননী। সুতরাং, জাতি-গৌরবে এবং পদমর্য্যায় পিটার এবং টমাসের মধ্যে অনেক প্রভেদ। একজন এক দিন উচ্চপদে অধিরূঢ় হইয়া শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইতে পারেন;

অন্যজন লক্ষপতি এবং লাট সভার সভ্য নিযুক্ত হইলেও প্রথমোক্ত ব্যক্তির তুলনায় সমাজের চক্ষুতে বহু নিম্নে অবস্থিত থাকিবেন।

এই যে অকিঞ্চিৎকর প্রভেদ—এই যে অন্যায় ব্যবধান মেরীর নিকট ইহা অত্যন্ত বিরাট এবং উৎকট বলিয়া অনুমিত হইল। মেরীর পিতাও মেরীকে ইঙ্গিতে এ কথা বুঝাইয়া দিতে বিস্মৃত হইলেন না। মেরীর মাতার অবশ্য এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বিবেচনার বিষয় ছিল না। তিনি স্বয়ং বর্ণশঙ্কর, সুতরাং পিটারকে সে হিসাবে টমাস অপেক্ষা অধিক আত্মীয় মনে করিতেন। তবে সওদাগরপত্নী হওয়া অপেক্ষা সিবিলিয়ান পত্নী হওয়া যে অধিক গৌরবের কথা সে কথা তিনিও অস্বীকার করিতে পারিতেন না।

টমাস আসিয়া মেরীর প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিল এবং মেরীও তাহার হৃদয়ের আসক্তি গোপন করিয়া টমাসের প্রতি কৃত্রিম অনুরাগ প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিতা হইল না। সে যেন একটা ক্রীড়া।

মেরী যখন টমাসের সহিত অধিক সময় অতিবাহিত করিতে আরম্ভ করিল পিটার তখন হৃদয়ে শক্তিশেল অনুভব করিল। যখন মেরী এবং টমাস টেনিস্ খেলিতে খেলিতে আনন্দে কোলাহল করিত, পিটার তখন দূর হইতে কাতর-নয়নে মেরীর মুখপ্রতি চাহিয়া থাকিত। মেরী তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিত, কিন্তু লক্ষ্য করিয়াও পিটারকে জানিতে দিত না যে, সে তাহার যন্ত্রণা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে।

মানুষ যাহা অভ্যাস করিতে চেষ্টা করে ক্রমে তাহা তাহার প্রকৃতিগত হইয়া যায়। কৃত্রিম প্রণয় প্রদর্শন করিতে করিতে মেরীর হৃদয় স্বতঃই পিটার হইতে একটু দূরে আসিয়া পড়িল। মেরী যে পিটারকে আর ভালবাসিত না তাহা নহে, তবে সে ভালবাসার উপর কৃত্রিমতার আবরণ আসিয়া পড়িল। মেরী যত আপনাকে পিটার হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিত পিটার তত নিকটে থাকিতে প্রায়াস পাইত। ফলে, মেরী ক্রমে পিটারের প্রতি বিরক্ত হইতে আরম্ভ হইল;—পিটার যেন তাহার এবং টমাসের মধ্যে একটি বিকট ব্যবধানস্বরূপ প্রতীয়মান হইল। বিরক্তি ক্রমে ঘৃণায় পরিণত হইল এবং প্রকৃত প্রণয়ের উপর কৃত্রিমতার আবরণ দৃঢ় হইয়া আসিল।

পিটার যখন অনুভব করিল যে, সে মেরীর ঘৃণার পাত্র, তখন তাহার হৃদয়ে বড় ব্যথা বাজিল। সে ব্যথার যন্ত্রণা বড় তীব্র। প্রথমে পিটার তাহাতে অভিভূত হইয়া পড়িল, কিন্তু যখন সে যন্ত্রনায় হৃদয় অনেকটা অসাড় হইয়া

পড়িল তখন তাহার হৃদয়ে প্রতিহিংসাবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সে যে পথ অবলম্বন করিল, তাহা একান্তই ঘৃণ্য। কিন্তু এরূপ অবস্থায় লোকের বিচার-শক্তি খর্ব্ব হইয়া আইসে; সুতরাং পিটার কৃপার পাত্র—সহানুভূতির অধিকারী।

যখন প্রায় একরূপ স্থির হইয়া গেল যে, মেরীর সহিত টমাসের বিবাহ হইবে, তখন এক দিন মধ্যাহ্নে পিটার অকস্মাৎ তাহার মাতুলগৃহে আগমন করিল। সে মেরীকে জানাইল, তাহার পিতা অকস্মাৎ আফিসে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন এবং সেইজন্য সে তাহাকে তথায় লইয়া যাইতে আসিয়াছে। তাহার মাতাকে এ কথা বলিতে নিষেধ, কারণ তাঁহার হৃদ্‌রোগ ইদানীং এত প্রবল হইয়াছে যে, অতর্কিত বিপদ-সংবাদে তাঁহার জীবন-সংশয় ঘটিতে পারে। মেরী তাহার সহিত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিল এবং উভয়ে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে প্রবেশ করিল।

পিটারের আদেশে গাড়ী যে বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহা মেরীর পিতার আফিস নহে। মেরী বিস্ময় প্রকাশ করিলে পিটার বলিল,—সেই স্থানে তাহার পিতাকে লইয়া আসিয়া শুশ্রূষা করা হইতেছে। মেরী সে কথা অবিশ্বাস করিল এবং কোন গভীর ষড়যন্ত্রের আশঙ্কায় করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিল। পিটার তখন পকেট হইতে একটি রিভলভার বাহির করিয়া তাহার ললাট লক্ষ্য করিয়া বলিল, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একপদ অগ্রসর হইলে মেরীর মৃতদেহ ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে। বিপদ-বিহ্বলা বালিকা পিটারের আদেশে তাহার অগ্রে অগ্রে সেই জনশূন্য গৃহে প্রবেশ করিল। মেরী ভীতা হইয়াছিল যে, পিটার সেই গৃহে বলপূর্ব্বক তাহাকে বিবাহ-অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিবে। তাহার সন্দেহ সত্য হইল। মেরী সেই গৃহে বন্দিনী হইল। নানা উৎপীড়নে পিটার তাহাকে আপনার পত্নীত্বে বৃত হইবার অঙ্গীকারবদ্ধা করিতে প্রয়াস পাইল।

ক্রমে সব কথা প্রকাশ পাইল। পুলিশ মেরীর উদ্ধার সাধন করিল।

তাহার পর আদালতে অভিযুক্ত হইয়া পিটারের সাত বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল। অসৎ কার্য্যের অপ্রতিহার্য্য অনুশোচনা লইয়া হতভাগ্য কারাগৃহের কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ হইল।

পিটার চলিয়া গেল; টমাস এই মোকদ্দমার পর তাহাকে পরিত্যাগ করিল; মেরীর দুঃখের ক্ষোভের সীমা রহিল না। সমাজে সে উপেক্ষিত—আত্মীয়

বন্ধু কর্ত্তৃক পরিবর্জ্জিত হইয়া রহিল। কতবার সে টমাসের নিকট অশ্রুজলে অভিষিক্ত লিপি প্রেরণ করিয়াছে—কিন্তু তাহার উত্তর পায় নাই। প্রায় এক বৎসর পিতৃগৃহের প্রাচীরাভ্যন্তরে আত্মগোপনের ফলে মেরীর স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইল। কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মেরী জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

মেরীর পিতা টমাসকে সংবাদ দিলেন, মেরী তাঁহাকে একবার দেখিতে চাহে। টমাস প্রত্যুত্তরে মেরীর অসুখের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া সৌজন্য জানাইল;—কিন্তু আসিল না। মেরীর রোগমলিন মুখ অশ্রুপ্লাবিত হইয়া গেল।

পরদিন পিটারের এক পত্র আসিল। কারাগৃহের চিহ্ন-অঙ্কিত—স্থানে স্থানে অশ্রুকলুষিত, মর্ম্মস্পর্শী সে পত্র! তাহার প্রতি বর্ণ—প্রতি ছত্র হৃদয়ের রক্তে রঞ্জিত। মেরীর প্রতি তাহার যে অবিচলিত ভালবাসা, তাহা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। অনুশোচনা তাহার চিত্তবৃত্তিকে এতাদৃশ অভিভূত করিয়াছে যে, সময় সময় তাহার মনে হয়, তাহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে। অহোরাত্র তাহার হৃদয়ে রাবণের চিতা জ্বলিতেছে—তাহার জ্বালা বৃশ্চিক-দংশন জ্বালার অপেক্ষাও তীব্র—তীক্ষ্ণ! মেরী—তাহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—তাহার ইহজীবনের ধ্রুবতারা—তাহার পরজীবনের শ্রেষ্ঠা। মেরী কি তাহাকে ক্ষমা করিবে? এক বৎসর—প্রতি রাত্রিতে সে মেরীর লাঞ্ছিত মুখচ্ছবি দেখিয়া নিদ্রাঘোরে কাঁদিয়া উঠিয়াছে। গত রজনীতে সে স্বপ্ন দেখিয়াছে—মেরী রোগ-শয্যায় শায়িতা, তাহার শীর্ণ কম্পিত হস্তে একখানি উন্মুক্ত লিপি, তাহার নিষ্প্রভ আঁখিযুগল অশ্রুস্নাত। স্বপ্ন দেখিয়া সে এমন বিকট চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল যে, কারারক্ষক প্রহরী ভীত হইয়া কারাধ্যক্ষকে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিল। টমাস্—টমাস্ কি তাহাকে প্রত্যাহার করিয়াছে? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই; কিন্তু টমাস কি নিষ্ঠুর! তাহার ভালবাসা কৃত্রিম—নতুবা প্রণয়িনীর অলীক কলঙ্ক তাহার প্রণয়-বর্জ্জনের কারণ হইত না। মেরী কি যথার্থই রুগ্না—অসুখিনী—পরিত্যক্তা? মেরী কি একবার আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যাইবে না? সে আপনার সুখের জন্য মেরীকে দেখিতে চাহে না। তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত—তাহার বন্দিদশা, তাহার লাঞ্ছিত মর্য্যাদা দেখিলে মেরীর হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইবে; দয়া ঘৃণার স্থান অধিকার করিয়া মেরীকে মহিমময়ী দেবী

মূর্ত্তিতে পরিণত করিবে। যদি তাহাই হয়;—সে তাহার পক্ষে কি সুখের দিন! ভগবান—এতদিনে ভগবানের নাম মনে হইয়াছে,—ভগবান কি তাহাকে ক্ষমা করিবেন, এমন সুখের দিনের ব্যবস্থা করিবেন? মেরী—মেরী, তুমি কাহার?

পত্র পড়িতে পড়িতে মেরীর নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটি অশ্রুসজল হইয়া আসিল,—বিশীর্ণ গণ্ড গড়াইয়া অশ্রুমুক্তা ঝরিতে লাগিল। মনে হইল, শৈশবের স্মৃতি—মনে হইল, বাল্যবন্ধু পিটারের উজ্জ্বল প্রশান্ত মুখচ্ছবি। মনে হইল, যৌবনসঙ্গী প্রেম-বিহ্বল চিরসুন্দর পিটার; সে তাহার জন্য কত কষ্ট—কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। তাহার সুখের জন্য পিটার কি না করিতে পারিত? এক দিনের কথা মনে হইল—সে দিন পিটার স্বীয় জীবন বিপন্ন করিয়া মেরীকে শার্দ্দূলমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিল! পিটার তাহাকে ভালবাসিত;—সে ভালবাসা যেমন গভীর, তেমনই অনাবিল। কেবল টমাস্ মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদের মধ্যে আসিয়া প্রমাদ ঘটাইয়াছে। মেরীর হৃদয় করুণায় বিগলিত হইয়া গেল। সহানুভূতি তাহার ঘৃণা বিদূরিত করিয়া প্রেমের উৎস মুক্ত করিয়া দিল। ক্রমে মেরীর পাংশু মুখ প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল।

মেরীর মাতা পিটারের পত্রের প্রত্যুত্তর লিখিলেন, মেরী রোগশয্যায় শায়িতা; সুস্থ হইলে সাক্ষাৎ করিবে।

কিন্তু সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষ পিটারকে মাণ্ডালে জেলে স্থানান্তরিত করিলেন। কিছুদিন পরে মেরীর পিতার মৃত্যু হইল। তাহার আর মাণ্ডালে যাইয়া পিটারের সহিত সাক্ষাৎ করা ঘটিয়া উঠিল না।

যে প্রেম এতদিন ফাল্গুনদীর ন্যায় অন্তঃপ্রবাহিনী ছিল, এখন উন্মুক্ত হইয়া দূরত্বের ব্যবধানে রুদ্ধস্রোত নদীর ন্যায় ক্রমে স্ফীত অনবরোধনীয় হইয়া উঠিল।

আরও ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। কারাবসানের পর পিটার মেঘনির্ম্মুক্ত হ্রস্বকলঙ্ক স্নিগ্ধদীপ্তি পূর্ণশশীর ন্যায় সমুদ্রতীরে আসিয়া দাঁড়াইল। অদূরে নিকটবর্ত্তী পোতাভ্যন্তরে তাহার লাঞ্ছিতা মেরী তাহাকে সম্বর্দ্ধন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য আসিতেছে। বীচিবিক্ষুব্ধ সমুদ্র-বক্ষের ন্যায় তাহার হৃদয় তরঙ্গ-সঙ্কুল। বুঝি তাহার ঘাত প্রতিঘাত শুনিতে পাওয়া যাইতেছে! পিটার হস্তাবরণে দৃষ্টি দূর-নিবদ্ধ করিয়া দেখিতেছে, যেন মেরী জাহাজের ডেকের উপর রেলিং ধরিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

ক্রমে জাহাজ তীরবর্ত্তী হইল; তখনও পণ্টুন হইতে দুই চারি হাত দূরে রহিয়াছে, কিন্তু অসহিষ্ণু মেরী আর অপেক্ষা করিতে পারিল না, পিটারকে লক্ষ্য করিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

পরমুহূর্ত্তে ঝপ্ করিয়া একটি শব্দ হইল এবং জাহাজ আসিয়া পণ্টুনের গাত্রে সংলগ্ন হইল। পিটারের চক্ষু আনন্দাশ্রুতে পরিপ্লুত; সে যেন কিছু দেখিতে পাইল না। কিন্তু যখন উচ্চ কোলাহল উঠিল, তখন তন্ময় পিটারের সংজ্ঞা লাভ হইল। উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া সে জলে ঝাঁপ দিতে গেল, কিন্তু বহু লোক তাহার গতিরোধ করিল।

তাহার পর মেরীর মৃতদেহ তীরে আনীত হইল এবং সেই দিন অপরাহ্নে তাহার সমাধি হইল।

হতভাগ্য পিটার! মাণ্ডালের রাস্তায় রাস্তায় "পিটার পাগল" ঘুরিয়া বেড়ায় এবং প্রতি নিশীতে মেরীর কবরের উপর বুক পাতিয়া অতি করুণ কণ্ঠে তাহাকে বলিতে শুনা যায়,—"মেরী—মেরী, তুমি কি এই স্থানে আছ?"

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মৃত্যু।

এ জীবনে একবার, দরশন পা'বে তা'র,
পা'বে তা'র স্নেহ-পরশন;
ঘুচাইয়া ভুল ভ্রান্তি, দিবে সে অনন্ত শান্তি,
ফুটাইবে সুদিব্য নয়ন।
সে কি আসে যখন তখন?

যেথা ইচ্ছা যাও চলি,' থাক তুমি তা'রে ভুলি,'
ভুলিবে না সে তোমা কখন,
যখন সময় হ'বে সে আসিয়া অঙ্কে ল'বে
খুলি' দিবে সহস্র বন্ধন।
সে কি আসে যখন তখন?

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

বিদ্যাসাগর।*

জীবনবৃত্ত সাহিত্যের একটি প্রধান ও আবশ্যক অঙ্গ। ইতিহাসের সহিত জীবনবৃত্তের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ইতিহাসে জাতীয় জীবনের উত্থান, উন্নতি, কীর্ত্তি ও পতনের কথাই আলোচিত হইয়া থাকে। জীবন-কথায়, যাঁহারা সেই জাতীয় জীবনের উত্থান, উন্নতি ও কীর্ত্তিলাভে সহায়তা করিয়া থাকেন তাঁহাদেরই কথা আলোচিত হয়। যে সময় জাতীয় জীবনে নূতন তরঙ্গধারা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময় এক একটি তরঙ্গ সেই আগন্তুক অভিনব ভাবের ফেনপুঞ্জ মস্তকে ধারণ করিয়া জাতীয় ইতিহাস বারিধির বক্ষে আবির্ভূত হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রথমে এই অভিনব ফেনপুঞ্জে মস্তক মণ্ডিত করিয়া আবির্ভূত হয়েন তাঁহারা মহাপুরুষ—তাঁহারাই নূতন যুগের প্রবর্ত্তক। সমতল ধরাপৃষ্ঠে উদীয়মান সূর্য্যের কিরণ সম্পাত হইবার বহুপূর্ব্বে যেমন সমুন্নত গিরিশীর্ষে সৌরকর কনকরাগে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে, সেইরূপ জনসাধারণের মানসক্ষেত্রে নূতন ভাবের আলোকরশ্মি ছড়াইয়া পড়িবার অনেক পূর্ব্বে সেই ভাবের হৈমদ্যুতি সমুন্নতমনা মনস্বিগণের মানসপটে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। যাঁহারা জাতীয় জীবনের এই নবতরঙ্গের অগ্রদূত, যাঁহারা এই নূতন আলোকের প্রথম ভোক্তা, তাঁহারাই জন সাধারণের আদর্শ ও শিক্ষক। তাঁহাদের নশ্বর দেহ নষ্ট হইয়া গেলেও জনসাধারণের মনে তাঁহারা অবিনশ্বর সিংহাসন লাভ করিয়া থাকেন। সেইজন্য তাঁহারা অমর। ইংলণ্ডীয় কবি বলিয়াছেন :—

"To live in hearts we leave behind
Is not to die."

---

* বিদ্যাসাগর—শ্রীবিহারীলাল সরকার প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য কাপড়ে বাঁধাই সাতসিকা, কাগজে বাঁধাই দেড় টাকা।

যাঁহারা জনসাধারণের আদর্শ ও শিক্ষক তাঁহাদের জীবন-কথা সাধারণের অবশ্যপাঠ্য। এইরূপ সমুন্নতমনা মহাত্মগণের জীবনকথা পাঠ করিলে মানব আপনাকে ও আপনার সমাজকে বুঝিতে পারে,—আত্মশক্তিতে অবহিত হয়। আমাদের মধ্যে একজন যাহা করিয়া গিয়াছেন,—আমরা তাহা না করিতে পারিব কেন, এইরূপ অলক্ষ্য অশরীরী বাণী যেন মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণের চরিত-পাঠককে কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বদাই উৎসাহিত করিতে থাকে। পরন্তু এইরূপ মহাত্মগণ সমাজে যে অভিনব ভাবের প্রভাব সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন,—যে ভাব অলক্ষ্যে আমাদের সামাজিক ও নৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করিতেছে,—সে ভাবটি সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে যিনি সেই ভাবের অগ্রদূত তাঁহার জীবন-কথা ও সামসময়িক ঘটনাবলী নিবিষ্টমনে পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। এই জন্য বৈদেশিক মহাত্মগণের জীবনকথা আলোচনা করা অপেক্ষা স্বদেশীয় মনস্বিগণের চরিত আলোচনা আরও অধিক ফলপ্রদ। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত অতি অল্পই উল্লেখযোগ্য জীবনবৃত্ত প্রকাশিত হইয়াছে!

সুপ্রসিদ্ধ লেখক, কবি ও সমালোচক শ্রীযুত বিহারীলাল সরকার মহাশয় স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি অতি উৎকৃষ্ট জীবন-কথা লিখিয়াছেন। সম্প্রতি সেই পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এতদিন পরে এরূপ সুন্দর পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে,—ইহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়। এই উপন্যাস-নাটক-প্লাবিত দেশে এখনও জীবন-কথা-পাঠকের সংখ্যা প্রয়োজনানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই, ইহাতে এই দুঃখজনক সত্যই সূচিত হইতেছে। বিহারী বাবুর ভাষা সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী ও ভাবগর্ভ। তাঁহার তথ্যানুসন্ধিৎসাও অনন্যসাধারণ। কালিদাস পদ্মপুরাণ হইতে 'শকুন্তলার' আখ্যানবস্তু সংগ্রহ করিয়াছিলেন,— এ তথ্য তিনিই প্রথমে তাঁহার 'শকুন্তলা রহস্য' নামক পুস্তকে প্রচারিত করেন। সিরাজউদ্দৌলাকৃত অন্ধকূপ হত্যার অলীকত্ব প্রমাণে তিনিই সাহসপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 'জন্মভূমিতে' তিনিই প্রথমে এ বিষয়ে সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন,—এবং পরে উহা 'ইংরেজের জয়' নামক সুন্দর পুস্তকের অন্তর্ভূক্ত করিয়াছেন। ভাষা গৌরবে তাঁহার 'তিতুমীর' অসাধারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু 'বিদ্যাসাগর'ই বিহারী বাবুর প্রধান কীর্ত্তি। ভাষা-গৌরবে এই গ্রন্থখানি যেমন গৌরবান্বিত,—পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক যত্ন সহকারে সংগৃহীত তথ্যে ইহা তেমনই

সম্পদশালী। ইহাতে এমন অনেক আবশ্যক তথ্য সংগৃহীত আছে যাহা অন্য কোনও গ্রন্থে নাই। সেই জন্য সাধারণে এই গ্রন্থখানিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিতাবলীর মধ্যে প্রথম ও প্রধান স্থান দান করিয়া থাকে।

স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় একজন বিখ্যাত পুরুষ ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব (personality) তাঁহাকে ভারতবাসীর নিকট অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি, প্রোজ্জ্বল প্রতিভা, সর্ব্বব্যাপিনী দয়া, বিস্তীর্ণ সহানুভূতি, অসীম ঔদার্য্য, অপূর্ব্ব স্বজাতিহিতৈষণা তাঁহাকে চিরকালই বাঙ্গালী-সমাজে বরেণ্য করিয়া রাখিবে। তিনি শিক্ষার পথ সুগম ও সাহিত্যের বনিয়াদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে যে ঋণজালে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী তাহা কখনই বিস্মৃত হইতে পারিবে না। যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙ্গালায় অমর রহিবেন। কিন্তু যে কৌলিক ও পারিপার্শ্বিক ঘটনানিচয় বিদ্যাসাগরকে এই অসাধারণত্ব প্রদান করিয়াছিল,—তাহা সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত না হইলে বিদ্যাসাগরকে সম্যকরূপে বুঝা সম্ভব নহে। একজন বিখ্যাত জীবনবৃত্তকার লিখিয়াছেন,—

"The great man springs from an ancestry competent to produce him; he is the final flower and ultimate outcome of converging hereditary forces that culminate at last in the full production of his splendid and exceptional personality." ইহার মর্ম্মার্থ এই যে মহাত্মগণ যে কুলে জন্মিয়া থাকেন, সে কুল তাঁহাকে উৎপন্ন করিবার যোগ্য। যে সকল কৌলিক শক্তি তাঁহার ন্যায় গৌরবমণ্ডিত ও অসাধারণ ব্যক্তিকে উৎপন্ন করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, সেই সমস্ত কৌলিক শক্তি একমুখী হইয়া তাঁহাকে তাহাদের চরম ফল এই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব প্রদান করে।" গ্রাণ্ট অ্যালেন যেরূপ কৌলিক শক্তিকে ডার্বিনের অসাধারণত্বের জননী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, সেইরূপ সকল অসাধারণ ব্যক্তির অসাধারণত্বই তাহাদের কৌলিক শক্তি-প্রসূত। ইহা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। বিদ্যাসাগরও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁহার পিতৃবংশ ও মাতৃবংশ কিরূপ অসাধারণ প্রতিভান্বিত ছিল, বিহারী বাবুর গ্রন্থে তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। বিহারী বাবু অত্যন্ত নিপুণতার সহিত একে একে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

তাঁহার পুস্তকের প্রথম অধ্যায় সেই আলোচনায় পূর্ণ। ইহা ভিন্ন বিহারী বাবু পরম হিন্দু। কোষ্ঠীফলে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস। সেইজন্য তিনি তাঁহার পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিদ্যাসাগরের কোষ্ঠীর ফলের সহিত তাঁহার জীবন ফল মিলাইয়া দিয়াছেন। এ ব্যাপারটি বিশেষরূপ আলোচ্য ও বটে।

ইহা ভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থাও (environments) মানব-চরিত্র-গঠনে বহুল পরিমাণে প্রভাব বিস্তৃত করিয়া থাকে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। বিদ্যাসাগরের সমকালীন সামাজিক অবস্থা ও চিন্তা-প্রবাহ তাঁহার জীবনের ও মতামতের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল। তাঁহার বাল্যশিক্ষাও তাঁহার জীবনপথকে বিশেষরূপ নিয়ন্ত্রিত করে। বিহারী বাবুর পুস্তকপাঠে বিদ্যাসাগরের জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবে। সকলেই জানেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় একজন প্রধান সংস্কারক ছিলেন। সাহিত্য-সংস্কার, শিক্ষাসংস্কার ও সমাজসংস্কার প্রভৃতিই তাঁহার জীবনের উদ্দিষ্ট ছিল। তিনি যে সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময়েই পাশ্চাত্য আলোক কেবলমাত্র ভারতে অরুণরাগে ফুটিয়া উঠিতে-ছিল। সেই আলোক-প্রভাবে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। সেই আলোক তরঙ্গের প্রথম সঙ্ঘাত বড়ই তীব্র হইয়াছিল। তখন ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মনে করিতেন, হিন্দুর যাহা কিছু তাহাই কুসংস্কার-বিজৃম্ভিত,— ইংরেজের যাহা কিছু তাহাই উন্নতির পরিচায়ক। সেইজন্য তদানীন্তন শিক্ষিত সম্প্রদায় অনিয়মিত মদ্যপানে ও গোমাংসাদি হিন্দুর অখাদ্য ভোজনে আত্মগৌরব অনুভব করিতেন। বিদ্যাসাগরের অত্যুন্নত প্রজ্ঞায় সেই উৎকট আলোক প্রতিফলিত হইয়াছিল, কিন্তু সে আলোকের প্রভাব তাঁহার অলোক-সামান্য ব্যক্তিত্বকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। বিদ্যাসাগর সেই আলোক-সাহায্যে সাহিত্যের ও শিক্ষার পদ্ধতি সংস্কৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু চলোর্ম্মীচালিত শৈবালখণ্ডের ন্যায় নিজ জাতীয়তার গণ্ডী ছাড়িয়া উধাও হইয়া ভাসিয়া যায়েন নাই। তিনি ইংরেজদিগের সহিত যত ঘনিষ্টভাবে মিশিয়া ছিলেন, তাঁহার সময় কেহই সেরূপ ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার অবকাশ পায়েন নাই। কিন্তু তথাপি তিনি কি আহারে, কি পরিচ্ছদে কিছুতেই জাতীয়ভাব পরিত্যাগ করেন নাই। নানাস্থানে নানা অসুবিধা ভোগ করিয়াও তিনি চটি জুতার সম্মান বজায় রাখিয়াছিলেন। এ সকল তথ্য বিহারী বাবুর পুস্তকেই সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। যে প্রতীভা বিদ্যাসাগরকে এত প্রতিকূল

শক্তির বিরুদ্ধে আপনার জাতীয়তা ও নিজস্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ করিয়াছিল, সে প্রতিভা যে অসাধারণ, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে সমর্থ নহেন। পাশ্চাত্য আলোকের প্রভাবেই তিনি সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সংস্কারে তিনি স্বজাতির রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্ম প্রভৃতিতে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই। তিনি ধর্ম্মের ও ধর্ম্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়াই সমাজসংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন। বিহারী বাবু এ সকল তথ্য তাঁহার গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের অনেকটা উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরই বঙ্কিম বাবু বাঙ্গালা গদ্যকে সম্পদশালী ও গৌরবমণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শিক্ষা-সংস্কারই বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রথম ও প্রধান গৌরবজনক কার্য্য। তিনি প্রথম ভাগ হইতে সীতার বনবাস পর্য্যন্ত বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণীত করিয়া বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার পথ যেরূপ সুগম করিয়া গিয়াছেন—উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদী, ঋজুপাঠ, প্রভৃতি সঙ্কলিত করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার কণ্টকাকীর্ণ পথ যেরূপ কুসুমাস্তৃত করিয়া গিয়াছেন,—তাহাতেই তাঁহার প্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আর সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা পদ্ধতি সুগম করিবার জন্য তিনি "এডুকেশন কৌন্সিলকে" যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন,—তাহাতেই আমরা তাহার প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় পাইয়া থাকি। কেবল বিহারী বাবুই অতীব পরিশ্রমের সহিত অনুসন্ধান করিয়া এই রিপোর্ট তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। অন্য কোনও পুস্তকেই এ রিপোর্ট নাই। এ রিপোর্ট ভিন্ন বিদ্যাসাগর চরিত্র সম্পূর্ণ হইতেই পারে না।

বিহারী বাবুর বিদ্যাসাগরে আর একটি অসাধারণ বিশেষত্ব বর্ত্তমান। সাধারণ চরিত-লেখকের ন্যায় তিনি তাঁহার আলোচ্য ব্যক্তির স্তব করিয়াই গ্রন্থ সমাপ্ত করেন নাই। ঐরূপ করিলে চরিত লেখার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। অনেক চরিত-লেখক মানুষকে দেবতা গড়িতে প্রয়াস পাইয়া হাস্যভাজন হইয়াছেন। কিন্তু বিহারী বাবুর নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যাহা কিছু ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রতীত হইয়াছে, তিনি অসঙ্কোচে তাহার নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা সপ্রমাণ করিতে ও সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় অশেষ পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এমন কি এই

কার্য্যকেই তিনি তাঁহার জীবনের 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৎকর্ম্ম' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। এই বিধবা-বিবাহ ব্যাপারেই বিহারী বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত ভিন্নমত। তিনি বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক বলিয়াছেন সত্য,—কিন্তু বিদ্যাসাগর যে সরল বিশ্বাসে এই মত প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন,—ইহা তিনি বিশেষরূপে সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে বিহারী বাবু ভ্রান্ত, কি বিদ্যাসাগর ভ্রান্ত, সে বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তবে এইমাত্র বলিতে পরি যে, বিহারী বাবু এই গ্রন্থে নিজত্ব বজায় রাখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন-কথার আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতেই গ্রন্থখানির গৌরব অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তৃতীয় সংস্করণে পুস্তকখানির ছাপা, ছবি ও বাঁধাই অতি সুন্দর হইয়াছে। পরিশিষ্টে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের মন্তব্য ও প্রায় পঞ্চাশজন খ্যাতনামা ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনকথা প্রদত্ত হইয়াছে। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার পাঠ্য তালিকাভুক্ত দেখিলে আমরা প্রীত হইব। বাঙ্গালীমাত্রেরই এই পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। এই পুস্তক প্রণয়নের বিপুল শ্রমে বিহারী বাবুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে; ইহার সম্যক সমাদরে তিনি সেই শ্রমের সার্থকতা দেখিতে পাইবেন।

কাতরা।

—:•:—

(সংস্কৃত হইতে।)

যাইব শুনিয়া, ব্যাকুল হইয়া,
অবসর তরে বসিয়াছিল।
নাহি গুরুজন, পেয়ে নিরজন,
কি বলিবে বলে' আসিয়াছিল।
যত বার আসে, আঁখিনীরে ভাসে,
সম্বরিতে তাহা ফিরিয়া যায়;
যাতায়াত সার, হইল প্রিয়ার
কথা অকথিত রহিল, হায়!

সংগ্রহ।

—:•:—

সাহিত্য।

—*—

ডিকেন্সের স্ত্রী-চরিত্র।

—:*:—

ইংরাজি সাহিত্যে ডিকেন্সের রচনার তুলনা নাই। যখন ইংরাজি পাঠক-সমাজ স্কটের যুদ্ধবিগ্রহবহুল নবন্যাস পাঠ করিয়া ক্রমে শ্রান্তিবোধ করিতেছিল, তখন রহস্য-রচনানিপুণ ডিকেন্স 'পিকউইক পেপার্স', প্রকাশ করিয়া যে যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন কাল তাহা বিনষ্ট করিতে পারে নাই। ডিকেন্স রহস্য-রচনার শাণিত অস্ত্রে সমাজ-শরীরের ব্যাধিদুষ্ট অংশ দেহচ্যুত করিয়া দিয়া সমাজ ব্যাধিমুক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং অসাধারণ প্রতিভাবলে বহু পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

সংপ্রতি সার রবার্ট নিকল ডিকেন্সের স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে যে সন্দর্ভ লিখিয়াছেন তাহাতে ঔপন্যাসিকের জীবনের এক অংশ নূতন আলোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে; দেখা গিয়াছে, তিনি স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতা লইয়া উপন্যাসবর্ণিত চরিত্র চিত্রিত করিয়াছিলেন। ডিকেন্সের সহিত কুমারী বেডনেলের পত্রব্যবহার নামক পুস্তকই লেখকের অবলম্বন। এই পত্র গুলিতে সপ্রমাণ হইতেছে যে, কুমারী বেডনেলই 'ডেভিড কপারফিল্ডে' ডোরার ও 'লিটল ডরিটে' ফ্লোরার আদর্শ এবং প্রথমোক্ত পুস্তকে নায়কের প্রেমব্যাপার উপন্যাসিকের স্বীয় অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি।

পরিচয়।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বেডনেল পরিবারের সহিত ডিকেন্সের পরিচয় হয়। মিষ্টার বেডনেল ব্যাঙ্কার অর্থাৎ মহাজন ছিলেন। ডিকেন্স তাঁহার তিন কন্যার সর্ব্ব কনিষ্ঠা মেরায়াকে ভালবাসেন। তখন ডিকেন্সের বয়স অষ্টাদশ, মেরায়ার উনবিংশ। ডিকেন্স তখন আইন আফিসের কায ছাড়িয়া দিয়াছেন—তিনি তখন বেকার। তিনি তখন লণ্ডনের সর্ব্ব বিষয় লক্ষ্য করিতেছেন ও নাটক রচনা করিতেছেন। মেরায়া তাঁহার সহিত প্রেম ক্রীড়া করিত। কিন্তু তাহার পিতামাতার বিশ্বাস ছিল, এই বেকার যুবক কখনই তাঁহাদের জামাতৃপদে বৃত হইবার উপযুক্ত নহে। সেও তাহাই ভাবিত।

হতাশা।

ডিকেন্স স্বয়ং লিখিয়াছেন, মেরায়া অন্য প্রণয়প্রার্থীদিগকে উত্যক্ত করিবার জন্য সময় সময় তাঁহার প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিত। কাযেই ডিকেন্সের অসুখের সীমা ছিল না। তথাপি তিনি মেরায়ার মোহে মত্ত ছিলেন; তাহাকে পাইবার জন্য সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত ছিলেন। অবশেষে তিনি বুঝিলেন, মেরায়া তাঁহাকে বিবাহ করিবে না। ডিকেন্সের সকল আশা নির্ম্মূল হইল।

ইহার পর ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ডিকেন্স কুমারী হোগার্থকে বিবাহ করেন। তিনি যেন আপনার বেদনাস্মৃতি হইতে মুক্তিলাভকামনায় এ বিবাহ করেন। কিছু দিন সুখে কাটিল; কিন্তু সব যায়, স্মৃতি যায় না। ডিকেন্স প্রথম যৌবনের প্রেমস্মৃতি বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। বেডনেল পরিবারে পরিচিত বহু ব্যক্তির চিত্র তিনি চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি আত্মচরিত লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এই প্রেম-পরিচয় কালের বর্ণনা-কালে তিনি আর লিখিতে পারেন নাই; পাণ্ডুলিপি ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন। হায় প্রেম! ইহার পর তিনি 'ডেভিড কপারফিল্ড' রচনা করেন। এই গ্রন্থ তাঁহার হৃদয়শোণিতে লিখিত, তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। এই গ্রন্থ বর্ণিত ডোরা চরিত্র অঙ্কন-কালে তাঁহার সংশয়ের সীমা ছিল না। ডোরা তাঁহার প্রথম যৌবনের প্রেম-প্রতিমা—মেরায়া।

বিবাহ।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ৩৫ বৎসর বয়সে মেরায়ার বিবাহ হয়। বহুদিন ডিকেন্সের সহিত মেরায়ার কোন রূপ পত্রব্যবহারাদি ছিল না। ১০ বৎসর পরে এক দিন অন্য অনেকগুলি পত্রের সঙ্গে মেরায়ার একখানি পত্র ডিকেন্সের হস্তগত হয়। ডিকেন্স প্রাপ্তিমাত্র সেই পরিচিত হস্তাক্ষর চিনিতে পারেন। তাহার পর ডিকেন্স স্বীকার করিয়াছিলেন যে, এত দিন তিনি যাহাই করুন না কেন—যে কাযেই থাকুন না কেন, তিনি মেরায়ার স্মৃতি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তিনি মেরায়ার নাম শুনিলে শিহরিয়া উঠিতেন। তিনি মেরায়াকে 'ডেভিড কপারফিল্ড' পাঠ করিয়া সেই পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিতে—তাঁহার প্রেমের গভীরতা উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করেন।

বহুদিন পরে।

পত্রের ভাবে বোধ হয়, মেরায়া ডিকেন্সকে জানাইয়াছিলেন, পিতামাতার অসম্মতি না থাকিলে তিনি ডিকেন্সকে বিবাহ করিতেন। ডিকেন্সকে তখনও সেই পূর্ব্বের মত বলিয়া মনে করিতেন। সাক্ষাতে সে মোহ দূর হইয়া গিয়াছিল; সেই দারুণ অভিজ্ঞতার কথা 'লিট্‌ল ডরিটে' বর্ণিত আছে। ইহার পর একবার ডিকেন্স তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

এই প্রেম-ব্যাপারে ডিকেন্সের দাম্পত্য জীবনের অসুখের কারণ বুঝা যায়—তাঁহার প্রতি স্বতঃই সহানুভূতিতে আমাদের হৃদয় আকৃষ্ট হয়।

বিবিধ।

—:*:—

সমাজসংস্কারক ডিকেন্স।

ডিকেন্সের শতবার্ষিক উৎসবের আর অধিক বিলম্ব নাই। তাই বর্ত্তমান সময়ে নানাপত্রে ডিকেন্সসম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। সংপ্রতি মিষ্টার ম্যাজ সমাজসংস্কার সম্বন্ধে ডিকেন্সের চেষ্টার ও কার্য্যের পরিচয় দিয়া 'বুকম্যান' পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন।

ডিকেন্স তাঁহার উপন্যাসে নানা অত্যাচার ও অনাচার দূর করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

শিক্ষা।

তাঁহার উপন্যাসগুলি অনাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধতূর্য্য নিনাদিত করিয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতা ও পত্র পাঠ করিলে বুঝা যায়, তিনি সংস্কারকল্পে সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। তিনি নানাবিধ সংস্কার সাধনোদ্দেশে বহু প্রবন্ধও লিখিয়াছেন। কারাগার-সংস্কার, শিল্পসংস্কার, সন্তানপালন, দরিদ্রাবাস—ডিকেন্স এ সকল কথারই বিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন। আজকাল—এতদিন পরে—আমরা যে ব্যবস্থা করিতেছি, বহুকাল পূর্ব্বে ডিকেন্স সেই ব্যবস্থার কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা ব্যতীত কিছুই হইবে না। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি লিখিয়াছিলেন,—অজ্ঞতাই অনাচারের কারণ। যাহাতে কারিগরী বিদ্যাগারে শিক্ষা সহজে কাযে লাগান যায় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন।

কারাগার-সংস্কার ডিকেন্সের মতে অত্যাবশ্যক ছিল। তিনি বলিতেন, যাহাতে বালকগণ

কারাগার-সংস্কার।

কারাগারে যাইতে না চাহে—তাহাই কর। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে কলেরার প্রাদুর্ভাবকালে তিনি একটি প্রবন্ধে শ্রমজীবীদিগকে স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া সহরের সংস্কার দাবী করুক। এই যে উপদেশ—এই যে পরামর্শ ইহা জননায়কেরই উপযুক্ত—ইহা সমাজের উচ্চস্তরস্থদিগের বিরুদ্ধে নিম্নস্তরস্থদিগের যুদ্ধ ঘোষণা—ইহা সমাজে সাম্যমন্ত্রপ্রচার। তিনি প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। যদিও তিনি ইংলণ্ডের আইন হইতে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা তুলিয়া দিতে পারেন নাই, তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, 'টাইমস' পত্রে প্রকাশিত তাঁহার পত্রের ফলে প্রকাশ্য স্থানে প্রাণদণ্ডদানের ব্যবস্থা রহিত হয়।

এখন তাঁহার শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, তাহার আলোচনা চলিতেছে।

———

স্বপ্ন।

(জর্ম্মাণ হইতে।)

উভয়েই বেকার; কাহারও চাল চুলা নাই। একজন তুর্ক অপর জন বেদিয়া। ক্ষুধিত হইয়া উভয়ে একটা হোটেলে প্রবেশ করিল। যেমন হোটেল, তেমনই আহার্য্য। তথায় একটা শীর্ণকায় মুরগী ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ভৃত্য সেটাকে মারিয়া পালক ছাড়াইয়া এক টুকরা কাঠ সংগ্রহ করিয়া ঝলসাইতে লাগিল।

তুর্ক বলিল, "মুরগীটা যেরূপ তাহাতে উহাতে উভয়ের ক্ষুন্নিবারণ হয় না। আইস, আমরা উভয়ে নিদ্রা যাই; যে ভাল স্বপ্ন দেখিবে সেই মাংস খাইবে। কি বল?"

বেদিয়া স্বীকৃত হইল;

উভয়ে হর্ম্ম্যতলে শয়ন করিল।

তুর্ক ঘুমাইল, কিন্তু ক্ষুধাতুর বেদিয়ার নয়নে নিদ্রা নাই। সে কেবল মুরগীটাকে দেখিতে লাগিল।

যখন "রন্ধন" শেষ হইল, তখন তুর্ক নিদ্রিত। বেদিয়া উঠিয়া খাইতে লাগিল।

তুর্ক জাগিয়া বলিল; "কি খবর? তুমি কি স্বপ্ন দেখিলে?"

বেদিয়া বলিল, "তোমার স্বপ্ন-কথা অগ্রে বল।"

"ভাল। আমি স্বপ্ন দেখিলাম, মহম্মদ আমার জন্য স্বর্গ হইতে একখানি মই নামাইয়া দিলেন। সে মই রেশম-নির্ম্মিত। আমি উঠিলাম। স্বর্গদ্বারে দেবদূত জননীর মত আমার অভ্যর্থনা করিলেন; বিবিধ খাদ্য ও পানীয় দিলেন। অন্য দেবদূতগণ আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহারাও আমাকে বহুবিধ মিষ্টান্ন দিলেন এবং অবিশ্বাসীদিগকে প্রহার করিবার জন্য একগাছি স্বর্ণ যষ্টিও দিলেন। আমি তাহা লইলাম না; কারণ, সে ভার লইয়া আসিতে হইলে আমার আসিতে বিলম্ব হইবে—এ দিকে খাদ্য প্রস্তুত।

তুর্ক মুরগীর সন্ধান করিতে লাগিল।

বেদিয়া বলিল, "তুমি লাঠী গাছটি লইলে পারিতে। কারণ, তোমাকে মই বহিয়া স্বর্গে উঠিতে দেখিয়াই আমি বুঝিলাম, মহম্মদ অবশ্যই তাঁহার অতিথিকে উত্তম আহার্য্য দিবেন। তাই আমি মুরগীটি খাইয়াছি।"

আর্য্যাবর্ত্ত।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
সম্পাদিত।

—০—

সূচী।

প্রকাশক—শ্রীদুর্গানাথ বসু।



আপনি কি জানেন

হাঁসমার্কা লিনসিড তৈল সকলে এত পছন্দ করেন কেন ?

রংয়ের কার্য্যকে উজ্জ্বল ও কাষ্ঠকে স্থায়ী করিতে কোন তৈল ইহার সমকক্ষ নয়, পরীক্ষা দ্বারা সকলে আশাতীত ফল পাইয়াছেন।

এণ্ড্রু ইউল এণ্ড কোং ৮ ক্লাইভ রো।

সীলেট চুণ

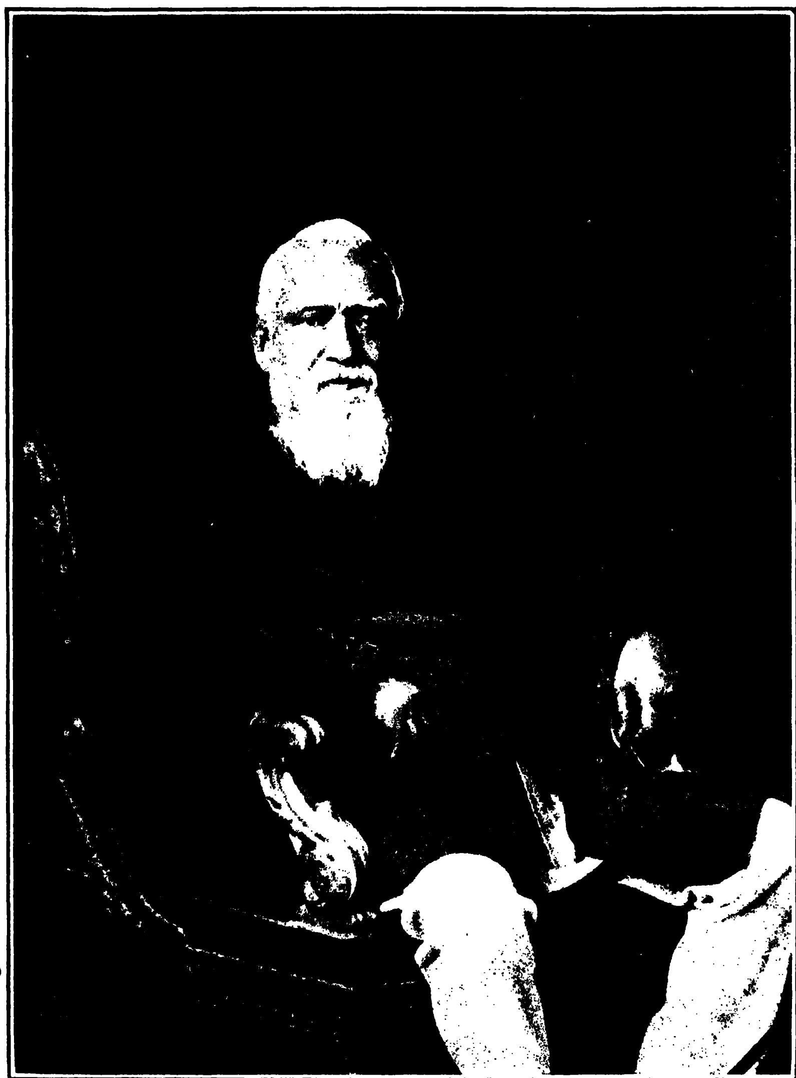
সীলেট চুণের

গাঁথুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের ন্যায় পরিণত হয়।

গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চুণ বস্তাবন্দী করিয়া রেলে কিম্বা ষ্টীমারে বুক করিয়া দিই।

কিলবরণ এণ্ড কোং।

৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।



স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী

লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্।

পুরাতন প্রসঙ্গ।

(৮)

৩১শে বৈশাখ, ১৩১৮।

অনেক দিন পরে আজ আবার সন্ধ্যার সময় বীডন উদ্যানে পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত আলাপ করিবার অবসর পাইলাম।

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"আজ তোমার সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত হইবার কথা ছিল, তথায় গেলে না কেন ?" আমি বলিলাম,—"শরীর ভাল নহে।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই সকল অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করা হয় কি ?" আমি উত্তর করিলাম,—"হয় বৈকি ? আজ সম্রাট্ কনিষ্কের একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদর্শন করিবার কথা আছে। তিনি বলিলেন,—"দেখ, কালিদাসের পুস্তকে যে নিষ্ক কথাটি পাওয়া যায়, আমার মনে হয় উহা আর কিছুই নহে, ঐ কনিষ্কের স্বর্ণমুদ্রা। নিষ্ক কথাটির অর্থ কি জান ? ছেলেদের গলায় অলঙ্কার-স্বরূপ যে সোণার ধুকধুকি পরাইয়া দেওয়া হয়, সেই অলঙ্কার-বিশেষকে নিষ্ক বলে। এখনকার ছেলেপিলের গলায় যেমন নবাবি আমলের মোহর কিম্বা ইংরাজের গিনি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, সেইরূপ হয় ত সীথিয় শকরাণের মোহর কালিদাসের সময়ে ব্যবহৃত হইত।"

আমি বলিলাম,—"আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বিশেষতঃ যদি এ কথা ঠিকই হয় যে, কনিষ্ক খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক, এবং মহাকবি কালিদাস চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের এক রত্ন।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—"দেখ, গ্রীক মুদ্রা আমাদের দেশে এত প্রচলিত ছিল যে, সংস্কৃত ভাষার মধ্যে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া সুকঠিন নহে। সংস্কৃত 'দ্রম্য' নিশ্চয়ই যাবনিক Drachma। অমরকোষে তাম্রের একটি নাম 'ম্লেচ্ছমুখ'। হইতে পারে, ম্লেচ্ছমুখের বর্ণের মত ইহার বর্ণ, কিন্তু আমার মনে হয় যে, বাস্তবিকই এই মুদ্রায় ম্লেচ্ছরাজার মুখ অঙ্কিত ছিল।"

আমাদের এই কথোপকথনের মাঝখানে একজন ভদ্রলোক বলিলেন—"শুনিয়াছেন মহাশয়, অনারেবল্ মোহিনীমোহন রায়ের এক পুত্র নোট জাল করা অপরাধে ধৃত হইয়াছে ?" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পণ্ডিত

মহাশয় বলিলেন—"মোহিনী বাবু was the architect of his own fortune। যখন তিনি সংস্কৃত কলেজে অঙ্কশাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন, আমি তখন তাঁহার ছাত্র। কিন্তু যখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল, তখন আমরা দুজনেই প্রথম বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলাম। বঙ্কিম বাবুও আমাদের সহিত উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার পর আমি বি. এ. পড়িবার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইলাম, মোহিনী বাবু কমিটি পরীক্ষা দিয়া উকিল হইলেন; রাজসাহী জিলায় ওকালতী আরম্ভ করিলেন। জিলার জজ লুইস জ্যাক্‌সন যখন তাঁহাকে স্নেহ করিতেন, বলিতেন—মোহিনীর বালকের মত কচি মুখ ও কোঁকড়ান চুল আমার বড় ভাল লাগে। পরে লুইস জ্যাক্‌সন যখন হাইকোর্টে আসিলেন, মোহিনী বাবুকে কলিকাতায় আসিতে পরামর্শ দিলেন। ক্রমে মোহিনী বাবুর কপাল ফিরিয়া গেল। লুইস্ জ্যাক্‌সনের আদালতে তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। সে কালের সেই কমিটি পাস করা উকিলদিগের মধ্যে তিনি বেশ গুছাইয়া ইংরেজি বলিতে পারিতেন, লুইস জ্যাক্‌সনও তাহাই পছন্দ করিতেন। আবার তিনি মোকর্দ্দমা এমন করিয়া আরম্ভ করিতে পারিতেন যে, প্রথম হইতেই জজের কাণ খাড়া হইয়া উঠিত। একবার এক আপিলের মুখবন্ধে তিনি বলিলেন—"My Lord, analysis of cases may be of two kinds,—the one a commonsense view of the case, the oher a learned analysis of it. Mr. Field has here given us a very learned analysis; but your Lordship will, I trust, appreciate the other kind of analysis, the commonsense view of the case." আমার বেশ মনে পড়ে, জজ প্রথম হইতেই মনোনিবেশ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। লুইস জ্যাক্‌সনের আদালতে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। উকিলরা তাঁহাকে ভয় করিতেন। পচা খাস আপিল দাখিল করিবার জন্য প্রসিদ্ধ কোনও উকিল আপিলের সওয়াল জবাব আরম্ভ করিতে না করিতেই তিনি আপিলের কাগজ আস্তে আস্তে ফেলিয়া দিতেন। তিনি আপনার সুখ্যাতি পর্য্যন্ত শুনিতে ভালবাসিতেন না, বরং যে তাঁহাকে সুখ্যাতি করিত, তাহাকেই কড়া কথা শুনাইয়া দিতেন। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা তোমাকে পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি, * কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমার মনে পড়িতেছে।

* আর্য্যাবর্ত্ত—চৈত্র, ১৩১৭।

একদিন একটা মোকর্দ্দমার argumentএর সময় তিনি লুইস জ্যাক্সনকে একটু compliment দিলেন,অমনি জজ বলিয়া উঠিলেন—"You must not expect to win your case by flattering me ;' হেম বাবুও অবিচলিত ভাবে উত্তর দিলেন—'Then I withdraw the remarks, my Lord'. হেম বাবুর ঐ একটা অসাধারণ গুণ ছিল, তিনি সদাই প্রফুল্ল থাকিতে পারিতেন। একদিন দ্বারি বাবু তাঁহাকে বলিলেন, 'গ্যাখ্ হেম, তোর ব্যাপারখানা কি বল্ দেখি? এই যে জজদের কাছে এত লাথি ঝাঁটা খাস্, তবুও তুই সর্ব্বদা হাসিস্, তোর মুখ ত কখনও ভার দেখ্লুম না।' দ্বারি বাবুর কথায় হেম বাবু হাসিতে লাগিলেন। হেম বাবুর এই সহাস্ত ভাব আমার বড় ভাল লাগিত। একবার তিনি আমাকে উপলক্ষ করিয়া একখানা গোটা নাটকই রচনা করিয়া ফেলিয়াছিলেন, এবং খান পঞ্চাশেক মুদ্রিত করিয়া বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। আমার নিকট সে নাটকের একখণ্ডও নাই। দেখি যদি উমাকালীর নিকট থাকে।

"কিন্তু মোহিনী বাবুর কথা বলিতেছিলাম। একটা বড় জমিদারি কিনিবার সময় লুইস জ্যাক্সন তাঁহাকে টাকা ধার দিয়াছিলেন। আজ সেই বিষয় সম্পত্তি তিন নয় ছয় হইয়া গেল!

"তখনকার দিনে জজরা যে উকিলের উপর বিরক্ত হইতেন, তাহার কারণ ছিল। কমিটি পাশ করা অনেক উকিল ভাল করিয়া গুছাইয়া ইংরাজি বলিতে ত পারিতেনই না, পরন্তু যাহা বলিতে যাইতেন, তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত রকম দাঁড়াইত। একজন উকিল একবার একটা right of wayর মোকর্দ্দমা উপলক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বিচারপতিকে বুঝাইতে চাহেন যে, যে পথ লইয়া বিবাদ হইতেছে, সে পথে সদা সর্ব্বদাই সকলের গতিবিধি ছিল। এই কথাটি বুঝাইবার জন্য তিনি ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন—It is a case of promiscuous intercourse, my Lord. জজ ম্যাক্ফার্সন্ উকিলের দিকে তাকাইয়া আস্তে আস্তে বলিলেন—You are a born idiot, Babu.

"বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারেই মোহিনী বাবুর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়। আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া কয়েক মাস ডভ্‌টন্ কলেজে পড়িয়াছিলাম। ডভ্‌টন্ কলেজে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন ডাক্তার জর্জ স্মিথ। সুন্দর, সরল, সুদীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত

ললাট, সৌম্য কান্তি, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ;—তাঁহাকে সকলেই ভক্তি করিত। তিনি প্রসিদ্ধ দার্শনিক স্যর উইলিয়ম হ্যামিণ্টনের ভক্ত ছাত্র ছিলেন। তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার গুরু হ্যামিণ্টন পক্ষাঘাত-রোগগ্রস্ত অবস্থাতেই অধ্যাপনা করিতেন। মিষ্টার স্মিথ দুইখানা বড় বড় পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন,—ডাক্তার ডফের জীবন-চরিত ও বিশপ কটনের জীবন-চরিত। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। দার্শনিক জর্জ্জ পেনের একখানি পুস্তক আমি এমন করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম যে, তিনি আমার আগ্রহ দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। আমার সহাধ্যায়ীরা সকলেই লাটিন জানিত, আমি উক্ত ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম, ইহা জানিতে পারিয়া তিনি আমাকে তাঁহার নিজকক্ষে বসাইয়া লাটিন শিখাইতেন। কিন্তু তিনি অধিক দিন অধ্যাপনা করিলেন না। কলেজের কাজ ছাড়িয়া দিয়া তিনি শ্রীরামপুরে গেলেন; সেস্থানের 'ফ্রেণ্ড অভ্ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদক হইলেন। সম্পাদক হইয়া তিনি কিছু গোল করিয়া বসিলেন। আমি জানিতাম, তিনি একটু গোঁড়া খ্রীষ্টান। সেই জন্যই গোল বাধিল। তখনও সিপাহিবিদ্রোহবহ্নি সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হয় নাই। 'ফ্রেণ্ড অভ্ ইণ্ডিয়া' এমন উৎকট খ্রীষ্টানি সুরে লিখিতে আরম্ভ করিল যে, গভর্মেণ্ট পর্য্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ খ্রীষ্টান না হইলে ইংরাজের রক্ষা নাই, এই কথাই উক্ত পত্রিকা বারম্বার বলিতে লাগিল। লর্ড ক্যানিং দেখিলেন, এ এক নূতন বিপদ; এরূপ উন্মত্ত প্রলাপে আবার অশান্তির তুফান উঠিতে পারে। সবিশেষ চিন্তা করিয়া তিনি মুদ্রাযন্ত্রের একটি আইন করিলেন, এবং উহার ফলে পত্রিকাখানা বন্ধ হইয়া গেল।

"বহুদিন পরে, আমি যখন হাইকোর্টে ওকালতি করি, একদিন শ্রীরামপুর রেল ষ্টেসনে মিষ্টার স্মিথকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাই,—সেই সুদীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত ললাট, সৌম্য কান্তি। তিনিও আমার প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন, আমার কিন্তু ভরসা হইল না যে, তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করি।

"হিন্দু কলেজের কাপ্তেন রিচার্ডসনের ন্যায় মিষ্টার স্মিথ যশস্বী হইতে পারেন নাই। আমি কাপ্তেনের কাছে কখনও অধ্যয়ন করি নাই; কিন্তু যখন আমি সংস্কৃত কলেজে পড়ি, তখন তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি। তোমরা বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে যে, লর্ড মেকলে রিচার্ডসনের মুখে সেক্সপীয়রের কিয়দংশের আবৃত্তি শুনিয়া এক চমৎকৃত

হইয়াছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। পরে কিন্তু মিষ্টার বীটনের (Drinkwater Bethune) সঙ্গে তাঁহার মনোমালিন্য হয়; তিনি কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। যতদূর আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম, তাঁহার এই কর্ম্মত্যাগের একটা নিগূঢ় কারণ ছিল, কিন্তু সে বিষয়ের আলোচনা এখন নিষ্প্রয়োজন।

"কাপ্তেন রিচার্ডসনের চাকরিটি গেল। অল্পকাল পরেই মতিলাল শীল ও রাজেন্দ্রলাল দত্ত প্রমুখ কয়েকজন ভদ্র লোক সিঁদুরিয়াপটির গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে মেট্রোপলিটান কলেজ নামক একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করিলেন। এখন হ্যারিসন রোডে সে বাড়ীর চিহ্নমাত্রও নাই, তাহার উপর দিয়া উক্ত রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। এই বাড়ীতে 'বিধবা-বিবাহ নাটক' প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। কাপ্তেন রিচার্ডসন সেই বিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। কলেজটি কিন্তু বেশি দিন টিকিল না। আমি যখন বি. এ. পাস করিয়াছি, তখন শুনিলাম যে, কাপ্তেন রিচার্ডসন কয়েকমাস প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে রাজকুমার সর্ব্বাধিকারি প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। আমি তাঁহার মুখে রিচার্ডসনের যথেষ্ট প্রশংসাবাদ শুনিয়াছি।

কাপ্তেন রিচার্ডসন Selections from English Poets, Literary Leaves, প্রভৃতি যে কয়খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন, সেই কয়খানা পুস্তকেই তিনি যে গুণপনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। তিনি ইংরাজ ও স্কচ্ কবিদিগকে যথোচিত সমালোচনা করিতে ছাড়েন নাই। এমন কি সেক্সপীয়রের যে সনেটটি পাঠ করিলে শিক্ষিতব্যক্তিমাত্রই বিস্ময়ে ও লজ্জায় অধোবদন হয়েন,—'Master mistress of my passion' ইত্যাদি, রিচার্ডসন সেই সনেটটিরও একটি সুরুচিপূর্ণ ব্যাখ্যা করিবার নিষ্ফল প্রয়াস পাইয়াছিলেন; অবশেষে তিনি বলিয়া উঠেন 'I wish Shakespeare had never written a sonnet like this.' যেকলে একবার হিন্দুকলেজে কাপ্তেন রিচার্ডসনের ছাত্রদের পরীক্ষা লইলেন। ঘটনাচক্রে যে কবিতাটি তাঁহার দৃষ্টিতে পড়িল, সেটি মিল্টনের একটি সনেট—যে কবিতায় তিনি ভয় প্রকাশ করিতেছেন যে, একদল সৈন্য আসিয়া তাঁহার গৃহ ভাঙ্গিয়া দিবে। তিনি কাপ্তেন, কর্ণেল ইত্যাদি সেনানায়কদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার যেমন পিণ্ডারের বাড়ীটি ভগ্ন করেন নাই, সেইরূপ

তাঁহারাও যেন ইংরাজ কবির বাড়ীটি না ভাঙ্গেন। কবিতাটির প্রথম ছত্র captain or colonel বলিয়া আরব্ধ হইয়াছে। পাঠ করিবার সময় কলোনেল উচ্চারণ না করিলে ছন্দপতন হয়। একজন ছাত্র প্রথমেই কবিতাটি পড়িবার সময় কলোনেল পড়িয়া গেল। মেকলে আনন্দিত হইয়া যুবকটির নিকটে আসিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইতে লাগিলেন।

"সম্প্রতি না কি রমেশচন্দ্র দত্তের এক ভাগিনেয়ীর সতীদাহ হইয়াছে? কাগজওয়ালারা না কি খুব বাহবা দিতেছে? দেখ, হরেস্ হেম্যান্ উইলসন্ আইনের দ্বারা সতীদাহ উঠাইয়া দিতে না কি নারাজ ছিলেন। একজন ইংরাজ এই প্রথার বিরোধী হয়েন নাই। ইহা কিরূপে ঘটিল, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন বটে, এমন কি সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি জোর এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেন যে, সতীদাহরোধ করিলে হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে। এই বিশ্বাসেই বোধ হয় তিনি আইনের দ্বারা সতীদাহ উঠাইতে চাহেন নাই।

"সিন্ধুদেশ জয় করিয়া যখন স্যর চার্ল্‌স্ নেপিয়র উক্তপ্রদেশে ইংরাজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তখনই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, তথায় আর সতীদাহ চলিবে না, কারণ সিন্ধুজয়ের দশ বৎসর পূর্ব্বেই লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে ইংরাজ-রাজ্য হইতে সতীদাহ-প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইংরাজ-রাজত্বের বিশিষ্ট গৌরব এই যে, উহার মধ্যে সতীদাহ-প্রথা অথবা ক্রীতদাস রাখিবার প্রথা আদৌ থাকিতে পারিবে না। যখন ঘোষণা প্রচারিত হইল, তখন তথাকার কয়েকজন প্রাচীন ধর্ম্মাভিমানী চাঁই-গোছ হিন্দু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন—হুজুর, সতীদাহ উঠাইয়া দিলে আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হয়। এই কথা শুনিয়া তিনি অম্লানবদনে উত্তর দিলেন—সতীদাহ তোমাদের ধর্ম্মের অনুগত হইতে পারে; কিন্তু আমি যে ধর্ম্ম মানি, এ প্রথা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত; অতএব জানিয়া রাখিও, যিনি ইহাতে লিপ্ত হইবেন, আমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে ফাঁসি দিব।—It may be your religion to burn your widows, but remember, it is my religion to hang those who will be concerned in it.—এই কথায় ভট্টিকাব্যের দুইটি শ্লোক আমার মনে পড়ে। রাক্ষস মারিচ বলিতেছেন—আমাদের ধর্ম্ম এই

যে, দ্বিজ ও বেদযজ্ঞীদিগকে হত্যা করা, নগরকে প্রেতের আবাস ভূমি করা,—

অগ্নঃ দ্বিজান্ বেদযজ্ঞীন্ নিহন্মঃ
কুর্ম্মঃ পুরং প্রেতনরাধিবাসং

ইত্যাদি,

রামচন্দ্রও উত্তর দিলেন 'তোমাদের যদি ঐ ধর্ম্ম হয়, আমারও এক ধর্ম্ম আছে,—যাহারা ঐ রূপ করিবে, তাহাদিগকে নিধন করা—

ধর্ম্মোঽস্তি সত্যং তব রাক্ষসায়ং
অন্যো ব্যতিস্তে তু মমাপি ধর্ম্মঃ
ব্রহ্মদ্বিষস্তে প্রণিহন্মি যেন
রাজন্যবৃত্তির্ধৃতভাস্বরাস্ত্রঃ।

ইহাতে দেখিতেছি যে, যেস্থানে যত উচ্চ অঙ্গের কর্ম্মবীর (men of action) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সমান অবস্থায় সংস্থাপিত হইলে সকলেরই একস্বরে 'রা' বাহির হয়। কোথায় ত্রেতাযুগের রামচন্দ্র, কোথায় স্যর চার্লস্ নেপিয়র! কিন্তু দেখ, যেন দুজনে পরস্পর পরামর্শ করিয়া কথা কহিতেছেন।

"যখন লর্ড বেণ্টিংকের আমলে সতীদাহ উঠাইবার হুকুম প্রচারিত হইল, তখন না কি হিন্দুসমাজের চাঁইগণ ইংলণ্ডে সে বিষয়ের প্রতিবাদের জন্য আন্দোলন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, এবং সেই উপলক্ষে তথায় এক-জন কৌন্সিলি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই কৌন্সিলি আর কেহ নহেন, আমাদিগের পরিচিত মিষ্টার বীটন (John Drinkwater Bethune) যিনি প্রায় ২২।২৩ বৎসর পরে এখানে আইনের সদস্য Law Member হইয়া আই-সেন। তিনি না কি যখন সতীদাহের স্বপক্ষে কৌন্সিলি হয়েন, তখন এই প্রথার বিশেষ বিবরণ, ইহার ঘোরতর অত্যাচারপূর্ণতা, ইহার লোমহর্ষণ নৃশংসতা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। পরে এ দেশে আসিয়া এবং এস্থানের লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া তিনি সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। তখন উহার স্বপক্ষে এক সময়ে কৌন্সলি হইয়াছিলাম বলিয়া এরূপ দুর্ব্বিবহ অনুতাপযন্ত্রণা তাঁহার হৃদয়কে অভিভূত করিল যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, দেশের নারীজাতির প্রতি এই প্রকার অত্যাচার-পাতকে আমি লিপ্ত হইয়াছি, উহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য সেই দেশের নারী-

জাতির কিঞ্চিৎ উপকারার্থ আমি আমার সর্ব্বস্ব দিয়া যাইব। তদনুসারেই তিনি বেথুনকলেজের প্রতিষ্ঠাকল্পে সর্ব্বস্ব দান করিয়া গিয়াছেন।

"আমি দেখিতেছি যে, এখনও প্রাচীনধর্ম্মানুরাগী কোনও কোনও মহাত্মা ব্যক্তি সতীদাহ-প্রথার প্রতি কিছু কিছু অনুরাগ প্রদর্শন করেন; এবং গায়ের জোরে উহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে ইহা ভাবিয়া তাঁহারা এখন পর্য্যন্ত যেন কিছু মনঃক্ষুন্ন হয়েন। ইহাতে ততদূর আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ নাই। কারণ Lecy's History of Rationalism পাঠ করিয়া দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মানুষ পোড়ান য়ুরোপেও বড় অধিক দিন উঠিয়া যায় নাই। এই সমস্ত ব্যাপার এবং য়ুরোপের ইতিহাসে ক্রুসেড নামক যুদ্ধ এবং ক্যাথলিক প্রটেষ্টাণ্টদিগের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী ঘোরতর রক্তারক্তি ব্যাপার, এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে মনোমধ্যে একটা বিষন্নতার ভাব আসিয়া পড়ে এবং মনে হয় How melancholy is the history of mankind when contemplated in connection with events like these! উন্নতি, উন্নতি বলিয়া আমরা যে বড়াই করিয়া থাকি তাহা কত সামান্য! এবং কি প্রকার অত্যাচারপরম্পরার মধ্যে দিয়া সেই যৎ-সামান্য উন্নতি লাভ করা গিয়াছে ভাবিলে এক প্রকার হতাশ্বাস হইতে হয়।

"এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বিধবা বিবাহ সম্বন্ধেও দুই এক কথা বলা যায়। আমি দেখিতেছি, এক্ষণে উচ্চ শিক্ষিত দলের মধ্যেও সনাতন ধর্ম্মের দিকে যে একটা reaction আসিয়া জুটিয়াছে তাহার প্রভাবে বিধবা বিবাহের প্রতিও বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। আরও এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোম্‌তের দলও সেই বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করেন। এ স্থলে বক্তব্য যে কোম্‌তের বিবিধ * apercuর মধ্যে একটি apercu আছে তাহার নাম তিনি দিয়াছেন বিশুদ্ধ বিবাহ—chaste marriage। তিনি বলেন যে, যদিও

* কিছু কাল হইল ফরাসি ভাষায় দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে এই একটি নূতন কথা প্রচলিত হইয়াছে। ইংরাজিতে এখনও পর্য্যন্ত ইহার অনুরূপ কোনও শব্দ বাহির হয় নাই। মোটা মুটি apercu শব্দের অর্থ এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, যখন কোনও চিন্তাশীল কোনও একটা গুরুতর এবং নানাবিষয় প্রসবী (prolific idea) উদ্ভাবিত করেন যাহার আন্দোলন দ্বারা অনেক অভিনব তত্ত্বকথা মনোমধ্যে উদিত হয়, তাদৃশ Idea কেই apercu কহে। কোম্‌তের গ্রন্থাবলীর মধ্যে এই প্রকার বিস্তর apercu লক্ষিত হয়, তাহার এক একটি অবলম্বন করিয়া এক একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ দেওয়া যাইতে পারে। কোম্‌ৎ কিন্তু দুচারি কথায় ইঙ্গিত মাত্র করিয়াই সারিয়া দিয়া গিয়াছেন।

পুরাকালে প্রথম উভয়ে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সন্তান উৎপাদন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপে শারীরিক বৃত্তি চরিতার্থকরা। চরমাবস্থায় কিন্তু বিবাহের সেই উদ্দেশ্য স্বীকার করা যায় না। স্ত্রীজাতি ও পুরুষ জাতির স্বাভাবগত অনেক গুলি বৈলক্ষণ্য আছে। এমন অনেকগুলি গুণ ও প্রকর্ষ (perfection) স্ত্রীজাতিতে আছে, যথা, স্নেহ, পরানুগ্রহ, কোমলতা, সন্তানপ্রতিপালনতৎপরতা, পরদুঃখকাতরতা, প্রভৃতি—যেগুলি সেই পরিমাণে সাধারণতঃ পুরুষজাতিতে স্বাভাবিক বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে পুরুষজাতিরও এইরূপ কতগুলি প্রকর্ষ আছে,যথা সাহস,দৃঢ়তা,অধ্যবসায়, নহোচ্চবাঞ্ছা এই বৃত্তি, যেগুলি সেই পরিমাণে স্ত্রীজাতির নাই। জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল হয়ত বলিবেন যে, স্ত্রীপুরুষজাতির এই স্বাভাবগত বিভিন্নতা উভয়ের চিরন্তন প্রচলিত শিক্ষার ও অভ্যাসের বিভিন্নতাবশতঃ ঘটিয়াছে এবং অভ্যাসের কিঞ্চিৎ অদল বদল করিয়া দিলে কয়েক পুরুষের মধ্যে সেই বৈসাদৃশ্য উঠিয়া যাইবে। কোম্‌তের মত কিন্তু তাহা নহে। যেমন স্ত্রীজাতির শ্মশ্রু উদ্ভেদ হয় না, চুল বড় হয়, স্তনদ্বয় বিবৃদ্ধ হয়, শরীরে লোম অল্প হয়, অস্থি কোমল থাকে, অধিকাংশই cartilage, স্বভাবের বিভিন্নতাও সেইরূপ physiological। পুরুষেরও তদ্রূপ। এখন কোম্‌ৎ বলেন যে,যখন বিবাহদ্বারা দুই জাতি পরস্পর সর্ব্বদা কাছাকাছি থাকে, তখন একের দেখিয়া অন্যের হীনতাগুলি কতকদূর অপনীত হইতে থাকে। পুরুষের স্নেহবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, নারীর অধ্যবসায় প্রবল হয়, ইত্যাদি। এই সকল পরিবর্ত্তন অপ্রার্থনীয় নহে। ইহাতে সমাজের উপকারই আছে, এবং বিবাহ দ্বারা সেই অভিপ্রায়টি কিয়দংশে সিদ্ধ হয়। অতএব যদি বিবাহের প্রধান অভিপ্রায় ইহাই হইল, তবে রিপুর চরিতার্থতার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিশেষতঃ এরূপ অনেক রুগ্ন, শীর্ণ, জীর্ণ ব্যক্তি আছেন যাঁহাদিগের পক্ষে সন্তানের উদ্ভব উচিত নহে। আজিকার কালে একথা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। রোগ যে পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হয়, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বভাবের দোষও তদ্রূপ। কেবল আমরা অদ্যাপি চিত্তদৌর্ব্বল্য বশতঃ এই গুরুতর শারীরতত্ত্বানুসারে চলিতে পারি না। কিন্তু ইহা আমাদিগের বড়ই লজ্জার ও ঘৃণার কথা। আমি স্বয়ং পক্ষাঘাতগ্রস্ত বা মৃগিরোগগ্রস্ত অথচ আরও অনেক সেই সেই রোগগ্রস্ত জীবকে পৃথিবীতে আনিবার উদ্যোগ করিতেছি, ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত কাণ্ড আর কি হইতে

প্পারে? কিন্তু এখন পর্য্যন্ত অতি অল্প লোকই ইহা ভাবিয়া থাকেন। বাপ মা ছেলেপুলের বিবাহ দিবার সময়ে একটু ভাবেন বটে, কিন্তু বিবাহ একবার হইয়া গেলে দম্পতি আদৌ এদিকে লক্ষ্য করে না। আবার য়ুরোপে এতন্নিবারণার্থ যে সকল প্রথা প্রচলিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে, যাঁহাদিগের অন্তকরণে ভব্যতার লেশ আছে তাঁহারা কেহই বোধ হয় সে-গুলির অনুমোদন করিবেন না। কেহ কেহ এই উপলক্ষে ভ্রূণহত্যাপ্রথাও চালাইতে চাহে। তৎসম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উহা ভদ্রলোকের নিকটে নিতান্ত জুগুপ্সিত ব্যাপার। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া কোম্‌ৎ বিশুদ্ধ বিবাহ নামে এক নূতন কাণ্ড চালাইতে চাহেন। তিনি বলেন, বিবাহ কর, কিন্তু শারীরিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিও না। ইহারই নাম chaste marriage। এই কথা শুনিবামাত্র বোধ হয় পনের আনা তিন পাই লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিবেন এবং কোম্‌ৎকে বদ্ধ পাগল বলিয়া বিদ্রূপ করিবেন। কিন্তু আমার ত বোধ হয়, যদি চ কাম-রিপুর তুল্য প্রবল বৃত্তি আর নাই, তথাপি কোম্‌তের নূতন কাণ্ডটা একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বিষয় বলিয়া বোধ হয় না। রোমান ক্যাথলিক পাদ্রিদিগের মধ্যে এ সম্বন্ধে বিস্তর ভণ্ডামি প্রকাশিত হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহাই বলিয়া উহা একেবারে আদ্যোপান্ত ভাওাখি বলিয়া মনে হয় না। তাহা হইলে এতদিন সমাজ কখনই উহা সহ্য করিত না।

"এখন বলিতে চাহি যে, যেমন কোম্‌তের মতে বিশুদ্ধ বিবাহ এক নূতন কাণ্ড, সেইরূপ ধর্ম্মবিবাহ (Religious marriage) আর একটি নূতন কাণ্ড। তিনি বলেন, ধর্ম্মবিবাহসূত্রে গ্রথিত হইলে এ জন্মে আর বিবাহ করা চলিবে না। পতিই মরুন, আর পত্নীই মরুন, উভয়কেই এ জন্মের মত মৃত পতি বা পত্নীর ধ্যানে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। যদি একবার তির বা পত্নীর স্বভাবের সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি অবর্ত্তমানে তাঁহার স্বভাবের ধ্যান করিয়াই বিশেষ আনন্দ সহকারে জীবন নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে। কোম্‌ৎ এই নিয়ম কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয়ের পক্ষেই একেবারে জারি করিতে চাহেন এবং একণকার কোম্‌তের দলও এই জন্য বোধ হয় বিধবাবিবাহের প্রতি বিরূপ হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা বোধ হয় বলেন যে, পরিণামে যখন বিধবা-বিবাহ উঠাইয়া দিতে হইবে, তখন উহা আর চালান কেন?

"কিন্তু তাঁহারা ইহা ভাবিয়া দেখেন না যে,এখন যে অবস্থা আছে, তাহাতে স্ত্রীজাতির প্রতি ঘোর অত্যাচার হইতেছে এবং পুরুষজাতির ঘোর স্বার্থপরতা প্রকটিত হইতেছে। পুরুষ ষাট বৎসরের বুড়া হইলেও অনায়াসে আবার বিবাহ করিতে যায়েন, কেহ টু শব্দটিও করে না, কিন্তু নারী ১২।১৩ বৎসরে বিধবা হইলেও বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করুন, এক সন্ধ্যা আহার করুন, সর্ব্বপ্রকার সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করুন,ভ্রাতার সংসারে আধাদাসী হইয়া কাল যাপন করুন, ভাইপো ভাইঝিদিগকে মানুষ করুন, ইহাই তাঁহার প্রতি আদেশ। এক্ষণকার সর্ব্বসাধারণ 'এজু'র (Educated শব্দের এই সংক্ষেপ ব্যবহার করিলাম) দলও এই ব্যবস্থার পক্ষপাতী। আজকাল আধ্যাত্মিকতা বলিয়া একটা কথা বাহির হইয়াছে। 'এজু'রা বলেন, বিধবা বিবাহ চালাইলে নারীর আধ্যাত্মিকতার হ্রাস হইবে। এরূপ ব্যবস্থা মন্দ নহে বটে! আমরা পুরুষ, মেঠাই মণ্ডার ভাগটা আমরাই সমস্ত গ্রহণ করি, আধ্যাত্মিকতা ওরফে কঠোর ব্রত পালন নারীর স্কন্ধেই চাপাইয়া দেওয়া যাউক। হ্যামলেটের ওফিলিয়া ভ্রাতা লেয়ার্টিসকে বলিতেছেন—দাদা, কণ্টকাকীর্ণ পথে বিচরণ করিবার পরামর্শ আমাকে ত খুব দিলেন, কিন্তু নিজে যেন কেবল মেঠাই মণ্ডা লইয়াই কাল যাপন করিবেন না, তাহাতে আপনারও চরিত্র-ভ্রংশ হইবার সম্ভাবনা আছে। মিল্টন বলিয়াছেন—Spare fast that with the Gods doth diet ;—মিল্টনের এই উক্তি অকপট বটে। ইহার মধ্যে তাঁহার মনে একখানা মুখে একখানা ছিল না। কিন্তু 'আইভানহো'তে বনবাসী সন্ন্যাসী (Monk) যখন রিচার্ড রাজাকে বলিতেছেন—আমার ঘরে ছোলা ভাজা ছাড়া অন্য কোনও ভাল খাদ্য দ্রব্য নাই,—তখন রিচার্ড অনেক পীড়াপীড়ি করাতে পরিশেষে তাঁহার ভাঁড়ারের মধ্য হইতে কালিয়া, কাবাব, পুরি প্রভৃতি ভাল ভাল খাবার বাহির হইতে লাগিল। নারীর প্রতি আমাদের পুরুষজাতির উপদেশটা কিয়দংশে তদ্রূপ। পুরুষ বিধবাদিগকে বলেন—ওগো শ্রীমতিগণ, একাদশী কর, একসন্ধ্যা খাও, চুল মুড়াইয়া ফেল, সৌখীন খাওয়া দাওয়া এককালে ত্যাগ কর, শরীর খুব ভাল থাকিবে, দীর্ঘকাল নীরোগে জীবন কাটাইবে। পুরুষ নিজে কিন্তু চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ছাড়িবেন না। ইহারই নাম আধ্যাত্মিকতা! এই আধ্যাত্মিকতা বজায় রাখিবার জন্য আমরা পুরুষ রৌদ্রবৃষ্টিতে ছাতা মাথায় দিব, স্ত্রীলোক কিন্তু দিতে পারিবে না। শীতকালে জামাজুতা পরিব, নারী কিন্তু শীতে হি হি করুক আর

ঠাণ্ডা মাটিতে চলিয়া বেড়াক। আমরা অগ্রে আহার করিব, নারী আমাদিগের ভুক্তাবশিষ্ট খাইয়া প্রাণধারণ করিবে।

"আমি এই সকল কথা বলাতে অনেকেই চটিয়া উঠিবেন, কিন্তু হক্ কথা না বলিয়াও থাকা যায় না। আজ কাল অনেক পরিবারের মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু হিন্দুর ঘরে গার্হস্থ্য জীবনের spirit ভাবভঙ্গি এইরূপ কি না তাহা অপক্ষপাতী লোক মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখুন, ইহাই অনুরোধ।"

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

বিরহিণী।

নয়ন-নলিন অশ্রু-মলিন,
অধরে ফুটে না হাসি;
প্রসাধনে আর নাহি মন তা'র,
রুক্ষ কেশের রাশি।
বসি' আনমনা; আকুল বেদনা
উচ্ছ্বসি' উঠে বুকে;
অজানা আশায় পথপানে চায়;
কথা নাহি ফুটে মুখে।
ভাবে আনমনে, বিরোধ কেমনে
ঘুচাবে বেদনে লাজে;
দিবস যামিনী যাপে বিরহিণী
পতিস্মৃতি হৃদি-মাঝে।

টলেমি। *



প্রসিদ্ধনামা টলেমি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে মিশরের অন্তর্গত আলেকজণ্ড্রিয়া নগরীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রে এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। তদ্ব্যতীত তিনি সঙ্গীত-পটু ছিলেন, তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে লোক মুগ্ধ হইত।

টলেমি জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ে অলমাজেষ্ট নামধেয় একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, অলমাজেষ্টের পরিশিষ্টরূপে তদীয় ভূগোল-বৃত্তান্ত রচিত হইয়াছিল।

টলেমির ভূগোল-বৃত্তান্তও আট অধ্যায়ে বিভক্ত সুবৃহৎ গ্রন্থ; ইহার একটি অধ্যায়ে ভারতবর্ষীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

টলেমি পৃথিবী গোলাকাররূপে বর্ণনা করিয়া তাহার পরিধি ১৮০০০০ ষ্টেডিয়া এবং মধ্য রেখার এক ডিগ্রির বিস্তার ৫০০ ষ্টেডিয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার এই অঙ্কপাত ভ্রমাত্মক, এজন্য তদীয় গ্রন্থোল্লিখিত নগর, নদ, নদী ইত্যাদির বর্ত্তমান নাম ও অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু তথাপি লাসেন, ইউল প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহু অনুসন্ধানে ও চিন্তা-বলে এবিষয়ে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে সিন্ধু নদের পশ্চিম কূলের বহু অংশ ভারত-বর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কান্দাহার, গজনী, কাবুল, বাল্ক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমা ছিল। এই সকল জনপদে হিন্দু রাজন্যগণ রাজত্ব করিতেন। পুরাকালে কান্দাহার গান্ধার, বাল্ক বাহ্লীক, কাবুল কম্বোর নামে পরিচিত ছিল।

ভারতবর্ষের উত্তর সীমা ইমায়ুস নামক পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইমায়ুস সংস্কৃত হিম শব্দের অপভ্রংশমাত্র। গ্রীকগণ হিন্দুকুশ পর্ব্বতের এই নাম প্রদান করিয়াছিলেন। ইমায়ুস পর্ব্বত এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে শাকই, কম্বোজ, কিরাতাই প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জাতির বাস ছিল।

টলেমি স্বীয় গ্রন্থে সিন্ধু নদের মুখ হইতে গঙ্গা নদীর মুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত

* Ptolemy's Geography of India (McKrindle.)

সমগ্র ভারতীয় উপকূলের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা তদনুসারে ভারত উপকূলবর্ত্তী প্রধান প্রধান জনপদের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

সিরিষ্ট্রিনি সৌরাষ্ট্রের অপভ্রংশ। বর্ত্তমান সময়ে উহা গুজরাট নামে পরিচিত। সিরাষ্ট্র প্রাগুক্ত দেশের প্রধান নগর ছিল। বর্ত্তমান সময়ে এই নগর জুনাগড় নামে পরিচিত, তৎপূর্ব্বে জীর্ণ নগর নামে পরিচিত হইয়াছিল। জুনাগড়ের চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীনত্বের অসংখ্য নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। জুনাগড়ের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতগাত্রে অশোকের, স্কন্দ গুপ্তের এবং রুদ্রদাসের অনুশাসন-লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

মনগ্লোসন বর্ত্তমান সময়ে মনগ্রোল নামে পরিচিত হইতেছে। মনগ্রোল দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী একটি সমুদ্র বন্দর এবং জুনাগড় করদ রাজ্যের অধীন।

লারিক লাসেনের মতে সংস্কৃত রাষ্ট্রিক এবং প্রাকৃত লাটিক শব্দের অপভ্রংশমাত্র, লারিক বা রাষ্ট্রিক বর্ত্তমান গুজরাট দেশের একাংশব্যাপী ছিল। লার শব্দ লাট শব্দের অপভ্রংশ। গ্রীক লেখকবর্গ লার শব্দের শেষে স্বদেশীয় "ইক" শব্দ যোগ করিয়া লারিক শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বারুগজা (সংস্কৃত নাম ভৃগুকচ্ছ এবং আধুনিক নাম বরোচ) ও উজ্জয়িনী নামক প্রসিদ্ধ স্থানদ্বয় লারিক দেশের অন্তর্গত ছিল।

নৌসরিপ বর্ত্তমান সময়ে নৌসরি নামে পরিচিত। নৌসরি আধুনিক সুরাটের অষ্টাদশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

পৌলিপৌল বর্ত্তমান সময়ে সঞ্জন নামে পরিজ্ঞাত। সঞ্জন নৌসরি নামক স্থানের অনতিদুরে দক্ষিণদিকে অবস্থিত।

আরিয়াকি বা আর্য্যকি আধুনিক মহারাষ্ট্রের পূর্ব্বনাম ছিল। এই দেশের অধিকাংশ অধিবাসী আর্য্যজাতিসম্ভূত ছিল। আর্য্য নরপতি তথায় শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তৎকালে এই দেশের চতুষ্পার্শ্বে আর্য্যেতর জাতির বাস ও রাজত্ব ছিল; এই কারণে আমাদের বর্ণিত জনপদ আর্য্যকি নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। আরিয়াকি বা আর্য্যকি তিন অংশে বিভক্ত ছিল। একাংশে সদিনেইস বংশীয়গণ আধিপত্য করিতেন, তাঁহাদের আধিপত্য সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সদিনেইস বংশীয়গণের আধিপত্যাধীন সমুদ্রোপকূলে সমৃদ্ধ বণিকগণ বাস করিত। আরিয়াকি বা আর্য্যকিতে অন্ধ্র বংশীয়গণেরও আধিপত্য ছিল।

সৌপর বর্ত্তমান সময়ে সুপারা নামে পরিচিত। সুপারা বাসিন নামক স্থানের ছয় মাইল উত্তরে অবস্থিত। প্রাচীন কালে সৌপর বিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। সুপারার পার্শ্বে পুরাতন অট্টালিকাদির অনেক ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে অশোকের লিপি এবং বৌদ্ধ স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সিমিলা আধুনিক চৌলের পূর্ব্ব নাম ছিল। চৌল বোম্বাইয়ের দক্ষিণ দিকে ২৩ মাইল দূরে অবস্থিত। সিমিলা প্রাচীন ভারতের একটি প্রসিদ্ধ বন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। পর্ত্তুগিস বণিকগণের প্রথম আগমন কালেও সিমিলার বাণিজ্য-গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। যে সকল বৈদেশিক বণিক বাণিজ্যোপলক্ষে চৌলে আগমন করিতেন, তাঁহাদের প্রমুখাৎ নানা তত্ত্ব অবগত হইয়াই টলেমি পশ্চিম ভারতের ভূগোল-বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন।

হিপ্পকৌর বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ঘোড়াবন্দর নামক স্থানে অবস্থিত ছিল, পণ্ডিত ভগবান লাল ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

টলেমি ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী আরও কতিপয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নগরের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত নগরের অধিকাংশই বাণিজ্য-প্রধান গঞ্জ ছিল। আমরা বাহুল্যভয়ে ঐ সমুদায় স্থানের কেবল নামোল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। (১) বালতিপত্ন, (২) মন্দগোর, (৩) খেরসোনিসস্, (৪) নিত্র, (৫) তিণ্ডিস, (৬) ব্রহ্মগড়, (৭) কলই করিয়াস, (৮) মৌছিরিস, (৯) পদ পিরৌর, (১০) সেমনি, (১১) কোরঔরা, (১২) মেলকিন্দ, (১৩) বকরেই, (১৪) এলঙ্কল, (১৫) কোত্তিয়ার, (১৬) বোম্মল। এই সমস্ত স্থানের বর্ত্তমান নাম সম্বন্ধে অনেক মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায়।

কুমারিয়া কুমারিকা অন্তরীপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কুমারী দুর্গার অন্যতম নাম। কুমারী দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া স্থানটি ঐ নাম প্রাপ্ত হয়।

সসিকোরেই বর্ত্তমান সময়ে তুতিকোরিণ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। তুতিকোরিণ বর্ত্তমান সময়ে একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য বন্দর। সসিকোরেইও প্রাচীন কালে বাণিজ্যস্থানরূপে প্রসিদ্ধ ছিল।

কোলখোই নগর কুমারিকা অন্তরীপের পূর্ব্বাংশে বিদ্যমান ছিল। এই স্থান মুক্তার কারবারের জন্য শ্রীসম্পন্ন ছিল। কোনকই বা কোয়কই প্রাচীন কোলখোই রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই স্থানে প্রাচীন

পাণ্ড্য (টলেমি লিখিয়াছেন পাণ্ডিয়ন) বংশের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। এই স্থানেই তাঁহাদের রাজ্যের রাজধানী ছিল, তাহার পর মাদুরায় রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান তিনেভেলি জিলার অধিকাংশ পাণ্ড্য রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পাণ্ড্যরাজ্য কোইম্বাটুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কোরির আধুনিক নাম কাল মিয়র, ইহা একটি অন্তরীপ।

বাটোই বর্ত্তমান সময়ে তাঞ্জোর জিলায় পরিণত হইয়াছে।

প্যারালিয়ার আধুনিক নাম ত্রিবাঙ্কুর। প্যারালিয়া ত্রিবাঙ্কুর আখ্যা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে পুরালী নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই কারণে ত্রিবাঙ্কুরের অধিপতিগণের উপাধি পুরালীশাল ছিল।

সোর চোলের অপভ্রংশমাত্র। চোল অতি প্রাচীন রাজ্য।

করৌরার আধুনিক নাম করুর; করৌরা খাবিরস নামক নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। খাবিরস বর্ত্তমান সময়ে কাবেরী নামে খ্যাত। খাবিরস বা কাবেরী অর্দ্ধগঙ্গা নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এই জন্য পুরাতত্ত্বজ্ঞগণ অনুমান করিয়াছেন যে, যে সকল আর্য্য এই স্থানে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, গঙ্গাতীরে তাঁহাদের বাস ছিল। করৌরা চেরা বা কেরলপুত্র রাজ্যের রাজধানী ছিল। চেরা বা কেরল-পুত্র অতি প্রাচীন রাজ্য।

কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যগত প্রদেশের কতিপয় স্থানের বর্ণনা টলেমির গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এই সকল স্থানের বর্ত্তমান অবস্থান ও নাম সম্বন্ধে অনেক তর্ক ও মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে আমরা কেবল তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। (১) পোদোকি, [বাণিজ্য স্থান] (২) মেলানজি [বাণিজ্য স্থান] (৩) কোন্তিস, (৪) মনরফ [বাণিজ্য স্থান] (৫) কণ্টকশীল [বাণিজ্য স্থান] (৬) কোদ্দোরা, (৭) অয়সিগিনি।

টলেমি উড়িষ্যা দেশের কতিপয় নগরের ও নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল নগরের ও নদীর নামের সহিত উড়িষ্যার বর্ত্তমান নগরের ও নদীর নামের সাদৃশ্য নাই। টলেমি-প্রদত্ত দুইটি নগরের নাম উল্লিখিত হইতেছে। ননিগইনা এবং কন্নগর। পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে,ননিগইনা শ্রীক্ষেত্র পুরী এবং কন্নগর সূর্য্যক্ষেত্র কনারক ব্যতীত আর কোন স্থান নহে।

টলেমি কোশম্ব নামক একটি নগরের উল্লেখ করিয়াছেন। ইউলের মতে বর্ত্তমান বালেশ্বর নামক স্থানই টলেমির কোশম্ব। কিন্তু লাসেন লিখিয়াছেন যে, সুবর্ণরেখা নদীর মুখে কোশম্ব নগর বিদ্যমান ছিল; যদি লাসেনের নির্দ্দেশ প্রকৃত হয়, তবে কোশম্ব নগর কালগর্ভে একেবারে বিলীন হইয়া গিয়াছে; উহার চিহ্নমাত্রও নাই। পুরাকালে এলাহাবাদের নিকট যমুনাতীরে কৌশাম্বী নামে একটি বিখ্যাত নগরী বিদ্যমান ছিল। বৌদ্ধগণ কৌশাম্বীকে পবিত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে গণ্য করিতেন। নামসাদৃশ্য দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে, যমুনাতীরবর্ত্তিনী কৌশাম্বীর রাজবংশীয়গণ টলেমির কোশাম্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া এক নূতন রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন।

টলেমি গঙ্গা নদীর পঞ্চ মুখের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কম্বিসন, মেগা, কম্বেরিখন, সিউদস্তমল এবং এণ্ডিবোল। গঙ্গার সর্ব্বপশ্চিম মুখের নাম কম্বিসন। কম্বিসন সম্ভবতঃ ভাগীরথী। লাসেনের মতে পুরাকালে সুবর্ণরেখা গঙ্গানদীর এক শাখা ছিল এবং কম্বিসন নামে সুবর্ণরেখাই উদ্দিষ্ট হইতেছে। টলেমি দুইটি নগরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, একের নাম পোলৌবা অপরের নাম তিলো গ্রামণ।

টলেমি কাশ্মীরের নাম কাশপেইরিয়া লিখিয়াছেন। 'রাজতরঙ্গিণী' অনুসারে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রাজা মেঘবাহনের শাসনকালে কাশ্মীরের বিপুল সমৃদ্ধি ও প্রবল প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কাশ্মীরের অধিকার পঞ্জাবের অধিকাংশ স্থানে প্রতিষ্ঠিত এবং বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

টলেমি বিপাশা, শতদ্রু, যমুনা এবং গঙ্গার উদ্ভবস্থানবর্ত্তী দেশ কিলিন্দ্রিনি নামে পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। কিলিন্দ্রিনির সংস্কৃত নাম কুলিন্দ। মহাভারতে কুলিন্দবাসীদিগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা রাজসূয় যজ্ঞকালে উপহার স্বরূপ স্বর্ণ প্রদান করিয়াছিল।

উত্তর ভারতে পাণ্ডই নামে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া টলেমি স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। টলেমির পাণ্ডই রাজ্য পাণ্ডবরাজ্য, ইহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। মহাভারত ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থেও পাণ্ডবরাজ্যের উল্লেখ আছে। 'ললিত বিস্তর' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকালে পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুরে রাজত্ব করিতেন। ইহার পরবর্ত্তীকালে পাণ্ডবগণ আদিস্থানচ্যুত হইয়াছিলেন এবং নানা শাখায়

বিভক্ত হইয়া ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। রাজপুতানা, পঞ্জাব, অনুগাঙ্গপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ভারতের স্থানে স্থানে তাঁহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, এরূপ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

বর্ত্তমান লাহোর প্রাচীন লবকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অযোধ্যার অধিপতি লব এই নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

শাগল সংস্কৃত সাহিত্যে শাকল লিখিত হইয়াছে। শাকল প্রাচীন মদ্ররাজ্যের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান লাহোরের পশ্চিমদিকে ৬০ মাইল দূরে শাকল অবস্থিত ছিল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মহাভারতোক্ত ইন্দ্রপ্রস্থ কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া ইন্দবর নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান দিল্লীর নিকটবর্ত্তী স্থানে এই নগর বিদ্যমান ছিল।

মহারাজ শত্রুঘ্ন ভারতবর্ষের ললামভূতা মথুরা নগরীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আধুনিক সময়েও মথুরার পূর্ব্বখ্যাতি অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। টলেমি এই মথুরার নামই বিকৃত করিয়া মদোরা লিখিয়া গিয়াছেন।

লাসেন এবং অন্যান্য পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের মতে গগাসমিরা বর্ত্তমান আজমীরের নামান্তরমাত্র।

ইউলের মতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত এররস নামে পরিচিত হইয়াছে। গোবর্দ্ধন পর্ব্বত শ্রীবৃন্দাবনের একাংশে অবস্থিত; সুতরাং, অনুমান করা যাইতে পারে যে, শ্রীবৃন্দাবনই টলেমির উদ্দিষ্ট ছিল।

উত্তর পঞ্চালরাজ্যের রাজধানীর নাম অহিচ্ছত্র ছিল। টলেমি এই অহিচ্ছত্রের নাম অদিসদর লিখিয়াছেন। এক বিষধর সর্প একদা উত্তর পঞ্চাল রাজ্যের নিদ্রিত প্রথম অধিপতির মস্তকোপরি ফণা বিস্তৃত করিয়াছিল। এইজন্য তদীয় রাজধানী অহিচ্ছত্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কণৌজ বা কান্যকুব্জ টলেমির হস্তে পতিত হইয়া কাণগোরা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। গঙ্গা নদীর অন্যতম শাখা কালিন্দী নদীর তীরে এই নগর অবস্থিত ছিল।

টলেমির হস্তে পতিত হইয়া ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানের নাম বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল; কেবল নাসিক নগরের নাম পরিবর্ত্তিত হয় নাই। রামাজ্ঞায় অনুজ লক্ষ্মণ এইস্থানে সূর্পনখার নাসিকা কর্ত্তন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে নাসিক ভারতবাসীর একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

টলেমি পালিম্‌বোথরা ও মেগাস্থিনিস পালিবোথরা লিখিয়াছেন। এই দুই নগরী অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পালিম বোথরা অথবা পালি বোথরা প্রাসাই রাজ্যের রাজধানী ছিল। প্রাসাই প্রাচ্য শব্দের অপভ্রংশ। গ্রীকগণ মগধ সাম্রাজ্যের এই নাম প্রদান করিয়াছিলেন। মগধ সাম্রাজ্যের পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তিতা নিবন্ধন এই নাম প্রদত্ত হইয়াছিল। পালিম বোথরা অথবা পালি বোথরার প্রকৃত নাম পাটলীপুত্র ছিল। বর্ত্তমান পাটনার নিকটবর্ত্তী স্থানে পাটলীপুত্রের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে

পুরাকালে তাম্রলিপ্তি (আধুনিক তমলুক) সাতিশয় প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। পালি সাহিত্যে তাম্রলিপ্তি তামালিতিরূপে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। তামালিতি সহজেই বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া তামাল তিসে পরিণত হইয়াছিল।

পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গ্রীক-বর্ণিত গঙ্গা রাঢ়ি ও রাঢ়ভূমি অভিন্ন। এই দেশের রাজধানী গঙ্গি নামে অভিহিত হইয়াছে। গঙ্গি কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহা আজও পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই।

ইউল নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, টলেমির হস্তে কর্ণসুবর্ণ নামক রাজ্য বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া কার্টসিনা হইয়াছে। পুরাকালে আধুনিক মুর্শিদাবাদ জিলায় কর্ণসুবর্ণ নামে এক পরাক্রান্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল।

আমরা টলেমি-বর্ণিত ভারত-বিবরণের স্থূল মর্ম্ম প্রদান করিলাম। এই প্রবন্ধে যে সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইল, তদ্ব্যতীত আরও বহুসংখ্যক নগর, পর্ব্বত এবং নদ নদীর বৃত্তান্ত তদীয় পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। এতৎসমুদায়ের অধিকাংশেরই অবস্থান ও ব্যাপ্তি এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই; যে গুলির অবস্থান ও ব্যাপ্তি নির্ণীত হইয়াছে, তাহাও তাদৃশ প্রসিদ্ধ ছিল না। এই কারণে আমরা তৎসকলের উল্লেখে বিরত হইলাম।

টলেমির গ্রন্থে অনেক ভারতীয় জাতির এবং বংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই বিবরণ পাঠে তৎকালের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণ-জন্য এই বিবরণের কিয়দংশ সঙ্কলিত করিয়া দিতেছি।

কাবুল ও সিন্ধু নদের সঙ্গমস্থল হইতে সিন্ধু নদের মুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র দেশে শিথিয় অর্থাৎ শকগণ আধিপত্য করিতেন। শকগণ মধ্য এসিয়া হইতে আগত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কালক্রমে ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও আচারব্যবহার গ্রহণ পূর্ব্বক ভারতবাসীর তুল্য হইয়াছিলেন।

সিন্ধু নদের পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ যে স্থান হইতে সিন্ধু নদ নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া সমুদ্রাভিমুখ হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বদিকে আভীরগণ বাস করিত। আভীর শব্দ সংস্কৃত, ইহার অর্থ গোপালক। দেশীয় শব্দ আহির।

ভারতবর্ষের প্রখ্যাতনামা নগর নাসিকের পূর্ব্বদিকে পুলিন্দেই জাতির বাস ছিল। এই প্রদেশে পুলিন্দেইগণের প্রবল প্রতাপ পরিদৃষ্ট হইত। পুলিন্দেই জাতি ভারতবর্ষের অনার্য্য আদিম অধিবাসী ছিল।

নর্ম্মদা নদীবিধৌত প্রদেশের একাংশে প্রপিওটাই জাতি বাস করিত। এই স্থানে কোসা নাম্নী একটি নগরী প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোসা নগরীতে হীরক পাওয়া যাইত।

তাপ্তি নদীর তীরদেশ হইতে সাতপুরা শৈলমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশে ফিলিটাই জাতি বাস করিত। লাসেন ফিলিটাই ভীল জাতির অপভ্রংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভীল শব্দের সংস্কৃত নাম ভিল্ল। ভীলগণ সাতিশয় মৃগয়াপ্রিয় ছিল বলিয়া আর্য্যগণ তাহাদিগকে ভিল্ল নামে অভিহিত করিতেন বলিয়া আমরা অনুমান করিতেছি; কারণ ভিল্ল, শব্দের অর্থ ধনুক।

বিন্ধ্য পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে ভাই ও লিঙ্গেই জাতি বাস করিত। পাণিনি এই জাতিকে ভুলিঙ্গী নামে পরিচিত করিয়াছেন।

মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের আরণ্য প্রদেশে শবরেই জাতির বাস ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে শবরেই জাতি শবর নামে কথিত হইয়াছে।

উত্তর ভারতের পশ্চিমে রাজপুতানায় পোরৌরোই বংশীয়গণ রাজত্ব করিতেন। পোরৌরোই পৌরব শব্দের অপভ্রংশ। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদে পৌরব রাজগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পৌরবগণ যমুনা ও গঙ্গানদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। পরবর্ত্তী কালে এতদপেক্ষা বিস্তৃত স্থানে তাঁহাদের অধিপত্য পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। গ্রীক বীর আলেক-জণ্ডারের ভারত আক্রমণ সময়ে মহারাজ পুরু পঞ্জাবের একাংশে আধিপত্য করিতেন। ঐতিহাসিকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, পুরু তাঁহার নাম নহে, পরন্তু উপাধিমাত্র ছিল এবং পৌরববংশসম্ভূত বলিয়া তাঁহার ঐ উপাধি হইয়া-ছিল। আলেকজণ্ডারের পরবর্ত্তী কালে পৌরবগণ প্রমর নামে খ্যাত হইয়া-ছিলেন এবং রাজপুতানায় তাঁহাদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

শোণ ও নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তি-স্থানের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে মন্দলইগণ আধিপত্য করিতেন।

পালিমবোথরায় প্রাসাইকি অথবা প্রাসাইগণের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কাটিসিনা, গঙ্গারাঢ়ি এবং তামালতিসে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য বিদ্যমান ছিল। তামালতিস বা তাম্রলিপ্তি সমুদ্র বাণিজ্যের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

কিরাদিয়া জাতি লৌহিত্য-তীরবর্ত্তী প্রদেশে রাজত্ব করিত। কিরাদিয়া শব্দের সংস্কৃত কিরাত। পুরাকালে ব্রহ্মপুত্র নদ লৌহিত্য নামে পরিচিত ছিল।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

বিহ্বলা।

:o:

(সংস্কৃত হইতে।)

একটি নয়নে হেরে গুরুজনে,
তরাসে চকিতা কে কোথা চায়!
অপর নয়নে প্রিয়-মুখ-পানে
তৃষিত হৃদয় যেন গো ধায়।
মনের বাসনা সফল হ'ল না
সজল নয়ন হ'ল বালার;
দাঁড়ায়ে চিত্রিত পুত্তলির মত,
চিত্ত অপহৃত হয়েছে তা'র।
লোচন গোচর নহে প্রাণেশ্বর,
তবু পথপানে চাহিয়া আছে;
মানস-নয়নে জাগ্রত স্বপনে
হেরিছে তাহারে আপন কাছে।

মৃত্যুমিলন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রণভেরী।

প্রাসাদের যে অংশ অজয় সিংহের অধিকৃত সেই অংশসংলগ্ন উপবনে একখানি শিবিকা ছিল। বাহকগণ শিবিকা রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। সেই শিবিকায় ভদ্রা মাসাধিক কাল পরে রেবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

মাসাধিক কাল পরে দুই সখীতে সাক্ষাৎ—যেন কত যুগ অদর্শনের পর আজ আবার মিলন। কথা ফুরায় না—কথায় কথা বাড়িয়া যায়—এক কথা হইতে অন্য কথার আরম্ভ হয়—শেষে মূল বিষয় আর মনে থাকে না। রেবা কত কথা জিজ্ঞাসা করিল—পিতার কথা, মাতার কথা, ভ্রাতার কথা, ভ্রাতৃজায়ার কথা, ভ্রাতুষ্পুত্রীর কথা, তাহার পর গৃহপালিত হরিণের কথা, শুকপক্ষীর কথা, সে কত কথা! তাহার সেই কিংশুক তরু কত বড় হইয়াছে; তরুশাখায় সেই ঝুলনা এখনও ঝুলান আছে কি না? এমনই কত কথা জিজ্ঞাসা করিয়া রেবা আজ ভদ্রাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। ভদ্রা উত্তর দিতে লাগিল—রেবাকে কত বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

ভদ্রা আজ বিশেষ প্রয়োজনে আসিয়াছিল, তাই সে রেবার প্রশ্নবর্ষণের বিরাম খুঁজিতেছিল। একবার একটু সুযোগ পাইয়া সে আপনার আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য রেবাকে জানাইল। রাজ্যে রণসজ্জার আয়োজন চলিতেছে, রাজা ঘোষণা করিয়াছেন, অস্ত্রধারণক্ষম প্রজাবর্গকে প্রস্তুত হইতে হইবে—রাজপুত যুদ্ধব্যবসায়ী—যুদ্ধেই তাহার আনন্দ—যুদ্ধই তাহার সুখ, এখন রাজপুত তাহা ভুলিয়া অলস, অকর্ম্মণ্য হইতেছে—ইহার প্রতীকার করা আবশ্যক; তাই রাজার আদেশ—গ্রামে গ্রামে যুদ্ধ-ক্রীড়া হইবে—প্রজাবর্গ এমনভাবে প্রস্তুত থাকিবে যে, যে দিন—যখন আবশ্যক সকলে সত্য সত্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারে। রাজকর্ম্মচারীরা রাজার এই আদেশ প্রতিপালনে ব্যগ্র হইয়াছে। অধিকাংশ প্রজাই মনে করিয়াছে, রাজার এ আদেশ, সত্য সত্যই রাজপুতকে পুনরায় বলবীর্য্যদৃপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু রেবার পিতা মনে করিয়াছেন, এ আদেশ-

প্রচারের অন্য—গূঢ় উদ্দেশ্য বর্ত্তমান। তাঁহার বিশ্বাস গূঢ় উদ্দেশ্য না থাকিলে—এ আদেশ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপালনে এমন কঠোরতার প্রবর্ত্তন হইত না; কারণ, এ আদেশ প্রজার বহুদিনের অভ্যাসে দারুণ আঘাত করিয়াছে—প্রজার নানা কার্য্যে বিশৃঙ্খলার উৎপাদন করিতেছে—সেইজন্য ইহাতে কোন কোন সম্প্রদায়ের অসন্তোষ অনিবার্য্য। রাজা তাহা বুঝিয়াছেন। বুঝিয়াও তিনি যে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয়—এ আদেশ প্রচারের কোন গূঢ় উদ্দেশ্য বর্ত্তমান। কিন্তু সে উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয় নাই। তাই রাজ্যের কোন বিপদের আশঙ্কা করিয়া রেবার পিতা ভদ্রাকে কন্যার নিকট পাঠাইয়াছেন; যদি কন্যা সে বিষয়ে কিছু জানিতে পারিয়া থাকে।

ভদ্রা রেবাকে এই কথা বলিল। রেবা স্থির হইয়া শুনিল—তাহার কৌতুকালোকদীপ্ত আননে ধীরে ধীরে চিন্তার ছায়া ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল—যেন সন্ধ্যার স্বচ্ছান্ধকারে বসন্তের দিবালোক আবৃত হইয়া গেল। সে বলিল, "ভদ্রা আমি ত ইহার কিছুই জানি না! পিতা কি বলিয়াছেন, রাজ্যের ও রাজার আসন্ন বিপদের আশঙ্কা আছে?"

ভদ্রা জানিত, সেই আশঙ্কা করিয়াই রেবার পিতা তাহাকে সংবাদ লইতে পাঠাইয়াছেন; কিন্তু রেবার স্বভাবতঃ প্রফুল্ল মুখ অন্ধকার দেখিয়া তাহার আর সে কথা বলিতে ইচ্ছা হইল না। সে বলিল, "তিনি কেবল আদেশ প্রচারের উদ্দেশ্য জানিতে চেষ্টা করিতেছেন। আশঙ্কা কিসের?"

শুনিয়া রেবা আশ্বস্তা হইল বটে, কিন্তু তাহার সন্দেহ কাটিল না। অন্য কথার মধ্যে সে ভদ্রাকে আরও দুইচারিবার এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। আর সে কেবল ভাবিতে লাগিল, কই অজয় সিংহ ত তাহাকে কিছু বলেন নাই।

অপরাহ্নে ভদ্রা বিদায় লইল। রেবার আদেশে প্রতিহারিণী যাইয়া বাহকবর্গকে অন্তঃপুরোদ্যানে ডাকিয়া আনিল।

এতদিন পরে সাক্ষাৎ; যাই-যাই করিয়াও যাইতে কত বিলম্ব!

শেষে বেলা যায় দেখিয়া ভদ্রা বলিল, "আর বিলম্ব করিতে পারিব না। চলিলাম।" রেবা সখীর সঙ্গে সঙ্গে উদ্যানে আসিল। ভদ্রা শিবিকার আরোহণ করিল,—প্রতিহারিণী উদ্যানদ্বার মুক্ত করিয়া দিল—শিবিকা বাহির হইয়া গেল; প্রতিহারিণী আবার দ্বার রুদ্ধ করিল। ভদ্রা মনে

মনে দেবতাকে ডাকিল—ঝড় উঠিলে প্রথম সর্ব্বোচ্চ গৃহচূড়ায় প্রতিহত হয়—সেই গৃহই তাহার প্রিয় সখীর গৃহ।

ভদ্রা চলিয়া গেল,—রেবার নয়ন ছল ছল করিতে লাগিল—মিলন সুখের—বিদায় দুঃখের। রেবা কি ভাবিতে ভাবিতে যাইয়া উদ্যানমধ্যে এক-খানি মর্ম্মর-রচিত আসনে উপবেশন করিল।

উপরে আকাশে রবিকর ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আসিতে লাগিল—গতি-শীল মেঘখণ্ডে নানা বর্ণের বিকাশ হইতে লাগিল। চারিপার্শ্বে তরুশাখায় নীড়াগত বিহগের সান্ধ্য কাকলি। নিম্নে ঘনশ্যাম তৃণ মরকতের মত সমুজ্জ্বল। রেবা বসিয়া রহিল। ক্রমে দিনান্ত-তপনের রক্তরশ্মি তরুমূলে লুটাইয়া পড়িল—তাহার পর তরুকাণ্ড বাহিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর শাখায় সিন্দুররাগ লেপন করিতে করিতে ক্রমে পত্রে রক্তরাগ ঢালিয়া শেষে ধূসর-গগনে মিলাইয়া গেল। অন্ধকার তরুর শির হইতে ক্রমে নামিয়া আসিতে লাগিল। উদ্যানোত্থিত কুসুম-সৌরভ যেন ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল; দূরে বৃক্ষমালা অন্ধকারে মিলাইয়া যেন এক হইয়া যাইতে লাগিল। নীড়ে বিহগ-বিরাব নীরব হইল। আকাশে তারকা ফুটিয়া উঠিল। সেই ম্লানা-লোকে বাদুড়ের দল উড়িয়া পক্কফল বৃক্ষাভিমুখগামী হইল—স্বচ্ছান্ধকার তৃণের উপর তাহাদের ছায়া গাঢ় অন্ধকার রচনা করিতে লাগিল।

রেবা বসিয়া ভাবিতেছিল।—কখন তপনকিরণ সন্ধ্যার অন্ধকারে নিবিয়া গিয়াছিল,—সে তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে ভাবিতেছিল—কোন্ বিপদের আশঙ্কায় পিতা ভদ্রাকে পাঠাইয়াছিলেন? সে আরও ভাবিতে-ছিল, অজয় সিংহ কেন তাহাকে কিছু বলেন নাই? সে কথা ভাবিয়া যুবতীর—প্রেমিকার—পত্নীর হৃদয়ে অভিমান দেখা দিতেছিল—যেন শরতের মধ্যাহ্ন গগনে লঘু মেঘ ভাসিয়া আসিতেছিল। পরিচারিকা যে কখন তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা সে জানিতেও পারে নাই।

অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া—রেবা তাহার আগমন জানিতে পারে নাই বুঝিতে পারিয়া পরিচারিকা জানাইল, যুবরাজ আসিয়া তাহার অন্বেষণ করিতেছেন। পরিচারিকার কণ্ঠস্বরে রেবা চমকিয়া উঠিল; চাহিয়া দেখিল, সন্ধ্যা হইয়াছে। সে উঠিল—গৃহাভিমুখগামী হইল।

রেবা দুই এক পদ অগ্রসর হইতেই দেখিল, সম্মুখে অজয় সিংহ।

অজয় সিংহ বলিলেন, "আজ যে একাকিনী অন্ধকারে বসিয়া আছ? ভদ্রা চলিয়া গিয়াছে ?"

রেবা বলিল, "হাঁ।"

অজয় সিংহ সেই মর্ম্মরাসনাভিমুখে চলিলেন, রেবাকে বলিলেন, "আইস, এই স্থানেই বসি।"

রেবা ফিরিল।

পরিচারিকা গৃহে ফিরিয়া গেল।

অজয় সিংহ ও রেবা মর্ম্মরাসনে উপবেশন করিলেন। তখন প্রাসাদের উপর নবোদিত চন্দ্র দৃষ্টিগোচর হইল। রেবার মুখে একটু আঁধার লাগিয়াছিল, তাহা দেখিয়া অজয় সিংহ রহস্য করিয়া বলিলেন, "আকাশে চাঁদ আজ মেঘমুক্ত, কিন্তু তোমার মুখ মেঘাচ্ছন্ন কেন ?"

রেবা কোন উত্তর করিল না। কেমন করিয়া কথাটা জিজ্ঞাসা করিবে, সে তাহাই ভাবিতেছিল।

রেবাকে নীরব দেখিয়া অজয়সিংহ ভাবিলেন, একি? যে সদাপ্রফুল্লা তাহার এ ভাবান্তর কেন ? রেবার পিতৃগৃহের সংবাদ ভাল ত ? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রা কি বলিয়া গেল ?"

রেবার ঈপ্সিত সুযোগ উপস্থিত হইল। সে বলিল, "পিতা সংবাদ জানিতে পাঠাইয়াছিলেন।"

অজয়সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের সংবাদ ?"

"রাজ্যের।"

"সে কি ?"

"রাজা প্রজাবর্গকে যুদ্ধ-ক্রীড়া করিতে ও সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে আদেশ প্রচার করিয়াছেন। এ আদেশ কেন প্রচারিত হইল ?"

"রাজপুতের গৌরবদীপ্তি নির্ব্বাপিতপ্রায়। তাহার পুনরুদ্দীপনকল্পে রাজা সচেষ্ট হইয়াছেন—তুমি ত তাহা জান। তাই এ আদেশ।"

"শুধু কি তাহাই ? পিতা বলেন, তাহা হইলে এ আদেশ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পালন বিষয়ে এমন কঠোর বিধান হইত না;—বহুদিনের অভ্যাস বিশেষ কারণ ব্যতীত একদিনে পরিবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য নহে—তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা বিদ্যমান।"

অজয় সিংহ মুহূর্ত নির্ব্বাক রহিলেন—ভাবিতে লাগিলেন, সমস্ত কথা

পত্নীকে বলিবেন কি না। গুপ্ত মন্ত্রণা-গৃহে যে কথায় আলোচনা হইয়াছে, সে কথা প্রকাশ করিবেন কি? কথায় বলে, রমণী স্বভাবতঃ গুপ্তকথা গোপন রাখিতে অসমর্থা। এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য?

স্বামীকে নীরব দেখিয়া রেবা তাঁহার মুখপানে চাহিল। অজয় সিংহ পত্নীর সেই জ্যোৎস্নাস্নাত মুখ দেখিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল, যে পত্নীকে বিশ্বাস করিতে না পারে, সংসারে তাহার মত হতভাগ্য আর কে আছে? যে পত্নী হৃদয়ে সুখ, বাহুতে বল—তাহাকে বিশ্বাস না করিলে কাহাকে বিশ্বাস করিব?

অজয় সিংহ সেদিন মন্ত্রণা-গৃহে শ্রুত সকল কথা ধীরে ধীরে পত্নীকে বলিতে লাগিলেন, রেবা স্থির হইয়া শুনিতে লাগিল।

সে কথা শেষ করিয়া অজয় সিংহ বলিলেন, "এ অবস্থায় বিপদের আশঙ্কা অস্বাভাবিক নহে। প্রস্তুত থাকাই কর্ত্তব্য। যদি বিপদ না ঘটে, এ কার্য্যে রাজপুতের উপকার ব্যতীত অপকার হইবে না।"

রেবা জিজ্ঞাসা করিল, "আর যদি বিপদ ঘটে?"

অজয় সিংহ বলিলেন, "বলিয়াছি, রাজা বলিয়াছেন—সংগ্রামে বা মৃত্যুতে রাজপুতের ভয় নাই।"

রেবা স্বামীর দিকে চাহিল। অজয়সিংহ দেখিলেন, তাহার নয়ন ছল ছল করিতেছে—সেই অশ্রু-সজল নয়ন জ্যোৎস্নালোকে জল জল করিতেছে। অজয় সিংহ বলিলেন, "সংগ্রামে কি রাজপুত-রমণীর এখন ভয় হয়?"

রেবা উত্তর করিল, "রাজপুত রমণী জীবনসর্ব্বস্বকে—হৃদয়ের ধনকে কাল সমরে পাঠাইবার সময় বলিয়া দিয়াছে—অপমানই মৃত্যু—মৃত্যু মুক্তি-মাত্র। রাজপুত সম্মুখ সংগ্রামে উন্মাদনায় মৃত্যুযন্ত্রণা বুঝিতে পারে না, রাজপুতরমণী অনলে আত্মসমর্পণ করিয়া শত্রুর স্পর্শ হইতে আত্মরক্ষা করে। রাজপুতরমণী এখনও সংগ্রামে ভীতিবিহ্বল হইতে শিখে নাই।"

অজয় সিংহের মনে হইল, যেন করুণাময়ী দেবীমূর্ত্তিতে রণরঙ্গিণীরূপ প্রকাশিত হইল। তিনি মনে করিলেন—রমণী সত্যই রহস্যময়ী। তিনি সাদরে পত্নীকে বক্ষে টানিয়া লইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ব্যাকুলা।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাণী দীপালোকিত কক্ষে বসিয়া আছেন—যেন কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; কক্ষদ্বারের নিকট কোন শব্দ শুনিলেই তিনি সেই দিকে চাহিতেছেন। কক্ষে বহুপাত্রসজ্জিত কুসুমের গাঢ় সৌরভ—দীপের তৈলের সুগন্ধে মিশিতেছিল—আর কক্ষের এক কোণে একটি পাত্রে প্রজ্বলিত অঙ্গার হইতে গুগ্‌গুলের সুরভি উত্থিত হইতেছিল।

রাণীর বেশভূষায় অভ্যস্ত পরিপাট্যের অভাব—অমানিশার মত অন্ধকার কেশে আজ আর হীরকের দীপ্তি নাই—কেবল পরিধেয় বসনে মণিমুক্তা দীপালোকে ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছে। রাণীর হৃদয়ে যে নানাভাবের বিকাশ হইতেছিল—তাহা তাঁহার মুখভাব লক্ষ্য করিলে বুঝিতে আর বিলম্ব ঘটে না—সে মুখ এখন আর পূর্ব্বের মত ভাবলেশশূন্য—মর্ম্মররচিতবৎ নহে—আজ নানা পরিবর্ত্তনশীল ভাবে ও চিন্তায় তাহা বিচিত্র সৌন্দর্য্যে শোভাময় হইতেছিল—প্রভাতের মুক্তাশুভ্র রবিকরে বা দিনান্তের স্নিগ্ধ-কোমল আলোকে কুসুম এমন বিচিত্র শোভা ধারণ করিতে পারে না। আজ রাণীর হৃদয় কি চিন্তা-চাঞ্চল্য-চঞ্চল?

রাণীর যৌবনের সমস্ত অজ্ঞাত কবিতা এখন আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, তাঁহার নিকট অসাধারণ মাধুরীময়ী মনে হইতেছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে দারুণ মনস্তাপে তাঁহার জীবন মরুভূমিতে পরিণত হইতেছিল। তাঁহার মনে হইতেছিল, যেন তাঁহার সযত্ন-সিক্ত কুসুম-কানন অসার কণ্টক-গুল্মে পূর্ণ হইয়াছে—তাই জীবন সুখহীন—সৌন্দর্য্যহীন—শ্রীহীন।

নিঃশব্দে দ্বার মুক্ত করিয়া উমা কক্ষে প্রবেশ করিল।

উমাকে দেখিয়া রাণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার নয়নদ্বয় দীপ্ত হইয়া উঠিল—মুখে রক্তাভা ব্যক্ত হইয়া পড়িল, কপালে কোমল—স্বচ্ছ—সুন্দর ত্বকের নিম্নে নীল শিরাগুলি রক্তপ্রবাহে পুষ্ট হইয়া উঠিল।

রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "উমা! সংবাদ পাইয়াছ?"

উমা শিরঃসঞ্চালনে জানাইল—পাইয়াছি, তাহার পর দ্বার অর্গলবদ্ধ করিল। সে রাণীর নিকটে আসিয়া বলিল, "উপবেশন করুন। আমি সকল সংবাদ নিবেদন করিতেছি।"

রাণী যেন আপনার অধীরতায় লজ্জিতা হইলেন —আসনে উপবেশন করিলেন। উমাও উপবেশন করিল।

অন্তঃপ্রাচীর সংবাদের—জনরবের গতিরোধ করিতে পারে না, বরং জনরব মুখে মুখে বিকৃতি ও বিশালতা লাভের পর সে প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া আইসে। রাজ্যে রণসজ্জার সংবাদও রাজান্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। তাই রাণী সংবাদ জানিবার জন্য উমাকে তাহার ভ্রাতৃসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

উমা শঙ্কর সিংহের নিকট প্রকৃত সংবাদ জানিতে গিয়াছিল। শঙ্কর সিংহ তাহাকে সকল কথা বলেন নাই সত্য, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারের সম্পূর্ণ আভাস দিয়াছিলেন। রাজ্যের বিপদের সম্ভাবনার কথা, রাজার সঙ্কল্পের কথা, মোগলের রোষাগ্নি প্রদীপ্ত হইলে কি ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহার কথা—শঙ্কর সিংহ ভগিনীকে এ সকলের আভাস দিয়াছিলেন।

তাহার পর শঙ্কর সিংহ ভগিনীর নিকট রাণীর পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন,—"উমা, এ পরিবর্ত্তন যদি পূর্ব্বে সংসাধিত হইত—তবে হয়ত ঘটনাস্রোতঃ অন্য পথে প্রবাহিত হইত। এখন বহ্নিমুখগত পতঙ্গকে কে ফিরাইতে পারে? এখন যে অগ্নি জ্বলিয়াছে—তাহাতে কত অমূল্য রত্ন ভস্মীভূত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? রাণী রাজাকে সুখী করিতে পারিলেন না, আপনিও বেদনায় জর্জ্জরিত হইলেন।" বলিতে বলিতে শঙ্কর সিংহের নয়ন অশ্রু-সজল হইয়া আসিয়াছিল। সে সকল কথা শুনিয়া উমা নয়নের জল সংবরণ করিতে পারে নাই। সে যে সত্য সত্যই রাণীকে ভাল বাসিয়াছে। তাহার ব্যর্থ-সুখসন্ধান নারী-জীবনে সে কর্ত্তব্য ভাবিয়া প্রথম তাঁহাকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিল সত্য, কিন্তু সে ভালবাসা যে শেষে একান্তই সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কর্ত্তব্যের স্বর্ণশৃঙ্খল শেষে প্রীতির কুসুমডোরে পরিণত হইয়াছিল। তাহার ব্যবহার বুঝি রাণীর হৃদয়েও সত্য সত্য অনুরাগের উৎপাদন করিয়াছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুরাগও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাই সে যখন পাষাণপ্রতিমাকে ভালবাসিত, তখনও আশা করিত, একদিন এ পাষাণে কোমলতার উৎস প্রবাহিত হইবে। আর আজ যখন তাহার সেই আশা কেবল ফলবতী হইয়াছে, তখন—তখন কি সব শেষ হইবে?

শিবালয় হইতে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তনকালে উমা সমস্ত পথ কাঁদিয়াছে।

প্রাসাদে আসিয়া সে আপনার কক্ষে যাইয়া আপনার চিত্তচাঞ্চল্য সংযত করিয়া,—আপনার অশ্রুচিহ্ন ধৌত করিয়া তবে রাণীর নিকটে আসিয়াছিল।

উমা রাণীকে প্রকৃত কথা কত দূর জানিতে দিবে, তাহা স্থির করিয়া আসিয়াছিল। রাণীর সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে সে ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে তাহা জানাইল। কিন্তু উমা যাহা বলিল, রাণীর তাহাতেই আসন্ন বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে বিলম্ব ঘটিল না।

উমার কথা শেষ হইলে রাণী আর চিত্তচাঞ্চল্য গোপন রাখিতে পারিলেন না—ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "উমা, এখন উপায় ?"

উমা কি উত্তর দিবে ? সেও ত কোন উপায় স্থির করিতে পারে নাই !

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া রাণী বিহ্বল ভাবে বলিলেন, "উমা, তবে কি আর কোন উপায় নাই ?"

উমা বহু কষ্টে আপনার ব্যাকুলতা গোপন করিল,—রাণীকে সান্ত্বনা প্রদানে সচেষ্ট হইল। সে বলিল, "বিপদের সম্ভাবনা হইতে পারে জানিয়া এত ব্যাকুল হইবার কোন কারণ নাই। আকাশে মেঘ ত সর্ব্বদাই গতায়াত করে—কয়খানি মেঘ সত্য সত্যই প্রলয়-বাত্যার সূচনা করে ?"

রাণী বলিলেন, "কিন্তু, উমা, যে পক্ষিণী আপনার ভাগ্যদোষে আশ্রয়-তরুর বিশাল বক্ষে আপনার আশ্রয়-নীড় বাঁধিয়া লইতে না পারে, তাহার আশঙ্কা যে কেবল আশঙ্কামাত্র নহে, সে যে সর্ব্বনাশের সান্নিধ্যে আপনার হৃদয়ের দারুণ বেদনাচাঞ্চল্য !"

রাণীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। উমা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

দুইজনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

রাণীর মনে হইতে লাগিল, তিনি যে দিকে চাহেন—কেবলই সূচিভেদ্য অন্ধকার ; তাহার অদৃষ্টাকাশ মেঘান্ধকার অমানিশার মত তিমিরাবগুণ্ঠিত—তাহাতে কোন দিকে কোথাও তারকার ক্ষীণ আলোক পর্য্যন্ত লক্ষিত হয় না, আর সেই অন্ধকারে অদূরে প্রলয়-ঝটিকার প্রবল গর্জ্জন শ্রুত হইতেছে,—বজ্রনাদে সংহার-ডমরু ধ্বনিত হইতেছে,—প্রকৃতি আসন্ন ধ্বংসের জন্য বক্ষ পাতিয়া দিয়াছে ! আর তাহারই মধ্যে তিনি রমণী একান্ত একাকিনী মৃত্যুমুর্ত্তির কূলে দাঁড়াইয়া আপনার প্রেমমাত্র লইয়া ধ্বংসের গতিরোধ করিতে উদ্যতা হইয়াছেন ; তাঁহার এই অসাধ্য-সাধন-প্রয়াসে দিকে দিকে

বিদ্রূপের অট্টহাস্য ধ্বনিত হইতেছে। তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল—তিনি আত্মবিস্মৃতা হইলেন।;

দ্বারে মৃদু মৃদু করাঘাতশব্দে রাণী চমকিয়া চাহিলেন। তখন নিশীথ-কাল উপস্থিত। রাণী দেখিলেন, ঊষা দীর্ঘকালব্যাপী চিন্তাশ্রমের পর প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা। তিনি উঠিয়া দ্বার মুক্ত করিলেন; দুইজন পরিচারিকা বহুক্ষণ অপেক্ষার পর শঙ্কা-সঙ্কুচিতহৃদয়ে দ্বারে করাঘাত করিয়াছিল। তাহাদিগকে আবশ্যক উপদেশ প্রদান করিয়া রাণী শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। শূন্য মন্দিরে শূন্য শয্যায় শয়ন করিয়া রাণী আবার ভাবিতে লাগিলেন। তিনি রাজাকে চিনিতে পারেন নাই; চিনিতে চাহেন নাই; চিনিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তাই তখন তিনি পতির স্বেচ্ছাদত্ত উপহার প্রগাঢ় প্রেম উপেক্ষা করিয়াছিলেন, সে প্রেম আকর্ষণ করিবার মত কোন গুণ তাঁহার ছিল না, তথাপি সাগর যেমন আপনার উচ্ছ্বসিত প্রেম নদীকে উপহার দেয়—রাজা তেমনই তাঁহাকে আপনার প্রেম উপহার দিয়াছিলেন—তিনি সে উপহার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, বুঝি সে প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার যোগ্যতাও তাঁহার ছিল না,—নহিলে তিনি সেই প্রেম উপেক্ষায় ও অবহেলায় পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর বেদনার কারণমাত্র হইবেন কেন? তাহার পর কত দীর্ঘ দিন গেল—বসন্তের পর বসন্ত আসিল, জীবনের বসন্ত আসিয়া তাঁহারই দোষে ফিরিয়া গেল। তাহার পর? তাহার পর যখন তাঁহার অন্ধের নয়নেও রাজার রাজমহিমা প্রতিভাত হইল—তখন লজ্জা—সঙ্কোচ—আপনার উপর ধিক্কার তাঁহার প্রেমের মুখরন্ধ্র রুদ্ধ করিয়া দিল। তখন সহসা রাজার আশ্রমের প্রতি অনুরাগ দেখিয়া আশ্রমবাসিনীর কথা শুনিয়া তাঁহার মনে পবনতাড়িত স্বচ্ছ মেঘের লঘু ছায়ার মত সামান্য সন্দেহের অনুভূতিমাত্র অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সে সন্দেহকে মনে স্থান দান করেন নাই।

তিনি বিবাহের অব্যবহিত পরে তাঁহারই সখিগণের সম্বন্ধে রাজার ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া, রাজধানীতে বিপন্ন ব্যথিত প্রজার সম্বন্ধে রাজার ব্যবস্থা মনে করিয়া মনকে সে সন্দেহ হইতে মুক্ত রাখিয়াছিলেন।

কিন্তু হায়—তিনি যে কিছুতেই রাজাকে মনের কথা জানাইতে পারেন নাই,—তিনি যে একবার ক্ষমা চাহিতে পারেন নাই,——ক্ষমা চাহিতে পারিলে তাঁহার হৃদয়ের এই বেদনার যে অর্দ্ধেক উপশম হইত? কত দিন

নিশীথে তিনি সুপ্ত পতির চরণতলে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার জাগরণের সম্ভাবনা দেখিলেই লজ্জায়—সঙ্কোচে চলিয়া আসিয়াছেন; যেন তিনি তস্করের মত আপনার স্বামীর শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন—আসিয়া আপনার শয্যায় লুটাইয়া কাঁদিয়াছেন। তিনি দিবা রাত্রি কেবল আশা করিয়াছেন রাজা যদি একবার তাঁহাকে পূর্ব্বের মত একটি কথা কহিতেন। কিন্তু কই সে আশা ত পূর্ণ হয় নাই; তাঁহারই ব্যবহার-ব্যথিত প্রেম আর ত তেমন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে নাই। সেও ত তাঁহারই দোষে।

আজ বিপদের যে ছায়া পড়িয়াছে—তাহাতে কি হয় কে জানে?

আজ রাণীর হৃদয়ের ব্যাকুলতা সকল সঙ্কোচ অতিক্রম করিল। আজ তিনি পতির চরণে আপনার সকল কথা নিবেদন করিবেন সঙ্কল্প করিয়া রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

কক্ষ শূন্য! রাজা নাই!

রাণীর চক্ষুর সম্মুখে কক্ষের আলোক ও হৃদয়ে আশার আলোক যেন নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। তিনি রাজার শূন্য শয্যায় পড়িয়া দারুণ যন্ত্রণায় কাঁদিতে চাহিলেন। যাতনাতিশয্যে ক্রন্দন আসিল না।

রাণী জানিতেন না—রাজা তখন দূতমুখে অনিবার্য্য বিপদের সংবাদ পাইয়াছেন—তখন তাঁহার আদেশপত্র লইয়া অশ্বারোহী পত্রবাহকগণ রাজ্যের চারিদিকে যাত্রা করিতেছে। রাণীর সকল আশা সত্য সত্যই ফুরাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে।

কায়া ও ছায়া।

(২)

ছায়া সকল প্রকার উন্নতির মূল। ছায়াকে অবলম্বন করিয়া ছায়ার যৌগ মাহাত্ম্যের আদর্শ হৃদয়ে ধরিয়া, সকল প্রকার উন্নতি করি। কি কাব্যে, কি কলাবিদ্যায়, কি ইতিহাসে—মানবজ্ঞানের সকল শাখাতেই এই ছায়া উন্নতির মূল বলিয়া বোধ হয়। চিত্রকর অপেক্ষা তদঙ্কিত চিত্রখানিকে আদর্শ করিলে চিত্রবিদ্যায় উৎকর্ষলাভ করিয়া থাকি। কবি অপেক্ষা কবির ছায়াস্বরূপ তদীয় ভাবপ্লাবিত কাব্যখানিকে আদর্শ করিয়া কাব্য-সাহিত্যে উন্নতি করিতে পারি। মানবজাতির প্রথম পুরুষের ছায়া উত্তর-বংশীয়গণের ছায়ার সহিত মিলিত হইয়া বিরাট মানব ইতিহাসে পরিণত হইয়াছে। মানব সৃষ্টির "প্রথম পুরুষের অবস্থা মনে কর দেখি—কিছু জানে না, কিছু বুঝে না, ভয়ে আকুল, পদে পদে ভ্রমবশতঃ ভীষণ অবস্থাপন্ন, রোগে নিরুপায়, পূজায় পিশাচ-শাসিত। অনেক ভুগিয়া, অনেক সহিয়া প্রথম মনুষ্য মরিয়া গেল। পৃথিবীতে কিছু রাখিয়া গেল না—কেবল এক খণ্ড পশুচর্ম্ম আর দুই খণ্ড কাঠ রাখিয়া গেল। দ্বিতীয় মনুষ্য সেই চর্ম্মটুকু এবং কাঠ দুইখানি পাইয়া যেন কতই শান্তিলাভ করিল, কত জ্বালা যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইল। আতপতাপিত পথিক বৃক্ষের ছায়া পাইলে যেমন চরিতার্থ হয়, প্রথম মনুষ্যের চর্ম্মটুকু এবং কাঠ দুখানি পাইয়া দ্বিতীয় মনুষ্যও তেমনি চরিতার্থ হইল। সেই চর্ম্মখণ্ডটুকু এবং দুইখানি কাষ্ঠে দ্বিতীয় মনুষ্য প্রথম মনুষ্যের ছায়া দেখিতে পাইল। সেই ছায়ায় বসিয়া সে পশুবধার্থ একটি পাথরের তীর নির্ম্মাণ করিল। নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূর্ব্বপুরুষের কাঠ এবং চর্ম্মখণ্ড এবং তাহার পাথরের তীরটি রাখিয়া মরিয়া গেল। তৃতীয় মনুষ্য সেই সবগুলি পাইয়া আরো একটু বেশী সুখশান্তি লাভ করিল, ক্লেশ হইতে আরো একটু মুক্ত হইল, তাহার জীবন-পথের যন্ত্রণা আরও একটু কমিল। তাহার জীবন-পথের উপর তাহার পূর্ব্বপুরুষের ছায়া আরো একটু প্রশস্ত, আরো একটু ঘনীভূত হইল। এইরূপে মনুষ্য পর্য্যায় যত বাড়িতে লাগিল, মনুষ্যের পূর্ব্বপুরুষের ছায়াও তত বাড়িতে লাগিল, সেই ছায়ায় বসিয়া মনুষ্যের সুখ, শান্তি,

সদ্বুদ্ধি, সদাশয়তা, সুনীতি, সুরীতি, সাত্বিকতা, সর্ব্বাঙ্গীণ সৌন্দর্য্য ভত বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে সেই ছায়া বাড়িয়া বাড়িয়া গাঢ়তর হইয়া বিরাট-রূপ ধারণ করিল। সেই বিরাট ছায়ায় বসিয়া বিরাট মনুষ্য ধর্ম্মশাস্ত্রে, ইতিহাসে, পুরাণে, দর্শনে, কাব্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে বিরাট কীর্ত্তি সম্পন্ন করিয়া বিরাট সভ্যতার সৃষ্টি করিল। মানুষের মন পূর্ব্ব পুরুষের বিরাট ছায়া পায় বলিয়াই বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে। নহিলে মানুষের পর মানুষ, পুরুষের পর পুরুষ, পর্য্যায়ের পর পর্য্যায় পশুপক্ষীর ন্যায় সমান কাঙ্গাল, সমান শোকার্ত্ত থাকিয়া যায়, জীবনপথে সমান জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে।" (ত্রিধারা।) সেই জন্যই বলিয়াছি, মানব-সমাজ ছায়ার সম্মিলনেই বিরাট রূপ ধারণ করিয়াছে। শুধু বিরাট মানব সমাজের উন্নতি ছায়ার উপর নির্ভর করিতেছে—তাহা নহে; ব্যক্তিগত, জাতিগত, দেশগত—সকল প্রকার উন্নতির মূলই ছায়া। তুমি নেপোলিয়ানের ছায়া লইয়া বীর হইতে চাহ। আমি প্রতাপের ছায়া লইয়া ত্যাগী, সন্ন্যাসী, সাধক হইতে চাহি। তুমি দার্শনিকের ছায়া লইয়া দার্শনিক হইতে চাহ। আমি কবির ছায়া লইয়া কবি হইতে চা'হ। তুমি Pope বা Bishop এর ছায়া লইয়া ধার্ম্মিক হইতে চাহ। আমি ব্রাহ্মণের আদর্শ লইয়া ধার্ম্মিক হইতে চাহি। সকল মানবই, সকল জাতিই, সকল দেশই এইরূপ ছায়ার অনুকরণে, ছায়ার অনুসরণে উন্নতিলাভ করিতেছে। ছায়ার এমনই আশ্চর্য্য শক্তি, এমনই মোহিনী মায়া, এমনি অদ্ভুত কুহক।

আত্মত্যাগেই আত্মপ্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। সুতরাং আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে আত্মত্যাগ বা আত্মোৎসর্গ করা আবশ্যক। "ছায়া আত্ম-ত্যাগের ফল। গাছের ছায়ায় গাছের রঙ থাকে না, গাছের দেহের পুষ্টি ও স্থূলতা থাকে না, গাছের জ্যোতিঃ ও লাবণ্য থাকে না, গাছের তেজঃ থাকে না, গাছের রস থাকে না। গাছ সব ত্যাগ করিলে তবে গাছের ছায়া হয়। স্ত্রী পুত্র, জনক জননী, ভাই ভগিনী, দাস দাসী, বন্ধু বান্ধব, সুখ সম্পদ, ভোগ বিলাস সব ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম ছায়ারূপী হইলে পর তবে বুদ্ধ, চৈতন্য অসংখ্য আতপতাপিত অনন্তপথের পথিকের বিশ্রামস্থান হইয়া-ছিলেন।" তিলে তিলে আপনার শ্যামল সৌন্দর্য্যশ্রীকে পরিপূর্ণ করিয়া নব অতিথি বসন্তের সমাগমে আপনার সমস্ত রূপসমৃদ্ধি উৎসর্গ করিয়া, যখন প্রকৃতি ত্যাগে বরেণ্য, মহিমায় উজ্জ্বল ও নগ্ন সৌন্দর্য্যে দিব্য হইয়া

উঠেন, তখনই তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠার সময় উপস্থিত হয়। তখনই আবার নবীন পল্লবে সজ্জিত হইয়া তদীয় ছায়া ফুলের ভিতর আত্মপ্রতিষ্ঠার বীজ নিহিত করিতে সমর্থ হয়েন। "বহুদিন হইল আমার একটি হিন্দু বালিকার সহিত সাক্ষাৎ হয়। বালিকা তিন চারি বৎসরের মধ্যে যৌবনে পদার্পণ করিল। তখন তাহার দেহ যেন ষোলকলায় পুর্ণ হইয়া উঠিল। পূর্ণ জোয়ারে সুন্দর স্রোতস্বিনী যেন কূলে কূলে পুরিয়া উঠিল, গাঙ্-ভরা জল ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। যুবতী শ্যামাঙ্গী,—কিন্তু শ্যামাঙ্গে সৌন্দর্য্য যেন ধরে না—শ্যামাঙ্গীর সৌন্দর্য্যের ছটা যেন চাঁদের হাসির ন্যায় হাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন যুবতীর পূর্ণ প্রস্ফুটিত দেহে পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য সংযুক্ত হইয়াছে। এই সময়ে কিছুদিন আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। আবার যখন দেখিলাম, তখন আর তাঁহাকে দেখিলাম না;—তাঁহার দেহের তত ঐশ্বর্য্য তাঁহার দেহে নাই—সে সমস্ত তাঁহার ছায়ারূপী দেহের ছায়ারূপী অঙ্কস্থিত শতদলপদ্মসদৃশ একটি শিশুর দেহে অর্পিত হইয়াছে। ঐশ্বর্য্যরূপিণী যুবতী আপনার ঐশ্বর্য্য সন্তানকে দিয়া আপনি ছায়ারূপিণী হইয়াছেন।" (ত্রিধারা) যুবতীকে জননী হইতে দেখিয়া বুঝিলাম যে, যুবতী অপেক্ষা জননী সুন্দর, এবং বৃক্ষ অপেক্ষা বৃক্ষের ছায়া সুন্দর। ত্যাগ করিতে না পারিলে জগতে কোন কাষই হয় না। জননীর ন্যায় আপনার সব ত্যাগ করিতে না পারিলে ছায়া হয় না,—ছায়া না হইলে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার উপায় হয় না।

সকল দেশেই কায়ার অপেক্ষা ছায়ার আদর অধিক। তবে ভারতে অন্য দেশের অপেক্ষা এ আদর আরও একটু গাঢ়তর। অন্য দেশে ছায়ার আদর আংশিক, ভারতে তাহা সম্পূর্ণ। অন্য দেশে অনেক সময় কায়ার জন্য কায়ার আদর, অন্যদেশে যুবতীর লাবণ্যময়ী মূর্ত্তির পূজাই দেখিতে পাই; কিন্তু ভারতে "প্রজনার্থং মহাভাগা পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ"—তাঁহারা সন্তানকে জন্ম দেন বলিয়াই মহাভাগ, পূজনীয়া, ও গৃহের দীপ্তিস্বরূপা। সেইজন্যই ভারত বলে "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—এবং সেইজন্যই ভারতের শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"—নারী যেস্থানে পূজিতা হয়েন, দেবতারাও তথায় বিহার করেন। ভারত রমণীকে দেবী বলিয়া পূজা করে।

প্রতি মানব জাতির চিন্তা, তাহার আচারবিচার, তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম তাহার

মতামত সেই জাতির কাব্যে যেমন পরিষ্কাররূপে প্রতিফলিত হয়,—এমন আর কিছুতেই হয় না। হিন্দুর এই ছায়াপ্রিয়তা হিন্দুর কাব্যে বহুল পরিমাণে দেখিতে পাই। ভারতের কাব্যে কায়ার অপেক্ষা ছায়ারই গৌরব অধিক দেখি। ভারতের যে কোন কবির কাব্যেই এইরূপ দেখিতে পাই। 'কুমার সম্ভবে' দেখি কায়ার অপেক্ষা ছায়ার গৌরব অধিক; 'অভিজ্ঞান শকুন্তলে' দেখি,—কায়া যে স্থলে কোনও কায করিতে পারে না, ছায়া সে স্থলে অনায়াসে সেই কায করিয়া দেয়। 'কুমার সম্ভবের' প্রথমে কি দেখি?—দেখি,—সৌন্দর্য্যের আকর হিমালয়ে অতর্কিত অকাল বসন্তের আবির্ভাবে "দিগ্বধূ সদ্যঃপুষ্পিত অশোকের নবপল্লবজাল মর্ম্মরিত করিয়া আতপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।" নব বসন্তের সমাগমে বনস্থলী অভিনব সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসমানা হইয়া উঠিল। আর সেই নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে, প্রকৃতির বাসন্তী বল্লরীরই মত অনুপম সুন্দরী—

আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিবস্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব॥

—গৌরী যখন যতি কৃত্তিবাসের হৃদয়ে লালসা উদ্দীপিত করিতে না পারিয়া অভিমানে, রোষে, ক্ষোভে আপনার সৌন্দর্য্য ও রূপরাশিকে ধিক্কার দিতে দিতে ফিরিলেন, তখন বুঝিলাম—কায়ার সৌন্দর্য্য যতই হউক না কেন, তাহা বাস্তবিকই মূল্যবান নহে। আবার যখন তিনি "দিবসের শশি-লেখার ন্যায় কর্শিতা, শ্লথ-লম্বিত পিঙ্গল-জটাধারিণী তপস্বিনী"বেশে—প্রেমের সফলতা সন্তানজননের উপযুক্ত নির্ম্মলোজ্জ্বলবেশে—মহাযোগী মহাদেবের মনোহরণ করিলেন, তখন বুঝিলাম, কায়ার অপেক্ষা ছায়ার গৌরব অধিক; জননীর মূর্ত্তি যুবতীর মূর্ত্তি অপেক্ষা মহিমময়ী। সেই জন্যই "জননীপদ আমাদের দেশের নারীর প্রধান পদ; সন্তানের জন্ম আমাদের দেশে একটি পবিত্র মঙ্গল-ব্যাপার। সমস্ত কুমার-সম্ভব কাব্য কুমার-জন্মরূপ মহৎ ব্যাপারের উপযুক্ত ভূমিকা। মদন গোপনে শর-নিক্ষেপ করিয়া ধৈর্য্যবাঁধ ভাঙিয়া যে মিলন ঘটাইয়া থাকে, তাহা পুত্রজন্মের যোগ্য নহে; সে মিলন পরস্পরকে কামনা করে, পুত্রকে কামনা করে না। এই জন্যই কবি মদনকে ভস্মসাৎ করাইয়া গৌরীকে দিয়া তপশ্চরণ করা-

ইয়াছেন। এই জন্তই কবি প্রকৃতির চাঞ্চল্যস্থলে ধ্রুব নিষ্ঠার একাগ্রতা, সৌন্দর্য্য-মোহের স্থলে কল্যাণের কমনীয় দ্যুতি এবং বসন্তবিহ্বল বনানীর স্থলে আনন্দনিমগ্ন বিশ্বলোককে দাঁড় করাইয়াছেন;—তবে কুমারজন্মের সূচনা হইয়াছে। কুমারজন্ম ব্যাপারটা কি; তাহাই বুঝাইতে কবি মদনকে দেব-রোষানলে আহুতি দিয়া অনাথা রতিকে বিলাপ করাইয়াছেন।" * অকস্মাৎ উদ্ভাসমান উদ্দাম সৌন্দর্য্য কল্যাণপ্রসূতি নহে,—তাহা প্রেমের চরম পরিণাম সন্তান-উৎপাদনের সহায় নহে বলিয়াই দেবতা ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। যে কায়া ছায়ার প্রসূতি হইবার উপযুক্ত নহে,তাহার এমনই অনাদর!

'অভিজ্ঞানশকুন্তলে' দেখি "কণ্বদুহিতাকেও একদিন তাঁহার যৌবন-লাবণ্যের সমস্ত ঐশ্বর্য্যসম্পদ লইয়া অবমানিত হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল।" 'শকুন্তলার' প্রথমে দেখি,—দুষ্মন্ত অনসূয়া-প্রিয়ম্বদার সখীর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ। তখন শকুন্তলার যৌবন সবে মাত্র উদ্ভিন্ন হইয়াছে, তারুণ্যের সমস্ত সৌন্দর্য্য বালিকার নবাঙ্গে মুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। আর রাজা সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়া কখনও বলিতেছেন,—"দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ", কখনও ভাবিতেছেন, মানুষী শক্তিতে এমন রূপের সম্ভব নহে,—"ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ",—আবার কখনও সেই রূপময়ীকে তদবস্থায় দেখিয়া মোহগ্রস্ত হইয়া মহর্ষি কণ্বকে "অসাধুদর্শী" ভাবিয়া বলিতেছেন,—

ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপু-
স্তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া
শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি॥

কায়ার উচ্ছ্বলিত রূপের জন্য এই যে আগ্রহ,—ইহা জ্ঞানীর লিপ্সা নহে, অজ্ঞানের মোহ। তাহা কাব্যমাত্রেই আমরা দেখিতে পাই। শকুন্তলার এই রূপ, এই অমানুষী ললিতশ্রী দুষ্মন্তকে শেষে ভুলাইতে পারিল না। রাজা এ রূপকে অগ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু শেষ অঙ্কে দেখ দেখি—কি স্নিগ্ধোজ্জ্বল চিত্র! স্বর্গের অমৃতময় তপোবনে একটি বালক আপনার পবিত্র রূপমঞ্জরী বিকীর্ণ করিয়া সমস্ত তপোবনটিকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। আর শকুন্তলার সে স্থানে কি রূপ? তিনি,—

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত প্রাচীন সাহিত্য।

বসনে পরিধূসরে বসানা
নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।

তিনি এখন আপনার সমস্ত রূপমাধুরী তদীয় সন্তান বা ছায়ার অঙ্গে ঢালিয়া দিয়া "ত্যাগের দ্বারা পরিপূর্ণ, দুঃখের দ্বারা চরিতার্থ এবং ধর্ম্মের দ্বারা ধ্রুব" হইয়াছেন। এখন রাজা সহজেই পরাজয় স্বীকার করিলেন। যে শকুন্তলাকে একদিন 'আপন্নসত্ত্বা' বলিয়া রাজা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, আজ সেই শকুন্তলার সেই পুত্রের অঙ্গস্পর্শ করিবার জন্য, রাজা একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কায়া যাহা করিতে পারে নাই, ছায়া সহজেই তাহা সম্পন্ন করিল। রাজা এবার পরিপূর্ণ রূপকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের মিলন হইল। ভারতবর্ষ এই মিলনকেই শ্রেষ্ঠ মিলন বলে।

"ভারতবর্ষের পুরাতন কবি প্রেমকেই প্রেমের চরমগৌরব বলিয়া স্বীকার করেন নাই, মঙ্গলকেই প্রেমের চরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে নরনারীর প্রেম সুন্দর নহে, যদি তাহা বদ্ধ হয়,—যদি তাহা আপনার মধ্যেই সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে,—কল্যাণকে জন্মদান না করে এবং সংসারের পুত্রকন্যা অতিথিপ্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্র সৌভাগ্যরূপে ব্যাপ্ত হইয়া না যায়।"* আবার সেদিনকার কবির কাব্যেও দেখি,—কায়া যে স্থানে প্রত্যাখ্যাতা,—সে স্থানে তাহা ছায়ার জন্য কাঁদিয়া মরিতেছে। ভ্রমর ক্ষুদ্র বালিকা—বালিকা নহে, যুবতী,—ভ্রমরেরই মত কালো; তাহার হৃদয়ে অগাধ প্রেম-পারাবার নিরন্তর উদ্বেলিত। গোবিন্দলাল সুগৌর। পতি-পত্নীতে অচ্ছেদ্য দৃঢ় বন্ধন। কিন্তু এ বন্ধনও কাটিয়াছিল। যে গোবিন্দলাল ভ্রমরের কালো রূপে একদিন মুগ্ধ ছিল, যে ভ্রমরকে সোহাগপূর্ণ "ভ্রমর," "ভোমরা" "ভোমর," "ভোম," "ভুমরি," "ভুমি," "ভুম" "ভোঁ-ভোঁ" প্রভৃতি নিত্যনূতন, নিত্য স্নেহপূর্ণ, রঙ্গপূর্ণ, সুখপূর্ণ সম্বোধনে আদর করিত, যে ভ্রমরের "চাহনি দেখিয়া গোবিন্দলাল ভাবিত, "এত গুণ!" আবার যে ভ্রমরের "চাহনি দেখিয়া গোবিন্দলাল ভাবিয়া ভাবিয়া, এ সংসার সকল ভুলিয়া যাইত," সেই গুণময়ী, প্রেমময়ী "ভোমরা দাসী"কেও গোবিন্দলাল ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু ভ্রমর যদি আপনার ছায়াটিকে কোলে করিয়া বসিয়া থাকিত, তাহা হইলে শত রোহিণীর রূপলাবণ্য

* প্রাচীন সাহিত্য।

ধূলিমুষ্টির ন্যায় নগণ্য বোধ হইত। যখন ভ্রমর স্বামীকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না,—যখন কায়া অভীষ্টলাভ করিতে পারিল না—তখন ভ্রমর কি করিল?—"ভ্রমরের একটি পুত্র হইয়া সুতিকাগারেই নষ্ট হয়। ভ্রমর আজি কক্ষান্তরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া সেই সাত দিনের ছেলের জন্য কাঁদিতে বসিল। মেঝের উপর পড়িয়া ধূলায় লুটাইয়া প্রশমিত নিশ্বাসে পুত্রের জন্য কাঁদিতে লাগিল। 'আমার ননীর পুতলী, আমার কাঙ্গালের সোনা, আজ তুমি কোথায়? আজ তুই থাকিলে আমায় কার সাধ্য ত্যাগ করে? আমার মায়া কাটাইলেন, তোর মায়া কে কাটাইত? আমি কুরূপা, কুৎসিতা, তোকে কে কুৎসিত বলিত? তোর চেয়ে কে সুন্দর? এক-বার দেখা দে বাপ—এই বিপদের সময় একবার দেখা দিতে পারিস না—মরিলে কি আর দেখা দেয় না?'—"

ছায়ার জন্য কায়ার এ রোদন বড়ই করুণ, বড়ই মর্ম্মস্পর্শী, বড়ই পবিত্র। জগতে কায়া অপেক্ষা ছায়ারই গৌরব অধিক। কায়ার ক্ষণিক উজ্জ্বল দীপ্তির মোহে আমরা যেন ছায়ার শাশ্বত শান্ত মাধুরী ভুলিয়া না যাই; কায়ার উদ্দাম সৌন্দর্য্যে অন্ধ হইয়া ছায়ার মঙ্গল প্রতিমাকে যেন অবহেলা না করি। ছায়াই জগতের সকল সুখের, সকল উন্নতির মূল। কায়া ক্ষুদ্র, ছায়া বিরাট; কায়া দীন, ছায়া মহান্; কায়া ও ছায়ার এই দর্শন বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টি!

শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

গুণের পরাজয়।

রবি করে সারা বিশ্বে কিরণ বিস্তার,
গিরি-গুহা-অন্ধকার না পারে হরিতে;
জ্ঞানী করে নরহৃদে জ্ঞানের সঞ্চার,
মূর্খ-হৃদি-অজ্ঞানতা নারে বিদূরিতে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পিতৃভক্তির পুরস্কার।

১

মৃত্যুঞ্জয় রায় যখন পাটের ব্যবসা করিতে আরম্ভ করেন তখন, ব্যবসা নূতন, কাযেই ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ ছিল। মৃত্যুঞ্জয় পঞ্চবিংশবর্ষকাল ব্যবসা করিয়া যে লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান সময়ে ব্যবসায়ীদিগের কল্পনাতীত। এই ব্যবসায় উপলক্ষে তাঁহাকে সর্ব্বদা য়ুরোপীয় ব্যবসায়ী-দিগের সহিত মিশিতে হইত। সে সম্প্রদায়ে তাঁহার যথেষ্ট সম্মানও ছিল। তিনি বৎসরে একদিন য়ুরোপীয় ব্যবসাদারপ্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া অপ্যায়িত করিতেন। কিন্তু নিমন্ত্রণটা হইত তাঁহার বাগানে। কারণ তিনি এদিকে কিছু গোঁড়া হিন্দু ছিলেন—গৃহের এক অংশ ভাঙ্গিয়া ঠাকুর বাড়ী নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। তবে দুই বিষয়ে তিনি য়ুরোপীয়দিগের অনুকরণ করিতেন—তিনি যেরূপেই হউক যথাকালে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য শেষ করিতে চেষ্টা করিতেন এবং শারীরিকশ্রমবিমুখতা নিন্দনীয় জ্ঞানে প্রত্যহ প্রাতে অশ্বারোহণ করিতেন।

চল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার কন্যাদ্বয় বিবাহিতা। মৃত্যুঞ্জয় আর বিবাহ করিলেন না; কিন্তু পিণ্ডের উপায় ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিবার উদ্দেশ্যে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন। এই দত্তকগ্রহণ উপলক্ষে কন্যাদ্বয়ের সহিত মৃত্যুঞ্জয়ের মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। কন্যাদ্বয়ের আশা ছিল, তাঁহারাই পিতার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবেন। পিতার দত্তক-গ্রহণে তাঁহারা হতাশ হইলেন। কন্যাদ্বয়ের হতাশা বেদনায় পর্য্যবসিত হইল; জামাতৃদ্বয়ের হতাশা মর্ম্মান্তিক ক্রোধে পরিণতি লাভ করিল। মৃত্যুঞ্জয় তাহা বুঝিলেন; বুঝিয়া মনে মনে হাসিলেন। তিনি স্বনামধন্য পুরুষ; জামাতৃদ্বয়ের বিলাসপ্রিয়তা ও কর্ম্মবিমুখতা তাঁহার ভাল লাগিত না। এখন তিনি আশা করিলেন, এবার হয়ত তাঁহারা উপার্জ্জনের উপায় দেখিবেন। সে যাহাই হউক, তিনি যে উইল করিলেন, তাহাতে কন্যাদ্বয়ের যে ব্যবস্থা করিলেন তাহাতে জামাতৃদ্বয়ের অর্থোপার্জ্জনচেষ্টা না করিলেও যে চলিত না, এমন নহে। কিন্তু সে উইলের ব্যবস্থা তিনি ও তাঁহার উকীল ব্যতীত আর কেহই জানিতেন না। সে ব্যবস্থার বিষয় তিনি সতর্কতার সহিত গোপন রাখিয়াছিলেন। কেবল তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহভাজন জ্ঞাতি ও প্রধান কর্ম্মচারী বলাইচন্দ্র জানিতেন, তিনি উইল করিয়াছেন।

জামাতৃদ্বয়ের ব্যবহারে মৃত্যুঞ্জয় যেরূপ অসুখী ছিলেন পোষ্যপুত্রের ব্যবহারে ততোঽধিক অসুখী ছিলেন। পোষ্যপুত্র কেবল যে অলস ও অকর্ম্মণ্য ছিল তাহাই নহে; পরন্তু অসৎ সংসর্গে সে ক্রমেই দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর সে যে ব্যবসা চালাইতে পারিবে না, তাহা বুঝিয়া তিনি অল্পে অল্পে জাল গুটাইতেছিলেন। কিন্তু ক্রমে তাঁহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছিল যে, সে সম্পত্তি নষ্ট করিয়া শেষে স্বয়ং কষ্ট পাইবে। এই ধারণা তাঁহার পক্ষে অশেষ ক্লেশের কারণ হইয়াছিল।

২

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মৃত্যুঞ্জয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহার বোধ হইল, নিম্নে প্রাঙ্গণে বহুকণ্ঠের কলরব; কিন্তু সকলেই যথাসম্ভব অনুচ্চ স্বরে কথা কহিতে সচেষ্ট। তিনি বাতায়নের পাখী তুলিলেন; যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে যুগপৎ বেদনায় ও বিরক্তিতে তাঁহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। পোষ্যপুত্র শ্রীমাধব অতিরিক্ত মদ্যপানহেতু "বেএক্তিয়ার;" ভৃত্যবর্গ ধরাধরি করিয়া তাহাকে লইয়া যাইতেছে। তাহারা অনুচ্চ স্বরে কথা কহিতেছে; বোধ হয়, উদ্দেশ্য—তিনি জানিতে না পারেন।

প্রাঙ্গণের যে দিকে তাঁহার শয়নগৃহ—তাহার বিপরীত দিকে শ্রীমাধবের শয়নগৃহ। মৃত্যুঞ্জয় দেখিলেন, সেই কক্ষের বাতায়নে দাঁড়াইয়া তাঁহার পুত্রবধূ মানদা আপনার দুর্দ্দশার দারুণ চিত্র দেখিল, তাহার পর বেদনার আতিশয্যে দুই কর জুড়িয়া দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিল। কিশোরীর এই বেদনাব্যঞ্জক ভাবে মৃত্যুঞ্জয় মর্ম্মাহত হইলেন। পুত্রবধূকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহারই স্নেহে বালিকা শাশুড়ীশূন্য শ্বশুরালয়ে আসিয়া এক দিন জনকজননীর অভাব অনুভব করে নাই। তাহার মর্ম্মবেদনার বিষয় চিন্তা করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হৃদয়ে বৃশ্চিকদংশনযাতনার মত দারুণ যন্ত্রণাভোগ করিতে লাগিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় আর ঘুমাইতে পারিলেন না। তিনি স্থির করিলেন, সম্পত্তির আবশ্যক ব্যবস্থা করিয়া তিনি ব্যবসায় তুলিয়া দিয়া বৃন্দাবনবাসী হইবেন।

৩

ক্রমে রাত্রি পোহাইল। ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—অশ্ব সজ্জিত হইয়াছে। অভ্যাসবশে অন্যমনস্কভাবে মৃত্যুঞ্জয় বেশপরিবর্ত্তন করিয়া অশ্বে আরো-

হণ করিলেন। চিন্তা সঙ্গে সঙ্গে গেল। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর সম্মুখে একটি পলায়নপরা বালিকার পবনান্দোলিত রঞ্জিত অঞ্চলাগ্র দেখিয়া অশ্ব ভীত হইল—সহসা ঋজুগতি ত্যাগ করিয়া বেগে বামদিকে ফিরিল। নিপুণ নাবিক যেমন বাত্যাবৃষ্টিতে অনায়াসে নৌকার গতি নির্দ্দেশ করিতে পারে অশ্বারোহণপটু মৃত্যুঞ্জয় তেমনই অনায়াসে অশ্বের গতি নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন। কিন্তু আজ তিনি একান্ত অন্যমনস্ক ছিলেন—আজ তিনি সমস্ত জীবনের সঙ্কল্পিত কার্য্য ত্যাগ করিতে উদ্যত—তাই চিন্তাবিষ্ট। অশ্বের গতিপরিবর্ত্তনে তিনি ভূপতিত হইলেন—মস্তকে দারুণ আঘাতে মূর্চ্ছিত হইলেন।

এদিকে আরোহীর পতনে অশ্ব বেগে গৃহাভিমুখে ছুটিয়া চলিল—যাইয়া মন্দুরায় প্রবেশ করিল। তখন গৃহে সংবাদ আসিল—হাঁকাহাঁকি ডাকা-ডাকি আরম্ভ হইল—চারিদিকে লোক গেল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে বলাইচন্দ্র মূর্চ্ছিত প্রভুকে লইয়া সাশ্রুনেত্রে গৃহে প্রবেশ করিলেন। মানদা কাঁদিতে লাগিল।

ডাক্তারগণ আসিলেন। বহু চেষ্টায় মৃত্যুঞ্জয়ের জ্ঞানসঞ্চার হইল, কিন্তু তাহার আবির্ভাব বিলয়ভূয়িষ্ঠ বিদ্যুতের মত অল্পকালস্থায়ী হইল। সকলেই বুঝিলেন, মৃত্যুঞ্জয়ের আয়ুষ্কাল ফুরাইয়া আসিয়াছে। শ্রীমাধবের মোসাহেব-মহলে "মাইফেল" চলিল; মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর পর কিরূপ ব্যবস্থা হইবে—তাহার সম্বন্ধে কালনেমীর লঙ্কাভাগের পুনরভিনয় হইতে লাগিল। বৃদ্ধ তাহাদের অধঃপতনের পথে অন্তরায়রূপে বিদ্যমান ছিলেন—এবার সে অন্তরায় দূর হইতেছে; তাহারা গড়াইতে গড়াইতে অধঃপতনের অতলে যাইবে। সে কল্পনাতেও কত সুখ!

৪

মানদা আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া শ্বশুরের সেবা করিতে লাগিল। ইহাতে তাহাকে ননন্দাদ্বয়ের নিকট অত্যন্ত গঞ্জনা ভোগ করিতে হইল। পিতা পোষ্যপুত্র গ্রহণে কন্যাদিগের ভাবান্তরে স্বার্থের প্ররোচনা বুঝিয়া-ছিলেন—কন্যাদ্বয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতার কিছু হ্রাস হইয়াছিল। এখন তাঁহারা আসিলেন।—পোষ্যপুত্রের পত্নী মানদার ব্যবহারে তাঁহারা এমনই ভাব দেখাইতেন, যেন সে নিতান্তই উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে। মানদা তাঁহাদের ঘৃণা বিদ্রূপ কিছুতেই বিচলিত হইত না। সে সাগ্রহে শ্বশুরের

শুশ্রূষা করিত। শৈশবে পিতৃহীনা মানদা শ্বশুরের স্নেহে পিতৃস্নেহের আস্বাদ পাইয়াছিল—সে স্নেহের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছিল।

৫

সাত দিন কাটিয়া গেল। রোগীর অবস্থা প্রভাতে একটু ভাল থাকে; মধ্যাহ্নের পর হইতে বিকারলক্ষণ প্রকাশ পায়। অষ্টম দিন প্রভাত হইতেই অবস্থান্তর লক্ষিত হইতে লাগিল—প্রভাতেই একবার মূর্চ্ছা হইল। মানদা "জল দাও—জল দাও"—বলিয়া উঠিল। বলাইচন্দ্র বলিলেন, "আমি ঠাকুর বাড়ী হইতে চরণামৃত আনিতেছি"; বলিয়া তিনি দ্রুতপদে ঠাকুরবাড়ীর দিকে চলিলেন। গোলমালে শ্রীমাধব তথায় আসিয়াছিল। সে বলিল "আর চরণামৃত কেন? আমার ঘরে ভাল জল আছে।" ততক্ষণে মৃত্যুঞ্জয়ের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছে—পুত্রের কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইল। পুত্র যে পানীয়ের কথা বলিতেছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন—ভাবিলেন, তিনি ত মৃত্যুমুখে; দুইদিনের বিলম্ব—তাহাও যাহার সহিতেছে না তাহাকেই তিনি পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন! তাঁহার কোটরগত নয়নদ্বয় জলে ভরিয়া উঠিল। মানদা সযত্নে অঞ্চলে সে অশ্রু মুছাইয়া দিল।

৬

পরদিন প্রভাতে আবার মৃত্যুঞ্জয়ের জ্ঞানোদয় হইল। আজ কন্যাদ্বয় পরামর্শ স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা বলিলেন, "বাবা, আমাদের কি হইবে?"

মৃত্যুঞ্জয় বলিলেন, "কেন, মা?"

"তুমি না থাকিলে কি আর আমরা এ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পাইব?"

"পাইবে, মা। আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। আর তোমাদের অভাব কিসের যে তোমার এবাটীর আশ্রয়ের প্রত্যাশা রাখিবে?"

কনিষ্ঠা এতক্ষণ অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছিলেন; এখন বলিলেন, "দেখিলে, দিদি, আমি ত বলিয়াছিলাম, বাবা সে ব্যবস্থা করিবেন।"

জ্যেষ্ঠা বলিলেন," আমিইকি তাহা জানিতাম না? কিন্তু বাবা—মা'র গহনাগুলি—"

মৃত্যুঞ্জয় বলিলেন, "ভাল কথা মনে করিয়াছ। আগামী কল্য প্রাতে আমাকে একথা স্মরণ করাইয়া দিও।"

কন্যাদ্বয়ের মুখে ও চক্ষুতে আনন্দদীপ্তি দীপ্ত হইয়া উঠিল।

মৃত্যুঞ্জয় বলাইচন্দ্রকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বলাই, কল্য প্রাতে একজন স্বর্ণকার আনাইবে এবং আমার এটর্ণীকে আসিতে বলিবে।"

৭

পরদিন প্রাতে স্বর্ণকার আসিলে মৃত্যুঞ্জয় কন্যাদ্বয়কে ডাকাইয়া তাঁহার মৃতা পত্নীর অলঙ্কারগুলি আনাইলেন। তাঁহার আদেশে প্রত্যেক অলঙ্কার সমান দুই ভাগে বিভক্ত করা হইল। দুই কন্যাকে সেইগুলি সমান ভাবে ভাগ করিয়া দিয়া মৃত্যুঞ্জয় বলিলেন, "তোমাদের প্রাপ্য হইতে কে তোমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে?" জ্যেষ্ঠা কন্যা বলিলেন, "বাবা, সে কি আর আমি জানি না? তুমি আমাদের কত ভালবাস!" কনিষ্ঠা বলিলেন, "তুমি ছাড়া আর আমাদের কে আছে; আমাদের মা নাই; কিন্তু তোমার স্নেহে আমরা সে অভাব বুঝিতে পারি নাই।"

ইহার পর এটর্ণীর ডাক পড়িল। রুদ্ধদ্বার কক্ষে মৃত্যুঞ্জয়ের নূতন উইল লিখিত হইবে। মৃত্যুঞ্জয় উইলে সহি করিলেন—সাক্ষী এটর্ণী, বলাইচন্দ্র ও এটর্ণীর সহকারী।

সাত দিন পরে মৃত্যু মৃত্যুঞ্জয়কে জয় করিল। মৃত্যুঞ্জয়ের শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার অবসান হইল।

৮

গৃহে দুহিতৃদ্বয়ের আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইল। কিন্তু তাহা অধিককালস্থায়ী হইল না। সকলেই মৃত্যুঞ্জয়ের উইলের নির্দ্দেশ জানিবার জন্য উৎসুক। কেবল মানদার সে ঔৎসুক্য নাই!

তাহার পর সংবাদ দিয়া এটর্ণীকে আনান হইল। তিনি উইল আনাইলেন। উইল পাঠকালে আশায় ও আশঙ্কায় মৃত্যুঞ্জয়ের দুহিতৃদ্বয়ের ও জামাতাদিগের হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। শ্রীমাধব জানিত, সে-ই মৃত্যুঞ্জয়ের উত্তরাধিকারী, নিশ্চিন্ত আনন্দে তাহার ওষ্ঠাধর মৃদুহাস্যলিপ্ত।

মৃত্যুঞ্জয় উইলে বলিয়াছিলেন, তিনি পূর্ব্বে যে উইল করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কন্যাদ্বয়ের প্রত্যেককে পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া পোষপুত্র শ্রীমাধবকে সেবাইত করিয়াছিলেন। পুত্রকন্যার ব্যবহারে তিনি মত পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। কন্যাদ্বয় তাঁহাদিগের জননীর অলঙ্কার পাইয়াছেন; তাঁহারা আর কিছুই পাইবেন না।

শ্রীমাধবকে তাঁহার কিছুই দিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু তিনি সেই দরিদ্র-সন্তানকে ধনীর উত্তরাধিকারী করিবার চেষ্টা করিয়া তাহার "চাল" বাড়াইয়া দিয়াছেন—সেইজন্য তাহাকে কিছু দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রিসিভারের হস্তে যাইবে। তাহার আয় হইতে শ্রীমাধব ও মানদা প্রত্যেকে মাসিক ১০০০৲ টাকা বৃত্তি পাইবেন; অবশিষ্ট আয় কোন সদনুষ্ঠানে ব্যায়িত হইবে।

* * * * *

উইলের নির্দ্দেশ শুনিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের দুহিতৃদ্বয় মৃত্যুসুপ্ত পিতার উদ্দেশে নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীমাধবা ক্রোধে ও অভিমানে অধীর হইয়া সুরাপানে হতাশা-বেদনা ভুলিতে সচেষ্ট হইল। তাহার মোসাহেবদল তাহাকে বুঝাইল, এ উইল টিকিবে না।

কেবল পতিপ্রেমবঞ্চিতা অভাগিনী মানদা শ্বশুরের মৃত্যুতে আপনাকে পিতৃহীনা, অসহায়া অনুভব করিল।

আজ সেই উইলে উল্লিখিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে আর কেহই জীবিত নাই। কেবল একটি জনহিতকর অনুষ্ঠান আজও মৃত্যুঞ্জয়ের স্মৃতিকে মৃত্যুজয়ী করিয়া রাখিয়াছে।

সত্য-প্রকাশ।

নিশীথের ধ্বান্তরাশি বিনাশি,' প্রভাতে,
ফুটে যবে প্রাচী-নভে ভাস্বর তপন;
ধরণী উজলি' উঠে পবিত্র জ্যোতিতে—
মধুর হরষ-রসে হয় নিমগন!
মিথ্যা-মোহ তমোরাশি নাশিয়া তেমতি
জ্যোতির্ম্ময় সত্য যবে প্রকাশে হৃদয়ে;
অন্তর ভরিয়া উঠে সে শুভ আলোকে,—
কি সুখ-আবেশে আত্মা রহে মগ্ন হ'য়ে!

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান।

য়ুরোপের সংসর্গে ও অন্যান্য কয়েকটি অবান্তর কারণে আজকাল আমাদের দেশে ধর্ম্মবুদ্ধি হ্রাস পাইতেছে। য়ুরোপে বিজ্ঞানের সহিত সংঘর্ষে ধর্ম্মকেই হটিতে হইয়াছে। যে ধর্ম্মমতের সহিত য়ুরোপে বিজ্ঞানের বিরোধ বাধিয়াছিল, সে ধর্ম্মমত তর্ক-যুক্তির সম্মুখে অধিক ক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে না। সে ধর্ম্মমতের প্রথম কথা জ্ঞান বৃক্ষের ফলের আস্বাদনই মানবের পতনের মূল কারণ। সংসার-উদ্যানে ভগবানই জ্ঞানবৃক্ষ সৃষ্ট করিয়াছিলেন, ভগবানের ইচ্ছাতেই সেই বৃক্ষ কাননপ্রান্তে ফলশোভিত হইয়াছিল। কিন্তু ভগবানের আদেশেই আদি মানব ও মানবী তাহা ভক্ষণ করেন নাই। তাহার পর সর্পরূপী সয়তান আসিয়া মানবজননী ইভকে সেই জ্ঞানফল ভক্ষণ করিতে প্রলুব্ধ করে। ইভ আবার তাঁহার ভর্ত্তাকে সেই ফল ভক্ষণ করান। ফলে মানবজাতির পতন ঘটে। পাশ্চাত্য ধর্ম্মশাস্ত্রে মানবদেহে পাতক-সঞ্চারের ইহাই আদি ইতিহাস। এই উক্তিতে পাশ্চাত্য ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্ঞান-বিরোধিতা ও অন্ধবিশ্বাস-মূলকতাই সূচিত হইতেছে। কিন্তু অবস্থার তাড়নায় ও প্রকৃতির প্রতিকূলতায় পাশ্চাত্য জাতিগণ ক্রমশঃ জড় জগতের কয়েকটিমাত্র রহস্যের উদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। যে যাহার সাধনা করে, সে তাহাতেই সাফল্য লাভ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে প্রকৃতি দেবী যেরূপ করুণা-কটাক্ষ করিয়াছেন, য়ুরোপের কোনও দেশেই প্রায় সেরূপ করেন নাই। প্রকৃতি-প্রদত্ত স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে য়ুরোপে প্রাণরক্ষা করা বড় কঠিন হইয়া উঠে। তথায় প্রাণের দায়ে প্রতি-কূলা প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে আত্মরক্ষার কবচ সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। সেই সংগ্রামে মানব যতই জয়যুক্ত হইতে লাগিল, ততই সে প্রকৃতির মর্ম্মরহস্য উদ্ভিন্ন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অধিক জ্ঞান ও সম্পদ সংগ্রহ করিতে আগ্রহন্বিত হইয়া উঠিল। এই প্রকারে য়ুরোপে জ্ঞান ও জড় বিজ্ঞানের উৎপত্তি আরব্ধ হইল।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যতদিন নিতান্ত শিশু ছিল, ততদিন তাহার সহিত ধর্ম্মের সংঘর্ষ বাধে নাই। তখন কংস-ভয়ে দূরে রক্ষিত দেবকীনন্দনের মত উহা গোকুলে যশোদার গৃহেই বাড়িতেছিল। ক্রমে বিজ্ঞান সবল ও পুষ্ট হইতে লাগিল,সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের সহিত তাহার বিরোধ বাধিয়া উঠিল। এই বিরোধের

ফলে ধর্ম্মের বল ও প্রসার বৃদ্ধি হইতে থাকিল। গ্যালিলীর ধীবর-সমাজে যে ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সেই ধর্ম্মই কত পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। জ্ঞান বা বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের বিরোধই ধর্ম্মমতের এই পরিবর্ত্তনের কারণ। ধর্ম্ম ও জ্ঞানের বিরোধ ফলেই পাশ্চাত্য দর্শনের উৎপত্তি। দর্শন প্রথমে ধর্ম্মেরই অনুগত ভৃত্য ছিল। ধর্ম্ম প্রবক্তৃগণ যখন নিরবচ্ছিন্ন বিশ্বাসের আসর ছাড়িয়া যুক্তির আসরে নামিলেন,—তখনই দর্শন-শাস্ত্রের উদ্ভব হইল। কিন্তু দর্শন অধিক দিন ধর্ম্মের আনুগত্য করে নাই। ধর্ম্মপ্রবক্তারা বিশ্বাসের আসরের অতি সান্নিধ্যেই যুক্তির আসর পাতিয়া তাহাতেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দর্শন যেমন বিশ্বাসের সহিত সকল সংশ্রব ছাড়িয়া কেবল যুক্তির আসরেই পালা আরম্ভ করিল, অমনই ধর্ম্মের সহিত দর্শনের ঘোর বিবাদ বাধিয়া উঠিল। নূতন আসরে দাঁড়াইয়া দর্শন সাহঙ্কারে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"আমার নিকট আইস, আমি যুক্তিবলে বিশ্বের ও মানব জাতির ভাগ্যের রহস্য উদ্ভিন্ন করিয়া তোমাদিগের নিকট নূতন তথ্যের প্রচার করিব।"

ধর্ম্মবক্তৃগণ বিশ্বাসের আসরে উপস্থিত থাকিয়া ধর্ম্মমতকে পদ্ধতিবদ্ধ করিতে থাকিলেন। ইন্দ্রিয়াতীত সত্য—যে সত্য বাক্য ও মনের অগোচর,—যে সত্যের যাথার্থ্য পরীক্ষা করিবার শক্তি মানবের নাই—সেই সত্য ধর্ম্মের বিষয়,—তাহার প্রমাণ আপ্তবাক্যে; আপ্ত-বাক্যে যাহার বিশ্বাস নাই—সে সেই অবাঙমনসোগোচর সত্য, উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। দর্শন বিশ্বাসের আসর ছাড়িয়া যুক্তির আসর ধরিল,—ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিল—কিন্তু বিজ্ঞানের সহিত তাঁহার বিরোধ ঘুচিল না। দর্শন যুক্তির ও তর্কের সাহায্যে অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্বন্ধে লোকের প্রত্যয় জন্মাইতে সচেষ্ট হইল। ইহার প্রধান অস্ত্র অনুমান। বিজ্ঞানও যুক্তির আসরেই কার্য্য আরম্ভ করিল, কিন্তু ইহার প্রধান অস্ত্র পর্য্যবেক্ষণ (Observation) এবং পরীক্ষা (Experiment) যুক্তির কতকগুলি তথ্য উভয়েই স্বীকার করিয়া থাকে। দর্শন সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব; বিজ্ঞানে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা সে সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিয়াছে। বিজ্ঞান ও অনুমানের আশ্রয় লইয়া থাকে, তবে সে অনুমান নিতান্তই প্রত্যক্ষমূলক। যাহার কতকগুলি দৃষ্টান্তও প্রত্যক্ষ করা হয় নাই, বিজ্ঞান সে সম্বন্ধে কোনও অনু-

মাত্রই করিতে সম্মত নহে। কিন্তু যে অনুমান যুক্তিবিরোধী নহে, দর্শন সেই অনুমান অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত। দর্শনের বিষয় প্রত্যক্ষ নহে, সুতরাং দর্শন কেবল প্রত্যক্ষমূলক অনুমানের উপরই নির্ভর করিতে সম্মত নহে।

দর্শনের আলোচ্য বিষয়,—পরমাত্মা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা, আত্মার অমরত্ব, কার্য্য-কারণ বাদ ও আস্তিক্য-বাদ। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই কয়টি বিষয় প্রতিপাদন করিবার জন্য অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মগণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন,—কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে সাফল্যলাভে সমর্থ হয় নাই। দর্শনশাস্ত্ররূপ তরণী সন্দেহদিগ্ধ অনুমানের কুহেলিকায় অঙ্গ আবৃত করিয়া বন্দর ত্যাগ করিল, পথে সেই কুয়াসাসমাচ্ছন্ন অস্ফুট আলোকে কত দৃশ্য দেখিল, কিন্তু চলিতে চলিতে বৃত্তাকার গতিতে আবার সেই বন্দরেই আসিয়া উপস্থিত হইল। সে যে আকাশ-তলে বিচরণ করিয়াছে, সে আকাশ সর্ব্বদাই অল্পাধিক কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন, নিশ্চয়তার সূর্য্য তথায় সে কুহেলিকা-জালভেদ করিয়া আত্মজ্যোতি প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। দর্শন মানবকে অনেক নূতন দৃশ্য দেখাইয়াছে, নূতন তথ্য শুনাইয়াছে, কিন্তু কুয়াসাজালে সমাচ্ছন্ন বলিয়া সে দৃশ্য ও সে তথ্য সে নিশ্চয় বলিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে পারে নাই। অধিকন্তু দর্শন যে স্থান ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই স্থানেই উপস্থিত, সে নিজ গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে পারিল না, সে যে সকল সমস্যার সমাধান করিবে সাব্যস্ত করিয়াছিল তাহা পূর্ব্বের ন্যায় রহস্যময়ই রহিয়া গেল! পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে; বিজ্ঞান সরল পথে অগ্রসর হইতেছে। বিজ্ঞান ঋজু পথে যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই তাহার বলবৃদ্ধি হইতেছে, ততই সে নূতন নূতন আবিষ্কারে মানব-সমাজকে চমকিত করিতেছে। বিজ্ঞান যে তথ্য আবিষ্কৃত করিতেছে, লোকের চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া তাহার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছে। বিজ্ঞানের এই উন্নতি-দর্শনে পৃথিবীবাসী মানবমণ্ডলী বিস্মিত। গত কল্য যাহা অসম্ভব ছিল, অদ্য বিজ্ঞান তাহা সকলের সমক্ষে সম্ভব বলিয়া সপ্রমাণ করিতেছে। সুতরাং সর্ব্বত্রই বিজ্ঞানের জয় বিঘোষিত হইতেছে। যাহা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের প্রতিকূল তাহাই ভ্রান্ত বলিয়া উপেক্ষিত ও উপহসিত হইতেছে। যুরোপের ধর্ম্মবিশ্বাসের কতকগুলি মত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের প্রতিকূল হওয়াতে তথায় ধর্ম্মবিশ্বাস

কুসংস্কারমূলক বলিয়া উপেক্ষিত ও অনাদৃত। য়ুরোপের দর্শনও এখন দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আধ্যাত্মিক ও অতীন্দ্রিয় বিষয় লইয়া কেবল যে দর্শন আলোচনা করিয়া থাকে (metaphysics), তাহা এখন জর্ম্মণী ভিন্ন আর সর্ব্বত্রই অনাদৃত ও উপেক্ষিত। যে ভাগ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় লইয়া সার্ব্বজনীন সত্য আবিষ্কারে যত্নশীল, তাহা ক্রমশঃ বিজ্ঞানেরই ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধ্রুবদর্শনের (positive philosophy) নাম করা যাইতে পারে।

বিজ্ঞানের প্রভাবে য়ুরোপে ধর্ম্মের প্রভাব ও প্রতাপ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন জিজ্ঞাস্য, বাস্তবিকই বিজ্ঞান ধর্ম্মের বিরোধী, না ধর্ম্মবিশেষের বিরোধী ? আমাদের ধারণা বিজ্ঞান—পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান, এখনও ধর্ম্মবিরোধী হইতে পারে নাই। আস্তিক্য-বাদ ও নাস্তিক্য বাদ উভয়ই জড়বিজ্ঞানের গণ্ডীর বাহিরে অবস্থিত। ঈশ্বর, আত্মার অমরত্ব, ও পুনর্জ্জন্মবাদ প্রভৃতির নাস্তিত্বও বিজ্ঞান এখনও সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হয় নাই। বিজ্ঞান এইমাত্র বলিতে পারে ও বলিয়াছে যে, ঐ সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করা সম্ভবে না ; সুতরাং ঐ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা মানবের ধৃষ্টতামাত্র। বিজ্ঞানকে অজ্ঞেয়বাদী বলিতে ইচ্ছা হয় বল, কিন্তু উহাকে নাস্তিক বলিতে পার না। হেকেলের ন্যায় দুরন্ত নাস্তিকও পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা নাস্তিক্য-বাদ সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকেও সম্ভাবনাসূচক অনুমানদ্বারা নাস্তিক্য-বাদ সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতে হইয়াছে।

বিজ্ঞানের সহিত সংঘর্ষে য়ুরোপে ধর্ম্মবিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হইতেছে ;—তাহা দেখিয়া হিন্দুও স্বীয় ধর্ম্মসিদ্ধান্তে আস্থাশূন্য হইতেছেন,ইহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়। হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাস জ্ঞানের বিরোধী নহে, বরং জ্ঞানের পক্ষপাতী। হিন্দুই বলিয়া থাকেন, 'জ্ঞানান্মুক্তিঃ'—অর্থাৎ জ্ঞান হইতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। এ জ্ঞান জড়বিজ্ঞানের জ্ঞান নহে সত্য,—কিন্তু এ জ্ঞান অজ্ঞানতা বা অন্ধ-বিশ্বাস নহে। এ জ্ঞান আত্মজ্ঞান। কিন্তু ইহাও সত্য যে, জড়বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত সেই আত্মজ্ঞানকে ভ্রান্ত বলিয়া সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হয় নাই। বরং হিন্দুর অনেক সিদ্ধান্ত জড়বিজ্ঞান সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। আর এক কথা—বিজ্ঞানকেই বা আমরা সত্যের কষ্টিপাথর বলিয়া গ্রাহ্য করিব কেন ? বিজ্ঞান যেমন নূতন নূতন সত্যের আবিষ্কার করিতেছে,

নূতন নূতন মতের স্থাপনা করিতেছে,—তেমনই অনেক পুরাতন মতকে ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছে না কি? বিজ্ঞান আজ যে সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছে, কাল তাহা ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিবে না, এ কথা কে বলিতে পারে? অবশ্য আমি বিজ্ঞানকে অনাদর করিতে বলিতেছি না। কিন্তু বিজ্ঞান একেবারেই অভ্রান্ত, এ কথা কখনই স্বীকার করা যায় না। বিজ্ঞান যে সার্ব্বভৌম সত্যের সন্নিহিত হইতে পারে না,—এ কথা অনেক বৈজ্ঞানিকই স্বীকার করিয়া থাকেন। গত অগ্রহায়ণ মাসের 'আর্য্যাবর্ত্তে' লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় "বিজ্ঞানে পৌত্তলিকতা" নামক সন্দর্ভে দেখাইয়াছেন,—"যে সকল তথাকথিত সত্য লইয়া আমরা স্পর্দ্ধা করি ও তাহাদিগকে সার্ব্বভৌম সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করি, মূল অন্বেষণ করিলে দেখা যাইবে, উহারা সর্ব্বত্রই আমাদের মনঃকল্পিত সত্য।" অন্যত্র "যাহাকে বিজ্ঞান বলি, তাহা মানুষেরই বিজ্ঞান এবং প্রকৃতি তাহার সঙ্কীর্ণ জীবনযাত্রার অনুকূল সঙ্কীর্ণভাবে মানুষকে গড়িয়াছেন বলিয়াই, মানুষের বিজ্ঞানকেও সঙ্কীর্ণ দেবালয়ের মধ্যে সঙ্কীর্ণ পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিতে হইয়াছে।" বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত, এরূপ অনুমান করিবার কারণ নাই। তথাপি বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান কতকগুলি আধ্যাত্মিক সত্য স্বীকার করিয়াছে। ইচ্ছাশক্তি (will power) চিন্তাসংক্রমণ (telepathy) ভাবাভিভূতি (hypnotism) প্রভৃতির কথা এখন বিজ্ঞান স্বীকার করিতেছে, কিন্তু ইহার কারণতত্ত্ব নির্ণয়ে এখনও বিজ্ঞান সাফল্যলাভে সর্ব্বথা সমর্থ হয় নাই। পক্ষান্তরে বিলাতের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার আল্‌ফ্রেড্ রাসেল্ ওয়ালেস্ বৈজ্ঞানিকের যুক্তি অবলম্বনেই হিন্দুর অনেকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইনি ঈশ্বর, আত্মার অমরত্ব, কর্ম্মফল, দেবতা প্রভৃতি স্বীকার করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, অ্যামিবা হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত নানা যোনি পরিভ্রমণ করিয়া এই জগতে মানবাত্মা পুষ্টি লাভ করে। পৃথিবী মানবসৃষ্টির জন্যই পরিকল্পিত। এ স্থানে জীবাত্মা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিলে সে লোকান্তরে আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার পায়। ইহা ত হিন্দুরই সিদ্ধান্ত। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ডাক্তার ওয়ালেসের এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা নিষ্পন্ন নহে,—বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে এ সিদ্ধান্ত কেবল সম্ভাব্য বলিয়াই বিবেচিত হইতেছে। যে বিজ্ঞান এতদিন ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া আসিতে-

ছিল, আজ সেই বিজ্ঞানের তরী যে স্থানে উপনীত হইয়াছে, সে স্থান হইতে হিন্দুর কতকগুলি সিদ্ধান্ত লোকালোক পর্ব্বতের ন্যায় কখনও দৃশ্য ও কখনও অদৃশ্য হইতেছে। বিজ্ঞান ইহা অপেক্ষা আর ঐ সত্যের সন্নিহিত হইতে পারিবে কি না, জানি না। কিন্তু ইহাও সত্য যে, হিন্দুরা যে পথ দিয়া এই সত্যকে পাইয়াছেন,—সে পথটা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

হিন্দুমনস্বিগণ যে পথ অবলম্বনে ধর্ম্মসম্বন্ধে এই সার সত্য আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তাহার নাম যোগ। যোগের নাম শুনিলেই ইদানীন্তন তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় উপেক্ষায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন, অথবা অট্টহাস্যে দিগ্বধূকে মুখরা করিয়া তুলেন। ইঁহাদের অবিশ্বাস নষ্ট হইতেও অধিক সময় আবশ্যক হয় না। একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ভূকৈলাসের রাজবাটীতে আনীত জনৈক যোগীকে দেখিয়া এতদুর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি পরে তাঁহার ছাত্রগণকে বলিয়াছেন,—"ভূকৈলাসের ব্যাপার দর্শনের পর কি সম্ভব আর কি অসম্ভব. তাহা আমি নিশ্চয় করিতে পারি না। বিজ্ঞান-পাঠে যাহা অসম্ভব বলিয়া আমার ধারণা ছিল,—তাহা সম্ভাব্য ইহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি।" এই ডাক্তার মহাশয় বিলাতে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন; শরীর বিজ্ঞানে ইঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি আছে। বিলাতের কোন চিকিৎসালয়ে ইনি কিছুকাল চিকিৎসাও করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ ঘটনা ত নিত্য প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না।

সাধারণ মনোবিজ্ঞান—পরোক্ষভাবে যোগের দ্বারা পরম সত্যকে উপলব্ধি করা যাইতে পারে,—এইরূপ অনুমানের সহায়তা করিয়া থাকে। হিন্দুরা বলেন, চিত্তের পাঁচটি অবস্থা,—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। চিত্ত যখন বাসনাতাড়িত ও চঞ্চল থাকে, তখন তাহার ক্ষিপ্ত অবস্থা; যখন সে রিপুর তাড়নায় কায করে. তখন তাহার মূঢ় অবস্থা; যখন সে উচ্চ চিন্তায় নিরত হয়, কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়নায় স্থির থাকিতে পারে না, তখন তাহার বিক্ষিপ্ত অবস্থা। আর যখন সে একনিষ্ঠ হইয়া আলোচ্য বিষয়ে সংলগ্ন থাকে, তখন তাহার একাগ্র অবস্থা। চিত্ত একাগ্র না হইলে কোনও দুরূহ সমস্যারই সমাধান করিতে পারে না। অনেকে জানেন যে, অনেক মনস্বী পণ্ডিত স্বপ্নসঞ্চরণ (somnumbulism) অবস্থায় অনেক দুরূহ সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। ইহার কারণ, সে সময় মনের অধিকাংশ বৃত্তিই সুষুপ্ত থাকে,—চিত্তের কার্য্য একমুখ হয়, সেইজন্য চিত্তের একাগ্রতা

অধিক হইয়া থাকে। চিত্তের সেই গভীর একাগ্রতা হয় বলিয়া জাগ্রত অবস্থায় যে সমস্তার সমাধান অসম্ভব, স্বপ্নাবস্থায় তাহা সম্ভব হইয়া উঠে। যোগদ্বারা সেই একাগ্র অবস্থা আরও গাঢ় ও ঘনীভূত করা হয়। যোগাবস্থায় জড় দেহ ও জড় মন একেবারে নিস্পন্দ হইয়া পড়ে। কেবল চৈতন্যমাত্র অবশিষ্ট থাকে। চিত্ত কেবল দগ্ধ সূত্রের ন্যায় ক্ষীণ ও সংস্কার-অবস্থা মাত্র প্রাপ্ত হয়। চিত্তের এই অবস্থাকে নিরুদ্ধ অবস্থা বলা হইয়া থাকে। এই অবস্থায় আত্মা জড় দেহ হইতে কতকটা বিমুক্ত হয়। সেই জড় হইতে বিমুক্ত আত্মা অধ্যাত্ম রাজ্যে প্রবেশ করিয়া উহার বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে সমর্থ হয়। এ কথা অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই। যখন দেখা যায়, ভাবাবিষ্ট (hypnotized) অবস্থায় দেহ ও মন কতকটা নিস্পন্দ হইলে আত্মিক শক্তি বিলক্ষণ বৃদ্ধি পায়, তখন যোগদ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিলে সে শক্তি যে বহুগুণে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? আর এক কথা, যোগের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ না করিয়া দেখিলে, সে অবস্থা কিরূপ, তাহা কেমন করিয়া বুঝা যাইবে? যদি অবিশ্বাসই করিতে হয়, তাহা হইলে বিনা পরীক্ষায় উহাতে সন্দেহ করা কি অযৌক্তিক নহে?

আসল কথা, বিজ্ঞান এখনও হিন্দুর ধর্ম্মমতে কুঠারাঘাত করিতে সমর্থ হয় নাই। তাই সুপ্রসিদ্ধ নাস্তিক মিসেস্ অ্যানি বেশান্ত বৃদ্ধ বয়সে হিন্দু-ধর্ম্মের পক্ষপাতিনী। তাই বিবেকানন্দ প্রভৃতি য়ুরোপে ও মার্কিণে বৈদান্তিক ধর্ম্ম প্রচারিত করিয়া প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছেন। বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের আসর স্বতন্ত্র সত্য,—কিন্তু উহারা পরস্পর-বিরোধী নহে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

নাকে খৎ।

ইহা কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা। ইহার ইতিহাস সম্বন্ধে আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন :—

হাইকোর্টের উকিলদিগকে প্রতি বৎসর আদালতে পঞ্চাশ টাকা জমা দিতে হয়। আমি একবার ভুলক্রমে পঞ্চাশ টাকার পরিবর্ত্তে একখানা পাঁচশত টাকার নোট জমা দিবার জন্য উমাকালীর (উমাকালী মুখোপাধ্যায়) হস্তে দিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস, আমি পঞ্চাশ টাকাই দিয়াছি। উমাকালী খুব সাকুব লোক, সে তৎক্ষণাৎ আমার ভুল বুঝিতে পারিয়া, আমাকে কিছু না বলিয়া, সেই নোটখানি লইয়া হেম বাবুর নিকটে যায়। হেম বাবু এই ব্যাপারটি অবলম্বন করিয়া একখানি নাটক রচনা করিয়া ফেলেন। এই নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে একটু টীকা বোধ হয় আবশ্যক।

কষ্টকল্প বিদ্যানিধি ওরফে মিষ্ট অমল বিদ্যাম্বুধি।		আমি
ধনুদ্ধর ওরফে 'গুণেন্দর'	...	যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
অগ্নিভট্ট ওরফে 'ধূম্রখালি'	...	উমাকালী
চাঁদকবি	...	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রঙ্গসভা	...	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কাব্যোক্ত পাত্র।

পুরুষ।

কষ্টকল্প বিদ্যেনিধি [বন্ধুসমাজে, মিষ্ট অমল বিদ্যাম্বুধি নামে পরিচিত]	একজন নানাশাস্ত্র বিশারদ বহুভাষাজ্ঞ পণ্ডিত, কিন্তু বিষয়বুদ্ধি প্রায় নাই। সম্প্রতি রত্নসভা* ইঁহাকে অনেক টাকার বৃত্তি দিয়া অধ্যাপকত্বে বরণ করিয়াছেন।
ধনুর্দ্ধর [বন্ধু-সমাজে-"গুণেন্দর"]	একজন ব্যবসাদার, বড় মানুষ; বিদ্যেনিধির বন্ধু।
অগ্নিভট্ট [বন্ধুসমাজে-"ধূম্‌খালি"]	উকীল, বিদ্যেনিধির ছাত্র, পূর্ব্বোক্ত উভয়ের বন্ধু।
চাঁদকবি	একজন কিম্ভূতকিমাকার কবি। পূর্ব্বোক্ত সকলের বন্ধু।
বাপ্‌পা পাঁড়ে	বিদ্যেনিধির দরোয়ান।

স্ত্রী।

রাঙা বৌ	... বিদ্যেনিধির বর্ষীয়সী গৃহিণী। স্বভাব কিছু অধিক ঋজু।
সতিন্ বৌ	বিদ্যেনিধির যুবতী স্ত্রী।
মোক্ষদা	... রাঙাবৌএর দাসী।
কুঞ্জ	... সতিন্ বৌএর দাসী।
সর্ব্বরী, সন্ধ্যাবালা	রাঙাবৌএর কন্যাদ্বয়।

---

* "রত্ন সভা" নানা জাতীয় পণ্ডিতের একটী বৃহৎ সভা; কোন ধনশালী রাজা প্রতি বৎসর এক এক জন অধ্যাপককে মনোনীত পূর্ব্বক অনেক টাকা বৃত্তি দিবার ভার এই সভার প্রতি সমর্পণ করিয়াছেন।

নাকে খং।



(হাস্য-কাব্য।)

প্রথম অঙ্ক।



প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কষ্টকল্প বিদ্যেনিধি। (Seated,—a quantity of bank notes scattered before him.)

বিদ্যেনিধি। (Solos স্বগত)—

ঢের্ টাকা!—উঃ ঢের্—heaps of 'em;
জয়্‌জয়্‌কার রত্নসভার! well that's a name!
অনেক শম্মা—বিদ্যেনিধি, বিদ্যেস্থধি ভায়া
বেঁচে যান—(বড় নয়!) আমারি যা হওয়া!
"একাদশ বৃহস্পতি"—বচনটা ত ঠিক!
ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র—শাস্ত্র কি অলীক?
নিদেন্ অনেক্ দুখ্‌খী প্রাণী (নামের্ পিঠে ছালা)
রত্নসভার্ দোহাই দিয়ে জুড়োন্ পেটের্ জ্বালা!

(নোট্‌গুলো নেড়ে চেড়ে)

তা, এই গ্যালো—এক্‌শো এক্‌শো—আর এক্‌শো এই;
(এ মাস্‌টা চল্‌বে ভালো, ভাব্‌না বড় নেই!)
আর চার্‌শো—ওতে, শুধ্‌বো অম্বর ভায়ার দেনা;
অঋণী মানবো শ্লাঘ্য—পরেও যদি ট্যানা!
এই পাঁশ্‌শো—বড় গিন্নির হাতে দেবো ফেলে;
বাগ্‌দান্‌টা অনেক্ দিনের, আর চলে না ঠেলে।
(ত্যা গ্যালো যা, তবু ফুরোয় না!)—বাকি এ পঞ্চাশ
(সব্‌ টাকা এক্‌বারে কি না!) এ পঞ্চাশ্‌—ও সর্ব্বনাশ,
এ বছরের্ লাইসেন্সি যে আজো নিতে বাকি!
(বেওসাদারি মন্দ নয়, সেটাও হাতে রাখি,)

ও টাকাটা, পাঠাই তবে অগ্নিভট্টের কাছে,
শুভস্য শীঘ্রং যুক্তি ;—কে ওখানে আছে ?

(বাপ্পা পাঁড়ের প্রবেশ)

এক জেরা ঠহ্‌রো—
(দুইখানি চিঠির মোড়কে শিরোনামা লিখিয়া)
দো খৎ লেতে যাও ;
ইয়েঃঠো কাশ্মীরি ঠাকুর্—লেও হাঁত্‌মে উঠাও,
ঠীকানা মালুম্ ? ইয়েঃ খাম্ উন্‌হিকো দেনা।—
দোস্‌রা ইয়েঃঠো ভট্‌জী (হ্যায় তো পহচানা ?)
লম্বাসা মুরদ্, গোরা, বেলুকা তৌঅর্ সীর—
উন্‌কা পাস্ লে জানা।

বাপ্পা।— হঁা মালুম কিয়া, মীর।

(বাপ্পা পাঁড়ে চিঠি লইয়া নিষ্ক্রান্ত।)

বি। ও সর্ব্বরি ! আয়, হেথা।—

(সর্ব্বরীর প্রবেশ)

ঠাকুর মা কোথায় র‍্যা ?

সর্ব্ব। পূজো কচ্চে ঠাকুর ঘরে ; আমি যাই—অ্যঁা—অ্যঁা—

(পালাবার চেষ্টা।)

বি। শোন্না বলি, ফুল তুলেছে কে র‍্যা আজ তাঁর ?
তুই তুলিচিস্ ?

সর্ব্ব। না বাবা না, আজ্‌যে সোঁদির* ভার।

বি। যেই তুলিস্, তা অতো কেন ? আদ্ সাজিটাক্ দিবি,
পূজোর-পূজোয় মলো মাগী !—বলি শোন্ সবি !
বলো গে তো রাঙা বৌকে আমার ঘরে যেতে।

সর্ব্ব। কেন বাবা ? তাকে কি তুই সন্দেশ দিবি খেতে ?
আমায় দেনা—

বি। দেবো এখন্, আগে গিয়ে বল্ ;
লক্ষী মেয়ে সবি আমার, চল্ মা, ঘরে চল্।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।)

* সোঁদি—সন্ধ্যা।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(পাশের ঘর।)

রাঙা বৌ এবং বিদ্যানিধির প্রবেশ।

রাং বৌ। কেন ডাক্‌লে?

বি। আর কিছু না, এই কখানা নোট
(তিন্‌শো টাকা) মাকে দিও,—মাস্‌খরচের মোট;
উপ্‌রি অতিথ্‌ যত কিছু, সবই এতে সারা—

রাং বৌ। আর হতভাগীর হলো বুঝি কথাই আশার ঝারা?
দেবো-দেবো, হচ্চে-হবে, কতই এলাকাটি!
মিছে খালি কেঁদে মলুম ভিজ্‌য়ে আচোট মাটি।
বল্লে দেবে একখানা—তা সেই বা এত কি?
চাট্টে যেয়ে পেটে হলো—ত্যাড়া গলা ছি!
মুখ দেখাতে লজ্জা করে, লোকে কতই বলে;
আমার বেলায় শুকনো হাঁড়ী—সবার বেলাই চলে!
এদ্দিন কিছু বলি নাই—ভালো টানাটানি,
এখন কি যে—ঐ কি বল্যে—শুনচি কাণাকাণি
রত্নসভার কি নচ্ছারি—কি একটা ভারি
পদ হয়েছে—তবু কেন এখন মারামারি?
না যদি দেও, বলুই না হয়—ভাঁড়াভাঁড়ি কেনো?
মন ঠাণ্ডায় প্রাণ ঠাণ্ডা আসল কথা জেনো।
এদের্—ওদের্—তাদের্ বেলায় কতই শুন্তে পাই;
ধর্ম্ম ভেবে দেওত দিও, এখন আমি যাই।

বি। চটুই কেন? শোনো বলি—

রাং বৌ। শুনে শুনে কালা!

বি। সত্যি বলুচি, এবার তোমার পোহাবারোর পালা।

রাং বৌ। (থম্‌কে) তিন সত্যি কর।

বি। তিন সত্যি ?—মেয়েম্ পড়ে !

মরদ্ কি বাৎ হ্যায় হাত্তী কি দাঁৎ—কভি না তোড়ে,

ইয়াদ্, রাক্হো জী !

রাং বৌ। ও আবার্ কি ? কি দেবে দেও।

(বিস্মে হস্ত প্রসার।)

দেখি—দেখি, কত ভরী ?

বি। ধরো, এই নেও।

রাং বৌ। (গালে হাত)

ও পোড়া ছাই ! কি অভাগগি !—এতেই ঝাঁপাই এত ?

ছেঁড়া কাগজ একটুকরো—মেতি পাতের মত !

কাজ নি—রাখো—

বি। আ আবাগী, পাঁশশো টাকার নোট !

ঐ ভাঙালিই দশনলী হয়—আর এক ছড়া গোট।

রাং বৌ। (আঁচলে বেঁধে)

জিগ্‌গুসবো—ঠাকরুণকে—

বি। দিব্বি—বিলক্ষণ !

(মুখরা প্রখরা ভার্য্যা তথাপি কাঞ্চন)

দাঁড়াও—শোনো, বলি শোনো—

রাং বৌ। শুন্‌বো, তা এখন

মিটুই আগে সন্দে'টা।

(প্রস্থান)

বি। আ তোমার মরণ্ !

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ধনুদ্ধরের বৈঠকখানা।

(অগ্নি এবং ধনুদ্ধর আসীন।)

অগ্নি। হরে কিষ্ট ! হরে কিষ্ট ! রাধামাধব, ছি!

ধন্নু। (XIX Century মুড়ে)

অ্যাঁ,—কিহে, ও অগ্নিভট্ট? কও ব্যাপারটা কি?

অগ্নি। (ধন্নুর হাতে দিয়ে)

এই নেও পড়ো চিঠী খানি—এই নেও ধরো নোট,

রত্নসভার অধ্যেপক—কেবল ভোটের যোট!

ধন্নু। (নোট ও চিঠি হাতে—অবাক!)

আঃ গ্যালো যা! রওত দেখি;

(উল্‌টে পাল্‌টে)

—না পাঁশ্‌শোই বটে!

বেশ পঞ্চাশ, বিদ্যেনিধি!

অগ্নি। ল্যাজ বেঁধে দাও জটে!

চাঁচা ছোলা বুদ্ধিখানি গুরুর আমার বেশ;

দিনকাণাটা মাঝেমাঝে—ঐটে দোষের শেষ!

অনেক জানে, অনেক পড়ে, অনেক ভাষায় জ্ঞান

বিষয় কাজে এই থান্‌টা (কপালে হাত দিয়ে)—

অাঁদারে ল্যাঠ্যান্!

তাঁর আবার গে বেওসাদারি—লাইসেনির পাস!

মরুন্‌ গিয়ে ভট্টী পড়ে—নয় করুন্‌ গে চাষ!

ধন্নু। চটো কেন?

অগ্নি। দেখো দেখি—চট্‌বো না ত কি?

পঞ্চাশে—পাঁশশোর ফের—তার্‌ টিকি কেটে দি!

ধন্নু। থাক্‌লে ত?

অগ্নি। কি বল্‌বো ছাই—চাঁদ কবি যে নাই!

ধন্নু। না, বেচারা—ভাব্বে কত!—ফেরোৎ দেওয়া চাই।

অগ্নি। তুমি দেখ্‌ছি আর্‌ একটী! রগড় করে কে?

সাধে খুঁজি চাঁদ দাদাকে,—থাকতো যদি সে—

ধন্নু। তাই বলো না—রগড় খোঁজো?

অগ্নি। বল্‌বে ঘোড়ার ডিম্‌!

টাকা ফেরৎ দেবে তাকে? থাক্‌ আগে হীমসীম!

ধন্নু। তবে চলো বড্ডীর হাতে দিয়ে আসি তাঁর,

বাড়তি যেটা সাড়ে চাশ্‌শো—বেশ হবে পয়জার!
ঘরে ঘরে বাধ্‌বে ভালো—জল্‌টা উচুনীচু।
ভাল মানুষের মেয়ে না হয় পেয়ে যাবে কিছু

অগ্নি। বেশ কথা এ,—চলো তবে—খাবার খেয়ে আসি,
শীগ্‌গির বলো গাড়ী জুতে।

(প্রস্থান)

ধনু। কোন্ হ্যায় রে? ঘাঁসী,
কোচ্‌মান্‌কো ভেজো ইহাঁ।—না, দিব্বি পীরের খাসী!



দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(বিদ্যেনিধির বাটি।)

ধনুর্দ্ধর ও অগ্নিভট্টের প্রবেশ।

ধনু। বিদ্যেনিধি মহাশয়, বাড়ী আছেন গো?

অগ্নি। কারুই যে সাড়া নাই—

ধনু। ও বিদ্যেনিধি,—ও ও—;
না, ঘরে নেই।—ও সব্বরি,—ও নিশি—ও সন্দেবালা,
নিঝ্‌ঝুম যে, সাড়া শব্দ বন্দ—একি জ্বালা!
ও গো, কে আছ গো?

অগ্নি। গ্যালো যা বাড়ী শুদ্ধ কালা?

রাং বৌ। (পরদার ভিতর হইতে মৃদুস্বরে)
ও মোক্ষদা, জিগ্‌গোস্ না, কে?

মো। হ্যাঁ গা, কে তোমরা গা?
কাকে খোঁজো?—কত্তা বাড়ী নেই।

ধনু। কত্তার মা?
তিনি কোথা?—আর মেয়ে সব্ যত কুঁচো কাঁচা?

মো। ও গো, সবাই গ্যাছে—সে বাড়ীতে।

ধনু। বাইরে এসো বাছা।

(মোক্ষদার প্রবেশ।)

হ্যাঁ গা, একাই তুমি আছ?—বৌ ও নেই ঘরে?

মো। কোন্ বৌ গো, রাঙা বৌ?—বাড়ী মাথায় করে
তিনিই কেবল আছেন একা।

ধনু। (অগ্নিকে) কর্ত্তব্য কি পরে?

অগ্নি। গুরু-পত্নী—হান্ কি তাতে?—ওগো বাছা শোণো।

ধনু। করিস্ কি,—ও মিন্‌সে?

অগ্নি। তুমি গাছের পাতা গোণো,
একাই আমি যাবো না হয়?—ও ঝি, তাঁকে বলো,
বাবু একটি মোটা সোটা—গণেশ-পেটা, ধলো,
ধীরপুরে ঘর, বড় দরকার—দেখা কত্তে চান।
আর—পড়ো আমি গুরুঠাকুরের—আমাণ্ডরে পান
এনো দুটো হাতে করে্য।

মো। (অগ্নির প্রতি তীব্রদৃষ্টি করিয়া)
আপনারা দাঁড়ান।

(প্রস্থান।)

মো। (পরদার পশ্চাৎ ভাগে)
ও রাঙাবৌ, খড়কি তুলে দেখ্‌দেখি চেয়ে
বাবু দুটি, কে ওনারা? চিন্তে পার মেয়ে?
একটি ওঁদের গেরস্থারি, একটি কিছু কাঁচা
(জানিনে মা আজ্‌কাল্‌কের কল্‌কাতার কি ঢাঁচা)
পান খেতে চায়! আবার বলে আস্‌বো তোমার ঠাঁই;
চেনা শুনো হবে বুঝি! দরোয়ানটাও নাই?

রাঙা বৌ। ও ঝি, ওঁদের আস্‌তে বল্, বস্‌তে জায়গা দে।

মো। (দুইখানি আসন পাতিয়া)
আসুন তবে।

রাঙা বৌ। ও মখি, ও পোড়ারমুখী কপাট টেনে নে।

(কপাট অর্দ্ধবদ্ধ করণ)

ধনুঃ ও অগ্নির অন্দরে প্রবেশ।

ধনু। দরকারী কাজ তাই আজকে এতো বাড়াবাড়ি
কত্তাটি কি গাঁজা টানেন! টাকার ছড়াছড়ি ?
পঞ্চাশেতে পাঁশ্‌শো দেন্‌—হিসেব আঁটাআঁটি!
রাখো তুলে, ধরো এখন সাড়ে চাশ শো খাঁটি।
পাশ আপিসে পঞ্চাশ দিতে পাঁশ্‌শো দেছে ফেলে;
মাথা খুঁড়্‌লেও দিওনা তাঁয়, দেখ্‌বো কেমন্‌ ছেলে ?
ও টাকাতে গয়না করো—না হয় যদি পারো
কোম্পানীর কাগোজ কিনে আখের সুসোর করো
দাঁতে কুটি নিলেও তবু দিওনা এ তায়,
কোথা পেলে এখন্‌ যেন, সন্ধান না পায়॥

মো। (রাঙা বৌএর হইয়া) উনি বল্‌চেন—
আপনিই রাখুন, কাজ কি হাতের ফেরে;
গয়নান্তরে পাঁশ্‌শো টাকার নোট দিয়েছেন ধর্‌্যে
আজ সকালে; তাই ভাব্‌চেন আবার কেমন কর্‌্যে
নেবেন এটা ?

ধনু। (মোক্ষদার প্রতি) কই, দেখি ? নেও ত চেয়ে।
(অগ্নিকে) ওহে শম্মা—বুঝেছত ?

অগ্নি। তোমার আগে—all bright as day.
(ভিতরে বাক্স টানা ও চাবি খোলার শব্দ।)

মো। (ধনুর প্রতি)
এই নিন, এই কাগজখানি আজ সকালে দিয়া
নিউদ্দেশ সেই অবধি। (নোট প্রদান।)

ধনু। (নোটখানি দেখিয়া)
ও শম্মা ভায়া,
দেখো দেখো, যা ভেবেচি, ঠীকঠাক এ তাই।
(নোট দেখাইয়া)

অগ্নি। হদ্দ কল্লে বিদ্যেনিধি "ড্যাম his আই!"

ধনু। (৫৫০ টাকার নোট দিয়া)
এখন তুলুন সবগুলি এ সিন্দুকটী খুলে;
আ-হাবা, বামুনের মেয়ে, এতেই গেচেন ভুলে?

পাঁশ্‌শো নয়ত ? পঞ্চাশ যে তোমার যা তা হেথা,
এখন কি আর এ সব নিতে ধর্ম্মাধর্ম্মির কথা ?
পাঁশ্‌শো দেছে পাঁশ্‌শোই ওঁর। কসে বাঁধুন গিরে
পরশু দিনে বিকেল বেলা আসবো আবার ফিরে।
আমরা এলে পরে যেনো—দেছেলো যে খানি,
সেইখানিকে দেখিয়ে তাঁকে, করেন টানাটানি।
ঘোরফের সব মিটে যাবে মিলবো যখন সবে ;
ভালোমানুষের মেয়ে তোমার পূরো পাঁশ্‌শোই হবে।

(আসন হইতে উত্থান।)

রাঙা বৌ। ও মোক্ষদা, বস্‌তে বল্‌, খাবার তৈয়ের্‌ করি।
ধনু। আজ্‌ থাক্‌ সে, পরশুই হবে, আগে চুরি ধরি।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিদ্যেনিধির অন্য স্ত্রীর বাটী।

সতিন বৌ ও কুঞ্জর প্রবেশ।

স। কি লো কুঞ্জ—দেখা হোলো ?
কু। না, সত্যই মা, না।
স। ও বাড়ী নেই,—গেছে কোথা ?
কু। ইচ্ছে যেথা।
স। তোমার্‌ মাথা !—ভেঙ্গে বল্‌। তোর আজ্‌কে নতুন কেতা !
কু। সবই নতুন—একলাই কেনে থাক্‌বো ছেঁড়া ন্যাতা ?
স। তুই যে দাসুরায়কে টেক্কা দিলি ? ও কুঞ্জ ঝি।
কু। সত্যই মা, শুন্‌লুম গিয়ে—ও বাড়ীতে
স। (সাগ্রহে) কি, শুন্‌লি কি ?
কু। শুনে এলুম কাণাঘুষো পাঁশ্‌শো টাকার নোট,
তিনশো ভরির চন্দ্রহার একশো ভরির গোট ;

রাঙা বৌয়ের ভাঙ্গা কপাল শুন্, গ্যাছে ফিরে!
এখন ভাগ্যবতীর পেস্তাবাদাম—সতীনমায়ের জিরে!

স। রাখ্ তোর ছড়াকাটা—কে বল্লে তোকে?

কু। ওরাই বলে—তারাই বলে—পাড়াশুদ্ধ লোকে।

স। কুঞ্জ, আমার মাথা খাস্‌লো—আন্‌গে তাকে ডেকে।

কু। (জিব কেটে)

ছি, কি কথা? আন্‌বো তো গা নাগাল পেলে তায়?
চৌপাহারা চাদ্দিকে যার তায় কি ধরা যায়?
কাট্‌লে শেকল আর কি পাখী দাঁড়ের পানে চায়?
এখন্ রাঙা বৌয়ের খাঁচায় পোরা, আর্ কে তাকে পায়!

স। পোষা যে না? অনেকদিনে অনেক্ ছাতু গুলে
সিটী দিতে শিখিয়েছি তায় সেও কি যাবে ভুলে?
যা কুঞ্জ যা, যেখানে পাস্, আ—ঐ যে গুণমণি!

(দূরে বিদ্যেনিধিকে দেখিয়া)

যা, সরে যা—ঐ ঘরে থাক্; আজকে খুনোখুনি!

(বিদ্যেনিধির প্রবেশ।)

স। (তাহার নিকটে গিয়া)

আমার কিছু চাই।

বি। হাতে কিছু নাই।

স। ওদের, ওদের বেলা
তবে টাকার কেন খেলা?
রাঙা ডোবার জলে
শুনি, ছী নী নি চলে।
ঢাকাই জালা পেট,
চন্দ্রহারে সেট!
কাঁকাল গাদা বোট
তাইতে সোনার গোট!
আমার বেলা যেই,
অমনি হলো! নেই!!

বি। কে বলেছে এ সব কথা?

স। কেন ?—একি সব উচ্ছে নতা ?

বি। দি, দিয়েছি ইচ্ছে আমার।

স। কে তোলাবে—আমার—?

বি। যা ছিল—তা সব গিয়েছে।

স। কতো ছিল ?—কে নিয়েছে ?

বি। তোমায় বলে তা—হবে কি ?

স। শুভঙ্করী আঁক্ শিখ্‌ছি।

বি। ক্ষ্যামা কর—ক্ষ্যামা কর—সত্যি হাতে নাই।

সবৌ। একাদশ বৃহস্পতি—কি তবে সে ছাই !
শনিবারে জেবে পূরে এলো এতো গুলো—
মার্কামারা—"ভেলম-পেপার"—সেগুলো কি ধূলো ?
ভাল বটে নাগরালি—কারো মুখে খাজা !
তারি যেনো আট্টা মেয়ে—আমি কি তা বাঁজা ?

বি। ক্ষেমঙ্করী, ক্ষ্যামা কর—হিসেব শোণো বলি ;
ধূলিগুঁড়ি সবই গ্যাছে—শূন্য এখন থলি !
দিব্বি করি পায়ে ছুঁয়ে (জানুপাত পূর্ব্বক)
—চাশ্‌শো মহাজনে,
তিন্‌শো গেল পেটে খেতে—পঞ্চাশ লাইসেনে ;
আর পাঁশ্‌শো—আর পাঁশ্‌শো রাখ্‌তে দিয়েছি,
ভাল মন্দ আখের ভেবে—

স। আমিই তবে কি
ছাই ফেল্‌তে ভাঙা কুলো ও বিদ্যেনিধি ?

বি। ফিরে বারে যত পাবো, তোমায় দেবো সব,
শুকু হাঁড়ি—পায়ে নেড়ে—কেন কর রব ?

স। লেখো তবে—লেখো খত—(আন্‌তো ঝি ইংষ্ট্যাণ্ড্)
সুদশুদ্ধ লিখে দেও—"প্রমিসরি বণ্ড"
আমি নাকি বোকা মেয়ে—আমায় দেবেন ফাকি ?
গুণনিধি, গুণীন্ আমি, চিনি ভালো—চাকি।

বি। (খত লিখিয়া পাঠ করণ)
"I. O. U.,—আই প্রমিস্"—সাতশো টাকা সাড়ে,

"অন্ ডিমাণ্ডে" দেবো - আমি সুদে যত বাড়ে ;
মাসে মাসে—টাকায় টাকা সুদ দিতে স্বীকার ;
না যদি দি—সতীন বৌএর শ্রীপদ-প্রহার।

স। এখন—সে বাড়ী যাও বিদ্যেনিধি !—করো গে আহার।

সঃ বৌ। (প্রস্থান।)

(ভাবিতে ভাবিতে বিদ্যেনিধির প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিদ্যেনিধির গৃহ।

আসীন তক্তপোষে—
বিদ্যেনিধি, ধনুদ্ধর ও অগ্নিভট্ট।

ধনু। আজ্ঞে বড় ব্যাজার ব্যাজার ?

বি। এমন কিছু নয়।

ধনু। তবু—তবু ?

বি। মাথা মুণ্ডু—

ধনু। বল্‌তে লজ্জা হয় ?

বি। আর জ্বালিও না,—ঢের জ্বলেছি !

অগ্নি। সে কেমন আবার ?
কি জ্বালাতন গুরুঠাকুর ?

সন্ধ্যাবালার প্রবেশ।

সন্ধ্যা। ও বাবা, একবার
বাড়ীর ভেতর মা ডাক্‌চে।

বি। যা যা—এখন যা।

সন্ধ্যা। আয় শীগ্‌গির—শীগ্‌গির করে—ডাক্‌চে তোকে মা

বি। সেও মরুক্—তুই ও মর্, দে—কাপড় ছেড়ে দে।
যাবো এখন্—যখন্ খুসী।

ধনু। ভারী গরম যে ?

যাও না কেনো, একটিবার শুনেই না হয় এলে ;
আমরাও ত বস্‌বো থাবো,—দোষ্‌টা কি তা গেলে ?

বি। বড় জ্বালালে—চল্‌ যাচ্চি।

সন্ধ্যার সহিত প্রস্থান।

অগ্নি। আমরাও গুড়ি গুড়ি
চলো না কেন পেছু ধরি।

ধনু। আ বিঘ্নের ঝুড়ি !
টের পাবে যে—সব ফাঁস্‌বে—তুমি কি পাগল ?
হেথা বসেই সব শুন্‌বে ;—ভাবনাটা কেবল
পার্‌বে কি না তাল রাখ্‌তে ; —নয় কুঁদুলে খল।

অগ্নি। ঐ বেধেছে—নারোদ, নারোদ !—পারবে না কোঁদল ?
কোঁদল ছাড়া মেয়ে মানুষ কে দেখেছে কবে ?

ধনু। শোণো—শোণো—হচ্চে কি।

রাং বৌ। হ্যাঁগা নাকি তবে
পাঁশ্‌শো টাকার একখানা নোট গয়নান্তরে দেছ ?
জুয়োচুরি এমনতরো কদ্দিন শিখেছ ?
তাই বুঝি, তা—ঠাকরুণকে দেখ্‌তে দিতে মানা ?
ভেল্কি খেলার চোখে ধূলো—যায় পাছে বা জানা !
নেই বা দিতে ;—এ ভাঁড়ামি এ বয়সে——ধীক্ !
গলায় দড়ি ! বিঘ্নেনিধি উপেধটাতেও ধিক্ !
আর একটা—কি ঐ যে—রত্ন কিসের পায়া—
তাতেও ধিক্—ধীক্—ধীক্—বড়ই বেহায়া !
মাথা খুঁড়ে মর্‌বো আমি—ঘর সংসারে ছাই,
এই নাও সেই জালী কাগোজ—

(৫০ টাকার নোট ফেলিয়া দিয়া)

বি। কি জ্বালা—বালাই।
এই খানা কি সেই খানা ?

রাং বৌ। না, অনেক স্তাভাৎ ভাই
আছে কি না—দিচ্চে আমার হাতে গুণে গুণে ?
বল্‌তেও লাজ নাই কি মুখে ?—পোড়াও গে উনুনে !

বি। তাইতো—তবে কেমন্ হোলো! কাকে দিনু ভুলে?
রাং বৌ। হয় তো তাকেই দেছ—যার পায়ধূলো খাও গুলে!
বি। (ক্রুদ্ধ হইয়া)
মুখ্ সামালে কথা বলিস্—বড্ড বাড়াবাড়ী?
শিকেয় তুলে এমনিই হয় ভাঙা ছড়ার হাঁড়ী!
ধনু। (বাহির হইতে)
বিগ্গেনিধি, বলি ওকি?—কি হয়েছে অ্যাঁ?
ভদ্রলোকের কথার কেতা এমনিই বটে হ্যা!
বি। (হতবুদ্ধিভাবে নোটখানি দেখিতে দেখিতে প্রবেশ)
তাইত!—তবে এ কি হলো?
ধনু। কি হয়েছে বলো?
বি। হবে আর কি মাথা মুণ্ডু!—এদিক ওদিক গ্যালো।
শম্মাভায়া, হ্যাঁ হে, তোমার চিঠির ভেতর মোড়া
নোটখানা সে কত টাকার?
অগ্নি। না, দিব্বি শালের যোড়া
পুরস্কারি হলো শেষে! এ নৈলে কি হয়?
গুরুর মত গুরু বটে—বিগ্গেনিধির্ জয়!
হুকুম্ যেমন্—তেম্নি দিছি সরকারি-আপীসে
চাওরটিকে এখন্ দেখি জেলে পাঠাও শেষে!
বি। আরে চটো কেন? আমার হেথা—বেস্রোতেলো জলে
ধনু। চট্বার তো কথাই বটে—
বি। বাঁচি আমি ম'লে।
ধনু। কি হয়েছে, বলুই ছাই—বুঝ্তে তবে পারি।
বি। মাথামুণ্ডু বল্‌বো কি আর—করিছি ঝকমারি
রত্নসভার্ টাকার্ পিণ্ডি—হাতে নিয়ে তুলে।
পাঁশ্‌শো টাকার একখানা নোট্—কাকে দিছি ভুলে!
ঠিক মিনুতে ঘাম ছুটেছে—নাকে দিনু খৎ;
এ ঝকমারি আর কর্‌বো না—দেখবো অন্য পথ!
ধনু। জানো—আমার্ ঠিকে ঠাকে আছে লেয়াকৎ।
বি। হ্যাঁ তা জানি।

ধনু। চলো—তবে, নাকে দেবে খত্

রাঙাবৌএর্ চরণতলে,—মিলিয়ে দেবো তবে।

আর্ এক কথা—একটা ভালো ফলার দিতে হবে!

থাক্‌বো তাতে আমরা দুজ'ন্—ইয়ার্ বক্‌স আর্;

চাঁদ্‌কবিকে হবে দিতে কথকতার ভার।

আগাগোড়া সভার মাঝে ভাংবে তোমার ভুর্।

রাজী হওত, ভ্রমটা তবে করি এখন্ দূর।

বি। তাই সই,— আর সয়না প্রাণে! যেথা সেথা জ্বালা,

দিবা রাত্তির ঝগ্‌ড়া কোঁদল—কাণ্‌টা ঝালা পালা!

এক জায়গায় দাসের খৎ—এক জায়গায় নাকে;

অধ্যেপকি কয়্ ভালো—চরকার পাকে পাকে!!

ধনু। চল এখন্ বৌএর কাছে।

বি। আজ্‌কে না হয় থাক্।

ধনু। না না,—না তা হবে না—ছেঁচ্‌তে হবে নাক্!

পঞ্চাশ্ দিতে পাঁশ্‌শো দিলে—পাঁশ্‌শোতে পঞ্চাশ;

ঠিকেঠাকে মিলে গ্যালো—মিটলো দশের আশ্!!

(সকলের অন্দরমহলে প্রবেশ।)

সমাপ্ত।

সংগ্রহ।

বিজ্ঞান।

অসবর্ণ-বিবাহে স্পেন্সার।

গত মে মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' নামক ইংরাজী মাসিক পত্রে অধ্যাপক শ্রীযুত ডি. এন. চৌধুরী "অসবর্ণ বিবাহে হার্ব্বার্ট স্পেন্সার" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকটিত করিয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন, "অসবর্ণ-বিবাহ-ব্যাপারে যে আইন-সম্পর্কিত বাধা বিদ্যমান, তাহা উঠিয়া যাইতেছে, সুতরাং এসময়ে উহার প্রাণিতত্ত্ব-সম্পর্কিত দিকটি বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।" এই উপলক্ষে তিনি মনস্বী হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া অসবর্ণ-বিবাহের সমর্থনের প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা নিম্নে তাঁহার সন্দর্ভের স্থূল মর্ম্ম প্রদান করিয়া তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আমাদের মন্তব্য প্রদান করিলাম।

জাতি বৈবাহিক মণ্ডলী।

চৌধুরী মহাশয় প্রথমেই বলিয়াছেন,—"প্রাণিতত্ত্ব হিসাবে যদি অসবর্ণ-বিবাহ সমর্থিত না হয়, তাহা হইলে সামাজিক আবশ্যকতা বা আইনের মঞ্জুরীর অজুহত দেখাইয়া কোনও লাভ নাই।" জীবতত্ত্ব-বিজ্ঞান এখনও সম্পূর্ণরূপে সূতিকাগৃহের সীমা উত্তীর্ণ হয় নাই সত্য, তথাপি এই উক্তিতে চৌধুরী মহাশয়ের উহাতে প্রগাঢ় বিশ্বাস সূচিত হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন, জাতি বিভাগটি এখন দৃঢ় বৈবাহিক মণ্ডলীতে (marriage guilds) পরিণত হইয়াছে। যদি জাতিবিভাগের বজ্রবন্ধন একটু শিথিল করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ব্যবসায়-সমিতি হিসাবে ইহা কতকটা সামাজিক মঙ্গল সাধিত করিতে পারে সত্য, কিন্তু যদি আমরা সামাজিক ও রাজনৈতিক হিসাবে জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে বৈবাহিক মণ্ডলী হিসাবে জাতি-ভেদটি বজায় রাখা বিধেয় নহে। সুতরাং এই সময় জীবতত্ত্বের হিসাবে এই সমস্যার সমাধান করা কর্ত্তব্য।

বিজাতীয় বিবাহের বিষ ফল।

হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, কেন্টেরো কানেকো নামক জনৈক জাপানী রাজনীতিবিশারদকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ পত্রে তিনি উক্ত জাপানীকে বিদেশীদিগকে যথাসম্ভব দূরে রাখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বিভিন্ন জাতির মিশ্রণের বিরোধী ছিলেন। জীব-বিজ্ঞানের হিসাবেই তিনি ঐরূপ মিশ্রণের বিরোধী। এই পত্র প্রকাশের পর য়ুরোপে একটা তুমুল কোলাহল উঠিয়াছিল। ডাঙ্কান লিখিত স্পেন্সার-চরিতে এই সম্বন্ধে এই মর্ম্মে এক টিপ্পনী প্রকাশিত হয় যে, "বিভিন্ন-জাতীয় মানবের মধ্যে বিবাহ দ্বারা ও একই জাতীয় বিভিন্ন প্রকারের পশুর সংমিশ্রণ দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে এই তথ্য সপ্রমাণ হইয়াছে যে, যাহাদের মধ্যে অতি সামান্য পরিমাণ পার্থক্য আছে, তাহাদের ভিন্ন যে স্থলে অত্যন্ত বিভিন্ন জাতির শোণিত মিশ্রিত হইয়াছে, পরিণামে

তাহার কল নিশ্চিতই বন্ধ হইয়াছে।" এ স্থলে বিভিন্ন জাতির শোণিত সংমিশ্রণ স্পষ্টতঃই নিষিদ্ধ হইয়াছে। এখন কতটুকু বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে আমাদের বংশধরগণের উন্নতি হইতে পারে, তাহাই বিচার্য্য। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি স্পেন্সারের এই মত উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে অসবর্ণ-বিবাহের বিরুদ্ধবাদী প্রমাণিত করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন।

অসবর্ণ-বিবাহ দোষাবহ নহে।

অতঃপর চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, উক্ত উক্তির পৌর্ব্বাপর্য্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, যে ক্ষেত্রে স্পেন্সার ঐ উক্তি করিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে কেবল যেরূপ অবস্থায় বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে কুফল ফলিবার সম্ভাবনা, তাহাই নির্দ্দিষ্ট করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। দুই বা ততোধিক জাতির মধ্যে কতটুকু পার্থক্য থাকিলে তাহাদের মধ্যে যৌন সম্বন্ধ সংস্থাপনে শুভ ফল ফলিবার সম্ভাবনা, তাহার কথা উক্ত পত্রে আলোচিত হয় নাই। তিনি উক্ত মনস্বী লেখকের 'সোসিওলজি' নামক গ্রন্থের প্রথম ভাগ হইতে সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, অত্যন্ত বিভিন্ন প্রকৃতির জীবের সম্মিলন শুভফলপ্রসূ হয় না। যে স্থলে ঐ বিভিন্ন প্রকৃতির জীবগণের জীবনপ্রবাহ ভিন্নমুখ, সে স্থলে সংমিশ্রণ-ফল অমঙ্গলজনক হইয়া থাকে, ইহা সত্য। সমাজ-শরীরে ঐরূপ সংমিশ্রণ ফল অশুভজনক হয়। এরূপ সংমিশ্রণে পরস্পর-বিরোধী গুণ বিভিন্ন-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় না করিয়া একই ব্যক্তিকে আশ্রয় করে। বর্ণসঙ্কর জাতি (half-caste) যেরূপ এক দিকের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে এক প্রকারের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ও সামাজিক প্রথা প্রভৃতি প্রসূত ভাব ও প্রবৃত্তি নিচয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অন্য দিকের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও সামাজিক প্রথা প্রভৃতি প্রসূত ভাব ও প্রবৃত্তি-নিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ফলে, তাহাদের কোনও ভাবই পরিস্ফুট হয় না। ব্যক্তিগত হিসাবে ইহাদের সামাজিক স্বাতন্ত্র্য থাকে না—এবং ইহারা স্বতন্ত্র সামাজিক জাতির সৃষ্টি করিতেও পারে না। চৌধুরী মহাশয় এ স্থলে বলিয়াছেন যে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির মানবজাতির মিশ্রণই অনিষ্টজনক।

ইষ্ট ও অনিষ্ট।

অতঃপর তিনি স্পেন্সারের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সম-প্রকৃতির মানবজাতির মধ্যে যদি সামান্য পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে তাহার ফল অত্যন্ত শুভজনক হয়। ইহাতে তাহাদের ধাতুগত স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুটও বিকশিত হইয়া উঠে, এবং সামান্য পার্থক্যগুলি লোপ পায়। অর্থাৎ যাহা সেই জাতির মৌলিক ভাব. তাহাই পুষ্ট ও যাহা কৌলিক তাহা লুপ্ত হয়। চৌধুরী মহাশয়ের ব্যাখ্যা অনুসারে যে সকল জাতির মূল এক, অথচ যাহারা বিভিন্ন শাখাভুক্ত, তাহাদের মিশ্রণই উন্নতিজনক,—যে সকল জাতি মূলতঃই বিভিন্ন, তাহাদের মিশ্রণই ঘোর অনিষ্টজনক ও বংশহানির কারণ। তিনি কতকগুলি উদাহরণদ্বারা এবিষয় সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হিব্রুজাতি শোণিতের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু নীলনদী-তীরে অবস্থিতি-কালে, দেশে দেশে ভ্রমণে ও প্যালেষ্টাইন দেশ বিজয়ের পর তাহাদের

দেহে বিভিন্ন সেমিটিক জাতির শোণিত মিশ্রিত হইয়াছে। অন্যান্য গ্রীক জাতির সহিত মিশ্রণ-ফলেই প্রাচীন এথেনীয়গণ উন্নতির উচ্চ শিখরে আরূঢ় হইতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রাচীন রোমক জাতি সাবিনি, সাবেলি ও সামনাইট প্রভৃতি আর্য্যজাতির বিভিন্ন শাখার সংমিশ্রণ-ফলে উন্নতি-লাভে সমর্থ হইয়াছিল। ইংরেজ জাতিও বিভিন্ন স্ক্যাণ্ডিনেভীয় জাতির মিলন-ফলে উৎপন্ন সেইজন্য তাহারা এত উন্নত। ইহার পর তিনি লিখিয়াছেন, স্পেন্সার যদি হিন্দু আর্য্য জাতির ইতিহাস ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিবার অবকাশ পাইতেন, তাহা হইলে তিনি জানিতে পারিতেন যে, অতি প্রাচীন কালে হিন্দুজাতিরা যখন ভিন্নজাতির শোণিত তাঁহাদের শোণিতে মিশ্রিত হইতে দিতেন, তখন তাঁহারা ক্রমশঃ উন্নতি-লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। আর্য্যগণ এদেশে আসিলে এদেশের আদিম অধিবাসী দ্রাবিড়ীয় (Dravidians) জাতির সহিত তাঁহাদের শোণিত মিশ্রিত হয়। তাহার পর কণিষ্কের সময় কুশান জাতির সহিত আর্য্যশোণিত মিশিয়া যায়। তাহার ফলে তদানীন্তন আর্য্যগণের এত উন্নতি। এই মিশ্রণের পথ রুদ্ধ করিয়াই হিন্দুজাতি অবনতি-পথের পথিক হইয়াছে।

স্পেন্সারের সিদ্ধান্তের কারণ।

স্পেন্সার ভারতের য়ুরেশীয় ও আমেরিকার সঙ্করজাতি দর্শনে উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই উভয় জাতিই মৌলিক জাতির দোষ সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছে—গুণ কিছুই পায় নাই। চৌধুরী মহাশয় বলেন, ইহারা পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থের ফল,সেই জন্য ইহারা উভয় কুলের দোষাবলী প্রাপ্ত হয়। তথাপি ইহাদের মধ্যে ভারত ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ডিরোজিও, প্রতীচ্য আলেকজণ্ডার ডুমা, ও মার্কিণী নিগ্রোদিগের নেতা ব্রুকার টি ওয়াসিংটনকে দেখিতে পাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নহে।

আমাদের মনে হয় যে, চৌধুরী মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই অসবর্ণ-বিবাহের অনুকূল সংস্কার লইয়া এই বিষয়টি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি যে সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে সম্মিলিত জাতিগণের কৌলিক পার্থক্য কতটুকু ছিল, যথাযথভাবে তাহার নির্দ্ধারণ অসম্ভব। অতীতের অন্ধকারে তাহা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় হিন্দুগণ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অনুমানমাত্র। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে অস্পষ্ট ও আনুমানিক তথ্যের স্থান নাই। সুতরাং বর্ত্তমানের দিকে দৃষ্টি দেওয়াই বিধেয়। অসবর্ণ-বিবাহের ফলে যদি জাতীয় উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইত, তাহা হইলে য়ুরেশীয়, ক্রিয়োল, প্রভৃতি জাতির মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক মনস্বী ও বলবান্ লোকের আবির্ভাব

আমাদের বক্তব্য।

দেখা যাইত। ব্রাহ্ম ও বৈরাগীদিগের মধ্যে নানাজাতীয় লোকের শোণিত মিশ্রণে বাধা নাই। দেশীয় খৃষ্টানসমাজে বহুজাতির সংমিশ্রণ ঘটিতেছে। কিন্তু কি দৈহিক বলে, কি মানসিক শক্তিতে, তাহারা য়ুরোপীয় বা হিন্দুজাতিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইতেছে না। এদেশীয় মুসলমানগণ এ দেশের নানা জাতি হইতে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত। তদ্ভিন্ন ইহাদের মধ্যে পাঠান, মোগল, তাতার প্রভৃতি জাতিও অল্প ছিল। বহুদিন ধরিয়া ইহাদের শোণিত মিশ্রিত হইয়া আসিতেছে।

কারণ, মুসলমানগণ স্বধর্ম্মীর মধ্যে কোনওরূপ পার্থক্যই রাখেন না। সাম্যবাদের এমন সুন্দর ধর্ম্ম আর নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কি দৈহিক বলে, কি সৌন্দর্য্যে, কি বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে, মুসলমানগণ কি জাতিভেদে বিভক্ত বৈষম্যবাদের সমর্থক হিন্দুদিগকে অতিক্রান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন? সত্য বটে, কর্ম্মঠ মুসলমান চাষী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের শারীরিক বল আলস্য-প্রিয় ভদ্র হিন্দুদিগের শারীরিক বল অপেক্ষা অধিক; কিন্তু পোদ, নমঃশূদ্র, কাপালিক, বাগদি, গোয়ালা প্রভৃতি হিন্দুচাষী ও শ্রমশীল জাতি অপেক্ষা তাহাদের দৈহিক বল অধিক নহে। মুসলমান ভদ্রলোকের দৈহিক বল হিন্দু ভদ্রলোকের দৈহিক বল অপেক্ষা কিছুমাত্র অধিক নহে। এরূপ পরীক্ষিত ও পরিদৃশ্যমান সত্য চক্ষুর সম্মুখে থাকিতে ইতিহাসের অন্ধকারে বিভ্রান্ত হইয়া অসবর্ণ-বিবাহই জাতীয় উন্নতির নিদান—একথা বলা সঙ্গত নহে। চৌধুরী মহাশয় যে জীবতত্ত্বের তথ্যাবতারণা করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত জটিল। উহার অনেক সিদ্ধান্ত এখনও অবিসংবাদিত বলিয়া সপ্রমাণ হয় নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা অসম্ভব।

বিবিধ।

মানবের ভবিষ্যৎ।

অদূর ভবিষ্যতে জগতের, বিশেষতঃ মানবজাতির, কি পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহা জানিবার জন্য অনেকেই উৎসুক। কিন্তু এ বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য ভবিষ্যদ্বক্তার একান্ত অভাব। সুতরাং লোক মনের ঔৎসুক্য মনেই চাপিয়া রাখে। বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানবলেই মানবের অদৃষ্টচক্র ও কার্য্যপদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সুতরাং বিংশ শতাব্দীর শেষে বা একবিংশতিতম শতাব্দীর প্রারম্ভে মানবজাতির অবস্থা কি ঘটিবে, তাহা জানিবার জন্য কৌতূহলী লোকরা বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞের নিকট মধ্যে মধ্যে গমন করিয়া থাকেন। টমাস এ এডিসন বর্ত্তমান যুগের একজন লব্ধযশা বৈজ্ঞানিক। তড়িদ্বিজ্ঞানেই ইনি বিশেষজ্ঞ। ফনোগ্রাফ, ইন্ক্যান্ডেসেণ্ট্ ল্যাম্প্, কিনেমেটোগ্রাফ, এরোফোন্, মেগাফোন্ ও অন্যান্য বিবিধ তাড়িত যন্ত্র আবিষ্কারে ইনি মানব-সমাজে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। বৈদ্যুতিক সঞ্চয় (electric storage) যন্ত্র আবিষ্কৃত করিবার জন্য ইনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-প্রভাবে মানব-সমাজের কিরূপ দশান্তর উপস্থিত হইবে, তাহা জানিবার জন্য কেহ কেহ তাঁহার সহিত আলাপ করিতে চাহেন। সম্প্রতি অ্যালেন বিয়েসন নামক জনৈক মার্কিণবাসী তাঁহার সহিত যে কথোপকথন করিয়াছেন, তাহা গত মার্চ্চ মাসের 'ম্যাস্ ম্যাগাজিন' নামক বিখ্যাত মার্কিণী মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা তাহার স্থূল মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত করিলাম।

এডিসন বলেন যে আর অধিকদিন সুবর্ণের দুর্ম্মূল্যত্ব থাকিবে না। লোক আর লোহার

সিন্দুকে স্বর্ণ না রাখিয়া উহা বাহিরে ফেলিয়া রাখিবে। লোক আর সুবর্ণ-মুদ্রায় বেতন লইবে না,—ভামিনীরা আর সোণার গহনায় "গা সাজাইবেন" না। কৃত্রিম উপায়ে সোণা প্রস্তুত হইবেই,—তবে কি উপায়ে সোণা প্রস্তুত হইবে, এইটুকুমাত্র জানিতে বিলম্ব। হয়ত কল্যই সে উপায় জানিতে পারা যাইবে। সুবর্ণ ও রজতের পার্থক্য অতি অল্প। উহাদের পরস্পরের উপাদান পদার্থ বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রযুক্ত। পদার্থের বিন্যাস ও প্রয়োগ-পদ্ধতির উপরই উহার নির্ভর। সকল পদার্থই সমান; সম্ভবতঃ রেডিয়াম সুলভ ধাতুকে মহার্ঘ ধাতুতে পরিণত করিতে পারিবে। রেডিয়াম দ্বারা ঐ কার্য্য সাধিত না হয়,—অন্য কিছুর দ্বারা সেই কার্য্য সংসাধিত হইবে।

হেমের অনাদর

ইদানীং অধমর্ণগণ সুবর্ণ দ্বারা উত্তমর্ণের ঋণ শোধ করিবেন বলিয়া চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ হয়েন। ইহা বাস্তবিকই বিষম বিপজ্জনক। পৃথিবীর অধিকাংশ সম্পত্তি অকস্মাৎ উত্তমর্ণের হস্ত হইতে অধমর্ণের হস্তে গমন করিতে পারে। ইহার মতে ব্যাঙ্কাররা বড় নির্ব্বোধ। তাহারা অর্থ লইয়া কায-কারবার করে সত্য, কিন্তু অর্থ কি তাহা বুঝে না।

আশঙ্কার আভাস।

ভবিষ্যতে মানুষ চিরকালই বাষ্পীয় যানে যাতায়াত করিবে না। যান সঞ্চালনে তড়িৎ কি অন্য কিছু ব্যবহৃত হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে এডিসন একটি সুন্দর গল্প বলেন। তিনি বলেন দশ বৎসর পূর্ব্বে একদা শীতকালের অপরাহ্নে তিনি তাঁহার ফ্লোরিডাস্থ পরীক্ষাগারের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে বসিয়া ছিলেন। আকাশ সৌরকর-সমুজ্জ্বল ও মেঘলেশমাত্রশূন্য ছিল। নিকটস্থ একটি কলের চিমনী বা ধূমনলী হইতে ধূমরাশি সহস্র ফুট উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল। বায়ু যেন রুদ্ধগতি। সেই সময় এডিসন লক্ষ্য করিলেন, একটি মার্কিণী বাজপক্ষী সেই উচ্ছৃত ধূমস্তম্ভের শীর্ষস্থলেরও উর্দ্ধে বায়ুমণ্ডলে চক্রাকারে পরিক্রমণ করিতেছিল। সে অকস্মাৎ অধঃক্রমিত ও উৎক্রমিত হইতেছিল, কিন্তু সে তাহার পক্ষদ্বয়ের কিছুমাত্র সঞ্চালন করিতেছিল না। তাহার পক্ষদ্বয় ঠিক সরলভাবে বিস্তৃত ছিল। পক্ষসঞ্চালন ব্যতীত পক্ষীটি কি প্রকারে বায়ুমণ্ডলে আপনাকে উড্ডীন রাখিয়াছে,—এডিসন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। স্থির, নিশ্চল বায়ুমণ্ডলে পক্ষীটি পক্ষকম্পন করিল না,—পাখা নিস্পন্দ রাখিয়া নিম্নে পড়িয়া আবার উর্দ্ধে উঠিল কি করিয়া? নয় বৎসর চিন্তা করিয়া তিনি কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। নয় বৎসর পরে তিনি সেই সমস্যার সমাধানে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শব্দজনিত বায়ুর তরঙ্গ ও ঐ পক্ষীর পক্ষাভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালকের সঙ্ঘর্ষণ-জনিত বায়ু তরঙ্গনিচয় ঐ পক্ষীকে বায়ুমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে সহায়তা করিতেছিল। ভ্রমর যেমন শব্দজনিত বায়ুতরঙ্গ কর্ত্তৃক পরিচালিত হয় পক্ষীটিও সেইরূপ বায়ুতরঙ্গ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছিল। বায়ু একেবারে নিথর না হইলে ভ্রমর পক্ষসঞ্চালন করে না। মানব ভ্রমরের নিকট হইতে ইহার গতি শিক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে যাতায়াতের জন্য বিমান প্রস্তুত করিবে। সেই বিমান ঘণ্টায় পঞ্চাশ ক্রোশ বেগে চলিবে। বর্ত্তমান যুগে যে সমস্ত "এরোপ্লেন"

ভবিষ্যৎ যান।

"বাইপ্লেন" প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে, তাহা টিকিবে না। যান-চালনে ভবিষ্যতে বাষ্প ব্যবহৃত হইবে না।

নিকেলের পুস্তক।

এডিসন বলেন, ভবিষ্যতে নিকেলের কাগজে ইস্পাতের মলাটে পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে। নিকেলের কাগজে ছাপার কালি বেশ ধরিবে। সৌদামিনীর সাহায্যে নিকেলের অতি পাতলা কাগজ প্রস্তুত হইবে। ৪০ হাজার পৃষ্ঠার পুস্তক দুই ইঞ্চির অধিক পুরু হইবে না।

গৃহ ও আসবাব।

এডিসন বলেন যে, ভবিষ্যতে মানুষ কাঠের আসবাব ব্যবহৃত না করিয়া ইস্পাতের আসবাব ব্যবহার করিবে। ইস্পাতের উপর মেহগিনি, চেরী, ওয়ালনাট, ওক প্রভৃতি কাঠের বর্ণ করা সহজ হইবে। লোক আর ইষ্টকের ঘর প্রস্তুত করিবে না। মাল মসলা কঠিনভাবে জমাট বাধাইয়া তাহাতে গৃহাদি প্রস্তুত করিবে। প্রাচীন মিশরবাসীদের নিকট হইতে য়ুরোপীয়রা ইষ্টকের ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছে। ইষ্টকের ব্যবহার বিষম ভুল। যাহারা কাঠের গৃহ নির্ম্মিত করে তাহারা বাতুল। জমাট মাল মসলায় গৃহ পঞ্চাশ তলা পর্য্যন্ত উন্নত করা যাইতে পারে। ইহাতে ভূমিকম্পের ও অগ্নির ভয় নাই। টেলিফোন যন্ত্রের আরও অনেক উন্নতি হইবে।

কলের উন্নতি।

এডিসন বলেন, ভবিষ্যতে কলের অনেক উন্নতি হইবে। কলের এক প্রান্তে কাপড়, সূতা, বোতাম, টিস্যু কাগজ ও পেষ্টবোর্ড দিলে অন্য প্রান্তে প্রস্তুত পোষাক বাক্সে মোড়ক হইয়া বাহির হইবে। মুদ্রাযন্ত্র হইতে পুস্তক বাঁধাই হইয়া বহির্গত হইবে। ইনি বলেন, মানবের উদ্ভাবনায় এখন শৈশবকালমাত্র। যন্ত্রের এক প্রান্তে তুলা ও বোতাম দিলে অন্য প্রান্তে প্রস্তুত পোষাক পাওয়া যাইবে, এরূপ যন্ত্র উদ্ভাবিত হওয়া অসম্ভব নহে।

কৃষির যুগান্তর।

অদূর ভবিষ্যতে কৃষিকার্য্যে যুগান্তর ঘটিবে। কৃষিকার্য্যে বুদ্ধিমান লোকের প্রয়োজন হইবে। যিনি কৃষক, তাঁহাকেই মৃত্তিকা-পরীক্ষক, উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ ও অর্থনীতি-বিশারদ হওয়া আবশ্যক হইবে। কৃষাণকে আর বলদ লইয়া ক্ষেত্র-কর্ষণ করিতে হইবে না। এক খানি কেদারায় বসিয়া বোতাম টিপিলে ও হাতল ঘুরাইলে, ক্ষেত্র তড়িৎবলে কর্ষিত হইবে; বিদে বাওই, মই, নিড়ান, কাটা, ঝাড়া শুকানো, এমন কি, শস্য গোলাজাত পর্য্যন্ত হইতে পারিবে। ইতোমধ্যেই কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু ভবিষ্যতের উন্নতির তুলনায় বর্ত্তমান উন্নতি অতি অকিঞ্চিৎকর বিদ্যুৎ-সঞ্চার-যন্ত্র আবিষ্কৃত হইলেই কৃষিকার্য্যের বহুল পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

বর্ষা-গীতি।

নব নীল মেঘজালে আবরিয়া গগনে,
শ্যামল হরিত পীত বরণে
রঞ্জি' কাননতল
বিকাশি' যুথির দল
দীর্ণা ধরায় করি' শোভাময়ী সরসা
আসে মঙ্গলময়ী বরষা।

বাদল রাগিণী বাজি' উঠে আজি ভুবনে
বনবীথি মুখরিত পবনে।
ঝরঝর অবিরল
ঝরে বাদলের জল,
ধ্বনিত তটিনীনীরে কলগীতি সহসা,
সঙ্গীতময়ী নব বরষা!

খেলিছে মেঘের কোলে চঞ্চলা দামিনী,
চমকিত-চিত পুর-কামিনী।
চাহি' আকাশের পানে
প্রেমব্যথা জাগে প্রাণে
প্রণয়-আকুল-হিয়া অনুরাগে বিবশা,
মিলন-মধুরা অয়ি বরষা!

সিক্ত কেতকীবন পুলকিত সুবাসে।
কেকা-রব করি' শিখী উল্লাসে;
মাতিয়া মেঘের ডাকে
নাচে নীপতরুশাখে।
পথিকবধুর হৃদে জাগে পুন ভরসা,
হরষ মগনা নব বরষা!

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

সাধুচরিত।*



মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে দেশে যে অশান্তি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা জাতীয় উন্নতির অন্তরায় ছিল। দেশে রাজনীতিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন সেই অশান্তির অবসান হইল ও দেশে নব শিক্ষার সূত্রপাত হইল, তখন-আজ হইতে ৮০ বৎসর পূর্ব্বে কোন ইংরাজ লেখক ইংরাজদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"Recollect, Gentlemen, that 'Knowledge is power.' You have now laid the foundation of it among an acute and intellectual people. Its diffusion is inevitable. The schoolmaster is abroad with his primer, pursuing a course which no power of man can hereafter arrest. A light is now rising in the East, destined to attain meridian strength and splendour, and to 'Shine more and more unto the perfect day'. Through the medium of schools, literary meetings, and printed books, all the learning and all the science, of Europe will be greedily imbibed, and securely domiciled, by the Hindoos of India. Knowledge, Gentlemen, is power." তাঁহার এই ভবিষ্যৎবাণী বর্ণে বর্ণে সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। য়ুরোপের শিক্ষার কিরণে ভারতের মানসক্ষেত্রে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা একান্তই অভূতপূর্ব্ব। তখন ভারতে বহু কর্ম্মবীরের ও ধর্ম্মবীরের আবির্ভাব হইয়াছিল। রবিকরে সমুজ্জ্বল চন্দ্র যেমন রজনীর অন্ধকার বিনষ্ট করে, নূতন শিক্ষার আলোকে সমুজ্জ্বল বাঙ্গালীর প্রতিভা তেমনই চারিদিক আলোকিত করিয়াছিল। "নব্য-বঙ্গের সাহিত্য-গগনে এই সময়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জের আবির্ভাব হইল,—কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে পুরোবর্ত্তী করিয়া কাব্যাকাশে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত

---

* সাধুচরিত—শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘটক বি, এ, প্রণীত মূল্য আট আনা।

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত—মূল্য ২॥০ টাকা—কলিকাতা ৫৪, কলেজ ষ্ট্রীট হইতে এস, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Ramtanu Lahiri—Sir Roper Lethbridge, K. C. I. E.



রামতনু লাহিড়ী
(প্রৌঢ় বয়স্ক)

লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্



সমুদিত হইলেন, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' 'নীলকর-বিষধর-গণের' বিষদন্ত চিরদিনের জন্য উৎপাটিত করিয়া দিল, বিদ্যাসাগরের প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণযুক্ত ভাষার উপর বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিমল রশ্মি পতিত হইয়া তাহাকে অনুপম সুষমায় মণ্ডিত করিল, তাঁহার তুলিকার বিচিত্র বর্ণসম্পাতে এবং অসাধারণ কাব্যকৌশলে বাঙ্গালা সাহিত্য অপূর্ব্ব শ্রী ও গৌরবে উদ্ভাসিত হইল। অতঃপর মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন আবির্ভূত হইয়া একেশ্বরবাদ প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ভাবের গভীরতায়, ভাষার ললিত ছটায় ও তাঁহার বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে যুবকগণ মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। সকল দিকেই আশা ও উদ্যমের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। নব্যবঙ্গের উদীয়মান কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক প্রভৃতির প্রচারিত পুস্তকাদি পাঠে এ দেশবাসী আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হইল। বাঙ্গালা ভাষা যে একটা ভাষা, তাহা যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রাণে বিভিন্ন ভাবের আবির্ভাব করিতে সমর্থ, তাহা যে কবির প্রতিভাসূত্রে গ্রথিত হইলে মেঘমন্দ্রে আকাশমণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া পরক্ষণেই আবার বসন্তসমা-গমহৃষ্ট কোকিলের ন্যায় মধুর ঝঙ্কারে প্রাণে সুধা-তরঙ্গ তুলিতে পারে, এ ধারণা কাহারও ছিল না; বাঙ্গালী বিস্মিত হইয়া দেখিল বাঙ্গালা ভাষা সংসারের সহস্র ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও সুখী অসুখী, ধনী নির্দ্ধন, সকলেরই প্রাণে শান্তিবিধান করিতে সমর্থ।"

এই সময় যে সকল ধর্ম্মবীরের ও কর্ম্মবীরের আবির্ভাব হইয়াছিল, রাম-তনু লাহিড়ী মহাশয় তাঁহাদিগের নেতৃদলভুক্ত। রামগোপাল ঘোষপ্রমুখ কর্ম্মবীরগণ যখন প্রতীচ্য আদর্শে বাঙ্গালীকে কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিতে-ছিলেন, রামতনুবাবু তখন বাঙ্গালীকে সাধুত্বের আদর্শ দেখাইতেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি শিক্ষকের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। যখন ডিরোজিও প্রভৃতির শিক্ষায় শিক্ষিত নব্যবাঙ্গালীদল সংস্কারের নামে উচ্ছৃঙ্খলতার উদ্দাম তরঙ্গে ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইতেছিলেন তখন রামতনু বাবু শিক্ষককার্য্যে রত থাকিয়া আপনার পুণ্য চরিত্রের পূত প্রভাবে তাঁহাদিগকে পবিত্রতার পথে পরিচালিত করিতেছিলেন।

রামতনু বাবুর জীবন অন্যরূপ কর্ম্মবহুল ছিল না—কর্ম্মের অস্থিরতায় সে জীবনের বিশেষত্ব ছিল না কাযেই সাধারণ হিসাবে সে জীবনের কাহিনী বিস্তৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সে জীবনের পুণ্য কথাপাঠে পাঠকের

উপকারের সম্ভাবনা। কাযেই তাঁহার একাধিক চরিতকথা প্রকাশে আমরা পুলকিত হইয়াছি।

শাস্ত্রী মহাশয় রামতনুবাবুর ভক্ত শিষ্য, স্বয়ং সুপণ্ডিত তিনি তাঁহার গ্রন্থে বাঙ্গালার সেই সময়ের সামাজিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া দেখাইয়াছেন—রামতনুবাবুর আবির্ভাব বাঙ্গালায় নূতন চেতনাসঞ্চারের ফল—ভারতের ঋষিচরিত্রে প্রতীচ্য প্রভাবের সুফল।

রামতনু বাবুর চরিত্রবলের পরিচায়ক একটি ঘটনা শাস্ত্রী মহাশয়ের পুস্তক হইতে নিয়ে উদ্ধৃত হইল:—যে দিন তাঁহার পুত্র নবকুমারের মৃত্যু হইয়াছে।—"নবকুমারের প্রাণবায়ু দেহকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাঁহার মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে, তৎপার্শ্বে শোকার্ত্ত মাতা অচেতন হইয়া রহিয়াছেন, এদিকে রামতনু বাবু পল্লীবাসী তাঁহার আত্মীয় সুপ্রসিদ্ধ কার্ত্তিকেকচন্দ্র রায় মহাশয়ের একটী পুত্রকে ধরিয়া বাহিরে প্রাঙ্গণস্থিত একটী বেঞ্চের উপরে বসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতেছেন। সে যুবকটী নবকুমারকে এতই ভালবাসিত যে সে শোকে অধীর হইয়া উঠিয়াছে; কোনও ক্রমেই শোক সম্বরণ করিতে পারিতেছে না। রামতনুবাবু তাহাকে বলিতেছেন 'সে কি হে! তুমি শিক্ষিত লোক, সকল বোঝ, কোথায় তোমার জেঠাইমাকে বোঝাবে, শান্ত করবে না, তুমিই অধীর হয়ে গেলে?' এমন সময়ে কয়েকজন যুবক আসিয়া উপস্থিত। তৎপূর্ব্বে তাঁহারা সপ্তাহে এক দিন আসিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেন। এ জন্য তাঁহাদের একটী সঙ্গত সভার মত ছিল। সেই দিন উক্ত সভার অধিবেশনের দিন। তদনুসারে তাঁহারা উপস্থিত। তাঁহারা জানিতেন না, যে কিয়ৎকাল পূর্ব্বে নবকুমারের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহারা না জানিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে লাহিড়ী মহাশয় দ্রুতপদে গিয়া বলিলেন, 'দেখ আজ এ বাড়ীতে সভার অধিবেশন হবে না; আমার ভুল হয়ে গিয়েছে, আগে সংবাদ পাঠান উচিত ছিল।' সকলে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ধীরভাবে বলিলেন, 'অল্পক্ষণ পূর্ব্বে নবকুমারের মৃত্যু হয়েছে, তার মৃত দেহ ঐ ঘরে পড়ে আছে, তোমরা যেও না, দেখ্‌লে কষ্ট হবে।' শুনে ত সকলে অবাক শোকের চিহ্ন মাত্র ও নাই।"

এই বিবরণে টেনিসনের অমর রচনা মনে পড়ে:—

"I curse not nature, no, nor death
For nothing is that errs from law"

'সাধুচরিত' এই সাধু পুরুষের পুণ্যকথায় পূর্ণ। এই পুস্তক হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত বিবরণটিতে রামতনু বাবুর সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যাইবে :— "একদিন দুই ঘটিকার সময় স্কুল ছুটি হইয়াছে। গ্রীষ্মকাল, বড় রৌদ্র উঠিয়াছে। দারুণ সূর্য্যের তাপে গাছপালা শুষ্ক ও মৃতপ্রায়। চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। লাহিড়ী মহাশয় যে পাল্কী করিয়া স্কুলে যাতায়াত করিতেন, বাহকেরা তাহা লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, দেখিতে পাইলেন না। অমনি ছাত্রেরা দৌড়িল, দেখিল, এক বৃক্ষতলে বেশ ছায়া পড়িয়াছে, তথায় পাল্কী রাখিয়া বাহকগণ নিশ্চিন্ত মনে অকাতরে ঘুমাইতেছে। বালকগণ ডাকিতে যাইবে, এমন সময় লাহিড়ী মহাশয় আসিয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। একটি বালক বলিল, 'কেন ডাক্‌ব না? আপনি দাঁড়াইয়া থাকিবেন, আর ওরা ঘুমুবে? আমি এক ছাতার খোঁচায় তুলে দিচ্ছি।' লাহিড়ী মহাশয় যেন অন্তরে ব্যথা পাইলেন, বলিলেন, 'কর কি, কর কি? এমন কাজ কর্‌তে আছে? ওরা কত পরিশ্রম করে, একটু ঘুমিয়েছে, থাক্ না। আমি ততক্ষণ তোমাদের সঙ্গে গল্প করি।"

সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, মতের জন্য রামতনু বাবু সর্ব্ববিধ নির্য্যাতন প্রফুল্ল ভাবে সহ্য করিতেন। সেই সকল নির্য্যাতনের অগ্নিপরীক্ষায় তাঁহার চরিত্র যেন অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের মত সমধিক বিশুদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

তিনি স্বভাবতঃ করুণ-হৃদয়—কোমল-প্রবৃত্তিশালী ছিলেন। কিন্তু অন্যায় দেখিলে তিনি তাহার প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, সত্যের অপলাপ দেখিলে তিনি তাহা সহ্য করিতেন না। তিনি মতের জন্য যে নির্য্যাতন সানন্দে সহ্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা মনে করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাঁহার 'সুরধুনী কাব্য' গ্রন্থে রামতনু বাবুর যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে নিপুণ চিত্রকরের তুলিকাপাতে লাহিড়ী মহাশয়ের পূত চরিত্রের গুণরাশি যথাযথ বিবৃত হইয়াছে :—

"পরম ধার্ম্মিকবর এক মহাশয়,
সত্য বিমণ্ডিত তাঁর কোমল হৃদয়।
সারল্যের পুত্তলিকা, পর হিতে রত,
সুখ দুঃখ সম জ্ঞান ঋষিদের মত।

জিতেন্দ্রিয়, বিজ্ঞতম, বিশুদ্ধ বিশেষ,
রসনায় বিরাজিত ধর্ম্ম উপদেশ।
একদিন তাঁর কাছে করিলে যাপন
দশদিন ভাল থাকে দুর্ব্বিনীত মন।
বিদ্যা বিতরণে তিনি সদা হরষিত,
নাম তাঁর রামতনু সকলে বিদিত।"

বর্ত্তমান লেখকের ন্যায় যাঁহারা তাঁহার স্নেহভাজন হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন, ভারতবর্ষের পুণ্যক্ষেত্র আজও ঋষিশূন্য হয় নাই; যে দেশে জ্ঞানীরা পূজাচারের অনুষ্ঠানই জীবনের চরম ও পরম মনে করিতেন—সেই দেশেই রামতনু বাবুর আবির্ভাব সঙ্গত ও স্বাভাবিক; এবং তাঁহার মত লোকের আবির্ভাবেই মানব সমাজ ধন্য হয়।

রামতনুবাবুর চরিতকথার আলোচনায় বাঙ্গালীর প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা। আমরা আশা করি, এই পরিবর্ত্তনের যুগে—এই সংস্কারের নামে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবর্ত্তন কালে রামতনু বাবুর আদর্শ অন্ধানিশায় ধ্রুব তারার মত বাঙ্গালীকে তাহার গন্তব্য পথের নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

আর্য্যাবর্ত্ত—



রামগোপাল ঘোষ

লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ।

শ্রাবণ, ১৩১৮

আর্য্যাবর্ত্ত।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
সম্পাদিত।

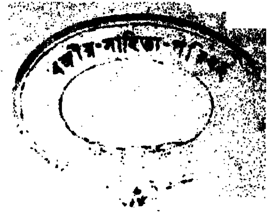
—০—

সূচী।

প্রকাশক—শ্রীদুর্গানাথ বসু।
১০৬।২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা] [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।

এম, এন, প্রেস,—২৩ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।



দুঃখ।

দুঃখের কাহিনী লইয়া আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছি, আপনারা ভিখারী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবেন না ত? দুঃখের প্রকৃতি এই যে সে হৃদয়ের অতি নিভৃততম প্রদেশকে স্পন্দিত করিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে নয়নোপান্তে সমবেদনার অশ্রুবিন্দু বহিয়া আনে। দুঃখকে শত চেষ্টা করিয়াও আমরা দূরে রাখিতে পারি না। সৃষ্টির আদি হইতে যে দুঃখের করুণ গীতি ধ্বনিত হইতেছে, তাহারই বিচিত্র তান মূর্চ্ছনা মানবের কাব্য-দর্শন-ইতিহাসকে আচ্ছন্ন, বিপ্লুত ও মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। সূর্য্যাস্তের স্নিগ্ধ করজাল যেমন সান্ধ্য মেঘমালাকে বিদ্ধ, বিদীর্ণ ও পরিব্যাপ্ত করিয়া তাহাতে নানাবর্ণ সমাবেশে বিচিত্র করিয়া তুলে, দুঃখ তেমনি মানবজীবনকে অসংখ্যভাবে ঘিরিয়া ঘিরিয়া তাহাকে স্নিগ্ধ, গম্ভীর ও করুণ করিয়া দেয়। তাহার চেতনা, তাহার কর্ম্ম-প্রবণতা, তাহার বেদনা, তাহার প্রযত্ন, তাহার মহিমা, তাহার উদারতা, তাহার আশাভরসা, তাহার হাহাকার—শতদিকে শতভাবে এই দুঃখের চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন কাহিনী বহন করিতেছে।

তাই মানবের ভাষা এই এক দুঃখেরই অনন্ত অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ। না হইবে কেন? দুঃখ হইতেই যে ভাষার জন্ম। শিশুর ক্রন্দন যে তাহার পরিস্ফুট ভাষার অগ্রদূত। ক্রৌঞ্চ মিথুনের দুঃখে মুহ্যমান হৃদয় হইতে যে শোক বা শ্লোকের জন্ম হইয়াছিল, সেই বিশ্বব্যাপিনী সমবেদনাই মানব-ভাষার আদি জননী। সেই জন্যই বোধ হয় ভাষা তাহার জননীকে প্রায় ভুলিয়া থাকে না। সহস্র কণ্ঠে সহস্র রাগিণীতে ভাষা দুঃখের গীতি গাহিয়া সমস্ত চরাচর বিশ্বকে মুগ্ধ, স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছে। তাই দুঃখ লইয়াই মানবের কাব্য। নির্ব্বাসিত যক্ষের বিলাপ, শ্রীরাধিকার বিরহ, হ্যামলেটের জীবনে বিস্পৃহা, নিষ্কলঙ্ক ডেস্‌ডিমনার শোকাবহ পরিণাম, পতিব্রতা ভ্রমরের লাঞ্ছনা—এ সকলই সেই বিশ্ব-বেদনার এক একটি মূর্চ্ছনা। সমস্ত মানবের জীবনের মধ্য দিয়া দুঃখ যে অবারিত স্রোতটি বহাইয়া দিয়াছে, তাহারই এক একটি ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গ কবিতার ছন্দে কাব্যে ফুটিয়া উঠে, আর সেই বিশ্বব্যাপিনী বেদনার ঝঙ্কারে সমস্ত মানবজীবন পূর্ণ ও পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়।

সমস্ত সৌরজগৎ যেমন সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত্তিত হইতেছে, তেমনই অন্য দিক দিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন মানবজীবনকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত বিশ্ব চরাচর দিবারাত্র ঘুরিতেছে। এই বিস্তৃত পরিধির মধ্যে বিন্দুমেয় মনুষ্য-জীবন আধ্যাত্মিক বলে সমগ্র বস্তুকে আকর্ষণ করিতেছে। সমগ্র ইহলোক ও পরলোক মানববুদ্ধির বিষয়ীভূত হইয়া প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে মানবের প্রয়োজন-সাধন করিতেছে। জড়বস্তু জড়ের কোনও প্রয়োজন-সাধন করে কিনা সন্দেহস্থল, কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে জগতের যাবতীয় বস্তু মানবের ভাগ্যের সহিত কোনও না কোনও প্রকারে জড়িত আছেই আছে। এই যে এক বিপুল বিশ্বব্যাপী নিগূঢ় আকর্ষণ, ইহাকে এক হিসাবে বিশ্বের কেন্দ্রগামিনী শক্তি বলা যাইতে পারে। মানব এই বহুধা বিভিন্ন শক্তি-সংঘের অবিশ্রাম ঘাতপ্রতিঘাতে সর্ব্বদা স্পন্দিত, জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ। এই যে এক অচেনা, অজানা, বিপুল ব্রহ্মাণ্ড শক্তিনিচয়ের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া মানব ধীরে ধীরে আপনার শক্তিসঞ্চয়পূর্ব্বক অন্য সকল শক্তিকে অভিভূত করিবার নিয়ত চেষ্টায় কখনও উঠিতেছে, কখনও বা পড়িতেছে, ইহাই মানবের সংসার, ইহাই মানবের ভাগ্য। সুখ এবং দুঃখ এই ভাগ্যেরই অবস্থা বিপর্য্যয়। কখনও সুখরবির খরকিরণে সে ভাগ্য প্রসন্ন, নির্ম্মল, জাজ্বল্যমান। আবার কখনও সে সুখ কেন্দ্রীয় উষার ন্যায় ক্ষণিক ম্লান আলোকে দুঃখের চিররাত্রিকে কদাচিৎ অবসান করিয়া দেয়!

ব্যক্তিগত এবং জাতীয় জীবন এই ভাগ্যবিপর্য্যয়ের অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত চক্ষুর সমক্ষে উন্মুক্ত করে। একদিকে যেমন যীশুর নিষ্ঠুর পরিণাম, সক্রেতিসের অপ্রত্যাশিত বিষপান, রাজপুত্র সিদ্ধার্থের সংসার ত্যাগ, সিজারের হত্যা, নেপোলিয়নের নির্ব্বাসন, অপরদিকে তেমনি পারস্যের পতন, উল্কার ন্যায় গ্রীসের উত্থান ও বিলয়, রোমের গৌরবদীপ্ত মধ্যাহ্নে সূর্য্যাস্ত—চিরাভিশাপ-গ্রস্ত ভারতের কথা আর তুলিয়া কায নাই—এ সকল ব্যক্তিগত ও জাতীয় দুঃখের কাহিনী বহন করিয়া ইতিহাস যুগযুগান্তর ধরিয়া শোকাশ্রুপূত ব্রতচারিণী বিধবার ন্যায় চলিয়াছে। তাহার প্রতি পত্র দুঃখের তপ্তশ্বাসে ম্রিয়মাণ। যেখানে কোনও ব্যক্তি বা জাতিবিশেষের আকস্মিক উন্নতি চক্ষু ঝলসিয়া দিতেছে, সেইখানেই এক বিরাট অধঃপতনের বিপুল আয়োজনের আভাস ও অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। যেখানে চরিত্রের মহিমায়, শৌর্য্যের গৌরবে হৃদয় আশান্বিত হইয়া উঠে, সেইখানে আবার কলঙ্ককালিমায়, ভগ্নহৃদয়ের হাহাকারে

দিক্ আচ্ছন্ন হয়। মানবের ইতিহাস আলোচনা করিলে দুঃখের বিশাল ছায়ায় শিহরিয়া উঠিতে হয়। মনে হয়, যেন দুঃখের বিরাটমূর্ত্তি মহাকায় কলোসাসের মত পদদ্বয়ের দ্বারা মানবের ভাগ্যকে অধিকৃত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। যতই আমরা উজ্জ্বলতর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করি না কেন, দুঃখের ছায়া অজ্ঞাতসারে তাহাকে মলিন করিয়া দেয়। সুখবাদের (optimism) একটি প্রবল বাধা এই যে সুখ বড় অনিশ্চিত, দুঃখের ন্যায় নিশ্চিত সংসারে আর কিছু আছে কি না সন্দেহ। সুখের সমষ্টি ও দুঃখের সমষ্টি মিলাইয়া দেখিলে সুখসমষ্টিরই আধিক্য দৃষ্ট হয়—এই ধারণাই সুখবাদের স্তম্ভ-স্বরূপ। কিন্তু সুখ ও দুঃখের "সমষ্টি" আদৌ করা যায় কি না তাহা গভীর সন্দেহের বিষয়। অতীত সুখ ও বর্ত্তমান সুখ যখন একই মাপকাঠির দ্বারা স্থিরীকৃত হইতে পারে না, অবস্থা ও কালভেদে যখন সুখ দুঃখের পরিমাণ ও প্রকৃতি অত্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়,তখন তাহাদের যোগফল তুলনা করা অসম্ভব বলিয়াই ত মনে হয়। আর একটি অতি গুরুতর কথা এই যে সুখের অনুভূতি অপেক্ষা দুঃখের অনুভূতি বোধ হয় মানব প্রকৃতিতে অত্যন্ত প্রবল। দুঃখ আমাদিগকে যত পীড়িত, ব্যথিত ও অভিভূত করে, সুখ তেমন আনন্দ দান করিতে সমর্থ নহে। সুখের মাদকতা অপেক্ষা দুঃখের তীব্রতা আমরা সমধিক অনুভব করিয়া থাকি। সেই জন্য একদিনের, এমন কি এক দণ্ডের, দুঃখ সারাজীবনের হাসিরাশিকে ম্লান ও অকিঞ্চিৎকর করিয়া দিতে পারে। সুখ বড় দুর্মূল্য, বিলাসের সামগ্রী, অনেক সাধনা করিয়া অল্প পরিমাণে সুখ লাভ করা যায়, সে সুখও আবার অনেক সময়ে দুঃখের সংমিশ্রণে বিস্বাদ হইয়া যায়। দুঃখ কিন্তু চিরস্থির, অনায়াসলব্ধ এবং অকৃত্রিম। "The still sad music of humanity"—কবির এই মর্ম্মস্পর্শী বাক্যটী একটি অতি নিষ্ঠুর সত্যের আভাসমাত্র। মানুষের জীবনের সহিত দুঃখ যে কি এক নিবিড় বন্ধনে বাঁধা আছে, তাহা যে বিধাতার বিধানে নিয়ন্ত্রিত, সেই বিধাতাই কেবল বলিতে পারেন। কোন্ অনাদি অনির্ব্বচনীয় দুঃখে এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছিল, আর কোন্ দুঃখে সমগ্র জীবের ললাটে দুঃখ লিখিত হইয়াছিল, তাহা মানবের পক্ষে চিরান্ধ যবনিকায় আবৃত। ক্ষণিকের জন্য ও যদি সে রহস্যময়ী যবনিকা অপসারিত হইত! কিন্তু তাহা হয় না। দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিয়া করিয়া যখন মানব অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন দুঃখের নবীন মূর্ত্তি মৃত্যু আসিয়া ক্লান্ত অক্ষিপংক্তি চিরমুদিত করিয়া দেয়।

জীবনের প্রভাতে দিগ্‌বলয়ের পার্শ্বে যে ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড সঞ্চিত ছিল, তাহাই প্রসারিত হইয়া দিনমানের দীপ্তিকে চিরান্ধকারে পরিণত করিয়া দেয়।

দুঃখের সহিত সংগ্রামে পরাভূত হইয়া মানুষ কখনও বিচলিত, ক্ষুব্ধ ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে, আবার কখনও সংসারের এই ক্রূর, নির্ম্মম উপহাস দেখিয়া চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করে। চিন্তা মানবের স্বাধীন বৃত্তি—সেখানে সে অনেক পরিমাণে শান্তি-লাভ করিতে পারে। সেই জন্য যখন বিশ্বের সহিত কোনও রূপে মানবের বনিয়া উঠে না, চারিদিকেই যখন লাঞ্ছনা, বেদনা, অপমান আসিয়া হৃদয়কে মথিত ও প্রপীড়িত করিয়া তুলে, তখন মানব আপনার মধ্যে সংযত হইয়া একটুখানি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। মানুষের যদি কোথায়ও কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকে, তবে তাহা এইখানে। অবশ্য চিন্তার দ্বারা দুঃখের অবসান হইতে পারে কি না এবং অনন্তকাল হইতে চিন্তা করিয়া মানব দুঃখের লাঘব করিতে পারিয়াছে কি না, তাহা ভাবিবার বিষয়। কিন্তু ইহা সত্য যে যতদিন হইতে মানুষ দুঃখভোগ করিতেছে, সেই স্মরণাতীত কাল হইতেই মানুষের চিন্তা দুঃখের স্বরূপ ও প্রতীকার নিরূপণে নিযুক্ত রহিয়াছে।

রাজকুমার শাক্যসিংহ যৌবনে এই দুঃখের বিশ্বরূপ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। জন্ম-জরা-মৃত্যু-প্রপীড়িত সংসারে সুখের আলেয়া দেখিয়া তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তাই রাজৈশ্বর্য্য ফেলিয়া সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিয়া তিনি চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার চিন্তার ফল এখনও অর্দ্ধজগৎ উপভোগ করিতেছে। "সর্ব্বং দুঃখং দুঃখং" এই সত্যের উপর তাঁহার ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিলেন।

কো নু হাসো কিমানন্দো নিচ্চং পজ্জলিতে সতি।
অন্ধকারেন ওনদ্ধা পদীপং ন গবেস্সথ। ধম্মপদ, জরাবগ্‌গো।

বাসনা দ্বেষাদি রূপ অগ্নির দ্বারা নিত্য প্রজ্বলিত এই সংসারে কিসের হাসি, কিসের আনন্দ! অন্ধকার-নিমগ্ন রহিয়াও তোমরা তত্ত্বজ্ঞান রূপ প্রদীপের অন্বেষণ করিতেছ না?

বাস্তবিকই কিসের হাসি? কিসের আনন্দ? যদি দুঃখই স্বভাবসিদ্ধ হয়, তবে কেন এ বিড়ম্বনা? কেন এ সুখের অভিনয়?

"যথা দণ্ডেন গোপালো গাবো পাচেতি গোচরং
এবং জরা চ মচ্চু চ আয়ুং পাচেন্তি পাণিনং।"

ধম্মপদ, দণ্ডবগ্‌গো।

রাখাল যেমন দণ্ডের দ্বারা তাড়না করিয়া গাভীগণকে গোঠে লইয়া যায়, তেমনই জরা ও মৃত্যু প্রাণিগণের আয়ুকে (জীবনকে) তাড়না করিয়া লইয়া যায়।

যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে দুঃখের কবল হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, সে তত্ত্বজ্ঞান বহুশ্রমলভ্য। কেবল শাস্ত্র পাঠের দ্বারা সে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। নির্ব্বাণ রূপ পরমসুখ লাভ করিতে হইলে বাসনার উচ্ছেদ-সাধন করিতে হয়। অনাদি বাসনা হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি এবং কর্ম্ম হইতে ফলের উৎপত্তি; কর্ম্মফল হইতে পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ হয়, জন্ম হইতে রোগ, শোক, জরা মৃত্যু প্রভৃতি অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা লোভ মোহ বাসনার নিরাশ হইলে কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; কর্ম্ম ক্ষীণ হইলে কর্ম্মফল বিলীন হইতে থাকে, সুতরাং জন্ম এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী সহস্র দুঃখ কষ্ট আর ভোগ করিতে হয় না। অতএব দুঃখের প্রতীকার সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধ উপদেশ করিলেন :—

"তণ্‌হায় জায়তে সোকো তণ্‌হায় জায়তে ভয়ং
তণ্‌হায় বিপ্পমুত্তস্‌স নত্থি সোকো কুতো ভয়ং?"

ধম্মপদ, পিয়বগ্‌গো।

তৃষ্ণা হইতে শোক জন্মে, তৃষ্ণা হইতে ভয় জন্মে, তৃষ্ণা হইতে বিপ্রমুক্ত ব্যক্তির শোক থাকে না, ভয় থাকিবে কেমন করিয়া?

বৌদ্ধের চিন্তাস্রোত যেমন জগতের দুঃখবেদনারাশি দূর করিয়া নির্ব্বাণের জন্য অন্তঃকরণের উর্ব্বরতা সম্পাদন করিয়া দিতে প্রবাহিত হইয়াছিল, তেমনি অন্যান্য ভারতীয় দর্শন ও দুঃখের কঠোর তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহার প্রতিবিধানকল্পে আবির্ভূত হইয়াছিল। ভগবান আদিবিদ্বান কপিল দুঃখের প্রস্তাবনা লইয়া সাংখ্যদর্শনের উদ্বোধন করিলেন :—

দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ
দৃষ্টে সাপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ।

আধ্যাত্মিক অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক দুঃখ, আধিভৌতিক দুঃখ, এবং আধি-দৈবিক দুঃখ সকল মনুষ্যকে নিয়ত তাড়না করিতেছে, এই দুঃখকে পরাভব করিবার জন্য মানব অসংখ্য উপায় অবলম্বন করিতেছে, কিন্তু তাহাতে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না অর্থাৎ নিঃশেষে পর্য্যবসান হয় না, এই জন্যই তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন। পুরুষ এবং প্রকৃতির ভেদজ্ঞানই সাংখ্যমতে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান। এই

ভেদজ্ঞান হইতেই মুক্তি। বাস্তবিক পুরুষের বন্ধন ও নাই, মোক্ষও নাই, প্রকৃতিই বন্ধন ও মোক্ষের বিষয়। পুরুষ তত্ত্বতঃ নিত্যমুক্ত, উদাসীন, এবং সাক্ষিস্বরূপ। প্রকৃতির সাহাচর্য্য পুরুষের যে দুঃখ, তাহা বিবেকবান ব্যক্তি আরোপিত বলিয়াই জানেন। অনুচরগণের জয় পরাজয় যেমন সেনাপতিতে বর্ত্তে, সেইরূপ প্রকৃতির সুখ দুঃখ পুরুষে বর্ত্তে। "বন্ধমোক্ষসংসারাঃ পুরুষে উপচর্য্যন্তে যথা জয়পরাজয়ৌ ভৃত্যগতাবপি স্বামিন্যুপচর্য্যেতে তদাশ্রয়েণ ভৃত্যানাং তদ্ভাগিত্বাৎ তৎফলস্য চ শোকলাভাদেঃ স্বামিসম্বন্ধাৎ ভোগাপবর্গয়োশ্চ প্রকৃতিগতয়োর-বিবেকগ্রহাৎ পুরুষসম্বন্ধ উপপাদিত ইতি।" তত্ত্বকৌমুদী।

তত্ত্বানুশীলনের দ্বারা "আমি পুরুষ, আমি ভোক্তা বা কর্ত্তা নহি, আমার স্বামিত্ব নাই," এইরূপ যে জ্ঞান হয়, তাহাই বিশুদ্ধ বিমল তত্ত্বজ্ঞান। প্রকৃত জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, অন্যপ্রকার জ্ঞান অজ্ঞানমাত্র। "তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ জ্ঞানমতোঽন্য-মিথ্যাজ্ঞানমজ্ঞানমেব।" (ভামতী)। একবার তত্ত্বজ্ঞান হইলে প্রকৃতির খেলা সাঙ্গ হইয়া যায়, পুরুষকে আর তখন প্রকৃতি বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। পুরুষের সুখদুঃখভোগরূপ যে অভিনয় তাহা নিবৃত্ত হইয়া মোক্ষলাভ হয়।

"রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ।"
সাংখ্যকারিকা।

দর্শকদিগের নিকট নৃত্য দেখাইয়া যেমন নর্ত্তকী নিবৃত্ত হয়, তেমনই প্রকৃতি পুরুষের নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করিয়া প্রবৃত্তি হইতে বিরত হইয়া থাকেন।

চৈতন্য-বিশিষ্ট নিষ্ক্রিয় পুরুষ দুঃখের অতীত। অচেতন, জড়-প্রধান অথবা প্রকৃতিই দুঃখের আলয়। কারণ প্রবৃত্তি হইতে দুঃখের জন্ম। পুরুষের ত কোন ও প্রবৃত্তি নাই, সুতরাং পুরুষের দুঃখ কল্পিতমাত্র। প্রশ্ন হইতে পারে অচেতনের অবার প্রবৃত্তি কি? তদুত্তরে বলা যায়, বৎসের জন্য অচেতন দুগ্ধের যেমন স্বতঃ ক্ষরণ প্রবৃত্তি আছে, অচেতন প্রকৃতির ও তেমনই মোক্ষের জন্য প্রবৃত্তি স্বীকার করিতে বাধা কি?

জার্ম্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার ও জগতের দুঃখ ক্লেশের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে গিয়া এক অচেতন প্রবৃত্তির (blind irrational will) অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। অচেতন অন্ধ প্রবৃত্তি হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, কাযেই জগতে দুঃখের আতিশয্য। দুঃখই জীবের স্বাভাবিক অবস্থা, সুখ দুঃখের অভাবমাত্র। (প্লেটোর মত ও এইরূপ।) বাঁচিয়া থাকিবার অন্ধ

বাসনা হইতেই অসংখ্য দুঃখের সৃষ্টি। জীবন এক প্রকাণ্ড মরীচিকামাত্র "প্রখর মার্ত্তণ্ডদগ্ধ নিরবচ্ছিন্ন মধ্যাহ্নের মত ঊষর এই সংসার" জন্মই দুঃখের আকর; সুখদুঃখ বিরহিত নির্ব্বাণই এক মাত্র কামনার বস্তু। শোপেন হাওয়ার বৌদ্ধ মতের প্রতি পক্ষপাতী ছিলেন।

শোপেনহাওয়ারের শিষ্য হার্টমান তাঁহার আচার্য্যের ন্যায় দুঃখকেই সারতত্ত্ব বলিয়া মানিয়াছিলেন এবং দুঃখের নিবৃত্তিকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মতে জগতের মূল প্রবৃত্তি একান্ত অচেতন নহে। চৈতন্যের সহিত প্রবৃত্তির মিলনই হার্টমানের চিন্তার মুখ্য ফল। তাহা হইলেও হার্টমান বৈদান্তিকের ন্যায় জগৎকারণকে প্রথম হইতেই সচেতন বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে প্রবৃত্তি প্রথমে অচেতন ছিল। সেই অচেতন প্রবৃত্তি হইতে সৃষ্টির আরম্ভ; কিন্তু সৃষ্টি প্রক্রিয়া আরম্ভ হইতেই চৈতন্যের আবির্ভাব হইল। চৈতন্য আবির্ভূত হইয়া জগৎকে নানাপ্রকারে শৃঙ্খলাসম্পন্ন ও সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিল। সেই চেষ্টার ফলে জগতের কার্য কারণ পরম্পরার মধ্যে অনেক সময়ে একটি সচেতন প্রেরণা দেখিতে পাওয়া যায়। চেতনা রূপ জননী এবং কাম (প্রবৃত্তি) রূপ জনক হইতে জগতের প্রসব হইয়াছে, প্রসবের পরে চেতনা গুণবতী মাতার ন্যায় গর্ভজাত সন্তানকে নানা উপকরণে সাজাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু প্রবৃত্তির যে উদ্দাম অন্ধ প্রকৃতি, তাহা যাইবে কোথায়! কাযেই জগতের অসম্পূর্ণতা স্বাভাবিক এবং দুঃখ ও অনিবার্য্য। প্রবৃত্তির যখন বিনাশ হইবে, দুঃখের তখন অস্ত হইবে। যেহেতু প্রবৃত্তি হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, প্রবৃত্তির বিনাশ হইলে জগৎ ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। সেই পরম নির্ব্বাণই একমাত্র কামনার বস্তু।

সৃষ্টির মূল যে প্রবৃত্তি, তাহাকে গয়টে ও অচেতন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন সৃষ্টির আদিতে "কর্ম্ম" ছিল ("Im Anfang war die That" Faust) এই কর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রথমে অচেতন ছিল। (বৌদ্ধেরা বলিতেন "অবিদ্যা হইতে বাসনার জন্ম।") গাভীর ক্ষীর যেমন অচেতন হইলে ও বৎসের জন্য প্রবাহিত হয়, তেমনই এই কর্ম্ম-প্রবণতা অজ্ঞাতসারেই তত্ত্বজ্ঞানের অভিমুখে প্রবর্ত্তিত করিতেছে।

তত্ত্বজ্ঞান যে দুঃখ নিবৃত্তির এক মাত্র উপায়, ইহা হিন্দু ও বৌদ্ধ দার্শনিকেরা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। এই বিষয়ে খৃষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত এ দেশীয় চিন্তার কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হয়। বাইবেলে যে মৌলিক পাপের বর্ণনা

আছে, তাহা হইতে মনে হয় যে মানুষ সেই নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বে সুখে স্বচ্ছন্দে ছিল; পরে প্রবৃত্তির প্রেরণায়ই হউক আর চিরাপরাধিনী স্ত্রী জাতির পরামর্শেই হউক, সেই ফলের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া মৃত্যু ও দুঃখভোগের অভিসম্পাত লাভ করিল। খৃষ্টান শিক্ষকগণ জন্মান্তর বাদ ও কর্ম্মফলের তত্ত্ব বুঝিতে পারেন না, বলেন যে এক জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত অপরজন্মে কিরূপে হইবে? বিশেষতঃ যখন পূর্ব্ব জন্মের পাপের স্মৃতি পর্য্যন্ত পরজন্মে থাকে না। কিন্তু তাঁহাদের অনেকেই অবলীলাক্রমে এই মৌলিক পাপের তত্ত্ব (Theory of Original Sin) মানিয়া আসিতেছেন। এক জনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিরপরাধ ভবিষ্যবংশীয়েরা কেন করিবে তাহা বুঝিয়া উঠা সহজ নহে। পিতার ধাতুগত দোষ যে পুত্রে বর্ত্তে, সেই তত্ত্বই বিধাতার ন্যায়-বিচারের সহিত মিলাইয়া উঠা কঠিন; তাহাতে একজনের দোষে যে অনন্ত কাল ধরিয়া সমগ্র মানব জাতি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মরিবে, ইহা বুঝা আর ও কঠিন ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। তারপর এই ফলভক্ষণব্যাপারকে যদি রূপক বলিয়া কল্পনা করা যায়, এবং ফলকে জ্ঞান-বৃক্ষের ফল বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে জ্ঞানলাভই দুঃখের কারণ। এক দিক দিয়া দেখিলে কথাটী ঠিক। জ্ঞান না থাকিলে সুখ-দুঃখের অনুভূতি হয় না। মনুষ্য ও নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে অনুভূতি বিষয়ে প্রভেদ এই যে পশু-পক্ষিগণ যন্ত্রণা অনুভব করে মাত্র (কোন কোন দার্শনিক তাহাও স্বীকার করেন না), মানুষ জ্ঞানের দ্বারা আপনার অবস্থা, দুঃখের প্রকৃতি ও পরিমাণ বুঝিতে পারে। চিন্তার দ্বারা তাহার অশ্রু-রাশি সে শতগুণে বাড়াইয়া লয়। কিন্তু যে জ্ঞানের দ্বারা দুঃখকে দুঃখ বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহা অনুভবমাত্র। প্রকৃত জ্ঞান তাহা নহে; প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী মৃত্যু হইতে অমৃতে উপনীত হয়েন।*

সংসার দুঃখময়, ইহা বৈরাগ্যের মূল সূত্র। এই বৈরাগ্য হইতেই প্রবৃত্তির উচ্ছেদ হয়। প্রবৃত্তি অনন্ত দুঃখের আকর। সেই জন্যই হিন্দু দর্শনে দুঃখ বাদের আতিশয্য। দুঃখবাদের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম-প্রবণতার মূল প্রস্রবণকে জমাইয়া তুষারে পরিণত করা বোধ হয় তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। চরিত্রনীতি যদি হিন্দু দর্শনের মূল ভিত্তি হয়, তবে দুঃখের এক বিরাট মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া সংযম ও সাধনার অভ্যাস করিবার চেষ্টা বর্ত্তমান সুখবাদের যুগেও যে মূল্য

* অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে। শ্রুতিঃ।

বিহীন এ কথা বলা যায় না। দুঃখের মধ্য দিয়া চরিত্রের অগ্নি পরীক্ষা হয়।† সংসারে যে সুখ নাই একথা বোধ হয় হিন্দুদর্শনকার বলিতেন না।

"ন সুখস্যান্তরাণনিষ্পত্তেঃ।" গৌতমসূত্র ৪র্থ অধ্যায় ১ম আঃ।

সংসারে যে সুখ নাই, একথা বলা মহর্ষি গৌতমের অভিপ্রেত নহে। দুঃখ-চ্ছায়া সমাচ্ছন্ন সংসারে সুখের আলোক ক্ষণিক ও অনিশ্চিত, ইহা জানিয়াই ঋষিগণ বৈরাগ্যের উপদেশ করিতেন। সুখের জন্য লালসা না থাকিলে যদি জীবনে দুঃখও আসে, তাহা হইলেও তাহা সহ্য করা সহজ হইবে এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা বলিয়াছেন,

ন তদ্ব্যবস্থিতং পুংসাং ন তৎকর্ম্ম ন তদ্বচঃ
ন তদ্ভোগঃ সমস্তীহ যন্ন দুঃখায় কল্প্যতে।

তদিদং সর্ব্বং দুঃখং ভাবয়মানো বিরজ্যতে বিরক্তো বিমুচ্যত ইতি। ন্যায়-দর্শন।

ইহ জগতে আমাদের এমন কিছু নাই যাহা দুঃখাত্মক নহে। অতএব সমস্তই দুঃখমূল ইহা ভাবিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন কর। বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে মনে বৈরাগ্য উদিত হয় এবং বৈরাগ্যই নিশ্রেয়সলাভের একমাত্র পন্থা।

বেদান্তের মতেও তত্ত্বজ্ঞানই দুঃখনিবৃত্তির মুখ্যতম সাধন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এখানে একটু বিশেষত্ব দৃষ্ট হয় এই যে আত্মার মুক্তির জন্য জ্ঞানই একমাত্র ফলোপধায়ক। মোক্ষ বিষয়ে অন্য কোনও ব্যাপার, অনুষ্ঠান বা ক্রিয়ার অপেক্ষা নাই। যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে মুক্তির পথে বিশেষ অগ্রসর হওয়া যায় না; "নিঃশ্রেয়সফলন্তু ব্রহ্মজ্ঞানং ন চ অনুষ্ঠানান্তরাপেক্ষং।" শাঙ্কর ভাষ্য। তবে শমদমাদিসাধনসম্পৎ এবং মোক্ষের জন্য আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকার জন্মে না। কর্ম্মকাণ্ড প্রাথমিক সোপান মাত্র। সংসারানল দগ্ধ হইয়া শান্তির সলিলে নিমজ্জন করিবার জন্য জীব যখন আকুল হয়, তখনই তাঁহাকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করিতে হইবে। (বেদান্তসার) ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে বৈরাগ্য উপস্থিত না হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার জন্মে না।

† Suffering is not only the postulate whence our moral nature starts, it is also the discipline through which it gains its true elevation"—Martineau's Study of Religion Vol. II, P. 94.

নিত্যানিত্যবিবেকের নাম তত্ত্বজ্ঞান। ব্রহ্মই নিত্য, আর সমস্তই অনিত্য। জীবাত্মার সহিত পরব্রহ্মের যে ভেদজ্ঞান তাহা অলীক, কল্পিত, অবিদ্যা-জনিত। অবিদ্যা দূর হইলে ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভিন্নত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানই মোক্ষ। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানই পরমপুরুষার্থ। "বিগলিত-নিখিলদুঃখানুষঙ্গপরমানন্দঘনব্রহ্মাবগতির্ব্রহ্মণঃ স্বভাব ইতি সৈব নিশ্রেয়সং পুরুষার্থঃ"।—ভামতী। "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"। ব্রহ্মের স্বরূপ সৎ, চিৎ এবং আনন্দ। দুঃখানুষঙ্গলেশবিহীন যে চিৎস্বরূপ আনন্দ সেই আনন্দই ব্রহ্ম। জীব যখন তাহার ব্যবহারিক সত্তাকে পরমার্থতত্ত্বে বিলীন করিয়া দিতে পারে, যখন তাহার আমিত্বের অভিমান দূর হইয়া এক বিরাট সর্ব্বব্যাপী নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-স্বভাবে নিমজ্জিত হয়, তখন তাহার মোহজাল, তাহার দুঃখরাশি অপসারিত হইয়া যায়। তত্ত্বজ্ঞানলাভের আর একটি ফল এই যে দেহকে আত্মা বলিয়া যে ভ্রম মানবের মনে বদ্ধমূল রহিয়াছে, দেহেন্দ্রিয়াদির সুখদুঃখ লইয়া তাহার যে অভিমান তাহাকে ইতস্ততঃ ধাবিত করিতেছে, তাহা বিদূরিত হয়।

চার্ব্বাকেরা বলেন দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই,

"দেহে স্থৌল্যাদিযোগাচ্চ স এবাত্মা ন চাপরঃ।"

"আমি স্থূল", "আমি কৃশ" এইরূপ উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে দেহ এবং আত্মা অভিন্ন"। সুতরাং চার্ব্বাকগণের মতে দেহের সুখই আকাঙ্ক্ষার বস্তু যদি তাহাতে দুঃখের মিশ্রণ থাকে, তায় ক্ষতি কি? কোন মূর্খ তুঁষের সদ্ভাব আছে বলিয়া তণ্ডুল আহরণে বিরত হয়? (চার্ব্বাক দর্শন) ইউরোপে এপিকিউরাসের শিষ্যগণও ক্ষণিক সুখের অনুসরণকেই সারনীতি বলিয়া মানিয়াছিলেন। চার্ব্বাক ও এপিকিউরাস উভয়ের এই সুখবাদের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন অতিমাত্র ব্যস্ততা লক্ষিত হয়। যেমন করিয়া হউক জীবনকে উপভোগ করিয়া লও, এই যে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তটি তাহার সুখদুঃখ লইয়া তোমার নিকট আসিয়াছে, ইহা এখনই চলিয়া যাইবে, আর ফিরিয়া আসিবে না; অতএব ইহার সুখটুকু লুটিয়া লইতে ভুলিও না। পরমুহূর্ত্তে তোমার ভাগ্যে কি আছে কে বলিবে? ওমর খাইয়মের কবিতার মধ্যে যেমন একটি দুঃখের সকরুণ তান রহিয়াছে, দুর্দ্দমনীয় সুখলিপ্সার নিম্ন দিয়া যেমন দুঃখের অন্তঃ-সলিল বহিয়া যাইতেছে, তেমনই এই সকল দার্শনিকগণ সুখ সুখ করিয়া জগতের দুঃখবাহুল্যকে আরও স্পষ্টতর করিয়া তুলিয়াছেন। হাসিতে গিয়া তাঁহাদের নয়নপংক্তি আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। দেহের সুখ দুঃখ লইয়া যাহারা

ব্যস্ত, তাহারা সুখ খুঁজিতে গিয়া দুঃখ আহরণ করিয়া ফিরিয়া আসে। বাসনার তৃপ্তিই জীবনের সমস্ত সুখের নিলয় মনে করিয়া তাহারা বাসনারূপ মরীচিকার দিকে ধাবিত হয়! ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি। কাজেই বাসনার অনলশিখা আরও দাহ করিতে থাকে। সুখান্বেষী এপি-কিউরীয়গণও ইহা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিয়াছিলেন, এবং বাসনাকে দমন করিবার বিধিমত উপদেশ প্রদান করিতে তাঁহারা ভুলেন নাই। মুহূর্ত্তের সুখ অপেক্ষা সমগ্র জীবনের ঘনীভূত সুখ যে শ্রেয়স্কর, তাহাও তাঁহারা উপদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু গোড়ায় যে ভুল রহিয়া গেল,—অর্থাৎ প্রবৃত্তির চরি-তার্থতাই সুখ—সেই ভুলের ফলে তাঁহাদের উপদেশ এক অস্বাভাবিক, জঘন্য স্বার্থবাদে পরিণত হইয়াছে।

বেদান্ত দেহ এবং আত্মাকে সেই জন্য সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দৈহিক তৃপ্তিকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। দেহে যে আত্মার অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রমাত্মক কল্পনা হয়, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়। আকাশে যেমন প্রাকৃতজন নীলকান্তির আরোপ করে, অবিদ্যাশ্রিত ব্যক্তি সেইরূপ দেহকেই "আমি" পদবাচ্য বলিয়া মনে করে। আত্মার স্বরূপ জানিলে এই অধ্যাস দূর হইয়া যায়, তখন আর অনিত্য দেহের দুঃখে লোকে সন্তপ্ত হয় না। তখন রোগশোক মৃত্যুর অতীত হইয়া আত্মা আপনার আনন্দঘন স্বভাবে তৃপ্তি লাভ করেন। আত্মা অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য, অজর, অমর, শীতোষ্ণ-সুখদুঃখাদির অতীত। (ভগবদ্‌গীতা) এই অদ্বৈত, আত্মতত্ত্বের দ্বারা বেদান্ত মরজীবনের দুঃখকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য ষ্টোয়িক (Stoic) দার্শনিকগণ জ্ঞানী পুরুষের (Theory of the Wise man) আদর্শ স্থাপন করিয়া বেদান্তের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী, যিনি পৃথিবীর সুখদুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীন। দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। এইরূপ চরিত্রই আদর্শচরিত্র। পৃথিবীতে দুঃখ অসংখ্য, অজস্র; কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইলে দুঃখেরই জয় হইবে; জ্ঞানী ব্যক্তি পার্থিব সুখদুঃখকে গ্রাহ্য করেন না। বেদান্তের ন্যায় ষ্টোয়িকগণও অদ্বৈতবাদী। সমস্ত বিশ্বচরাচর অনন্ত চিৎশক্তির (Logos) দ্বারা অনুপ্রাণিত। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ টিণ্টারণ অ্যাবে নামক কবিতায় এই সর্ব্বব্যাপী সত্তার একখানি সুন্দর ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। বিশ্বনিয়ন্তৃশক্তি (Pneuma) সূর্য্যলোকে অবস্থিতি করেন, ইহাও ষ্টোয়িকগণ কল্পনা করিতেন।

চৈতন্যস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সৃষ্ট বিশ্বে দুঃখ ও পাপ কেমন করিয়া আসিল, তাহারও একটা মীমাংসা করিবার জন্য ষ্টোয়িকগণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে অনেক দুঃখই প্রকৃতপক্ষে অমঙ্গল নহে। অনেকস্থলে দুঃখ মঙ্গলের নিদান। যেমন যুদ্ধ। যুদ্ধে লোকক্ষয় হয় বলিয়া পৃথিবী অত্যধিক জনাকীর্ণ হইতে পারে না। যে সকল স্থলে দুঃখকে এরূপভাবে উড়াইয়া দেওয়া যায় না, সেরূপ স্থলে ষ্টোয়িকগণ স্বীকার করেন যে জগতের অসম্পূর্ণতাই (Imperfection) দুঃখ ক্লেশের জননী। সমস্ত জাগতিক ক্রিয়া ও প্রণালী সাধারণ বিধিসমূহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই সকল সাধারণ নিয়ম ব্যক্তিবিশেষের অপেক্ষা করে না। সুতরাং সাধারণতঃ সমগ্রের পক্ষে যাহা মঙ্গলাস্পদ অংশের পক্ষে বা ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে তাহা মঙ্গলাস্পদ না হইতেও পারে। এই অসম্পূর্ণতার জন্যই জগতে দুঃখকষ্টের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক ইংরেজ দার্শনিক মার্টিনোর মতও এইরূপ। সুখদুঃখকে অগ্রাহ্য করিয়া যিনি কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সুখী। পাশ্চাত্য জগতে ষ্টোয়িকগণই কর্ত্তব্যবুদ্ধির (conception of Duty in the abstract) প্রবর্ত্তক।

ষ্টোয়িকগণ বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে আস্থাবান হইলেও দুঃখের উপলব্ধিকে একেবারে বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। চতুর্দ্দিকে দুঃখের অস্তিত্ব দেখিয়া তাঁহারা আমোদপ্রমোদকে সর্ব্বদা দূরে রাখিতেন। "মধুবিষমিশ্রিত অন্ন খাইতে গিয়া এমন কে শিল্পিবর আছেন যিনি বিষভাগ পরিত্যাগ করিয়া মধুভাগ গ্রহণ করিতে পারেন?" এই গম্ভীরপ্রকৃতিক ষ্টোয়িকগণের মধ্যে কেহ কেহ আত্মহত্যার সমর্থন করিতে ও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। রোগশোক দুঃখ যখন একেবারে চারিদিক হইতে ঘনাইয়া আসে, জীবন যখন যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠে, তখন সে দুঃখ নিবারণ করিবার ক্ষমতা সকলেরই আছে। আত্মবিনাশের মহান্ অধিকার ভগবানই আমাদের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন, আত্মহত্যার দ্বারা দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার এই চরম অধিকার মানবের শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা। (এপিক্‌টেটস্)। দুঃখতত্ত্বের মীমাংসায় ব্যাপৃত হইয়া ষ্টোয়িকদিগের চিন্তা এই অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক ফল প্রসব করিয়াছিল।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই বিস্তৃত প্রবন্ধের উপসংহার করিব। দুঃখতত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়া দার্শনিকগণ কখনও কখনও দুঃখকে একেবারে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন

যে দুঃখ পারমার্থিক নহে। আমাদের ভাবনাই সুখদুঃখের জন্য দায়ী। আমাদের চিন্তার দ্বারা আমরা একটি ঘটনাকে সুখাত্মক বা দুঃখাত্মক রূপে দেখিতে পারি। যখন আমার পায়ের আঙ্গুল কাটিয়া গিয়াছে, তখন আমি ইচ্ছা করিলে ইহাকে সুখ বা দুঃখের প্রযোজক বলিয়া মনে করিতে পারি। শারীরিক যন্ত্রণায় যখন আমি অস্থির হইতেছি, তখন আমি মনে করি, যে আমার নিতান্তই দুরদৃষ্ট, আমি সংসারে কেবল কষ্ট ভোগ করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, হয়ত এই ক্ষত বিষাক্ত হইয়া উঠিয়া অচিরে আমার ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া দিবে, তাহা হইলেই আমার পুত্রকন্যাদির মুখদর্শনে আমাকে চিরজন্মের মত বঞ্চিত হইতে হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি......, এইরূপ চিন্তা মনে উদিত হইলে আমার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিবে, আমি নিশ্চয়ই চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিব, এবং জীবনে অভিসম্পাত না করিয়া থাকিতে পারিব না। আর যদি মনে করি, আমার সামান্য পায়ের আঙ্গুল কাটিয়া গিয়াছে বইত নয়, আর একটু হইলে আরও গুরুতর ক্ষতি হইত, এমন কি জীবনসংশয় হইতে পারিত। সামান্য আঘাত অল্প দিনেই ভাল হইয়া যাইবে, যাহারা চিরকালের জন্য উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়িয়া আছে, তাহারা কি দুর্ভাগ্য! এইরূপ চিন্তা করিলে দুর্ঘটনার লঘুত্বের জন্য ও নিজের শুভাদৃষ্টের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। নিজের ইচ্ছার উপর যখন সুখদুঃখ নির্ভর করে, তখন প্রকৃতপক্ষে সুখদুঃখের স্বতন্ত্র সত্তা কোথায়? (জেম্‌স্ হিণ্টন)

"শব্দাদ্যবিশেষেঽপি চ ভাবনাবিশেষাৎ সুখাদি বিশেষোপলব্ধেঃ।"

(শাঙ্কর ভাষ্য ২ অঃ ২ পাঃ ২ সূঃ)

একই শব্দ, একই স্পর্শ, একই রূপ কেবল ভাবনার পার্থক্য অনুসারে কাহারও কিছুতে সুখ, কাহরও কিছুতে দুঃখ হইয়া থাকে। কিন্তু সুখদুঃখ যে কেবল মানবের কল্পনার উপর নির্ভর করে, বস্তুতঃ তাহাদের কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

যাহা হউক, দুঃখের অস্তিত্ব যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে আর একটা প্রশ্ন আসিয়া পড়ে; তাহার মীমাংসা জগতের ধর্ম্মতত্ত্বের একটি বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া আছে; আমি পূর্ব্বেই স্থানে স্থানে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি, সুতরাং উপসংহারে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আর দুই একটি কথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এ জগতে দুঃখ কেন?

এই প্রশ্নের সমাধান করিতে আস্তিক দার্শনিকগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এত দুঃখক্লেশের সহিত এক পরমকারুণিক ভগবানের ধারণার সামঞ্জস্য রক্ষা করা অনেকস্থলে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। পাপস্পর্শশূন্য শিশুরা যখন বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় ঝরিয়া পড়ে, সংসারের একমাত্র অবলম্বন, অন্ধের নয়ন পুত্র যখন অনাথা জননীকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যায়, ভূমিকম্পে, ভীষণ ঝটিকায়, বা জলপ্লাবনে সহস্র সহস্র লোক হাহাকারে গগন বিদীর্ণ করিয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন আমরা অশ্রুসিক্ত নয়নে কেবল ভগবানের করুণার দিকে চাহিয়া সান্ত্বনালাভ করিতে পারি না। যিনি বিশ্বাসী, তিনি অবশ্য গভীর বিশ্বাসের বলে মনে করিতে পারেন যে ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে এসবই ভাল। কিন্তু এরূপ একান্তবিশ্বাস-সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্তই বিরল। অবশ্য যাহারা আমাদের অল্পবুদ্ধিতার দোহাই দিয়া জগতের যাবতীয় দুঃখক্লেশ ও নিষ্ঠুর ব্যাপারকে সমর্থন করিতে চাহেন, তাঁহাদের বিনয় ও নির্ভর উভয়ই বিস্ময়জনক। তাঁহারা বলিবেন, এ সকলই মঙ্গলের জন্য, কেবল আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি সমস্ত বিষয় বুঝিতে সমর্থ নহে। সসীম কি অসীমকে ধারণা করিতে পারে? খদ্যোতের আলোক দেখিয়া মধ্যাহ্নসূর্য্যের জ্যোতিঃ মাপিতে চাহ? এইরূপ দীনতার ভাব লইয়া যাঁহারা জাগতিক মঙ্গলে আস্থাবান, তাঁহাদের বিশ্বাস অসীম। এরূপ বিশ্বাসীর সংখ্যা ও বেশী নাই বলিয়া বোধ হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে খৃষ্টানগণ এই দুঃখনিচয়ের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া এক মৌলিক পাপের কল্পনা করিয়াছেন। স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা মহাশয়ও নিরন্তর মনুষ্যকে পাপের দিকে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত আছেন। পাপই দুঃখের মূল; দুঃখের ফলভোগ করিতেই হইবে, সেইজন্য নরনারায়ণ অথবা নরদেবতা খৃষ্ট (Man in God, God in man—Tennyson) সমস্ত মানবের দুঃখের ভার স্কন্ধে লইয়া অতি নিষ্ঠুর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার ললাটে সেই কণ্টক কিরীটি যে স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহার কনককিরণে সহস্র সহস্র মানবের হৃদয় আজিও পুলকিত ও মহিমান্বিত। খৃষ্টানদিগের স্বর্গ নিরবচ্ছিন্ন সুখের আলয়। সংসারের নির্ম্মম কশাঘাতে কাতর মানব পরলোকে সমস্ত অত্যাচার ও অবিচারের প্রতীকার আশা করে। পুত্রশোকাতুরা মাতা, স্বামিবিয়োগ বিহ্বলা পত্নী স্বর্গে গিয়া পুত্র ও পতির দর্শন কামনা করে। হিন্দু দার্শনিকগণের সহিত খৃষ্টানগণের এইখানে একটু

প্রভেদ আছে। পৌরাণিকগণ যদিও বিবিধ সুখের উপাদানে তাঁহাদের স্বর্গকে সাজাইয়া লন—দিব্যস্ত্রীকরচারুচামরবীজন হইতে উর্ব্বশী তিলোত্তমার নৃত্যগীতাদির উপভোগ কিছুই বাদ দেন নাই, তাহা হইলেও দার্শনিকগণ এই স্বর্গকে দুঃখানুষঙ্গবিহীন বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা এই স্বর্গের জন্য লালায়িত নহেন। পরলোকে গিয়া পুত্রকলত্রাদির সহিত মিলিত হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিব এরূপ চিন্তা তাঁহাদের নাই। পুত্রকলত্রাদির সহিত যে বন্ধন, তাহা মায়ার খেলা মাত্র মনে করিয়া নিষ্ঠাবান হিন্দু ইহলোকেই সে সকল হইতে বিমুক্ত হইতে চেষ্টা করেন। ইহলোকের অনিত্য সুখ কল্পনা তাঁহারা পরলোক পর্য্যন্ত বহিয়া লইয়া যান না।

খৃষ্টানগণ যেমন দুঃখ ও পাপের জন্য ঈশ্বরাতিরিক্ত এক স্বতন্ত্র কারণের কল্পনা করিয়াছিলেন, অন্যান্য ধর্ম্মেও সেরূপ কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। আবেস্তার সৎ ও অসৎ, আলোক ও অন্ধকার (অহুরমসদ্ ও আরিমান) এই দুই প্রকার দেবতার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

হিন্দু দার্শনিকগণ এইরূপ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। যে তত্ত্বজ্ঞানকে তাঁহারা পুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, (সক্রেতিস ও বলিতেন ধর্ম্ম এবং তত্ত্বজ্ঞান অভিন্ন—Virtue is knowledge), সেই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা তাঁহারা দুঃখের কারণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে হিন্দুদর্শনে জন্মান্তরবাদের এবং কর্ম্মফলবাদের আবির্ভাব হইল। যে অসংখ্য দুঃখক্লেশ সংসারকে ভয়াকুলিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার হেতু এ জন্মে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন, এজন্য জন্মান্তরের কল্পনা আবশ্যক হইয়া উঠে। কর্ম্মচক্র নিয়ত ঘূর্ণ্যমান, সুখদুঃখ সেই কর্ম্মচক্রের নেমী মাত্র। সেই কর্ম্মচক্রের আবর্ত্তনে পুনঃপুনঃ জীবকে সংসারে আসিতে হয়। যে দুঃখ এজন্মে অসহ্য বোধ হইতেছে, তাহা পূর্ব্বজন্ম বা প্রাক্তনের ফল মনে করিয়া শান্ত হও। কর্ম্মোচ্ছেদের চেষ্টা কর, তাহা হইলেই সংসার বন্ধন খসিয়া পড়িবে। যদি কর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিতে চাও, কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা করিও না; নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিলে, (Kant's Categorical Imperative—নিরপেক্ষ বিধি) কর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখদুঃখকে উপেক্ষা করিলে (Stoic Indifference), বাসনার কটাহে দগ্ধ হইতে হয় না। সুখ দুঃখের অতীত জীব মোক্ষপন্থায় আরূঢ় হইয়া একমাত্র ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করেন ("মামেকং শরণং ব্রজ" গীতা)।

অনেকে বলেন যে সংসারকে যাঁহারা অনিত্য মনে করেন তাঁহারা সকলেই দুঃখবাদী এবং এই জন্যই ভারতীয় অদ্বৈতবাদ দুঃখবাদের সহিত জড়িত। আমাদের যে অলসতাও অসাড়তা, তাহাও এই অদ্বৈতবাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হয়। অবশ্য অদ্বৈতবাদ আত্মাভিমানকে খর্ব্ব করিয়া যে কর্ম্মনিষ্ঠাকে সঙ্কুচিত করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মানুষ দুঃখের কশাঘাতেই ইতস্ততঃ ধাবিত হয় এবং যতই সে সুখকে স্পৃহনীয় ও নিজের আয়ত্ত বলিয়া মনে করে ততই তাহার কর্ম্ম প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হয়। বোধ হয় দুঃখের তাড়না এবং পুরুষকারাশ্রয়ই পাশ্চাত্য জগৎকে এত কর্ম্মময় ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে অদ্বৈতবাদ ও নিষ্কাম কর্ম্মোপদেশের দ্বারা ভগবান অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিলেন, তাহাই আমাদের মধ্যে অলসতা আনিয়া দিয়াছে! অদ্বৈতবাদ দুঃখবাদকে আশ্রয় করিয়া জন্মে নাই জগতের দুঃখ বিমিশ্রিত ক্ষণস্থায়ী সুখের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া অদ্বৈতবাদী এক উজ্জ্বলতর অনাবিল চিরন্তন সুখের কামনা করিয়াছিলেন। ক্ষণিক সুখবাদের তুলনায় ইহাকে নিত্যসুখবাদ বলিতে পার, কিন্তু ইহাকে দুঃখবাদ বলিলে সঙ্গত হইবে না।

যাহা হউক, দুঃখের তত্ত্বমীমাংসায় মানবের এত যে ঐকান্তিক প্রযত্ন তাহা কতদূর সফল হইয়াছে? দুঃখ কি কমিয়াছে? যেস্থানে মরুভূমি ছিল, সেস্থান কি পুষ্পের উদ্যানে পরিণত হইয়াছে? এপ্রশ্নের কোনও তাত্ত্বিক (theoretical) উত্তর দেওয়া সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। দর্শনশাস্ত্র যে ভাবেই এ প্রশ্নের মীমাংসা করুক না কেন, ব্যবহারতঃ এ মীমাংসার জন্য কেহ অপেক্ষা করে না। সংসারের স্রোত এক মুহূর্ত্তও এ মীমাংসার জন্য দাঁড়াইয়া নাই। সাধারণ দৃষ্টিতে লোকে সহজেই বুঝিয়া লয় যে সংসারে যত আসক্ত হওয়া যায়, ততই উর্ণানাভে মক্ষিকার মত আরও আবদ্ধ হইয়া পড়িতে হয়; দুঃখের বোঝা ততই বাড়ে। স্বার্থকে যত বড় করিয়া দেখা যায়; ততই প্রকৃত মঙ্গল দূরে চলিয়া যায়। মানুষ আপনার লাভ খুঁজিতে গিয়া কেবল কণ্টকের বোঝা মাথায় করিয়া লইয়া আসে।

ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। ছান্দোগ্য ৭।১৩

আনন্দ পাইতে হইলে ভূমানন্দের অনুসন্ধান করিবে, অল্পে সুখের তৃষ্ণা কখনও মিটে না।*

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

---

* সাহিত্য পরিষদে পঠিত।

মৃত্যু-মিলন।

নবম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বিপদ।

পত্রবাহকদিগকে পাঠাইয়া রাজা একবার কক্ষের সম্মুখে মুক্ত অলিন্দে আসিলেন। উপরে আকাশ নক্ষত্র-খচিত; চারিদিকে স্নিগ্ধ সুপ্তি। রাজার মনে হইল, জীবনে এইরূপ স্নিগ্ধ সুপ্তি কবে আসিবে? অন্ধকারে—মেঘাবৃত গগনের এক প্রান্তে একটি ক্ষীণজ্যোতি তারকার আলোকের মত আশা তাঁহার হৃদয়েও লক্ষিত হইল। তিনি কক্ষে প্রত্যাগত হইলেন।

তখন অতিরিক্তশ্রান্তিজনিত অবসাদ অনুভূত হইল। রাজা বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল; তিনি শয়ন করিলেন—তাহার পর অল্পক্ষণের মধ্যেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

কক্ষের দ্বার ও বাতায়ন মুক্ত ছিল; প্রভাতের প্রথম আলোক ফুটিতে না ফুটিতে গৃহ আলোকিত হইল। রাজা জাগিয়া মন্ত্রীকে ও সেনাপতিকে আসিতে সংবাদ দিলেন।

মন্ত্রী ও সেনাপতি আসিলে রাজা তাঁহাদিগের সহিত আবশ্যক পরামর্শ করিলেন। রাজার নিকট সকল কথা শুনিয়া উভয়েরই মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। এ বিপদের সম্ভাবনা ছিল সত্য, কিন্তু এত সত্বর যে এ বিপদ ঘটিবে, তাহা কেহই মনে করেন নাই।

রাজা বলিলেন, "আমি জানিতাম, এ বিপদ অনিবার্য্য; আমি মোগলের স্বভাব বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছি।"

তাহার পর রাজা সৈন্যবল সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা করিলেন; নানা স্থানে যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন তাহা দুইজনকে জানাইলেন। উভয়েই বলিলেন, সে অবস্থায় অন্য কোনরূপ উপদেশ দিবার ছিল না।

বহুক্ষণ পরামর্শের পর মধ্যাহ্নের অল্পক্ষণ পূর্ব্বে মন্ত্রী ও সেনাপতি বিদায় লইয়া স্ব স্ব কার্য্যালয়ে গমন করিলেন।

রাজা অজয় সিংহকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

অল্পক্ষণ পরে অজয় সিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজা ভ্রাতাকে বসিতে বলিলেন; তিনি বসিলে বলিলেন, "অজয়, সংবাদ শুনিয়াছ?"

অজয় সিংহ বলিলেন, "কিসের সংবাদ?"

"মোগল সেনা রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছে। গতকল্য রাত্রিকালে আমি সংবাদ পাইয়াছি। দুই তিন দিনেই তাহারা রাজ্য-সীমায় উপস্থিত হইবে।"

অজয় সিংহের বোধ হইল যেন, তিনি সহসা আলোকোজ্জ্বল গিরিশিখর হইতে গভীর অন্ধকূপে পতিত হইলেন। তিনি কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

রাজা তখন সংবাদ প্রাপ্তি হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছেন, সমস্ত ভ্রাতার নিকট বিবৃত করিলেন।

অজয় সিংহ নীরবে সব শুনিলেন, কোন কথা কহিতে পারিলেন না। রাজার কথা শেষ হইলে তিনি কেমন অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, "মোগল শক্তির সহিত কি আমরা সংগ্রামে সমর্থ হইব?"

রাজা বলিলেন, "না। আমাদের পরাজয় অনিবার্য্য।"

অজয় সিংহ বিস্ময়ে ভ্রাতৃমুখে চাহিলেন।

রাজা সস্নেহে ভ্রাতার স্কন্ধে করসংস্থাপন করিয়া বলিলেন, "আমি তাহা জানিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। রাজপুত সংগ্রামে মৃত্যু ভুলিয়া যাইতেছে। সে আদর্শের উদ্ধার আবশ্যক। আমি সে কার্য্য করিব।"

অজয় সিংহ ভ্রাতার চরণে পতিত হইলেন, "আপনার সঙ্গে সঙ্গে যে ভবিষ্যতের সকল আশার অবসান হইবে! আমি আপনার আদেশে মোগলের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব।"

জ্যেষ্ঠ সস্নেহে কনিষ্ঠকে তুলিয়া বলিলেন, "অজয়, আমি রাজা; আমিই এ কার্য্যের অধিকারী। তুমি অধিকারী নহ। স্নেহবন্ধনে বাঁধিয়া আমাকে কর্ত্তব্য-চ্যুত করিও না।"

অজয় সিংহ বলিলেন, "আমার কি কোন কর্ত্তব্য নাই?"

"আছে। আমার পর সমস্ত রাজকর্ত্তব্য তোমার,—রাজ্য-রক্ষা, প্রজা-পালন, রাজপুতগৌরবের পুনরুদ্ধার এ সকল তোমার কর্ত্তব্য হইবে।"

"আমি এ কর্ত্তব্য কেমন করিয়া পালন করিব?"

"সেই কথা বলিব বলিয়া তোমাকে ডাকিয়াছি,—এই আমার শেষ উপদেশ।"

অজয় সিংহ কাঁদিয়া ফেলিলেন।

রাজা বলিলেন, "অজয়, ভাই, স্থির হও। আর ধৈর্য্যচ্যুত হইবার সময় নাই, পুরদ্বারে শত্রু, বিপদ আসন্ন ; এখন ধৈর্য্যচ্যুত হইও না। স্নেহ, প্রেম, ভক্তি কর্ত্তব্য এ সকলের অপেক্ষা অধিক আদরণীয়। আজ আমি তোমাকে তোমার কর্ত্তব্যের কথা বলিব।"

অজয় সিংহ শুনিতে লাগিলেন।

রাজা বলিলেন, "আমি সেতু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। সেতুর দুইটি স্তম্ভ নষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে, তাহা হইলে সেতু দুইজন অশ্বরোহীর ভার সহিতে পারিবে-না ; সহজে নষ্ট করা যাইবে। বিজয়ী মোগল সেনা যদি সেতু নষ্ট করিবার পূর্ব্বে কোনরূপে পুরপ্রবেশের চেষ্টা করে, তবে তাহারা সেতুর মধ্যভাগে আসিলেই সেতু ভাঙ্গিয়া পড়িবে। আর আমাদের প্রয়োজনে তুমি সেতুর অবস্থা জানিয়া আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে পারিবে।"

অজয় সিংহ বুঝিলেন, রাজা বুঝিয়াছেন, তিনি স্বয়ং আর ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না।

রাজা বলিলেন, "তুমি সেতুর মুখ রক্ষা করিবে। আমি যদি মোগল সেনার সহিত সংগ্রামে নিহত হই, তবে আর আমার দেহ উদ্ধারের চেষ্টা করিও না। কিন্তু সম্ভবতঃ শত্রুদল আমাকে বন্দী করিতে চেষ্টা করিবে; পিঞ্জরাবদ্ধ রাজপুতকে দিল্লীর রাজ-সভায় দেখাইতে ইচ্ছা করিবে। সেই আশঙ্কায় আমি প্রত্যাবর্ত্তনে পথ শঙ্কটশঙ্কুল করিয়াছি। মোগল সেনা দীর্ঘ পথ ঘুরিয়া আসিবে, ততক্ষণ গুপ্ত পার্ব্বত্য পথে আমরা সেতুমুখে আসিতে পারিব। জানিও জীবনের আশা থাকিতে আমি সংগ্রাম হইতে বিরত হইব না। যদি সেতুমুখে ফিরিয়া আসি, জানিও আমার বাঁচিবার আশা নাই। সেতু অধিক ভার সহিতে পারিবে না, আমার মস্তক দেহচ্যুত করিয়া আনিয়া সৎকার করিও।"

এই আদেশ শুনিয়া অজয় সিংহ সম্মুখে বিষধর দেখিয়া বিচলিত পথিকের মত বিচলিত হইলেন। রাজা বলিলেন, "স্থির হইয়া শুন। তোমার পুর-প্রত্যাবর্ত্তন আবশ্যক ; অনর্থক আপনাকে বিপন্ন করিও না।"

অজয় সিংহ বলিলেন, "আমি পুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কি করিব ?"

রাজা বলিলেন, "সেতু নষ্ট হইলে মোগল সহজে পুরপ্রবেশ করিতে পারিবে না। বিশেষ এ রাজ্যে প্রলোভনীয় কিছুই নাই। তখন মোগল সন্ধিপ্রার্থী হইতে পারে। তাহা হইলে—তুমি সন্ধির আবরণে আবার প্রস্তুত হইতে পারিবে।"

"এখন কি সন্ধি অসম্ভব ?"

"যুদ্ধের পূর্ব্বে সন্ধি! সে কাপুরুষের কার্য্য। বিশেষ রাজপুত যে আদর্শ হারাইতেছে, যুদ্ধের পূর্ব্বে সন্ধিতে তাহার পুনরুদ্ধার অসম্ভব।"

"তবে কি নিশ্চয় মৃত্যু জানিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই আবশ্যক?"

"এ ক্ষেত্রে তাহাই কর্ত্তব্য।"

অজয় সিংহ আবার বলিলেন, "আমি যুদ্ধে যাই। আপনি যে মহৎ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আপনি ব্যতীত আর কেহ তাহার সংসাধনে সমর্থ হইবে না।"

"কায কাহারও জন্য বাধিয়া থাকে না। এ কায তুমি আমার অপেক্ষা সুসম্পন্ন করিতে পারিবে।"

অজয় সিংহ বিস্মিত ভাবে বলিলেন—"আমি!"

রাজা বলিলেন, "হাঁ। আমার এ কায কর্ত্তব্য-পালন; তোমার কেবল তাহাই নহে।"

অজয় সিংহ কিছু বুঝিতে পারিলেন না—বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে জ্যেষ্ঠের মুখে চাহিয়া রহিলেন।

রাজা বলিলেন, "আমি তোমাকে কিছু বলি নাই সত্য; কিন্তু তুমি কি আমার সকল কথা জান না? আমি এতদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কর্ত্তব্যে উদাসীন ছিলাম; আপনি হতাশ হইয়া স্বার্থান্ধ আমি কর্ত্তব্য ভুলিয়াছিলাম। আজ তাহার প্রায়শ্চিত্তকাল উপস্থিত। আমি দেহশোণিতে আমার সে অপরাধ প্রক্ষালিত করিব। আমার জীবনে সুখ নাই; আমার জীবন মরুময়। যশে আমার সুখ নাই, জীবনে আমার আকর্ষণ নাই।"

অজয় সিংহ এতক্ষণে ভ্রাতার কথার অর্থ বুঝিতে পারিলেন। রাজা বলিতে লাগিলেন, "অজয়, আমার সৌভাগ্য—এ রাজ্যের সৌভাগ্য, আমার সন্তান নাই। প্রেমহীন পিতামাতার সন্তান মনুষ্যত্বের অধিকারী হয় না। তুমি আপনি ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছ। তাই আমি তোমার বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তোমাদের সন্তান একদিন এই রাজ্যের অধীশ্বর হইবে এ কল্পনাও আমার পক্ষে সুখের। তুমি তোমার সন্তানগণের জন্য রাজ্য রক্ষা করিবে; তাহাদের গৌরবের জন্য কীর্ত্তি অর্জ্জন করিবে; তাহাদের জননীর সুখের জন্য যশস্বী হইতে সচেষ্ট হইবে। তুমি আমার অপেক্ষা ক্ষত্রিয় গৌরবের উদ্ধার-কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিবে! আমি তোমার উপর এ কার্য্যের ভার দিয়া সুখে মরিতে যাইতেছি; আমার মৃত্যুতে আমার দুঃখের অবসান, আর নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা।"

আজ জ্যেষ্ঠের জীবনের দারুণ নিষ্ফলতা ও অসীম বেদনা কনিষ্ঠের নিকট পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন, যুক্তিতর্কে তিনি জ্যেষ্ঠকে নিরস্ত করিতে পারিবেন না। তিনি তথাপি বলিলেন, "তবে অনুমতি করুন, আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ করিব।"

রাজা সস্নেহে বলিলেন, "তুমি সে অনুমতি পাইবে না; আমি দিব না। জীবনে তোমার আকর্ষণ আছে; সেই আকর্ষণ তোমার মঙ্গলকর। তাহাই তোমাকে কর্ত্তব্য-পথে পরিচালিত করিবে। যদি তোমার দ্বারাও আমার অনুষ্ঠিত কার্য্য সম্পন্ন না হয় তুমি তোমার সন্তানদিগকে ব্রত উদ্‌যাপনের ভার দিয়া যাইতে পারিবে।"

অজয় সিংহ কিছুতেই মন স্থির করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া রাজা বলিলেন, "অজয় বেলা হইয়াছে। যদি সময় পাই আবার এ বিষয়ের আলোচনা করিব।"

অজয় সিংহকে উত্থনোযোগী দেখিয়া রাজা বলিলেন, "অজয়, যাইও না। আজ দুই ভাই একত্র আহার করিব।"

জেষ্ঠের স্বর স্নেহার্দ্র।

এই কথায় অজয় সিংহের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। তিনি বুঝিলেন, হয় ত জীবনে দুই ভ্রাতার মিলনের এরূপ সুযোগ আর ঘটিবে না বুঝিয়াই আজ জ্যেষ্ঠ এ কথা বলিলেন।

আহারে বসিয়া জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের সহিত অন্য কথা কহিতে লাগিলেন—তিনি নানা বিষয়ের আলাপ করিতে লাগিলেন, যেন আসন্ন বিপদের ছায়া—মৃত্যুর মূর্ত্তি তাহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। জ্যেষ্ঠের অবিচলিত ধৈর্য্য, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, হৃদয়ের বল ও আদর্শের উচ্চতা দেখিয়া অজয় সিংহের হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া গেল।

অপরাহ্নে সংবাদ আসিল, আর এক দিনে মোগল-বাহিনী রাজ্যের সীমায় উপনীত হইবে।

রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, অজয় সিংহ ও শঙ্কর সিংহকে লইয়া কর্ত্তব্য বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বিদায়।

—০—

মোগল সৈন্য রাজ্যসীমার নিকটে উপস্থিত,—এ সংবাদ অসিল। রাজা প্রস্তুত হইয়া ছিলেন। যতদূর সম্ভব সেনাসংগ্রহ হইয়াছিল, অনেক সৈন্য পূর্ব্বেই সীমান্তে প্রেরিতও হইয়াছিল।

আগামী প্রাতে রাজধানীর পরিখারূপে বিরাজিতা নদীর পরপারে—কয় ক্রোশমাত্র ব্যবধানে রাজ্যসীমায় যুদ্ধক্ষেত্রে জয়পরাজয় নির্দ্ধারিত হইবে। রাজা যুদ্ধের ফল বুঝিয়াছেন; তদনুসারে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি রাজ্যের সকল কথা অজয় সিংহকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, মন্ত্রীকে আবশ্যক উপদেশ দিয়াছেন; রাজ্যের ও রাজধানীর সম্বন্ধে রাজার কর্ত্তব্য করিয়াছেন। তিনি শেষ বিদায়ের জন্য প্রস্তুত।

রাত্রি যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে তখন সংবাদ আসিল, যে সমস্ত সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিল তাহারা সকলে সেতু পার হইয়া গিয়াছে। শুনিয়া রাজা বলিলেন "যুবরাজকে সেতুর দুইটি স্তম্ভ নষ্ট করিতে আদেশ দিতে বল।"—তিনি স্বয়ং অজয় সিংহকে সেই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া দিলেন। দূত পত্র লইয়া চলিয়া গেল।

রাজা কক্ষ ত্যাগ করিয়া নিম্নে আসিলেন, তাহার পর অন্তঃপুর ও বহির্বাটীর মধ্যবর্ত্তী উদ্যানে আসিলেন। আকাশে চন্দ্রকর, উদ্যান জনহীন—শব্দহীন। উদ্যানমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে রাজা এক পার্শ্বে একটি রুদ্ধ দ্বারের নিকট উপনীত হইলেন। তিনি দ্বার মুক্ত করিলেন। সেই দ্বারপথে রাজা গৃহ-বিগ্রহের মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। প্রাঙ্গণ ও মন্দির জনশূন্য; প্রাঙ্গণ প্রস্তরফলকাবৃত—পরিচ্ছন্ন। আজা অগ্রসর হইয়া মন্দিরের সম্মুখে উপনীত হইলেন। দ্বার রুদ্ধ। রাজা লৌহদণ্ডের মধ্য দিয়া চাহিয়া দেখিলেন। মন্দির-গর্ভে প্রজ্বলিত দীপালোকে বিগ্রহ স্পষ্ট দেখা গেল না। রাজা আবার চাহিয়া দেখিলেন। সাধনার এমন সময় আর নাই—মন্দিরে আর কেহ নাই, চারিদিকে শান্তি; সাধক সংসারের সকল বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, তাহার সম্মুখে মৃত্যুর মহতী মূর্ত্তি! রাজা ভক্তিভরে প্রণত হইলেন—বলিলেন,—"হে দেবতা, তুমি ব্রত

দিন যে অযোগ্য শাসকের হস্তে এ রাজ্যের শাসনদণ্ড দিয়া রাখিয়াছিলে—সে আজ তাহার রাজদণ্ড লইয়া ছেলেখেলা শেষ করিল। আজ তুমি তাহার সকল অপরাধ—সকল ত্রুটি মার্জ্জনা কর; তাহার দুঃখ, তাহার দৌর্ব্বল্য, তাহার আকাঙ্ক্ষা, তাহার আশা—তুমি সকলই জান। তুমি এই রাজ্যের মঙ্গল কর!" রাজা আবার প্রণত হইলেন। তিনি সেই স্নিগ্ধ—শান্ত রজনীরই মত স্থির—চাঞ্চল্যহীন।

মন্দির-প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া রাজা পুনরায় উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। আজ তাঁহার পুরমন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিতকে মনে পড়িল। তিনিই তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু ফুটাইয়াছিলেন। ভাবিতে ভাবিতে রাজা উদ্যানের আর এক দিকে আসিলেন। শুদ্ধান্তে প্রবেশের দ্বার সেই দিকে অবস্থিত। রাজা ধীরে ধীরে সেই দ্বারের সম্মুখে আসিলেন। দ্বার হইতে পথ আলোকে উজ্জ্বল। রাজাকে দেখিয়া প্রহরী সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল, রাজাকে অভিবাদন করিল। রাজা কি ভাবিতেছিলেন—দেখিতে পাইলেন না।

রাজা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া কি ভাবিলেন; স্থির হৃদয়ে সামান্য অস্থির-তার আবির্ভাব অনুভব করিলেন। রাজা আবার ভাবিলেন,—আজ সব শেষ!

ভাবিতে ভাবিতে ধীর পদে রাজা দ্বার অতিক্রম করিলেন—পথ ও সোপান অতিক্রম করিয়া দ্বিতলে উপনীত হইলেন।

প্রথম কক্ষেই রাজা দেখিলেন, উমা বসিয়া আছে। উমা সে রাত্রিতে ঘুমাইতে পারে নাই—কেবল ভাবিতেছিল। সে রাজাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজা বলিলেন, "উমা, তুমি ঘুমাও নাই? সমস্ত রাত্রি জাগিয়া আছ? যাও, যাইয়া শয়ন কর।"

রাজা সে কক্ষ অতিক্রম করিলেন। রাজা প্রথমে রাণীর বিশ্রাম-কক্ষ-দ্বারে উপনীত হইলেন। কক্ষদ্বার মুক্ত; কক্ষে আলোক জ্বলিতেছে। রাজা কক্ষে প্রবেশ করিলেন। রাণী সে কক্ষে নাই।

রাজা সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সে কক্ষও দীপালোকে আলোকিত; সে কক্ষও শূন্য!

রাজা হৃদয়ে সহসা বেদনা অনুভব করিলেন। তিনি মনে করিলেন, মানুষ আশায় ভ্রান্ত হয়;—আশায় কেবল যাতনা। মেঘান্ধকার নিশায় সহসা বিদ্যু-দ্বিকাশে যেমন সমস্ত প্রকৃতি নয়ন সমক্ষে সপ্রকাশ হইয়া উঠে—তেমনই আজ

তাঁহার বিবাহিত জীবন মনে পড়িয়া গেল। সে জীবনে সকল আশার আলোক হতাশার অন্ধকারে বিলীন হইয়াছে—জীবন ধূমপূর্ণ হইয়াছে।

আজ সে জীবনে শেষ আশার নির্ব্বাণ!' তিনি ভ্রান্ত আশায় আজ মৃত্যু-প্রবাহে পতিত হইবার পূর্ব্বে একবার অন্তঃপুরে রাণীর নিকট শেষ বিদায় লইবার জন্য আসিয়াছিলেন। সে আশাও হতাশায় পরিণত হইল।

রাজা ফিরিলেন।

তিনি সোপানপ্রান্তে উপনীত হইলে উমা রাণীর সন্ধানে গেল। সে রাজাকে এত সত্বর ফিরিতে দেখিয়া ভাবিল—এ কি? উমা যাইয়া রাণীর বিশ্রাম-কক্ষে ও শয়ন-কক্ষে দেখিল, রাণী নাই। তখন সে অন্যান্য কক্ষ দেখিতে দেখিতে রাজা কার্য্য করিতে করিতে যে বিশ্রাম-গৃহে শয়ন করিতেন সেই কক্ষে উপনীতা হইল; দেখিল, রাণী বসিয়া আছেন। রাজা সেই কক্ষে আসিবার সম্ভাবনা জানিয়া রাণী সেই কক্ষেই তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আজ তিনি হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করিবেন সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহার নয়নে নিদ্রাস্পর্শ হয় নাই। কক্ষে উমাকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত ভাবে চাহিলেন।

উমা রাণীকে জানাইল, রাজা অন্তঃপুরে আসিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহাকেই সন্ধান করিয়াছিলেন এবং না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন।

রাণীর মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা কোথায়!"

উমা উত্তর করিল, "আমি তাঁহাকে সোপানশ্রেণীঅবতরণোদ্যোগী দেখিয়া আসিয়াছি।"

রাণী যেন জ্ঞানহারার মত দ্রুতপদে সেই দিকে চলিলেন, উমা সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

রাণী দীর্ঘ পথ-কক্ষ দ্রুত পদে অতিক্রম করিয়া সোপানশ্রেণীতে আসিয়া দাঁড়াইলেন—তাহার পর সোপানশ্রেণী অবতরণ করিয়া পথ বাহিয়া উদ্যান-দ্বারে উপনীতা হইলেন। সহসা তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া প্রহরী সসম্ভ্রমে সরিয়া গেল।

রাণী সতৃষ্ণ নয়নে দেখিলেন, রাজা উদ্যান অতিক্রম করিয়া বহির্ব্বাটীতে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহার পক্ষে যেন জগতের ধ্বংস হইয়া গেল। তিনি মুহূর্ত্ত পাষাণমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাহার পর

একবার অশ্রুবাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিলেন—"উমা!" রাণীর আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তাঁহার দুই চক্ষু ফাটিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

এ দিকে রাজা হতাশাকাতর হৃদয়ে আপনার উপবেশন-গৃহে উপনীত হইলেন। সে কক্ষে কেবল শঙ্কর সিংহ উপবিষ্ট ছিলেন। রাজা শঙ্কর সিংহকে শেষ উপদেশ দিয়া—ভৃত্যকে আপনার বেশ আনিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্য কোন্ বেশ আনিবে জিজ্ঞাসা করিলে রাজা মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমি অভিষেকের দিন যে বেশ পরিধান করিয়াছিলাম, সেই বেশ আনয়ন কর।"

ভৃত্য সেই বেশ আনয়ন করিল। রাজা তাহা পরিধান করিলেন,—আজ তিনি রাজা।

রাজা যখন অশ্বারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখগামী হইলেন—তখন পূর্ব্ব গগনে দিবালোক কেবল ফুটিয়া উঠিতেছে।

রাজা দ্রুত অশ্বচালনা করিয়া নগর অতিক্রম করিলেন; তাঁহার মনে হইতে লাগিল—নগর যেন আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় স্থির।

নগরোপকণ্ঠে আশ্রমদ্বারে উপনীত হইয়া রাজা দেখিলেন, দ্বার মুক্ত। রাজা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন,—দ্বাররক্ষককে অশ্ববল্গা প্রদান করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, পার্ব্বতী অলিন্দে দাঁড়াইয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া আছে।

রাজা অলিন্দে উঠিয়া বলিলেন, "পার্ব্বতী, আমি যুদ্ধে যাইতেছি। তোমার আশ্রমের বিষয় আমি অজয়কে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছি।"

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "যুদ্ধে পরাজয় কি অবশ্যম্ভাবী?"—তাহার কণ্ঠস্বর আবেগ-কম্পিত।

রাজা বলিলেন, "হাঁ।"

"তবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াও কি অবশ্যম্ভাবী? আর কোন উপায় কি নাই?"

"সকলেই যদি অন্য উপায়ের সন্ধান করে, তবে রাজপুতকে বিলোপোন্মুখ গৌরব রক্ষার আদর্শ কে দেখাইবে?"

"কিন্তু আপনি—"

"দীর্ঘ অবর্ষণ অন্তে যখন সুস্নিগ্ধ বর্ষণে ধরণী শস্যপূর্ণা হইবার সম্ভাবনা হয়, তখন কোন্ পথে একজন পথিক বারিসিক্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে তাহা কেহ গণনায় আনে না।"

পার্ব্বতী ধীরে ধীরে বলিল, "রাজ্যের কি হইবে ?"

রাজা উত্তর করিলেন, "রাজ্য কখন রাজহীন হয় না—তাই রাজার নিধন নাই। এক যায়—আর তাহার স্থান অধিকার করে। কেবল কাহারও জন্ত প্রজা দুই দিন দুঃখ করে—কেহ মরিলে সুখী হয়। অজয় প্রজারঞ্জন বিষয়ে আমার অপেক্ষা পারগ হইবে,—তাহাতেই রাজার কীর্ত্তি ও কৃতিত্ব। আমার জন্ত শোক করিবার কেহই এ জগতে নাই।"

পার্ব্বতী মুখ তুলিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কেহ নাই !"

রাজা বলিলেন, "না।"

রাজা দেখিলেন, পার্ব্বতীর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। তিনি আপনার হৃদয়ে ব্যাকুলতা অনুভব করিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইল, বুঝি এতদিন হৃদয়ে গোপনে রক্ষিত ভাব আজ মৃত্যুমুখে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে। তিনি শঙ্কিত হইলেন—ব্যস্তভাবে বিদায় লইলেন, দ্বারে আসিয়া অশ্বে আরোহণ করিয়া কশাঘাতে অশ্বকে বেগে চালিত করিলেন।

পার্ব্বতী দাঁড়াইয়া দেখিল—রাজাকে লইয়া অশ্ব বেগে সেতু অতিক্রম করিয়া গেল। তাহার পিপাসিত নয়ন যেন সে মূর্ত্তি পান করিতে লাগিল।

তাহার পর অশ্ব ও অশ্বারোহী অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন পার্ব্বতী সেই নগ্ন হর্ম্ম্যতলে লুটাইয়া পড়িল। রাজা যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলেন—পার্ব্বতী ভক্তিভরে সাধকের মত—প্রেমিকার মত—আসীম আগ্রহে সেই স্থান চুম্বন করিল।

বিভাগ।

—:*:—

(সংস্কৃত হইতে)

কুসুম-কোমলা বালা, বিষম বিরহ জ্বালা,
সহিতে না পারি' একাকিনী।
নিদারুণ সে বেদনে, নিজ আত্মবন্ধুজনে
ভাগ করি' দিল বিরহিনী!
মর্ম্মভেদী অশ্রুধার বন্ধুজনে দিল তা'র,
গুরুজনে গুরু চিন্তাভার;

দীনভাব পরিজনে, সন্তাপ-সজনীগণে,
কিছু আর না রহিল তা'র।
সব জ্বালা ফুরায়েছে, শুধু দীর্ঘশ্বাস আছে,
আজি কালি তাহাও ফুরাবে।
তা'র লাগি চিন্তা আর কেন কর বারবার,
সব জ্বালা তা'র ত জুড়াবে।

অশোকের রাজকার্য্য ও শাসন-পদ্ধতি।

(২)

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে মহারাজ অশোকের সাম্রাজ্য-বিভাগ বর্ণনা করিয়াছি এবং দেখাইয়াছি যে, তাঁহার সাম্রাজ্য পঞ্চভাগে বিভক্ত ছিল ; সম্রাট পাটালপুত্রে অবস্থান করিয়া স্বয়ং সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলবর্ত্তী রাজ্যসকল শাসন করিতেন এবং অন্য চারিটি বিভাগ রাজকুমারগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইত।

কয়েকটি রাজ্য লইয়া ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ নির্দ্দিষ্ট ছিল। কুমারগণের নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদিগের নাম "রাজ্জুক" বা রাজা। পৃথক পৃথক রাজ্য ইঁহাদিগের অধীনে থাকিত ; আবার এক একটি রাজ্য বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এই সকল প্রদেশে শাসনকর্ত্তৃগণের নাম "প্রাদেশিক"। ইঁহারা রাজ্জুকের অধীনে থাকিয়া প্রদেশের রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। রাজ্জুক ও প্রাদেশিকগণ সাম্রাজ্যের উচ্চতম কর্ম্মচারী ; এই জন্য তাঁহারা "মহামাত্য" নামে অভিহিত হইতেন। মহামাত্যগণের অধীনে বহু নিম্নতর কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিত। তাঁহাদিগের নাম "যুক্ত" "উপযুক্ত" প্রভৃতি। অশোকের ভিন্ন ভিন্ন অনুশাসন হইতে এই সকল কর্ম্মচারিগণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দেখা যাইতেছে, ইদানীং ভারত-সম্রাজ্য যেরূপ ভাবে বিভক্ত হইয়া ইংরাজ-রাজ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে, অশোকের সাম্রাজ্যও প্রায় সেইভাবে পরিচালিত হইত। বিভাগীয় শাসনকর্ত্তা কুমারগণকে আমরা আধুনিক লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর বা গভর্ণরের সহিত তুলনা করিতে পারি। আজকাল যেমন লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণরের অধীনে বিভাগের কমিশনারগণের স্থান, তৎকালে রাজ্জুকগণ সেইরূপ কুমারদিগের অধীনস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। আবার প্রাদেশিকগণ জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত তুলনীয়। কমিশনার এবং ম্যাজিষ্ট্রেটগণ যেমন ভারত রাজের উচ্চতম কর্ম্মচারী বা Imperial Service এর লোক, তৎকালে রাজ্জুক ও প্রাদেশিকগণও সেইরূপ মহামাত্য বা উচ্চ কর্ম্মচারীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অশোকের যুক্ত ও উপযুক্ত অভিধেয় নিম্নতম কর্ম্মচারিগণ আধুনিক ডেপুটি ও উপ (সাব) ডেপুটি পুঙ্গব।

আজকাল সরকারী কার্য্যালয় সকল ছোট বড় নানাবিধ কেরাণীকুলে পরিপূর্ণ। সামান্য ক্লার্ক হইতে বড় বড় সেক্রেটরি পর্য্যন্ত সকলেই ত কেরাণী। তখনও সরকারী কার্য্যালয়ের লিখাপড়া করিবার জন্য এক দল কর্ম্মচারী

নিযুক্ত থাকিত ; চাণক্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে এই লেখক সম্প্রদায়ের কার্য্যকলাপ বিবৃত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সাম্রাজ্যের প্রজাবৃন্দের এবং রাজ-কর্ম্মচারিগণের সকল বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য অশোক "প্রতিবেদক" নামে এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রতিবেদকগণ সকল সময়ে সম্রাটকে সম্রাজ্যের যাবতীয় সংবাদ গোপনীয়ভাবে জ্ঞাপন করিত।

রাজধানী পাটলিপুত্রের রাজকার্য্য-পরিচালনার্থ একটি সমিতি নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই সমিতি ছয়টি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত ছিল। ৫ জন কর্ম্মচারী লইয়া প্রত্যেক বিভাগ গঠিত হইত। প্রথম সম্প্রদায় শিল্পসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিত। রাজধানীর অধিকাংশ শিল্পী পারিশ্রমিক লইয়া রাজ-সরকারে কার্য্য করিত। এই সকল শিল্পী ও কারীকরগণের পারিশ্রমিক নির্দ্ধারণ করা, তাহাদিগের দৈনিক কার্য্য পরিদর্শন করা প্রভৃতি সকল কার্য্য প্রথম বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। দ্বিতীয় সম্প্রদায় বিদেশীয় ব্যক্তির তত্ত্বাবধান করিত। রাজধানীতে আগত বিদেশীয়গণের বাসস্থান নিরূপণ করা, তাহাদিগের সর্ব্ব প্রকার অভাব বিমোচন করা, পীড়িত হইলে তাহাদিগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা—এই সম্প্রদায়ের কার্য্য ছিল। আজ কাল বিদেশী রাজার দূতগণ (Consuls) অন্য রাজার রাজ্যে বাস করেন। স্বদেশ হইতে কোন ব্যক্তি সেই রাজ্যে আগমন করিলে, এই দূত তাঁহার অভাব অভিযোগ শ্রবণ করেন। রাজা বিদেশীর জন্য স্বয়ং কোন বন্দোবস্ত করেন না। কিন্তু ভারতবর্ষ অতিথ্যের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ ; তাই মৌর্য্যরাজ বিদেশীয় অতিথি অভ্যাগতের সৎকারভার স্বয়ং গ্রহণ করিতেন ; বিদেশীয়-গণের সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তৃতীয় সম্প্রদায় অধিবাসি-গণের জন্মের ও মৃত্যুর ধারবাহিক তালিকা প্রস্তুত করিত। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখা বিশেষ আবশ্যক হইত। বোধ হয়, তৎকালে জনসংখ্যার উপরে লোকপ্রতি বার্ষিক কোন রূপ কর নির্দ্দিষ্ট ছিল। এখনও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এইরূপ কর বা Poll Tax প্রচলিত আছে। ব্যবসায়বাণিজ্য পরিদর্শনের ভার চতুর্থ সম্প্রদায়ের উপর সংন্যস্ত ছিল। এই বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ পণ্যদ্রব্যাদির ওজন করিবার মান নিরূপণ করিতেন। পণ্য দ্রব্যের বিক্রয়-মূল্যের উপর একটি বিশেষ শুল্ক নির্দ্দিষ্ট ছিল বলিয়া সকল দ্রব্যই এই বিভাগ কর্ত্তৃক চিহ্নিত হইয়া বিক্রয়ার্থ বাজারে নীত হইত। অদ্যাভন্ন যে সকল পণ্য দ্রব্য রাজধানীতে প্রস্তুত হইত, পঞ্চম সম্প্রদায় সেই সকল

তত্ত্বাবধান করিত। ব্যবসায়িগণ নূতন ও পুরাতন দ্রব্য সকল পৃথক রাখিতে আদিষ্ট হইত এবং তাহারা রাজধানীতে প্রস্তুত, রাজ্যের অন্যত্র হইতে আনীত এবং বিদেশজাত দ্রব্য পৃথক ভাবে রক্ষা করিতে বাধ্য হইত। ষষ্ঠ সম্প্রদায়ের কার্য্য ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে বিক্রীত দ্রব্যের শুল্ক সংগ্রহ করা। এই শুল্কগ্রহণ প্রথা আবহমান কাল হইতে ভারতে প্রচলিত আছে। মিগাস্‌থেনিস লিখিয়াছেন, ব্যবসায়ীদিগকে বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যের দশমাংশ শুল্ক স্বরূপ রাজাকে প্রদান করিতে হইত। কিন্তু সকল দ্রব্যের সমান শুল্ক হওয়া সম্ভব নহে; বোধ হয়, দ্রব্যের প্রকার ভেদে শুল্কের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হইত। মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে দেখিতে পাই,

"ক্রয়বিক্রয়মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ম্।
যোগক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বাণিজ্যো দাপয়ৎ করান্॥"
৭। ১২৭

বাণিজ্য দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়ের মূল্য, তাহা কতদূর হইতে আনীত হইয়াছে, ভক্তাদিতে কত খরচ পড়িয়াছে, চৌরাদি হইতে রক্ষার নিমিত্ত যে ব্যয় এবং লভ্যাংশ—এই সকল হিসাব করিয়া রাজা বাণিজ্য দ্রব্যের উপর কর-স্থাপন করিবেন।

সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রধান নগরীতে কিরূপ ভাবে রাজকার্য্য সংসাধিত হইত, তাহা ঠিক বলা যায় না; তবে "অর্থশাস্ত্র" আলোচনা করিলে মনে হয় যে, রাজধানীর ন্যায় অন্যান্য প্রধান নগরের রাজকার্য্যও সমভাবে এইরূপ সমিতি কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইত।

রাজাই ভূমির অধিস্বামী ছিলেন। কৃষকগণের নিকট হইতে রাজা উৎপন্ন শস্যের চতুর্থাংশ রাজস্ব গ্রহণ করিতেন। সময়ে সময়ে অষ্টম ভাগও গৃহীত হইত। রুম্মিন্‌দেই গিরিস্তম্ভে লিখিত আছে, বুদ্ধদেবের জন্মস্থান বলিয়া অশোক লুম্বিনী গ্রামের অষ্টভাগ কর গ্রহণ করা বন্ধ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ভূমির উৎপাদিকা শক্তির এবং কর্ষণ-ব্যয়ের তারতম্যানুসারে শস্যের চতুর্থ বা অষ্টমভাগ রাজার প্রাপ্য ছিল। এইরূপে রাজস্ব আদায় করিয়া প্রতি বৎসর অনেক শস্য রাজ ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইত। ইহার কিয়দংশ ব্যবসায়ীগণ ক্রয় করিত; কিয়দংশ রাজ-কর্ম্মচারী ও সৈন্যগণের ভরণপোষণের জন্য ব্যয়িত হইত এবং কতক বা ভবিষ্যৎ দুর্ভিক্ষাদি-নিবারণজন্য সঞ্চিত থাকিত।

পণ্য দ্রব্যের শুল্কের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন "উদক-ভাগ" নামে আর এক প্রকার জলকর প্রচলিত ছিল। কৃষি কার্য্যের উন্নতি-কল্পে রাজা খাল কাটাইয়া দিতেন, হ্রদের চারিধার বাঁধাইয়া যাহাতে সকল সময়ে তাহাতে জল থাকে,তাহার বন্দোবস্ত করিতেন। এই সকল খালের বা হ্রদের জল কৃষকগণ নিজ নিজ ক্ষেত্রে ব্যবহার করিত এবং তজ্জন্য ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যের তৃতীয় অথবা চতুর্থ, আংশ রাজাকে উদক-ভাগ স্বরূপ প্রদান করিত।

গির্ণারে আবিষ্কৃত রুদ্রদামার গিরিলিপিতে লিখিত আছে,—"মৌর্য্যস্য রাষ্ট্রীয়েন বৈশ্যেন পুষ্যগুপ্তেন কারিতং অশোকস্য মৌর্য্যস্য তে (তৎ ?) যবন রাজেন তুষাস্পেনাধিষ্টায় প্রণালী-ভিরলঙ্কৃতং।" মৌর্য্য-রাজ চন্দ্রগুপ্তের শ্যালক পুষ্যগুপ্ত (এই সুদর্শন হ্রদ) প্রস্তুত করাইয়াছিলেন; মৌর্য্য-রাজ অশোকের প্রসিদ্ধ যবন-রাজ তুষাস্প প্রণালী দ্বারা (এই হ্রদ) অলঙ্কৃত করাইয়াছিলেন। এই গিরিলিপি পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কৃষি-কার্য্যের উন্নতি-কল্পে অশোক বিশেষ যত্নবান ছিলেন। গুজরাটের অন্তর্গত গির্ণার পাটলিপুত্র হইতে প্রায় সহস্রাধিক ক্রোশ দূরে অবস্থিত ছিল, সেই সুদূর প্রদেশেও তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সুদর্শন হ্রদের সংস্কার করাইয়া কৃষিক্ষেত্রে জল-সেচনের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, কৃষিকার্য্যের উন্নতি-বিধান করা—তিনি রাজোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করিতেন। মিগাস্থেনিস্ লিখিয়াছেন, উচ্চতন রাজ-কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কতকগুলি লোক, মিশর দেশের ন্যায়, নদনদীর তত্ত্বাবধান করিত, জমি জরিপ করিত, এবং প্রধান প্রধান খালের জল যে সকল স্রোতদ্বার দিয়া বাহির হইয়া অন্যান্য শাখা খালের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া কৃষকগণের ক্ষেত্রে সমভাবে জল যোগাইত—সেই সকল স্রোতোদ্বার পরিদর্শন করিত। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ক্ষেত্রে জল-সেচনের ব্যবস্থা করণার্থ রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল।

চন্দ্র-গুপ্তের বিপুল বাহিনীর কথা সকল ইতিহাস লেখকই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সৈন্য বিভাগে ৬০ লক্ষ পদাতিক, ৩০ সহস্র অশ্বারোহী, ৯ সহস্র রণহস্তী এবং বহু সংখ্যক রথ নিযুক্ত থাকিত। রাজা শান্তি অশান্তি—সকল সময়েই সৈন্যগণের ভরণপোষণ এবং যুদ্ধের উপকরণাদি সংরক্ষণের ব্যয়ভার বহন করিতেন। রাজধানীর শাসনকার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির ন্যায়, সৈনিক বিভাগের শাসন ও পরিচালন ভার একটি পৃথক রণসমিতির উপর ন্যস্ত ছিল। এই রণ-সমিতির ছয়টি বিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য

নির্দ্ধারিত ছিল; এবং ৫ জন কর্ম্মচারী প্রত্যেক বিভাগের যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করিতেন। এই ছয়টি বিভিন্ন বিভাগের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) জলযুদ্ধ বিভাগ। একজন সেনাপতি ও অন্য চারিজন কর্ম্মচারী এই বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন।

(২) যুদ্ধের জন্য রসদ সংগ্রহ ও বহন বিভাগ। এই বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ, সৈন্যদিগের খাদ্যাদির ব্যবস্থা করিতেন।

(৩) পদাতিক সৈন্য বিভাগ।

(৪) অশ্বারোহী সৈন্য বিভাগ।

(৫) রণ-রথ বিভাগ।

(৬) রণ-হস্তী বিভাগ।

সৈন্যগণ সাধারণতঃ ধনুর্ব্বাণ, ঢাল ও তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিত। শত্রুপক্ষ অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইলে, যোদ্ধৃগণ দুই হস্তে অসি চালনা করিত। যুদ্ধ-রথে সারথী ব্যতীত, দুইজন রথী এবং রণ-হস্তীতে মাহুত ব্যতীত তিন জন যোদ্ধা অবস্থিতি করিত।

তৎকালে হস্তীই রাজাদিগের প্রধান বল ছিল। হস্তী ভিন্ন কোন যুদ্ধই প্রায় সংঘটিত হইত না। চাণক্য লিখিয়াছেন, রাজার যুদ্ধজয় প্রধানতঃ হস্তীর উপরেই নির্ভর করে। এই জন্যই তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন যে, হস্তী-বিনাশকারীর প্রাণদণ্ড হইবে।

অশোকের সৈন্যবল কিরূপ ছিল তাহা তাঁহার অনুশাসন হইতে জানা যায় না। তবে কলিঙ্গ জয়ের সময়ে,—"একশত পঞ্চাশ হাজার লোক বন্দী হয়, লক্ষ লোক তথায় নিহত হয় এবং উহার অনেক গুণ লোক (সেই সময়ে) মারা যায়"—ইত্যাদি বিবরণ অনুশাসনে পাঠ করিলে মনে হয় অশোকের সৈন্যবল বড় সাধারণ ছিল না।

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে অতি ভয়ঙ্কর দণ্ডবিধি প্রচলিত ছিল। তিনি সাতিশয় কঠোর ভাবে রাজ্য পরিচালনা করিতেন। তাহার ফলে এবং দেশের জনসাধারণ মিতাচারী ও স্বধর্ম্মপরায়ণ ছিল বলিয়া, রাজ্যে দস্যুতস্করাদির উপদ্রব প্রায়ই ঘটিত না। মিগাস্থেনিস্ লিখিয়াছেন, তিনি যতদিন পাটলিপুত্রে ছিলেন তাহার মধ্যে একদিনও মোট ২২৫৲ টাকার (২০০ Drachmai) অধিক চুরি হয় নাই; অথচ তৎকালে পাটলিপুত্রের জনসংখ্যা প্রায় চারি লক্ষ ছিল। কোন ব্যক্তি অন্য লোকের অঙ্গহানি করিলে, সেই অপরাধী ব্যক্তিরও

রাজাদেশে সেই অঙ্গহানি হইত; তদ্ভিন্ন তাহার হস্তও কাটিয়া দেওয়া হইত। যদি কেহ কোন রাজকর্ম্মচারী শিল্পীর হস্তপদাদি ছেদন করিত, তাহা হইলে সেই অপরাধী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইত। কোন পবিত্র বৃক্ষের অনিষ্ট-সাধন করিলে, বিক্রীত পণ্য দ্রব্যের শুল্ক প্রদান না করিলে অথবা রাজা যখন মৃগয়াযাত্রা করিতেন তৎকালে পথে তাঁহার গমনে বাধা প্রদান করিলে— মৃত্যুদণ্ড হইত।

মহারাজ অশোক তাঁহার পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অপরাধীদিগকে এইরূপ কঠোর শাস্তি প্রদান করিতেন কি না, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে তিনি যে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন, সকল লোককেই আপনার সন্তানের ন্যায় স্নেহের চক্ষুতে দেখিতেন—তাঁহার মুক শিলালিপিগুলি আজিও এই কথা স্পষ্টাক্ষরে সাধারণ্যে ঘোষণা করিতেছে। অশোক কলিঙ্গ গিরিলিপিতে লিখিয়াছেন,—"সকল প্রজাই আমার সন্তান আমার সন্তানগণ যাহাতে ইহলোকে ও পরলোকে সুখ-স্বচ্ছন্দতা লাভ করে, ইহা যেমন আমার অভিপ্রেত, সকল প্রজার জন্যও আমার সেইরূপ অভিলাষ।" আবার তিনি কর্ম্মচারিগণকে আদেশ প্রদান করিতেছেন—"যাহাতে প্রজাবৃন্দ আমাকে বিশ্বাস করে এবং 'রাজাই আমাদের পিতৃস্বরূপ। তিনি তাঁহার আপনার মত আমাদিগকে ভালবাসেন, তাঁহার নিকটে আমরা তাঁহার সন্তানের ন্যায়'—এই বাক্যের সত্যতা যাহাতে তাহারা বুঝিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবে।" ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, অশোক পিতামহের ন্যায় রাজ্য-শাসনে কঠোর নীতি অবলম্বন করেন নাই। সম্ভবতঃ তিনি রাজকীয় দণ্ডবিধির আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন।

মৃত্যুদণ্ড অশোকের সময়েও প্রচলিত ছিল। কিন্তু পূর্ব্বে দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইবামাত্র, অপরাধীর প্রাণবিনাশ হইত। অশোক এই প্রথার পরিবর্ত্তন করিয়া আদেশ প্রচার করিলেন যে, দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইবার পরেও তিন দিবস অপরাধিগণ জীবিত থাকিবে। তাহারা এই তিন দিন পরজন্মের হিতাকাঙ্ক্ষায় দান করিবে এবং অনশনব্রত গ্রহণ করিয়া পরলোকে গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইবে।

অশোকের রাজ্যাভিষেকের বার্ষিক উৎসব মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। জনসাধারণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া এই উৎসবে যোগদান করিত। বন্দিগণ এই উৎসব উপলক্ষে কারামুক্ত হইত।

অশোক প্রথমে রাজসিক বলে সাম্রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত যতই তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন, ততই তিনি উপলব্ধি করিতে লাগিলেন যে, কেবল বাহুবলে সেই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করা অসম্ভব। তৎপরে কলিঙ্গের রক্তপ্লাবিত রণক্ষেত্রে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল। অতঃপর তিনি স্বয়ং গিরিলিপিতে প্রচার করিলেন,—"আমার মতে সকল বিজয়ের মধ্যে ধর্ম্মবিজয়ই মুখ্য।" তিনি বুঝিলেন যে, বাহুবলে বা অসিসাহায্যে রাজ্য জয় করা অপেক্ষা, সাত্ত্বিক বলে অথবা ধর্ম্মপ্রভাবে রাজ্য জয় করাই সমীচীন। অনন্তর তিনি বৌদ্ধসঙ্ঘের নেতৃত্ব গ্রহণপূর্ব্বক প্রজাপুঞ্জের ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি অসি দ্বারা অথবা প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া আপনার এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন নাই; পক্ষান্তরে সর্ব্বজীবে দয়া, ধর্ম্মোপদেশ প্রদান, সাধুজনের সেবা এবং বহুবিধ লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানই তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান সহায় হইয়াছিল। "ধর্ম্মরাজ অশোক" শীর্ষক প্রবন্ধে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার।

প্রশ্ন।

—:•:—

(মূরের অনুকরণে)

কেন নীল আভা গগনে ?
তব সুনীল স্নিগ্ধ নয়নের কথা
সদা জাগে তা'র স্মরণে,
তাই নীল আভা গগনে।

কেন মধুমাখা রাগিণী ?
তব মধুর বচন ঝঙ্কারে তার
বাজিছে দিবস যামিনী,
তাই মধুমাখা রাগিণী।

কেন এ রাঙিমা অশোকে ?
তব রক্ত চরণ পরশে মাতিয়া
ফুটেছিল সে যে পুলকে,
তাই এ রাঙিমা অশোকে।

কেন এ মাধুরী ভুবনে ?
তব কান্ত করুণ নির্ম্মল ছবি
নেহারি গগনে পবনে,
তাই এ মাধুরী ভুবনে।

শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

য়ুরোপ-ভ্রমণ।

—:*:—

(২)

ট্রেণে উঠিয়া দেখি যে, গাড়ীগুলি আমাদের দেশের গাড়ীর মত নহে। প্রত্যেক গাড়ীর দুই সীমায় দ্বার এবং লম্বালম্বিভাবে Corridor (বারান্দা) রহিয়াছে। প্রত্যেক গাড়ীতে গুটিপাঁচেক কামরা, এক এক কামরায় দুইটি বেঞ্চ, ভাল গদি ও লেস্ দিয়া মোড়া। প্রত্যেক বেঞ্চে তিনজন যাত্রীর বসিবার কথা। একটা কামরা মহিলাদিগের জন্য ও একটা কামরা ধূমপায়ী-দিগের জন্য; অবশিষ্ট তিনটা nonsmokers; জানালায় কাচ দেওয়া এবং পর্দ্দা দেওয়া; কাঠের জানালা বা খড়খড়ি নাই। ধূমপায়ীদিগের গাড়ীতে জানালার নিম্নে ছাই ফেলিবার জন্য কৌটার মত একটা পাত্র বসান। এ ট্রেণে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীরই গাড়ী ছিল; কিন্তু অনেক ট্রেণে দ্বিতীয় শ্রেণী থাকে না, বিশেষ ইংলণ্ডে। সে কথা পরে বলিব।

আমি যখন গাড়ীতে উঠিলাম, তখন সে কামরায় আর কেহ ছিলেন না। জাহাজের সঙ্গীদিগের মধ্যে দুই জনের সঙ্গে দেখা হইল; তাঁহারা বলিলেন, সে রাত্রি মার্শেল্সেই থাকিবেন।

গাড়ী ছাড়িবার কিছু পূর্ব্বে একজন ফরাসী যুবক আসিয়া উঠিলেন। একটি যুবতী ও একজন বালক তাঁহাকে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন। জিনিষপত্র তুলিয়া দিয়া তাঁহারা দুইজন প্ল্যাটফর্ম্মে যাইয়া দাঁড়াইলেন, আর যাত্রীটি corridorএর জানালা নামাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে কথাবর্ত্তা আরম্ভ করিলেন। যখন গাড়ী ছাড়িবার সময় হইল তখন তিনি সেই জানালা দিয়া ঝুঁকিয়া যুবতীটিকে সেই লোকারণ্যের মধ্যে ক্রমাগত প্রগাঢ়ভাবে চুম্বন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া মনে হইল, হাঁ ফরাসীদেশ বটে!

ষ্টেশনে একটা খাবারের বাক্স কিনিয়াছিলাম। পুরু কাগজের বাক্স; তাহার মধ্যে তিন টুক্‌রা তিন প্রকার মাংস, একখানা রুটি, কিছু মাখন, কিছু পনির, একটা আপেল, একখানা চকোলেট, একটি ছুরী, একটা কাঁটা, এক খানা প্লেট, এক বোতল জল, এক বোতল ক্লারেট, একটা কাচের গ্লাস ও একটা কর্ক-স্ক্রু; দাম মাত্র ৪ ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ ২৷৷০ টাকার কিছু কম।

গাড়ী ছাড়িবার পর আমি সেই বাক্স খুলিয়া আহার করিতে লাগিলাম।

সহযাত্রীটি আমার সহিত আলাপ করিলেন। তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী জানিতেন, কথাবার্ত্তায় খুব ভদ্রলোক বলিয়াই মনে হইল। তিনি আমাকে সমস্ত খবর দিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, যে যুবতীটি তাঁহাকে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন তিনি তাঁহার fiancee; দুইমাস পরে বিবাহের কথা ঠিক হইয়াছে। আমাকে বিদেশী দেখিয়া তিনি খুব যত্ন ও আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন।

য়ুরোপের গাড়ীতে শয়নের স্থান পাওয়া যায় না। কোন কোন ট্রেণে sleeping car থাকে, প্রথম শ্রেণীর ভাড়ার উপর প্রায় ১৫।২০ টাকা অধিক দিলে এক রাত্রির জন্য শয়নের স্থান পাওয়া যায়। আমাদের ট্রেণে sleeping car ছিল না, থাকিলেও অতগুলি টাকা অপব্যয় করিতাম কি না সন্দেহ। দুইজনে দুই বেঞ্চে শুইয়া রাত্রি কাটাইয়া দেওয়া গেল। প্রভাতে উঠিয়া দেখি, দুই ধারে কেবল ছোট ছোট পাহাড়, ধারে ধারে দ্রাক্ষাক্ষেত্র; গাছপালা সবই নূতন ধরণের; মাঝে মাঝে মাঠ ও ঘর দেখা যায়, সেও আমাদের দেশের মত নহে; বাড়ীর ছাত সবই ঢালু। গ্রাম, মাঠ সবই অতি পরিপাটিভাবে সাজান। অনেক নদীও দেখা গেল, সবই ছোট।

আমাদের ট্রেণ rapide অর্থাৎ খুব কম ষ্টেশনে দাঁড়ায়। প্রায় ৭॥০ টায় ট্রেণ লারোস্ (Laroche) ষ্টেশনে দাঁড়াইল। তথায় চা পান করিতে নামিলাম। দেখি, বুফেতে (buffet) চা নাই, আছে কফি অথবা চোকোলাত বা কোকো। অগত্যা কোকো পান করা গেল। দাম মাত্র ।৶১০! আমাদের দেশের তিন গুণ!! একটু পরেই সেন্ নদী দেখিলাম। এই সেন্ (Seine) যাহার নাম বাল্যকালে বিদ্যালয়ে এত করিয়া মুখস্থ করিয়াছিলাম? আমাদের দেশের খালের অপেক্ষাও ছোট। পাহাড় আদৌ উচ্চ নহে, জল হইতে ৩।৪ হাত মাত্র হইবে; দুইধারে বেশ জঙ্গল, মধ্যে গজ ত্রিশেক চওড়া এক নদী, এরই নাম সেন্।

প্রায় সাড়ে দশটায় প্যারিসে পৌঁছিলাম।

আমার একজন বাঙ্গালী বন্ধু লণ্ডন হইতে প্যারিসে আসিয়া আমার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিবেন, কথা ছিল। মার্শেল হইতে তাহাকে টেলিগ্রাফও করিয়াছিলাম। ট্রেণ যখন গার ডু লিয়ঁ (Gare du lyon) নামক ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল তখন আমি উৎসুক হইয়া তাহাকে খুঁজিতে লাগিলাম, কিন্তু তাঁহার কোনও চিহ্ন পাইলাম না; ভাবিলাম, এখন কি করি? সে যাহা

হউক, মুটে (fecteur) আসিয়া জিনিষপত্র নামাইল। এ দেশের মুটেরা মাথায় মোট বহে না; হয় ঠেলাগাড়ীতে জিনিষ তুলিয়া হাত দিয়া ঠেলিয়া লইয়া যায়, নহেত একটা চামড়ার দল দিয়া জিনিষগুলি বাঁধিয়া স্কন্ধে ফেলিয়া লয়। মুটেরা সকলেই রেল কোম্পানীর নিকট মাহিয়ানা পায়, কাজেই যাত্রীদের নিকট যেটা পায় সেটা সবই "উপরি লাভ"।

ষ্টেশনটি খুবই বড়। এরূপ ষ্টেশন প্যারিসে আরও আটটি আছে। ষ্টেশনে সর্ব্বত্রই ফরাসী, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় লিখা "Beware of Pickpockets" অর্থাৎ গাঁটকাটার ভয়; সাবধান! ইংলণ্ডে এ রকম বিজ্ঞাপন ট্রাম, টিউব, ডাকঘর প্রভৃতি সর্ব্বত্র দেখা যায়; কোথাও কোথাও আবার আছে "male and female" অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী দুই জাতীয় গাঁটকাটা, সাবধান।

ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়াই বুঝিলাম, এ আমাদের দেশ নহে। রাস্তা পরিষ্কার ও পাতর দিয়া বাঁধান। বাহিরে বড় বড় হোটেলের অম্‌নিবস্ গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে ও অনেক ভাড়াটে গাড়ী রহিয়াছে। অম্‌নিবস্ ও গাড়ী দুই রকম, ঘোড়ায় টানা ও মোটর (বৈদ্যুতিক), ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ীতে Taximeter বসান; ভাড়ার জন্য গাড়োয়ানের সহিত বকাবকি করার প্রয়োজন হয় না। অবশ্য Meterএ যে ভাড়া লিখে তাহার উপর যৎকিঞ্চিৎ (Tip) গাড়োয়ানকে দেওয়া নিয়ম; টিপ্ অথবা পুর বোয়ার (Pour boire) য়ুরোপে অত্যন্ত চলিত; উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে সকলকেই টিপ্ দিতে হয়। হোটেলেও এই পাপ; শুনিয়াছি, কম টিপ্ দিলে হোটেলের লোকরা মালপত্রের উপর গুপ্ত সঙ্কেত লিখিয়া দেয়, অন্য হোটেলে যত্ন পাওয়া যায় না। তবে সব দেশের চেয়ে ইংলণ্ডে টিপের প্রচলন কম। তথায়ও দুই একটি হোটেল আছে যথায় ওয়েটারদের খানার পর স্বর্ণ মুদ্রা টিপ দিতে হয়, তাহাই নিয়ম। প্যারিস, লণ্ডন প্রভৃতি বড় বড় হোটেলে ওয়েটাররা বেতন ত পায়ই না; অধিকন্তু অধিকারীকে অনেক টাকা দিয়া (premium) চাকরী পায়। আমি এক গাড়ী ভাড়া করিয়া টমাস্ কুকের অফিসে বন্ধুর সন্ধানে চলিলাম। বলিতে ভুলিয়াছি, ভাড়াটে গাড়ী সবই খোলা, ফিটন জাতীয়। কুকের অফিসে কর্ম্মচারীরা বলিল, "লোকদের ঠিকানা আমরা কাহাকেও বলি না।" অনেকক্ষণ বকাবকি করার পর ঠিকানা বলিয়া দিলে, গাড়োয়ানকে সেই ঠিকানায় যাইতে বলিলাম। সে অনেক ঘুরিয়া প্রায় ১২॥০ টার সময় বন্ধুদিগের হোটেলের সম্মুখে লইয়া গেল। যাইয়া দেখি, তিন জন বাঙ্গালী আমার জন্য

লণ্ডন হইতে আসিয়াছেন। একজন বাসায় আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; আর দুইজন আমাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে প্যারিসের সব কয়টা ষ্টেশন Taxiতে ঘুরিয়া তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রায় ১৪ ফ্রাঙ্ক (৮৸০) ট্যাক্সি ভাড়া আক্কেল সেলামি দিতে হইল। যাহা হউক, একটার পর সকলে মেশা গেল এবং প্রাতরাশ সমাপন করা হইল।

প্যারিস।

প্যারিসে অষ্টাহ বাস করিয়াছিলাম। কত সহর দেখিয়াছি. প্যারিসের ন্যায় সুন্দরী নগরী আর কোথাও দেখি নাই। আমাদের জাহাজে যিনি পার্সার ছিলেন, তিনি একজন প্যারিসবাসী। পার্সার জাহাজের Executive head; কাপ্তেন যেমন জাহাজ চালান বিষয়ে একচ্ছত্র নরপতি, পার্সার যেইরূপ জাহাজের আভ্যন্তরীণ বন্দোবস্তের সর্ব্বময় কর্ত্তা। যাত্রীদের সুখস্বচ্ছন্দতা তাঁহার উপর বিশেষরূপে নির্ভর করে! ভদ্রলোক ১৮ মাস ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কাশীধামের ও জয়পুরের অনাবিল প্রশংসা তাহার মুখে শ্রুত হইত। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন "শুনিলাম, আপনি বেড়াইতে যাইতেছেন। তাহা হইলে প্রথমে প্যারিসে যাওয়া আপনার পক্ষে অত্যন্ত ভুল হইতেছে। কারণ, প্যারিস দেখিলে আপনার আর কোনও সহরই ভাল লাগিবে না; হয় ত আর কোথাও যাইবার ইচ্ছাই হইবে না।" কথাটি বাস্তবিকই বড় ঠিক। এমন সহর ত আর দেখিলাম না। প্রত্যেক রাস্তা প্রত্যেক বাড়ী দেখিলেই চক্ষু জুড়ায়। আমাদের দেশে অথবা বিলাতে যেরূপ যে কোনও রকমে বাসোপযোগী করিয়া বাড়ী গাড়িতে পারিলেই হইল, প্যারিসে সেরূপ বলিয়া বোধ হইল না। সব বাড়ী দেখিলেই মনে হয়, কিসে সুন্দর দেখাইবে তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা সপ্রকাশ। রাস্তাও সেইরূপ—খুব সোজা সোজা পরিষ্কার রাস্তা। ভুবন-বিখ্যাত বুলভার্ডগুলি দেখিলে দিল্লীর চাঁদনী চকের কথা মনে পড়ে। ফুটপাথের উপর গাছের সারি; রাস্তার মধ্যস্থল দিয়া আর একটা চওড়া ফুটপাথ, তাহার উপর দুই সারি গাছ। অন্যান্য রাস্তাও বেশ চওড়া একেবারে সরু গলি খুবই কম। প্রত্যেক চৌমাথার উপর চারিধারে চারিটি সুন্দর বাড়ী; কিছু না কিছু একটা স্থাপত্য সৌন্দর্য্য আছেই। দক্ষিণে বামে রাস্তা সরল ভাবে গিয়াছে; দেখিলে বাস্তবিকই চক্ষু জুড়ায়। সর্ব্বত্রই মনে হয়, স্থাপত্য সৌন্দর্য্যের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। রাস্তায় ধূলার একান্ত অভাব; প্রায় সকল রাস্তাই পাতর দিয়া বাঁধান; দুই একটা রাস্তা কাঠ দিয়া বাধানও আছে।

প্যারিসে দুইটি জিনিষ প্রথমেই আগন্তুকের দৃষ্টি আদৃষ্ট করে, প্রথম প্যারিসের স্ফূর্ত্তি—প্যারিস যেন সদাই আনন্দময়ী। রাস্তায় লোক জন ব্যস্ত সমস্ত ভাবে চলিতেছে কিন্তু সকলেরই মুখে যেন হাসি লাগিয়া আছে। সকলেরই পরিধেয় অতি পরিপাটি, সাজ সজ্জা হাবভাব সবই যেন holiday garb। এ সহরে কেহ যে দুঃখী আছে তাহা বোধই হয় না; বিশেষ সন্ধ্যার পর। উজ্জ্বল আলোক-মালায় শোভিত রাস্তায় দলে দলে শত শত নর নারী কেবল হাসিমুখে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দেখিলে বাস্তবিকই মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দের আবির্ভাব হয়। দ্বিতীয়, রাস্তায় বসিয়া কাফি বা অন্য পানীয় সেবন। সব রাস্তার ধারেই অনেকগুলি কাফে (cafe) বা রেস্তরাঁ (Restaurant) আছে। ফুটপাথের উপর অনেকগুলি চেয়ার ও ছোট ছোট পাতরের টেবল। বৈকালে ৪।৫ টার পর হইতে রাত্রি ১২।১ টা পর্য্যন্ত এই সব চেয়ার লোক-পূর্ণ থাকে। এইরূপ রাস্তায় বসিয়া কাফি পান প্যারিস সহরের একটা অঙ্গবিশেষ। কেহ হয়ত এক পেয়ালা কাফি চাহিয়া সেই স্থানে ৩।৪ ঘণ্টা বসিয়া ক্রমাগত লোকজনের যাতায়াত দেখিতেছেন বা নিজের পত্রাদিই লিখিতেছেন; তবে অধিকাংশই যুগলমূর্ত্তি। এইরূপ ভাবে রাস্তায় বসিয়া সময় কাটান আর কোন সহরে এরূপ ভাবে নাই। ইংলণ্ডে এ প্রথা একেবারেই নাই। য়ুরোপের অন্য দুই একটি দেশে এইরূপ কতকটা আছে বটে; কিন্তু সে খুব কম।

প্যারিস সহর সন্ধ্যার প্রাক্কালে জাগিয়া উঠে, ও রাত্রি ২।৩টা পর্য্যন্ত খুব প্রফুল্ল থাকে। রাস্তায় খুব ভীড়; সকলেই সহাস্য মুখে গমনাগমন করিতেছে; থিয়েটার, অপেরা, মিউজিক হল প্রভৃতি হইতে বাদ্যধ্বনি শুনা যাইতেছে। সকলেই যথাসম্ভব ফ্যাসান করিয়া কাপড় চোপড় পরিয়া বাহির হইয়াছে। বাস্তবিকই প্যারিসের পরিচ্ছদে একটি মাধুরী আছে। যদিও ভারতবাসী আমি ও বিষয়ের বড় কিছু ধার ধারি না, তবুও প্যারিসের পরিচ্ছদে যে একটা মনোহারিত্ব দেখিয়াছিলাম, তাহা আর কোনও দেশে দেখিলাম না। প্যারিসের স্ত্রীলোকের মুখে (বোধ হয় এই পোষাকের জন্যই) যে কমনীয়তা দেখা যায়, ইংলণ্ডে তাহা নিতান্তই দুর্লভ। প্যারিসের আর একটা বিশেষত্ব, প্যারিসবাসীর সৌজন্য। কোনও লোককে রাস্তায় যদি পথ জিজ্ঞাসা করেন, তিনি তখনই আপনার সহিত কিছু দূর যাইয়া আপনাকে পথ দেখাইয়া দিবেন। লণ্ডনে কাহাকেও পথ জিজ্ঞাসা করিলে সে ব্যক্তি তখনই বলিবে, আমি এ সহর অথবা এ পল্লী চিনি না, অথচ সম্ভবতঃ সে সেই পল্লীতেই

আজন্ম বাস করিতেছে। তবে লণ্ডনে পুলিশম্যানরা এত সজ্জন ও তাহাদের রাস্তাঘাটও এত ভাল জানা থাকে যে অন্য লোককে জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন বড় হয় না। সে কথা পরে বলিল।

প্যারিসে আমার এই বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল যে, যে কয়জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমার অপেক্ষায় প্যারিসে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন খুব ভাল ফরাসী জানেন। এমন কি কেহ কেহ বিশ্বাসই করিত না যে, তিনি পূর্ব্বে কখনও প্যারিসে আইসেন নাই। তাঁহার ফরাসী ভাষার উচ্চারণ প্রভৃতি একেবারে অনিন্দ্যসুন্দর। তাঁহার গুণে আমরা অল্প খরচে ও অল্প সময়ে প্যারিসে যেরূপ সমস্ত দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা তিনি না থাকিলে কিছুতেই হইত না। আমি তাঁহার কাছে নিতান্তই কৃতজ্ঞ; কারণ, যদিও আমরা কলিকাতায় খুব কাছাকাছি থাকিতাম, স্বদেশে তাঁহার সহিত আমার আলাপ ছিল না এবং তিনি অনেক সময় নিজের অসুবিধা করিয়া আমার জন্য প্যারিসে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। তখন ধন্যবাদ দেওয়া হইয়া উঠে নাই; কারণ, উহাতে আমি অনভ্যস্ত। আজ এই সুযোগে শ্রীশ বাবুর গুণগান করিয়া লইলাম, যদি তাঁহার দৃষ্টিতে পড়ে।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু।

কবি।

(সংস্কৃত হইতে)

না ডাকিতে যায় কাছে গিয়ে পদ চলে না;
শুধাইলে সমাদরে কোন কথা বলে না;
কম্পযুতা তনুলতা শোভে স্বেদ হারেতে;
মলিন নলিন মুখ স্বররুদ্ধ লাজেতে;
প্রতিভা নবীনাবালা যা'র হৃদে উদিত
নবোঢ়া বধূর মত সরমে সে মুদিত।
সভামাঝে লাজে পদ থেমে যায় সহসা
হৃদয়ে উদয় ভাব রসনা যে অবশা।

এই কি চিকিৎসা ?

(১)

ভাল ছেলে বলিয়া বাহিরে আমার একটা বেশ খোস্ নাম ছিল, আর "সাহেবের" প্রিয় ছাত্র বলিয়া সহপাঠী মহলেও বেশ একটু পসার প্রতিপত্তি ছিল। তাই যখন কোন বিষয়ে কোনও অভাব অভিযোগাদির কথা জানাইবার জন্য সকল ছেলেরা আমাকে তাহাদের প্রতিনিধি করিয়া "সাহেবের" নিকট পাঠাইত, আর যখন আমি স্ফীতবক্ষে, দীপ্ত নয়নে "সাহেবের" সম্মুখে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া চাঁচাছোলা ইংরাজীতে সেগুলি বেশ গুছাইয়া বলিতাম এবং বাহিরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছেলেরা বিস্ফারিত নয়নে আমাদের পানে চাহিয়া থাকিত, আর অস্ফুট স্বরে জল্পনা করিত,—"অমরেন্দ্রের কি বরাৎ!" "ওঃ ওর কি কপাল জোর!"—তখন বাস্তবিকই আমি বুকের ভিতর একটা তেজ অনুভব করিতাম, প্রাণের ভিতর দিয়া একটা বৈদ্যুতিক শক্তির "ঝাঁকি" চলিয়া যাইত।

পরীক্ষার কিছুদিন পূর্ব্বে যখন "সাহেব" একদিন আমাকে হাঁসপাতালের 'অপারেশন্ থিয়েটারে' বলিলেন,—"I think, Amarendra, you must pass and be a worthy assistant of mine."—তখন ঈষৎ হাস্যের সহিত শিরঃসঞ্চালন করিলেও আমি মনে মনে প্রভূত আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলাম। তাহারপর সবেমাত্র এক সপ্তাহ পরীক্ষার ফল বাহির হইলেই "সাহেব" আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন,—"You should formally apply for the post now vacant in the Surgical Ward."

দুইচারিদিন পরে কলেজের প্রিন্সিপ্যালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেলাম দিলাম; তিনি হাসিমুখে আমাকে বহলি পরোয়ানা দিয়া একবারে আমাকে দাস-খতে সহি করাইয়া লইলেন। আমিও তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সানন্দচিত্তে মেসে ফিরিলাম; বুঝিলাম, First Surgeon স্পার্ক "সাহেবের" সুনজরের জোরেই আমি আজ Surgical Ward এর House Surgeon। আনন্দে আত্মহারা হইয়া তৎক্ষণাৎ ৫৲টাকার ল্যাংড়া আম আনাইয়া সেগুলির যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করা গেল; অবশ্য আমি একা নহে, মেসের কয়েকটি বন্ধুবান্ধব মিলিয়া। সকলে কত কি বলিতে লাগিল;—কেহ বলিল,—

"এইবার একটা কুবেরের একমাত্র কন্যার স্কন্ধে চাপ দাদা।" কেহ বলিল,—"মাহেন্দ্রক্ষণে 'সাহেবের' সহিত তোর শুভদৃষ্টি হ'য়ে ছিল।" রমেশ বাবু একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক, এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন, তিনি অতি মৃদুস্বরে সহানুভূতিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন,—"এইবার তোমার দুঃখ ঘুচিল, ভাই!" আমি কেবল হর্ষবিষাদের আন্দোলনে তাড়িত হইতে হইতে ঐ শেষের কথাই ভাবিতেছিলাম; মনে হইতেছিল, বুঝি আজ এই পঁচিশ বৎসর বয়সে জগতের মধ্যে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইবার একটা অধিকার পাইলাম; বোধ হইল, জগতের সাধারণ সুখ-দুঃখের উপর আমার একটা দাবী, একটা স্বত্ব যেন আজ হইতে নিজের পাঁওনা-গণ্ডা বুঝিয়া লইবার জন্য মাথা তুলিতে আরম্ভ করিল; মনে হইতে লাগিল, বুঝি এত দিনের জল-ঝড়ের পর, আজ আবার সৌভাগ্যের সুখরবি মাথার উপর মঙ্গল-আশীষের পূর্ণজ্যোতি-বিকাশে অতীতের সেই দুঃখ ভোগের স্মৃতিকে মধুরতর করিয়া তুলিতে লাগিল,—আর সঙ্গে সঙ্গে আমার বিগত জীবনের সুখসামগ্রীর অভাব আমার নয়নকে অশ্রুভারাক্রান্ত করিল। এমন সময়ে মেসের ছেলেরা আমার পিঠে একটা চড় মারিয়া বলিল,—"কি দাদা! নগদ টাকা ক'টা একদমে খরচ ক'রে কি heart এর contraction টা বেড়ে গেল নাকি?"

(২)

নূতন কাযে খুব প্রাণপণে খাটিতেছি। 'সাহেব' যথেষ্ট স্নেহ করেন, আর হাঁসপাতালের অনাথ, পীড়িত, রোগক্লিষ্ট বেচারীদের শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের ম্লান জ্যোতি আমার হৃদয়ের সমস্ত করুণাকে এমন একটা সবল আঘাতে জাগাইয়া তুলিয়াছে যে, সে আর আমার মনকে একটুও অবসন্ন হইতে দেয় না, কাযে কাযেই ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তিটা তাহার বড় কমই হয়। কিন্তু আর ত পারি না! প্রতিনিয়ত রোগীদিগের সেই "গেলুম—মলুম" চিৎকার,—সেই একঘেয়ে কান্নার সুর, সেই এক রকমের আইডোফর্মের গন্ধ, সেই একই প্রকার অসুখ, ব্যাণ্ডেজ, আর ড্রেসিং, সেই একই অনুচর সহচর ও কাযের ফর্দ্দ—আমাকে যেন একেবারে "অতিষ্ঠ" করিয়া তুলিয়াছে। এরা সব যেন আমাকে পাগল করিবার জন্য একযোগে ষড়যন্ত্র করিয়াছে; সবাই রোজ একই ভাবে, একই সুরে, একই সজ্জায় আমার বৈচিত্র্যবিহীন জীবনটাকে একটা নীরস, শুষ্ক—না, একটা প্রকাণ্ড মরুভূমিতে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এদিকে প্রত্যহই মার চিঠি পাইতেছি,—"শীঘ্র শীঘ্র ছুটী নিয়ে বাড়ী এস, বাবা। আমি তোমার জন্ত একটি পরীর মত মেয়ে দেখে রেখেছি। আমার একটি দোসর করে দাও, বাবা! আমি আর একা পেরে উঠি না ইত্যাদি।"—হাঁ, আমি এতদিন বিবাহ করি নাই, কারণ পড়াশুনার সময়ে—বিশেষতঃ মেডিক্যাল কলেজের ছয় বৎসরের rigorous imprisonment-এর মেয়াদের মাঝে আবার কাঁধ ভারি করা বুদ্ধিমানের কায নহে; তা ছাড়া বাবা মারা যাওয়ার পর হইতে আমাদের নিতান্তই দুরবস্থা গিয়াছে, বলিতে হইবে। কোনও ক্রমে মা তাঁহার শ্বশুরের ভিটার মাটি কামড়াইয়া থাকিয়া দিনান্তে একবার করিয়া বাস্তুভিটায় "সন্ধ্যা" দেওয়া বজায় রাখিয়াছিলেন।—আজকালকার নব্য ভব্য শিক্ষিত সহুরে সুন্দরী হইলে এতদিনে পৈতৃক ভিটাটা কৃত্তিবাসের বা চণ্ডীদাসের ভিটার অবস্থায় অথবা মহাকবি বাল্মীকির সমাধি-স্তূপে পরিণত হইত। মার মত মেয়ে নাই, তাই তিনি আজও সে চালাঘর খানিকে এবং তাহার আনুসঙ্গিক সমস্ত সুখকাহিনীজড়িত শত পুণ্যস্মৃতির নিদর্শনটিকে যক্ষের ধনের ন্যায় বুক দিয়া রক্ষা করিতেছেন। তাই, এক একবার মনে হইতেছিল, যাই, বাড়ী গিয়া কিছুদিন বিশ্রাম সুখভোগ করিয়া আসি। কলিকাতার এই অবিশ্রান্ত ঘড়্ ঘড়্ ছড়্ ছড়্ শব্দ-কোলাহলের নারকীয় বিভৎসতাকে কিছুদিনের জন্য দূরে ফেলিয়া রাখিয়া পল্লী-জননীর সেই শান্তিসুপ্ত স্নিগ্ধশ্যাম অভয়াঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করি। আবার ভাবি,— এই নূতন চাকরীটা? দূর হউক, চুপচাপ করিয়া থাকা যা'ক। হাঁসপাতালের রোগীর সেবা করিয়া যে আনন্দ হয়, সেইটাকেই কিছু বাড়াইয়া লইয়া, বেশ একটা মহত্বের খোলস তাহাকে পরাইয়া দিয়া, সেইটার দ্বারাই মনকে ভুলাইয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়। আবার যখন নাটক-নভেল-কাব্য-রসাভিসিক্ত মনের মাঝে সেই অব্যক্ত অচিন্তনীয় কল্পনা-প্রসূত সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী-রূপিণী মানস-প্রতিমার মোহিনী ছবি মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ-দীপ্তি হানিয়া যায়, তখন মনে হয়. বিবাহ জিনিষটি কি? যাহাই হউক, পাঁচ রকম উপসর্গে পড়িয়া প্রাণটা যেন কিছু ধড়্-ফড়্ করিতে লাগিল। ভাবিলাম, কি করি? একটু সুখ-শান্তির জন্ত কোথায় যাই?

* * *

(৩)

না, আর পারা যায় না! দুইটা বাজিয়া গিয়াছে, কাযগুলি শেষ করিয়া সবে মাত্র হাত ধুইয়াছি, আর অমনি বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল,—"বাবু, মন্ত্রী

কেস্ আয়া হ্যায়।" কিঞ্চিৎ রাগতস্বরে বলিলাম,—"তোম্‌রা মাথা আয়া হ্যায়।" তাহার পর কাগজপত্র দেখিয়া বুঝিলাম যে, সেটি Transferred case; রোগী Tuberculosis of the knee-jointএ অনেক দিন ভুগিতেছে, আমাদের হাঁসপাতালে অঙ্গচ্ছেদের জন্য আসিয়াছে। অতিশয় বিরক্তির সহিত তদন্ত করিতে গেলাম।

রোগীকে দেখিয়া বলিলাম,—"কই, দেখি কোন্ পায়ে? বাঁচবেও না, অথচ কেবল আমাদের ভোগাতে আসা।" এই শেষের কথাগুলি যদিও আপনার মনে মনে বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে সময়ে মন অত্যন্ত অপ্রসন্ন ছিল বলিয়া সেগুলি অস্বাভাবিক কর্কশ ভাবে, একটু জোরে মুখ হইতে বাহির হইল; আমি নিজেই আমার অসাবধানতায় একটু লজ্জিত হইলাম। তাহার পরে একটু স্থির হইয়া চাহিয়া দেখি যে, রোগী রোদনোন্মুখ। সুন্দর, সুঠাম চেহারা, বয়স প্রায় ১৮।১৯, লম্বা-লম্বা ঘন কাল চুল, বড় বড় টানা-টানা চোক দুটি জলে ভরিয়া ডবডবে হইয়া আছে। মুখখানি সুগোল, পরিষ্কার, গৌরবর্ণ, দেহ বেশ বলিষ্ঠ। সে হাত দু'খানি জোড় করিয়া বলিল,—"বাবুজী, তুমি আমার বাবা, তুমি আমার মা, তুমিই আমার ভাই। আমার কেউ নেই, তুমি আমায় বাঁচাও।" আমি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়াও, নিজের সেই দুর্ব্বলতাকে একটা কাঠিন্যের আবরণে ঢাকিতে গিয়া, গম্ভীর ভাবে বলিলাম,—"কাঁদ্‌লে আর আমি কি কর্‌ব? দেখি কোথায় ঘা। অমন কান্না ঢের দেখেছি।" যতদূর সম্ভব বিনীতভাবে ও কোমল বাক্যে সে রোগের বিবরণ ও পরিচয় একে একে বলিলে পরে, তাঁহার একটা ব্যবস্থা করিয়া আমি জোর করিয়া মুখের উপরে খানিকটা গাম্ভীর্য্য ছড়াইয়া দিয়া "বেশী গোলমাল ক'র না, চুপ ক'রে প'ড়ে থাকো।"—এই কথা বলিতে বলিতে সদর্পে সেস্থান পরিত্যাগ করিলাম।

কিন্তু মানুষের মন এমন একটা জিনিষ, যে তাহাতে অতি ক্ষীণ রেখারও বিম্বপাত খুব সহজেই হইয়া থাকে,—সে এত সূক্ষ্ম যে, সামান্য কম্পনেরও সে নিখুঁত পরিমাপক। কিন্তু তাহার তারগুলি এত খাঁটি সুরে বাঁধা যে, সামান্য একটু এড়ো ঘা লাগিলেই, সেগুলি ভিতরে বেসুরা বাজিবেই বাজিবে,—আবার বাহ্য বস্তুর যত মোহ, বহির্জগতের যত কোলাহল কর্ণের তীক্ষ্নতাকে যতই হ্রাস করুক না কেন, প্রাণের ভিতরের নিগূঢ় কথা—প্রাণের তারের কম্পন, তাহার ভাষা—তাহার শব্দ জগতের অপর সমস্ত ধ্বনিকে ছাপাইয়া উঠিবে, আর অনুষ্ঠিত কর্ম্মের যথাযথ সমালোচনা সমান ভাবে শুনাইয়া যাইবেই যাইবে।

সেদিন আমি অনেক কাযকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিলেও মাঝে মাঝে সেই করুণ রাগিণীর উচ্চ ঝঙ্কার আমার প্রাণে যেন ছুরির দাগ বসাইতেছিল। রাত্রিতে ঘুমের ঘোরেও শুনিতে লাগিলাম,—"তুমি আমার মা, তুমিই আমার ভাই, আমার কেউ নাই। আমার ভাই ও ভাইবৌ আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বাবু—উহুঃ, উহুঃ বড় ব্যাথা। একটু আস্তে, বাবুজী, বড় ব্যাথা।" রাত্রিতে অনেকবার ঘুমাইতে ঘুমাইতে উঠিয়া বসিয়াছি, অনেকবার তন্দ্রালস-ভাবে অর্দ্ধোচ্চারিত নিদ্রালস-কণ্ঠে বলিয়াছি,—"ভয় কি, ভাই! এই যে আমি।" কতবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বিছানায় বসিয়া মনে করিয়াছি—আজ ভাল কায করি নাই; অনাথ বিপন্নকে ভর্ৎসনা করিয়া ভাল কায করি নাই। দশ বৎসর পূর্ব্বের সেই ঘটনা,—একখানি এমনই মুখের ছবি, একটী এমনই করুণ বেদনা-জড়িতকণ্ঠের অভিমানোচ্ছ্বসিত বাণী যেন কর্ণে শুনিতে পাইলাম,—"উহু, দাদা! বড় ব্যাথা, বড় লাগ্‌ছে।" কি একটা অব্যক্ত যাতনায় বুকের ভিতরটা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল; বাকি রাত্রিটুকু আর ঘুম হইল না। বিছানায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতে করিতে আবার তন্দ্রা আসিল; আহা সেই সরল সুন্দর মুখখানি, পরিষ্কার বড় বড় টানা-টানা জলভরা চোক, আর লম্বা লম্বা কাল ঘন চুল! বলিতেছে—দাদা! বড় ব্যাথা, বুকে নাও।"

(৪)

তাহার পর প্রতিদিন সেই রোগীকে দেখিতে যাই,—হাঁসপাতালের কায থাকিলে ত যাই-ই, আবার কোন কায না থাকিলেও বাসায় বসিয়া পরকুৎসা করার চেয়ে,—সমাজ-নীতির, রাজ-নীতির প্রবল তর্কে ঘরের কড়িকাঠ ভাঙ্গিয়া ফেলার চেয়ে, গোলদিঘীতে অসংখ্য জনস্রোতের মধ্যে বেড়াইতে গিয়া বিষম ধাক্কা খাওয়ার চেয়ে, হাঁসপাতালের নির্জ্জন গৃহে, দীনহীনের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া একটি পরিত্যক্ত গৃহ-প্রতাড়িত পীড়িতের দুঃখ-কাহিনী শুনিতে আমার প্রাণের ভিতর বেশী আগ্রহ হইত।

প্রত্যহ বৈকালে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমি তাহাকে দেখিতে যাই, সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া বাসায় ফিরি। তাহার পা এখনও কাটা হয় নাই, সে একটু সুস্থ আছে, আজকাল সে বুকে একটু বল পাইয়াছে। তাহার মুখে, তাহার স্বদেশের, তাহার গৃহস্থালীর সমস্ত খুঁটি-নাটি শুনিতে বড় করুণ, বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। সে এখন মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী, হয় ত আর ইহজীবনে তাহাকে স্বদেশে ফিরিতে হইবে না, তাহার জন্মভূমিকে সে আর দেখিতে পাইবে না—এইরূপ

অবস্থায় তাহার উত্তেজিত চিত্তের সরল করুণ উচ্ছ্বাস, তাহার বাল্যের স্বপ্ন, তাহার শৈশবের খেলা, যৌবনের আকাঙ্ক্ষা যেস্থানে পূর্ণতা লাভ করিবার সুযোগ পাইত—সে জন্মভূমির, তাহার সোণার বাঙ্গালার এমন একটা মহিমময় বন্দনা-গীতি সে গাহিত, যাহা আমার নিকট বড় মধুর, অথচ গভীর ঠেকিত। সে যখন বলিত, কেমন করিয়া তাহারা দুইটি ভাই বোনে মিলিয়া গৃহপ্রান্তবাহিনী নদীতীরে খেলাঘর পাতিয়াছিল, কেমন করিয়া উর্ব্বরক্ষেত্রপ্রসূত ধনধান্যেভরা সৌন্দর্য্যশালী কামরূপে বর্দ্ধমান শশিকলার ন্যায় তাহারা স্ফূর্ত্তি পাইত, কেমন করিয়া তাহারা শৈশবে মাতৃক্রোড়ে শুইয়া উপকথা শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িত, কেমন করিয়া শেফালি-ফুলের মালা গাঁথিয়া কল্পিত দেবতার গলদেশে দুলাইয়া দিত, কেমন করিয়া সুখদুঃখের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের শৈশব ও বাল্যকাল অতীত হইয়াছিল—তখন আমারও শৈশব ও বাল্যকালের একটি নিখুঁত ছবি মনের মাঝে বেশ স্পষ্টভাবে উঁকি মারিত।

আবার যখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিত, সে তাহার পিতাকে কখনও দেখে নাই, তাহার মা-ই তাহাদের আশ্রয়দণ্ড ছিলেন, সেই মা যখন তাহার বড় ভাইয়ের হাতে তাহাকে ও তাহার ছোট বোনটিকে সঁপিয়া দিয়া এ জগৎ হইতে বিদায় লইলেন, তখন সে কি দুঃখের দিন! তাহার পর যখন ভাইবৌর অনাদরে—অবজ্ঞায় আধ ফুটন্ত কুসুমের মত কিশোর ভগিনীটি হঠাৎ শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল, আর সেই তীব্র হিংসাদ্বেষপূর্ণ সংসারের মাঝে সে একা দাঁড়াইয়া রহিল, তখন তাহার কি অবস্থা! আবার যখন তাহার দাদা তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন, বলিলেন, "এখানে তোমার জায়গা হবে না, তুমি চলে যাও," যখন তাহার জননী জন্মভূমির বুকে তাহার প্রতিপালনের জন্য একবিন্দু খাদ্য সামগ্রীও সে পাইল না, তাঁহার কোলে মাথা গুঁজিবার একটু স্থানও তাহার পক্ষে দুর্ল্লভ হইল, তাঁহার আপন ভাই তাহার সাক্ষাতে তাহার ছায়াস্পর্শ করিতে ঘৃণা-বোধ করিতে লাগিল, তখন একবার সে ভাবিয়াছিল যে, কামিখ্যার পাহাড় হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বিপুলস্রোত অতলস্পর্শী ব্রহ্মপুত্রের বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চিরদিনের জন্ত তাহার সকল জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়াইবে। আহা, তাহা হইলে বোধ হয় সে একটু শান্তিতে মরিতে পাইত!

কিন্তু সে ভাবিল যে, সে পুরুষ, মেয়ে মানুষের মত মৃত্যুই তাহার প্রধান আশ্রয় নহে; সে বিদেশে গিয়া নিজের পুরুষকারের বলে একবার জগতের

মাঝে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিবে, তাহাও যদি না হয়, জগৎ যদি এতই নিষ্ঠুর হয় যে, একটা পেট চলিবার মত আহার তাহাকে দিতে কুণ্ঠা বোধ করে, একটা মাথা রাখিবার মত জায়গা তাহাকে দিতে অস্বীকৃত হয়, তবে সে চলিয়া যাইবে,—কোন দুরস্থিত তীর্থস্থানে গিয়া, তীর্থাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সাক্ষী রাখিয়া তাহার সেই অপ্রয়োজনীয়, সেই প্রত্যাখ্যাত জীবনকে এ জগৎ হইতে অবসর লইতে, চিরদিনের জন্য এ জগতের মায়া কাটাইতে বাধ্য করিবে। তাহার পর সে তাহার জন্মভূমি—সৌন্দর্য্য ও প্রাচুর্য্যের লীলাক্ষেত্র কামরূপ—ভারতের সেই পুণ্যতীর্থ,—তাহার সাধের কামরূপ ছাড়িয়া অনেক কষ্ট, অনেক পরিশ্রমের পর কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সেখানে একটি আসাম বৌর্ডিংএর পাচকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, মাস কয়েক কাটাইয়া এখন সে রোগশয্যায় দিন যাপন করিতেছে। হায়! হতভাগ্য এ কালব্যাধি কি আর কখনও তোমায় ছাড়িবে? আমিই কি তোমায় এই কালকবল হইতে কাড়িয়া লইয়া আবার তোমায় জন্মভূমির ক্রোড়ে পাঠাইয়া দিতে পারিব? না; তাহা দুরাশামাত্র।

(৫)

কাল রাত্রিতে ভাল ঘুম হয় নাই। আজ সেই কেস্‌টি "সাহেব" take up করিবেন বলিয়াছিলেন। কাল সন্ধ্যার সময় অনেক বুঝাইয়া, অনেক প্রবোধ দিয়া তাহাকে রাজি করিয়াছি। আহা, তাহার এতদিনের পাখানি আজ পর হইতে চলিল! তাহার যে পা তাহাকে মাটীর উপর খাড়া করিয়া রাখিয়াছিল ও রাখিবে—আজ জীবনের মধ্যাহ্ন-সময়ে সে তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে,—এ কথা ভাবিতে আমারই বড় কষ্ট বোধ হইতেছে, তাহার ত হইবেই।

তাড়াতাড়ি কলেজে গিয়া শুনিলাম যে, "সাহেব" আইসেন নাই; আজ তিনি আসিবেন না, একটি বিশেষ "কলে" দার্জ্জিলিং গিয়াছেন। মনটা একটু দমিয়া গেল। বড়ই বিষণ্ণ চিত্তে ৭৮ নং "বেডে" সেই রোগীকে জানাইলাম যে, আজ আর তাহার পা কাটা হইবে না। দেখিলাম, সেও যেন একটু নিশ্চিন্ত হইল।

তাহারপর রাত্রিতে night duty ছিল; গিয়াই শুনিলাম, Resident Surgeon Maclein সাহেব বলিয়া গিয়াছেন, যেগুলি emergency case সেগুলি তিনি এই রাত্রিতেই দেখিবেন, আর একটা amputatien case আছে, সেটাও তিনি নিজেই শেষ করিবেন। অপ্রসন্ন চিত্ত আরও বেঠিক হইয়া গেল। মনটা কেমন একরূপ বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হইয়া বড়ই ব্যথা দিতে লাগিল।

কি করি, একে "সাহেব" বড় রাগী ও বদমেজাজী, তাহার উপর এ কাজের

তিনি বেশ সিদ্ধহস্ত নহেন। মনটা বড়ই চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে। নিতান্ত অপ্রসন্ন চিত্তে রাত্রির অন্যান্য কতকগুলি কায সারিতে লাগিলাম। এমন সময়ে "সাহেব" আসিলেন, এক মুখ হাসিয়া বলিলেন, "অমরেন্দ্র! তুমি বোধ হয় সব কেসগুলি গুছাইয়া রাখিয়াছ?" আমি নীরবে মাথা নাড়িয়া সম্মতি প্রকাশ করিলাম।

তাহার পর অপারেশন। দুই একটি যাহা উপস্থিত কেস্ ছিল, সেইগুলি সারা হইলে, সেই পরিচিত ৭৮নং রোগীকে লিফ্‌টে তুলিয়া অপারেশন্ থিয়েটারে আনা হইল। সে অনেকবার আমার মুখপানে চাহিতে লাগিল; আমি বলিলাম "ভয় কি! আমি রয়েছি।" কিন্তু আমারও বুকের ভিতরে যেন কেমন করিতে লাগিল; আমি কম্পিত হস্তে তাহার নাকে ক্লোরোফর্মের ঠুলি চাপিয়া ধরিলাম।

ধীরে ধীরে সেই কুসুম সুকুমার অঙ্গ অসাড়, নীরব, নীথর হইল। আহা! কি সে কমনীয় মূর্ত্তি। রাত্রিতে সেই অপারেশন্-রুম্ বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত, চতুর্দ্দিকে সুপরিষ্কৃত যন্ত্রাদি কাচপাত্রে সজ্জিত, শ্বেতধৌত পরিচ্ছদে নার্সেরা চারিদিকে দাঁড়াইয়া আছে, এ সমস্তই যেন চতুর্দ্দিকে একটা ঔজ্জ্বল্যের প্রবল তরঙ্গ ছুটাইল, ঘরের মাঝে যেন আলোকের ঢেউ খেলিতে লাগিল। এ সময়ে সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখের স্নিগ্ধ কান্তি কি মধুর! ধ্যানী বুদ্ধের ধ্যান-নিরত শান্তিপবিত্র মুখমণ্ডলের সেই আত্মদানের বিস্ময়কর চিত্র যেন এ মুখেও প্রতিফলিত। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস আমার অন্তরের অন্তস্তল হইতে বাহির হইল।

(৬)

"সাহেবের" অপারেশনে অসম্ভব রকম বিলম্ব হইতে লাগিল। রক্তস্রাব অত্যন্ত অধিক হইতেছে দেখিয়া আমি একটু অস্থির হইয়া পড়িলাম। 'একি! হাতে যে নাড়ী পাইতেছি না! তৎক্ষণাৎ তাহার হাতে যন্ত্র বিদ্ধ করিয়া ঔষধ দেওয়া হইল। 'সাহেব' অপারেশন্ করিতে গিয়া একটি বড় শিরা কাটিয়া ফেলিয়াছেন, অথচ সে দিকে তাঁহার লক্ষ্যই নাই। একি! একি সম্ভব? আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলে, তিনি গম্ভীর মুখে বলিলেন, "I know my duty best," এবং আপন মনে কায করিতে লাগিলেন। আমি সভয়ে আবার বলিলাম,—"Sir, saline inject করিতে হইবে। রোগীর রক্তহীনতায় মৃত্যু হইতে পারে।"

তিনি একটু কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, "Mind your business, Sir." আমি কিছু অশান্ত হইয়া উঠিলাম। তাহার পরে সাহেব রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া, গায়ে হাত দিয়া মুখ কিঞ্চিৎ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় sudden shock লেগে কোন cerebral vessel rupture হয়েছে, আমি open ক'রে দেখবো।" আমি ত বিস্ময়ে হতবুদ্ধি! একি! "সাহেবের" কি মাথার ঠিক নাই নাকি? তাহারপর তাঁহার ছুরিকা-সমেৎ উত্থিত হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া তাড়াতাড়ি বলিলাম, "আপনি কি কর্‌ছেন, সে এখনও নিশ্বাসপ্রশ্বাস ফেল্‌ছে, তাকে ঝোঁক কাটাতেদিন; আবার মাথায় অস্ত্রাঘাত ক'রে লোকটাকে খুন কর্‌বেন নাকি?" 'সাহেব' রাগে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিলেন, "Damn you! I don't want such an impertinent assistant. You ought to be disimssed immediately". আমি এত উত্তেজিত হইয়া ছিলাম যে আমার আত্মসংবরণের ক্ষমতাটুকুও তখন লোপ পাইয়াছিল। আমি তৎক্ষণাৎ "সাহেবের" সম্মুখে রাগান্বিতভাবে বলিলাম,—"I care a fig for the post. আপনি কি আমাকে মনুষ্যত্ব বর্জ্জন করতে বলেন। ছিঃ লোকটা মরছে, আর তাকে এই সময়ে আপনি পশুর ন্যায় কাটাকাটি কর্‌বেন; এ কখনও হ'তে পারে না। চাকরী করছি ব'লে কি হৃদয় পাষাণে বেঁধেছি নাকি? এই দণ্ডেই আপনার চাকরীর মুখে লাথি মেরে চলে যাচ্ছি।"

ফ্যাকাসে ঠোঁট দু'খানি বার কতক কাঁপিয়া কাঁপিয়া স্থির হইল। রোগীর মুখে মৃত্যুরছায়া ঘনাইয়া আসিল; মৃত্যুবিভীষিকা তাহার মুখে চোখে কেমন একটা আতঙ্কের ছায়া দেখাইয়া গেল; পরিপাণ্ডুর মুখশ্রী আরও পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল; হাত দু'খানি বাড়াইয়া দিয়া, একবার জোরে নিশ্বাস টানিয়া লইয়া সে বলিল, "দাদা! বড় ব্যাথা—জল, একটু জল।"

সে জল চাহিতেছে। আহা এ সময়ে কে তাহাকে একটু জল দিবে? আমি তৎক্ষণাৎ এক লাফে একটা বোতল হইতে একটু distilled water লইয়া তাহার মুখে চোখে দিতে লাগিলাম। সে কেবল কাতর ভাবে বলিল,—"দাদা! বড় ব্যাথা,—একটু জল। আমি যাই।" আমার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। আমি আর থাকিতে না পারিয়া, তাহার বুকের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিলাম, "কোথা যাচ্ছ, ভাই! কোন্‌খানে বেদনা, ভাই?" আমার চক্ষুর জল তাহার বুকের উপর মুখের উপর, অজস্রধারে পড়িতে লাগিল।

দশ বৎসরের সেই পুরাতন কথা আমার মনে আবার জাগিয়া উঠিল।

সেই আমার ছোট ভাই ! রুগ্নাকে আমি বড় মারিতাম, সে আমাকে যেন যমের মত ভয় করিত। তাহার শেষ অসুখের সময় আমায় দেখিলে বা আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সে কেবল বলিত,—"দাদা, বড় ব্যাথা।" সে শুধু আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া "দাদা ! দাদা !" বলিয়া ডাকিত।

আজ এই ঘোরা রজনীর মধ্য যামে, এমন স্থানে এরূপ অবস্থায় আত্মহারা আমি কি করিতেছি ? মুমূর্ষুর মুখের ক্ষীণ ম্লান জ্যোতি যেন গৃহের সমস্ত তীব্র আলোককে উপহাস করিয়া আরও ম্লান হইয়া আসিতেছে ; তাহার রক্তহীন পাণ্ডুবর্ণ মুখখানি যেন ক্ষণিক ক্ষমতামত্ত মানবকে সগর্ব্বে উপহাস করিয়া ধীরে ধীরে কালিমামণ্ডিত হইয়া আসিতেছে। বিধাতার দেওয়া একটা আশীর্ব্বাদ যেন আর্ত্তনাদ করিতে করিতে এ জগতের নিষ্ঠুরতাকে অভিশাপের বন্যায় ডুবাইয়া দিয়া উর্দ্ধদিকে চলিয়া যাইতেছে,—একটা উজ্জ্বল জ্যোতির ক্ষীণাবশেষ যেন ধীরে ধীরে আপনি নিবিয়া আসিতেছে,—বিধাতার একটা দান ধীরে ধীরে আবার দাতার নিকটে ফিরিয়া যাইতেছে। তাহাকে নীরবে যাইতে দাও ; ধীরে ধীরে তাহাকে অনন্তে মিশাইতে দাও। চুপ !

অমর।

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ।

—:•:—

বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ ভাবে উপদেশ দিতেন; তাহার একটি পরিচয় দিব।

আমাদের বংশের কেহ বাহিরের লোকের কাছে মন্ত্র গ্রহণ করেন ন বংশের মধ্যে কোন বয়োজ্যেষ্ঠ উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। এ প্রথা বহুকাল হইতে আমাদের বংশে চলিয়া আসিতেছে। তদনুসারে আমার কোন খুল্লতাত-ভ্রাতা বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। মন্ত্র প্রদান করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নবদীক্ষিত শিষ্যকে একটিমাত্র উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি নিয়ত স্মরণ রাখিবে, তুমি ব্রাহ্মণ।" কথাটি বড় ছোট নহে। এত অল্প কথায় এত বড় উপদেশ হইতে পারে, আমি পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না।

এবার বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ের পরিচয় দিবার অভিপ্রায়ে একটা ক্ষুদ্র গল্পের অবতারণা করিব। কাঁটালপাড়ার সন্নিকটবর্ত্তী গরিফা নিবাসী কোন ভদ্র-সন্তান বিদ্যাভ্যাস করিতে সমুদ্রপারে গমন করিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সমাজ তাঁহার বিরুদ্ধে দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে। তৎকালে আমার পিতা ও খুল্লতাত সঞ্জীবচন্দ্র সমাজের নেতা। ভদ্র-সন্তান আমার পিতার আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। পিতা আশ্রয় দিতে পরাঙ্মুখ হইয়া বলিলেন, "আমি যদৃচ্ছা সমাজের উপর অত্যাচার করিতে পারি না ; তুমি তোমার জাতির কাছে যাও। যদি তোমার স্বজাতি তোমায় গ্রহণ করে ত তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি নাই।"

অবশেষে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। কিন্তু জাতি বা সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের শরণাগত হইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের দয়া হইল। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা উপায় স্থির করিলেন; ভদ্র-সন্তানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, তুমি একটা রবিবারে আমায় নিমন্ত্রণ কর, আমি তোমার বাড়ীতে গিয়া খাইয়া আসিব।"

তিনি তাহাই করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র রবিবার দিবস বেলা ৯ টার সময় শিয়ালদহে ট্রেণে উঠিলেন ; এবং দশটা সাড়ে দশটার সময় নৈহাটীতে নামিয়া ঘোড়ার গাড়ী করিয়া নিমন্ত্রণকারীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, কাঁটালপাড়ার কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না, অথবা তাঁহার উদ্দেশ্য জানিতে পারিল না।

কথিত ভদ্রলোকের গৃহে অন্নাহার করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অপরাহ্নে আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আমি তখন উপস্থিত ছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র দুই একটা কথার পর সহাস্যে বলিলেন, "দাদা, একটা কায করেছি।"

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করেছ ?"

বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যের সুর আরও চড়াইয়া বলিলেন, "রায়েদের বাড়ী খেয়ে এসেছি।"

পিতা স্তম্ভিত হইলেন। রায় মহাশয় অন্তরালে অবস্থান করিতেছিলেন। সময় বুঝিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। তখন পিতা আর কি বলিবেন ? ভদ্র-সন্তান অচিরে সমাজে স্থান পাইলেন। কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল কিছু না লইয়া ছাড়েন নাই। কবেই বা ছাড়েন ? অন্নপ্রাশনে বা শ্রাদ্ধে—আগমনে বা নিষ্ক্রমণে তাঁহাদের সমান আনন্দ। শ্রাদ্ধে কিছু বেশী, কেন না তখন বিদায় দিয়া 'বিদায়' গ্রহণ করেন।

ভদ্রসন্তান সমাজে স্থান পাইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ ছিলেন। এইরূপ অনেকে সমাজচ্যুত হইয়া অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের শরণাগত হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের অভয় দিয়া সমাজভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম করিবার প্রয়োজন নাই। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বাবু তারকনাথ সরকার সে সব কথা বলিতে পারেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুরে ছিলেন তখন কোন পত্রিকা-সম্পাদক ভিক্ষার্থে কলিকাতা হইতে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। চাঁদা কি জন্য, তাহা আমি জানি না। সম্পাদক মহাশয় চাঁদা সংগ্রহে বড় একটা কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্রকে ধরিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র রাণী স্বর্ণময়ীকে অনুরোধ করিলেন। রাণী তদ্দণ্ডে চারিশত টাকা প্রদান করিলেন ; সম্পাদক মহাশয় চারিশত টাকা লইয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ধারণা জন্মিল যে, এই টাকা উচিত কার্য্যে ব্যয়িত হয় নাই। তিনি বড় ক্ষুব্ধ হইলেন ; কেন না, তাঁহারই চেষ্টায় এ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। তিনি এই চারি শত টাকা দাতাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। সম্পাদক উদ্গীরণ করিতে অসম্মত হইলেন। তখন উভয়ের মধ্যে কড়া কড়া কথা চলিতে লাগিল। অবশেষে উভয়ের মধ্যে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল।

সম্পাদক মহাশয় তখন বেশ এক হাত লইলেন ; তাঁহার হাতে কাগজ ছিল ; তিনি সেই পত্রিকার স্তম্ভে খুব জোর কলমে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে লিখিতে লাগিলেন। কাগজখানি সে সময় বাঙ্গালায় লিখিত হইত। বাঙ্গালা ভাষায়, বাঙ্গালীর গৌরব বঙ্কিমচন্দ্র অনেক গালি খাইলেন। তিনি কোন উত্তর দিলেন না ; কেবল 'রজনীতে' হীরালালকে আনিয়া সম্পাদকের চরিত্র অঙ্কিত করিলেন।*

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

---

* গ্রন্থকারের বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী হইতে।

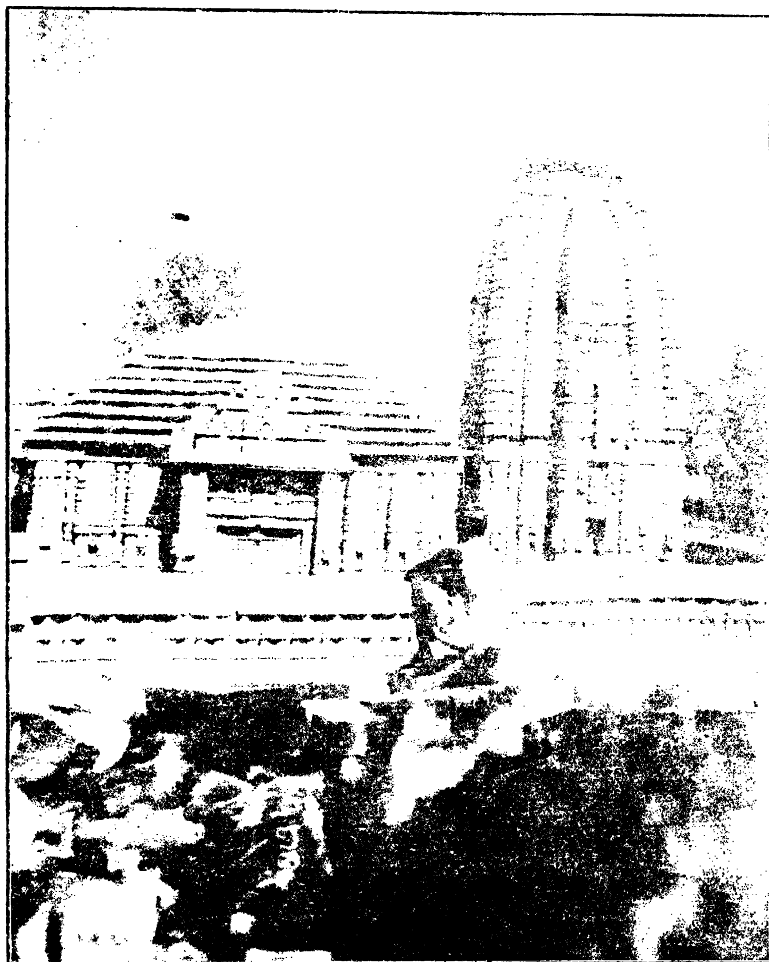
শ্রীক্ষেত্র।

—:০:—

অদ্য শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথ-যাত্রা। কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই 'রথেতু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে' এই মহাজনোক্তি স্মরণ করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু যাত্রীর দল নানা দিগ্দেশ হইতে শ্রীক্ষেত্র পুরী অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। উৎকলে শ্রীক্ষেত্রে এ মহোৎসব যে দেখিয়াছে সে আর জীবনে তাহা ভুলিবে না। লক্ষাধিকলোক মিলিত কণ্ঠে যখন 'জয় জগন্নাথ জি কি জয়' উচ্চারণ করে তখন সেই উৎসারিত ভক্তির উৎসে অবিশ্বাসীর হৃদয়ও প্লাবিত হইয়া উঠে। সমগ্র উৎকল দেশ প্রাচীন কাল হইতেই ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ; এই স্থানে পঞ্চোপাসকের তীর্থ ক্ষেত্রই বিরাজমান :—(১) বিরজা মণ্ডল বা পার্ব্বতী ক্ষেত্র —যজ্ঞপুর বা যাজপুর—পূতসলিলা বৈতরণীতীরে (২) মহাবিনায়ক ক্ষেত্র—গণপতি ক্ষেত্র—ধান মণ্ডল রেলষ্টেশন হইতে কিয়দ্দূরে (৩) হরক্ষেত্র—একলিঙ্গ লিঙ্গেশ্বর বা ভুবনেশ্বর (একাম্রবন) (৪) অর্কক্ষেত্র বা পদ্মক্ষেত্র—কোণার্ক—এই সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত সূর্য্যমন্দির পুরী হইতে নয় ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে সাগরতীরে (৫) শ্রীক্ষেত্র—পুরুষোত্তম—পুরী।

এই প্রধান পঞ্চতীর্থ ব্যতীত সাধারণ দেব মন্দির যে উড়িষ্যায় কত আছে কে তাহা গণনা করিবে? তাই হণ্টার লিখিয়াছেন, শত শত দেবালয় এই প্রদেশের কীর্ত্তি বিস্তার করিতেছে। এমন গ্রাম বিরল যথায় উৎকৃষ্ট জমিগুলি দেবোত্তর নহে। প্রতি নগরে বৃহৎ মন্দির ও প্রতি গ্রামে দেবালয় বিরাজমান। এই ধর্ম্মপ্রবণতার স্রোত পার্ব্বত্য অঞ্চলের দিকেও প্রধাবিত, ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক পর্ব্বতচূড়া দেবমন্দিরে অলঙ্কৃত। বৈদেশিকরাও এ দেশে আসিলে পবিত্র ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি, এই ভাব অনুভব করেন। এখনও উড়িয়া কৃষক বলিয়া থাকে, প্রতিমা-নাশক মুসলমান বিজেতা এই স্থানে আসিয়া অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়াছে। কথিত আছে, জনৈক মুসলমান সেনাপতি বলিয়াছিলেন,—(১) এ দেশ মানুষের উচ্চাভিলাষের বা জয়াকাঙ্ক্ষার স্থান নহে, ইহা দেবতার লীলাভূমি; এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এস্থানে ধর্ম্ম-যাত্রীরই অধিকার। বিদেশীর মনেই যখন এই ভাব তখন তীর্থযাত্রী বা পর্য্যটক হিন্দুর পক্ষে এই পূণ্য ভূমি কিরূপ অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন বলিয়া

(১) Stirling's Account of Orrisa



শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির—পুরী।

Printed by K. V. Seyne & Bros.

প্রতীয়মান হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। উৎকলের সমস্ত তীর্থের মধ্যে আবার তীর্থরাজ পুরুষোত্তমই বহু প্রাচীন কাল হইতে সমগ্র ভারতবাসী হিন্দুর ভক্তিপূর্ণ অনুরাগ আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। বৈদিক উক্তি ছাড়িয়া দিয়া (১) মহাভারতের লবণ সাগর গর্ভ হইতে 'পুনরুন্নহ্য সলিলা দ্বেদী রূপা স্থিতা বভৌ' (২) উল্লেখে যদি শ্রীক্ষেত্রের রত্ন বেদী অনুমান করা যায়, তবে বলিতে হইবে অতি প্রাচীন কাল অবধি পুরী দেবেশ বিষ্ণুর অধিষ্ঠানক্ষেত্র। প্রধান প্রধান পুরাণ গ্রন্থে পুরুষোত্তমের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে (৩) পরবর্ত্তী তন্ত্র গ্রন্থেও এই মাহাত্ম্য সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্বীকৃত। কলিঙ্গদেশ মহারাজ অশোকের রাজ্যভুক্ত হইবার পর উৎকলে বৌদ্ধ প্রভাব বদ্ধমূল হয়। বৌদ্ধেরাও এই পুরুষোত্তমকে কেন্দ্র করিয়া উড়িষ্যায় সদ্ধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। খণ্ডগিরি প্রভৃতিতে জৈন ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের দৃষ্টান্তও বিরল নহে। তবেই অন্ততঃ সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর ধরিয়া শ্রীক্ষেত্র হিন্দুর ধর্ম্ম-ক্ষেত্র স্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা সাহস করিয়া বলা যায়। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মগণ এ ক্ষেত্রে শুভাগমন করিয়া ইহাকে পুণ্যতম করিয়া তুলিয়াছেন। এ হেন তীর্থে রথ দেখিবার জন্য লোকের অত্যাধিক আগ্রহ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

---

(১) স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দন অথর্ব্ব বেদ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আদৌযদ্দারু প্লবতে সিন্ধোমধ্যে অপুরুষম্।
তদাবলম্ব দুর্দ্দনো তেন যাহি পরং স্থলম ॥

শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণেও এই বচন আছে। কিন্তু বর্ত্তমান মুদ্রিত অথর্ব্ব বেদে ইহা না পাইয়া কেহ কেহ ইহার আধুনিকত্ব প্রতিপাদনে প্রয়াসী। শাঙ্খায়নের ভাষ্যকার "অপুরুষ দারুময় পুরুষোত্তমের আরাধনা করিলে লোকে 'পরং স্থলং' বিষ্ণুলোক যায়" এই ব্যাখ্যাই দিয়াছেন, এবং পণ্ডিতপ্রবর রঘুনন্দনের উক্তি প্রামাণিক।

(২) বন পর্ব্ব—১৪৪। "সান্নিধ্যং কুরু দেবেশ সাগরে লবণাম্ভসি" ইত্যাদি উক্তি শ্রীক্ষেত্র লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে স্পষ্ট মনে হয়। তবে এ কালে "বৌদ্ধ প্রভাবের পূর্ব্বে হিন্দুর প্রায় কিছুই ছিল না" এই মত বড়ই প্রবল; যে কিছু প্রাচীনত্বের প্রমাণ বাহির হয়—তাহাই প্রক্ষিপ্তের মধ্যে পড়িতেছে বলিয়াই—ভয়ের কথা।

(৩) ব্রহ্ম পুরাণ, পদ্ম পুরাণ, নারদ পুরাণ, এবং স্কন্দ পুরাণের উৎকল খণ্ডে জগন্নাথ মূর্ত্তি স্থাপনের বিবরণ এবং পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। পুরাণগুলির বয়স এখনও নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় নাই। অন্যান্য পুরাণেও ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। কপিল সংহিতা ও নীলাদ্রি মহোদয় উড়িষ্যায় লিখিত। এতদ্ভিন্ন বিষ্ণু যামল, রুদ্র যামল, বৃহদ্ব্রহ্ম পরিশিষ্ট ও চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণি প্রভৃতি তন্ত্রাদি গ্রন্থেও ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে।

স্কন্দ পুরাণে উৎকল খণ্ডে লিখিত আছে যে, সত্যযুগে জনৈক তপস্বী পরম ভাগবত অবন্তীর অধিপতি মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ভারতবর্ষের অন্তর্গত বিষ্ণু ক্ষেত্র সমূহের মধ্যে ওড্র দেশের সমুদ্রতীরবর্ত্তী পুরুষোত্তম ক্ষেত্র অতি মহান্। বৈতরণী হইতে ঋষিকুল্যা পর্য্যন্ত স্থান অতি পবিত্র, তন্মধ্যে দক্ষিণ সমুদ্রের উত্তর ভাগের পঞ্চক্রোশ পুণ্যতর এবং ইহার মধ্যে ক্রোশত্রয়পরিমিত দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খাকৃতি ভূমি পুণ্যতম, কিন্তু দুর্গম। উহার তৃতীয়াবর্ত্তে নীলাচলে নীলনীরদকান্তি নীল-মণিময় মাধবমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছেন। দেবতারা বৎসরের অর্দ্ধেক কাল তাঁহার পূজা করেন, অপরার্দ্ধে বিশ্ববসু নামক পুণ্যবাণ শবর অর্চ্চনা করিয়া থাকে। সেই স্থান অতি গোপনীয় পুণ্যভূমি। সামান্য গুণশালী ব্যক্তিদিগের চর্ম্মচক্ষু দ্বারা ঐ মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। এই অদ্বিতীয় পবিত্র বিষ্ণুবেষ্টনে আমি নিরন্তর বাস করি। যদি তুমি এই শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে অভিলাষী হও, তবে প্রথমে আপনার কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে তথায় প্রেরণ কর। তিনি পথ নিরূপন করিয়া প্রত্যাগমন করিলে তুমি সেই ক্ষেত্রে যাত্রা করিবে।" এই বলিয়া তপস্বী অন্তর্হিত হইলেন।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বীয় পুরোহিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যাপতিকে নীলাদ্রি গমনে আদেশ দিলেন। বিদ্যাপতি মহানদী উত্তীর্ণ হইয়া একাম্র কানন লঙ্ঘন করিয়া নীলাচলের দিকে চলিলেন; পথিমধ্যে ব্যাধ বিশ্ববসুর সাক্ষাৎ পাওয়ায় তাহার সাহায্যে অনায়াসে দুর্গম পথ অতিক্রম করিলেন। ব্যাধের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া তাহার সাহায্যে তিনি রোহিণ্যাদি তীর্থ ও নীলমাধব দর্শন করিলেন। অতঃপর বিদ্যাপতি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া রাজাকে সংবাদ দিলে ইন্দ্রদ্যুম্ন অবিলম্বে মন্ত্রীর হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া সপরিবারে প্রধান প্রজাবর্গ ও সম্পত্তিসহ নারদের সঙ্গে উৎকল যাত্রা করিলেন। উড়িষ্যার সীমান্তভাগে রাজা চণ্ডিকা-দেবী দর্শন ও অর্চ্চনাদি করিলেন। চিত্রোৎপলা মহানদীর সমীপবর্ত্তী স্থানে উড়িষ্যারাজের সহিত ইন্দ্রদ্যুম্নের সাক্ষাৎ হইল তাঁহার নিকট নীলাচল বালুকায় প্রোথিত হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নিতান্ত মুহ্যমান হইয়া শেষে নারদের পরামর্শে ও উৎসাহে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহারা একাম্রকানন (ভুবনেশ্বর) দিয়া অগ্রসর হইবার সময় লিঙ্গেশ্বরের পূর্ব্বাহ্ণ-পূজার বাদ্য-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। নারদ বলিলেন, কৃষ্ণের সহিত দ্বন্দ্বে পরাস্ত সুতরাং ভীত হইয়া শিব তখন একাম্রকাননে অবস্থিত

করিতেছেন। রাজা বিন্দুতীর্থে স্নান ও একলিঙ্গের অর্চ্চনাদি করিয়া পরে অগ্রসর হইলেন। নারদ বলিয়াছিলেন, নীলমাধব তিরোহিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি পরে দারুব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ হইবেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন সমুদ্রতীরে উপনীত হইয়া নরসিংহ দেবের স্থাপনের পরে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞের ষষ্ঠ দিনে রাজা স্বপ্নে ভগবানের শ্বেতদ্বীপস্থ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। নারদের নিকট স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করিলে নারদ বলিলেন "দশ দিনেই স্বপ্নের ফল প্রত্যক্ষ হইবে; তিনি যজ্ঞশেষে বৈকুণ্ঠনাথের সাক্ষাৎ পাইবেন।" যজ্ঞাবসানে মঞ্জিষ্ঠাবর্ণের এক বৃক্ষ সমুদ্রতটে সংলগ্ন দেখিয়া লোক রাজাকে সংবাদ দিল। শঙ্খচক্রাঙ্কিত মহান্ বৃক্ষকাণ্ডের সৌরভে সমুদ্রতীর পরিব্যাপ্ত হইল। নারদ মহানন্দে রাজাকে বলিলেন "স্বপ্ন অদ্য সফল হইল। শ্বেতদ্বীপে ভগবানের লোম হইতে এই বৃক্ষের উৎপত্তি।" রাজা বৃক্ষরূপী চতুর্ভূজ নারায়ণ মূর্ত্তি দেখিলেন; নারদের পরামর্শে বাদ্যোৎসব সহকারে তরুরূপী যজ্ঞেশ্বরকে লইয়া গিয়া যজ্ঞবেদীর মধ্যে স্থাপিত করিলেন। এই দারুতে কি প্রকারে প্রতিমা নির্ম্মিত হইবে জিজ্ঞাসিত হইয়া নারদ বলিলেন, "অচিন্ত্য জগৎ-পতির রূপ কে স্থির করিতে পারে?" ইতোমধ্যে আকাশ বাণী হইল, "মহারাজ চিন্তা নাই, শাস্ত্রপাণি এক বৃদ্ধ বার্দ্ধকি আসিয়া নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিবে। পঞ্চদশ দিবস প্রতিমার নির্ম্মাণস্থান অর্থাৎ যজ্ঞবেদীর চতুর্দ্দিক রুদ্ধ করিয়া রাখিবে, এবং সর্ব্বদা বাদ্যধ্বনি করাইবে, যেন নির্ম্মাণ-শব্দ কেহ না শুনিতে পায়। যে ঐ শব্দ শুনিবে তাহার বংশনাশ ও যে দেখিবে সে অন্ধ হইবে।" বিশ্বকর্ম্মা বৃদ্ধ সূত্রধররূপে মহাবেদীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পঞ্চদশ দিবসে দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে দেখা গেল, বার্দ্ধকি অন্তর্হিত এবং সুদর্শনহস্ত জগন্নাথ, বলরাম ও চারুমুখী সুভদ্রা রত্নবেদীর উপর বিরাজিত।

অনন্তর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সহস্র হস্ত উচ্চ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার গর্ভ প্রতিষ্ঠা করাইলেন এবং শবর বিশ্ববসুর বংশধরগণকে আনাইয়া প্রতিমার লেপ-সংস্কার কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। তৎপরে মন্দিরের ও প্রতিমার প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্রহ্মাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন নারদের সঙ্গে ব্রহ্মলোকে উপনীত হইলেন। ব্রহ্মা তখন পূর্ণ ব্রহ্মের লীলা-গান-শ্রবণে ব্যাপৃত ছিলেন। রাজা দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে নারদ সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলে ইন্দ্রদ্যুম্নকে নিকটে আনাইয়া ব্রহ্মা বলিলেন—"রাজন, তুমি পরম বিষ্ণুভক্ত। তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আমি সম্মত আছি।

কিন্তু তুমি যে সময়টুকু এই স্থানে অপেক্ষা করিয়াছ, তাহার মধ্যে ৭১ যুগ অতীত হইয়াছে। এখন স্বয়োচিষ মনুর অধিকার। যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছ সেই মূর্ত্তির ও প্রাসাদের চিহ্নমাত্র আছে। যাহা হউক তোমরা অগ্রগামী হইয়া প্রতিষ্ঠাসম্ভার আয়োজন কর, আমি দেবগণসহ পশ্চাৎ যাইতেছি। ইন্দ্রদ্যুম্ন মর্ত্ত্যে প্রত্যাগমন করিয়া অনেক অনুসন্ধানের পর দেখিলেন যে, তাঁহার নির্ম্মিত মন্দিরে উড়িষ্যার গাল রাজার প্রতিষ্ঠিত মাধবমূর্ত্তি বিরাজমান। মাধবকে মন্দিরের পশ্চিম ভাগের ক্ষুদ্র মন্দিরে স্থাপিত করিয়া রাজা প্রতিষ্ঠার দ্রব্যাদির আয়োজন করিতে লাগিলেন। লোকে গাল রাজাকে এই বৃত্তান্ত জানাইলে তিনি মহাক্রোধে সসৈন্যে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন; কিন্তু ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া অপূর্ব্ব দেবমূর্ত্তি ও ব্রহ্মা প্রভৃতিকে তাহার প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত দেখিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্নের যথারীতি সৎকার করিয়া গাল রাজা তাঁহার অনুগত হইয়া প্রতিষ্ঠাকার্য্যে যোগ দিলেন। ব্রহ্মা ভরদ্বাজ মুনিকে প্রাসাদ-প্রতিষ্ঠা করিবার আজ্ঞা দিলেন। বৈশাখের শুক্ল অষ্টমী তিথিতে পুষ্যা নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সময় ভগবান্ স্বয়ং ইন্দ্রদ্যুম্নকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার এই নিষ্কাম কার্য্যে আমি প্রীত হইয়াছি। তুমি ভূরি অর্থব্যয় করিয়া এই প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছ—ইহ ভগ্ন হইলেও আমি এই স্থান ত্যাগ করিব না। অপরার্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত দারুব্রহ্মরূপে এই স্থানে অবস্থান করিব।" (১) অতঃপর পূজা, রথ উৎসবাদির বর্ণনা, মহাবেদী মহাত্ম্য ও ক্ষেত্র-মহাত্ম্য বর্ণিত আছে। বিশ্বাবসুবংশীয় দয়িত (ভগবানের প্রিয়) এবং বিদ্যাপতিবংশীয়রা (বর্ত্তমানে পতি ও মহাপাত্র) সেবার কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। অন্ন প্রসাদ সম্বন্ধে জাতিভেদজ্ঞান ত্যাগ করিয়া নির্ব্বিকার ভাবে উহা গ্রহণ করিতে হইবে, 'প্রাসাদের অবমাননার ফল' ইত্যাদি কথাও উৎকল খণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম এবং নারদ পুরাণে উল্লিখিত বিবরণ অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত এক বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহাতে বিদ্যাপতি ও শবর-সংবাদ নাই; ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আসিয়া যজ্ঞসমাপনান্তে কিরূপে পুরুষোত্তম-সাক্ষাৎকার লাভ হইবে এই চিন্তায় কুশাসনে নিদ্রিত হইয়া পড়িলে ভগবান তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলেন, "হে মহীপাল, তোমার ভক্তিতে ও যজ্ঞে আমি প্রীত

(১) উৎকলখণ্ড (১৮—২৯ অধ্যায়)

হইয়াছি। তুমি আমার সনাতনী প্রতিমা প্রাপ্ত হইবে। নিশাবসানে সাগর-তীরে জলে স্থলে কুলালম্বী এক মহা বৃক্ষ দেখিতে পাইবে। একাকী পরশু হস্তে তথায় যাইবে এবং সেই বৃক্ষে আমার প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবে।" রাজা সেই বৃক্ষচ্ছেদন আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় বিষ্ণু বিশ্বকর্ম্মাকে লইয়া তথায় উপনীত লইলেন এবং পরিশেষে বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা ত্রিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইল। (১) পদ্মপত্রায়ত নয়ন শঙ্খচক্রগদাধর নীলজীমূতসন্নিভ ও দিব্য হরি মূর্ত্তি (২) শারদেন্দুসমপ্রভ নীলাম্বর মহাবল অনন্তমূর্ত্তি (৩) স্বর্ণবর্ণাভা হারকেয়ূরভূষিতা সুভদ্রা মূর্ত্তি। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের দক্ষিণে নৈঋত কোণে মণ্ডপের উপরে রাজার নির্ম্মিত মন্দিরে মূর্ত্তিত্রয় স্থাপিত করিবার নিমিত্ত স্বয়ং বিষ্ণু আদেশ দিয়া গেলেন। মহা মহোৎসবে রথে করিয়া মূর্ত্তিত্রয় প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত হইল। ইতি। উৎকল খণ্ডের বর্ণনার সহিত ইহার তুলনা করিলে বলিতে হইবে, উৎকল খণ্ড পরবর্ত্তী কালে লিখিত। অন্যান্য পূরাণে (কুর্ম্ম, পদ্ম, মৎস্য, বরাহ ইত্যাদিতে) উৎকল খণ্ডে প্রতিপাদ্য ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কপিল সংহিতা, নীলাদ্রি-মহোদয় প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের বর্ণনা বিস্তারিত বলিয়া তাহা দেশীয় পণ্ডিতের রচনা বলিয়া অনুমিত হয়। মন্দিরে রক্ষিত মাদলা পঞ্জীতে জগন্নাথের ইতিহাস লিখিত আছে। উড়িয়া ভাষায় মাগুনিয়া দাসের ক্ষেত্র পুরাণ ও শিশুরামের দারুব্রহ্ম নামক পুস্তকদ্বয়ে উৎকলে প্রচলিত প্রবাদযোগে রূপান্তরিত হইয়া জগন্নাথের প্রতিষ্ঠাব্যাপারও জগন্নাথদেবের মত নব কলেবর ধারণ করিয়াছে। বারান্তরে ঐ সমস্ত বর্ণনার সার সংগ্রহ করা যাইবে।

শ্রীজগন্নাথ নীল মাধবরূপে পূর্ব্বে শবরের পূজিত ছিলেন, ইন্দ্রদ্যুম্নের আগমনের অব্যহিত পূর্ব্বে সমুদ্রমধ্যে গুপ্ত হইয়াছিলেন, শেষে ইন্দ্র-দ্যুম্ন যজ্ঞান্তে দারুব্রহ্মরূপে জগন্নাথের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমস্ত উল্লেখে অনুমিত হয় যে, আর্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা প্রথমে উৎকলে পদার্পণ করেন, তাঁহারা প্রাচীন অধিবাসী শবরদলকে অনুগত করিবার অভিলাষে, তাহাদের স্থাপিত মূর্ত্তির অনুকরণে দারুমূর্ত্তির পূজাই প্রচলিত করিয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের যজ্ঞের মহাবেদীই পূণ্যতীর্থ বলিয়াই গণ্য হইয়াছিল (মহাভারতের-বেদীর উল্লেখ পুরাণের উক্তির সহিত মিলাইয়া দ্রষ্টব্য); এখনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-বর্গ ঐ মহাবেদীকেই পুণ্যময় সিদ্ধপীঠ জ্ঞান করেন; ঠাকুর মহাবেদীতে না থাকিলে 'মহা প্রসাদ' ই হয় না। উৎকল খণ্ডে রথোৎসবকে মহাবেদীর উৎসব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। দারুব্রহ্মপ্রতিষ্ঠার বিষয়টিই অথর্ব্ববেদের

ও শাব্বায়নের "অপৌরুষেয় দারু" বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। মহাভারতাদিতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভূভাগই শবর জাতির বাসভূমি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের এবং রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয়ের গবেষণায় ইতঃপূর্ব্বে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, জগন্নাথের পূজা উৎসব প্রভৃতির ভিত্তি বৌদ্ধ ধর্ম্ম। তাঁহাদের মতে জগন্নাথমূর্ত্তি বৌদ্ধ যন্ত্র বা ত্রিশুল মূর্ত্তির বা বৌদ্ধ ত্রিমূর্ত্তি (বুদ্ধ, সঙ্ঘ ও ধর্ম্মের) অনুকরণ; জগন্নাথ মূর্ত্তির মধ্যে এখনও ব্রহ্ম পদার্থ বলিয়া যে বস্তুটি সযত্নে রক্ষিত হয় তাহা বুদ্ধ দেবের চিহ্ন বা উহার অনুকরণে সৃষ্ট; জগন্নাথের রথযাত্রা উৎসব বুদ্ধদেবের দন্তোৎসব—ইত্যাদি ইত্যাদি (১) মহা প্রসাদে জাতিভেদ প্রথার মূলোচ্ছেদ এবং দেশীয় প্রবাদে ও চিত্রপটে বৌদ্ধ অবতারের জগন্নাথ মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় এই দুইটি তাঁহাদের উল্লিখিত প্রমাণের মধ্যে প্রধান কথা।

কিন্তু সমস্ত বিষয় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে অনুমিত হয় যে, মহারাজ অশোক-প্রিয়দর্শীর রাজ্যভুক্ত হওয়ার পরে কলিঙ্গে ও উৎকলে বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার হইলে জগন্নাথের উপাসনায় বৌদ্ধ ভাব অনুপ্রবিষ্ট হয়। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার বা জগন্নাথ-উপাসনার মূল ভিত্তি—এই মত আধুনিক। মাদলা পঞ্জীতে লিখিত আছে—অশোক দেব যখন সম্রাট ছিলেন, তখন বৌদ্ধ ভাবে জগন্নাথের উপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল। বুদ্ধের দন্তোৎসবের ব্যাপার পৌরাণিক কাহিনীমাত্র—ঐতিহাসিক ভিত্তিহীন। দন্তপুর ও পুরী একই স্থান নহে। মহাভারতে ইহার নাম দন্তকুরা; প্লিনীর ভৌগোলিক বিবরণে দন্তগুলা—ইহা গোদাবরী তীরে অবস্থিত ছিল। বৌদ্ধ যন্ত্রের সহিত জগন্নাথ মূর্ত্তির সাদৃশ্য আনুমানিকমাত্র। হিন্দু শাস্ত্রেও প্রাচীন কাল হইতে যন্ত্র পূজার প্রথা দৃষ্ট হয়। (১) শবরপূজিত নীলমণিনিভ প্রস্তর মূর্ত্তি আর্য্য-ঔপনিবেশিকের হস্তে এই যন্ত্রের ভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে, ইহাও বলা যাইতে পারে। রথ-যাত্রা বৌদ্ধদিগের উদ্ভাবিত নহে। অশোকের অনুশাসনে দেবতা-

(1) Cunningham, Fergusson, Hunter and M. Williams and Rajendra Lala Mitra's Orissa.

(১) পণ্ডিত সদাশিব কাব্যকণ্ঠ অনুমানকরেন যে, জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা এই ত্রিমূর্ত্তির—আমাদের 'ওঁ' অর্থাৎ অ, উ, ম, এই তিনের যন্ত্রাকারে প্রতিষ্ঠা। মীমাংসা দর্শনে মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপূজার উল্লেখও দেখা যায়। এক্ষেত্রে হস্তপদাদিবিহীন অথচ কার্য্যকরণক্ষম নিরাকার ব্রহ্মের উপসনাই সূচিত হইতেছে।

দিগের রথযাত্রার উল্লেখ আছে,-ইহা তাঁহার সময়ে প্রাচীন প্রথা ছিল, স্পষ্ট বোধ হয়। জগন্নাথদেবকে বুদ্ধ অবতারের মূর্ত্তি বলিয়া অঙ্কিত করা উড়িষ্যায় অতি অল্প কালই চলিতেছে এবং ভারতের সর্ব্বত্র ইহা স্বীকৃত হয় না। মহাপ্রসাদ কেবল জগন্নাথের নহে, ভুবনেশ্বরে এবং নিকটবর্ত্তী অন্য তীর্থেও সকল জাতীয় লোকের নির্ব্বিকার ভাবে প্রসাদগ্রহণের প্রথা আছে। ব্রহ্ম পদার্থ বুদ্ধদেবের মর্ত্ত্যদেহের কোন্ অংশ—বা বৌদ্ধ-প্রথা হইতে এইরূপ চিহ্ন রক্ষা করার প্রথা আসিয়াছে এই উক্তিও সমীচীন নহে; কারণ, বৈদিক যুগেও এই প্রথার উল্লেখ দৃষ্ট হয় এবং প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহা পরিনির্ব্বাণ সুত্তে' বুদ্ধদেবের দেহ-সংকারের পর দেহের অংশ-বিশেষ রক্ষা করার কথায় তৎপূর্ব্বে এই প্রথা প্রচলিত ছিল দেখা যায় (২)।

দুই বৎসর পূর্ব্বে যখন দ্বিতীয়বার পুরী গিয়া তথায় কিছুদিন ছিলাম, তখন পুরী-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় সদাশিব কাব্যকণ্ঠ মহাশয়ের সহিত এই সম্বন্ধে আমার কিছু আলোচনা হইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় স্বয়ং এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এবং মন্দিরে রক্ষিত বিখ্যাত মাদলা পঞ্জীর প্রথমাংশ বা 'রাজভোগ' ইতিহাসের নকল তাঁহার নিকট যাহা আছে, তাহা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পড়িতে দেন। মাদলা পঞ্জীর (তালপত্রে লিখিত, মর্দ্দলাকার) এই অংশের ভাষা পুরী-প্রবাসী, উড়িষ্যার ভাষায় ফাজেল আমার দুই উকিল বন্ধু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারিলেন না; কাব্যকণ্ঠ মহাশয়ের পরিচিত একজন কৃতবিদ্য বি এ উড়িয়া মহাপাত্র বিশেষ শ্রম স্বীকার করিয়া কয়েকদিন ধরিয়া উহা আমার সমক্ষে অনুবাদ করিলেন, আমি লিখিয়া লইলাম। ইংরাজ পণ্ডিতরা এবং ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় মাদলা পঞ্জীর বয়স কি উপায়ে স্থির করিয়াছিলেন, জানা যায় না। মহাপাত্র মহাশয় বলেন, ইহা অতি প্রাচীন উড়িয়া, সাধারণের বোধগম্য নহে; কিন্তু কত প্রাচীন তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। মাদলা পঞ্জীর প্রথম খণ্ডে পুরাণাদির অনুকরণে প্রতি যুগের কাল ও প্রধান সম্রাটগণের নাম আছে। পরে পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫ জন সম্রাটের অধীনে জগন্নাথের সেবাকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। ইঁহাদিগের সুদীর্ঘ রাজত্বকাল ও অন্যান্য অসম্ভব বিষয়ের নির্দ্দেশ দেখিয়া পঞ্জীর এই অংশ

(২) উল্লিখিত বিষয়ের অনেকগুলি নূতন Bengal District Gazetteer পুস্তকেও স্বীকৃত হইয়াছে। 'বিশ্বকোষে' বন্ধুবর নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

আনুমানিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পঞ্জীর মতে তৎপরে শোভন বা শিবদেবের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে রক্তবাহু নামক এক যবনরাজ পুরী আক্রমণ করায় জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি দক্ষিণদেশে শোণপুরে স্থানান্তরিত ও মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত হয়। ১৪৪ বৎসর পরে মহারাজ যযাতি মূর্ত্তি উদ্ধার করিয়া আনিয়া তাঁহার রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে ৩৮ হাত উচ্চ এক মন্দির নির্ম্মাণ ও তাহাতে বিগ্রহের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করান। যযাতি দ্বিতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন বলিয়া উল্লিখিত।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

ব্যবহারিক কৃষি-দর্পণ।*

সে বড় লজ্জার কথা—যে দেশের জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ জন কৃষিজীবী, সে দেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে সেই দেশের লোকই এত উদাসীন; সে বড় ক্ষোভের বিষয়—যে দেশের কৃষকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া বৎসরের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দিবারাত্র সমানে একটানা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া দশের অন্নসংস্থানের জন্য প্রাণপাত করে, সেই দেশের কৃষকরাই দুর্ভিক্ষপীড়িত হইয়া সর্ব্বাগ্রে যমালয়ের পথ দেখাইয়া দেয়; সে বড় দুঃখের কথা—যাহারা আমাদের সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ, আমাদের অন্নদাতা, আমরা তাহাদিগকেই ঘৃণার চক্ষুতে, অবজ্ঞার ভাবে দেখিয়া থাকি! তাই দেশে কৃষি সম্বন্ধীয় কোনরূপ আলোচনা হইতে দেখিলে আমাদের মনে আনন্দের উদয় হয়, আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতাটুকু কেন্দ্রীভূত করিয়া সেই আলোচনায় যোগদান করিতে ইচ্ছা করে।

মেডিক্যাল নর্শরীর সুযোগ্য অধ্যক্ষ কবিরাজ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্রদেব মহাশয় 'ব্যবহারিক কৃষি-দর্পণ' অভিধেয় একখানি বহুগবেষণাপূর্ণ পুস্তক

---

* ব্যবহারিক কৃষি-দর্পণ—কবিরাজ শ্রীহেমচন্দ্র দেব কর্ত্তৃকপ্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ২৷৷০ টাকা।

প্রণয়ন করিয়া সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সমালোচনার জন্য আমরাও একখণ্ড পুস্তক উপহার পাইয়াছি।

কিন্তু সমালোচনা করিতে গিয়া বড়ই গোলে পড়িয়াছি। প্রথম গোল—পুস্তকের নাম লইয়া। 'ব্যবহারিক কৃষি-দর্পণ' নাম পড়িয়া প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, 'ব্যবহারিক' অর্থে Practical,—যাহা কৃষি-সম্বন্ধে আসল কাযের কথা—Theoryর ফাঁকা কথা নহে। কিন্তু যখন পুস্তকের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, ইহাতে প্রকৃত কাযের কথা অতি অল্পই লিপিবদ্ধ হইয়াছে, পুস্তকের অধিকাংশই Theoryতে এবং শস্যের ইতিহাসে ও পরিচয়ে পূর্ণ তখন পুস্তকের নামের অর্থ সম্বন্ধে মনে কেমন একটু সন্দেহ উপস্থিত হইল। গ্রন্থের ২৬ পৃষ্ঠায় উপনীত হইয়া আমাদের এই সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে। দেখিলাম "কৃষি কাহাকে বলে?" শীর্ষক পরিচ্ছেদে লিখিত আছে,—"কৃষি দ্রব্য স্থূলতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আলু, ধান্য.........ইক্ষু, তামাক প্রভৃতি যেরূপ কৃষি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, রবার, চা, কফি.........কার্পাস, লাক্ষা.........প্রভৃতিও সেইরূপ কৃষি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে মানবের খাদ্যরূপে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা খাদ্যকৃষি এবং বস্ত্র, রং বা কস্ প্রভৃতি শিল্পের উপাদানের নিমিত্ত যেগুলি উৎপন্ন হয়, তাহা ব্যবহারিককৃষিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।" সুতরাং বুঝা গেল, ব্যবহারিক অর্থে Practical নহে। ইহার অর্থ, যাহা আমরা আহার না করিয়া অন্য উপায়ে ব্যবহার করি।

বাস্তবিকই গ্রন্থের মধ্যে 'ব্যবহার্য্য' শস্য ভিন্ন অন্য কোনও শস্যের বিষয় লিখিত হয় নাই। যাহাতে পেট ভরে, এমন কোন শস্যের উল্লেখও ইহাতে নাই। গ্রন্থে তিনটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে,—(১) মিষ্টবর্গ, (২) রবারবর্গ, (৩) সূত্রবর্গ। মিষ্টবর্গ অর্থাৎ, ইক্ষু, বিট, খর্জ্জুর প্রভৃতির চাষ যে কিরূপে 'ব্যবহারিক কৃষি'র মধ্যে প্রবেশ লাভ করিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এতদ্ভিন্ন ৫২ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি উপক্রমণিকা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই উপক্রমণিকাই পুস্তকের গৌরব রক্ষা করিয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকার স্বীয় কৃষিবিষয়ক জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেচনার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; সাধারণ কৃষি সম্বন্ধীয় যাবতীয় অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় অতি সংক্ষেপে অথচ বেশ নিপুণতাসহকারে বিবৃত হইয়াছে। অন্নরক্ষা, মূলধন, যুক্তিযুক্ত কৃষিকার্য্য, কৃষিকার্য্যে লোকাভাব, লাভজনক কৃষি, মৃত্তিকা পরীক্ষা, ভূমির প্রকারভেদ,

ভূমি-কর্ষণ, সার, শস্যপর্য্যায়, বীজরক্ষা প্রভৃতি বহুতর বিষয় এই অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। জীবদেহের মস্তকের ন্যায়, এই উপক্রমণিকাই এ পুস্তকের প্রধান অঙ্গ। এই উপক্রমণিকাবিহীন হইলে পুস্তকের প্রাণহানি হইত।

দ্বিতীয় গোল—এই পুস্তক প্রণয়নের উদ্দেশ্য লইয়া। লেখক লিখিয়াছেন,—"ব্যবহারিক কৃষির প্রায় অধিকাংশই বহুব্যয়সাধ্য, সুতরাং বিত্তবান্ না হইলে তাহাদের চাষ সফল হয় না।" তবেই বুঝা গেল যে, এই পুস্তক সাধারণ লোকের জন্য লিখিত হয় নাই; কারণ তাহারা বিত্তবান্ নহে এবং তাহারা "ব্যবহারিক কৃষি" অপেক্ষা খাদ্যকৃষি অধিক বুঝে,—তাহারা যে "হাভাতের" দল। আগে পেটের চিন্তা তাহার পর অন্য কথা। উদর পূর্ণ থাকিলে তবে অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করা যায়। গ্রন্থকার অবগত আছেন কি না জানি না যে, আমাদের দেশের দশ আনা লোক প্রত্যহ এক বেলা মাত্র আহার করিতে পায়। দেশের যখন এইরূপ হৃদয়-বিদারক শোচনীয় অবস্থা, তখন দেশের জনসাধারণ যে 'পেটটা জানে সার'—তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই বলিতেছিলাম যে, যদি কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিয়া দেশের দৈন্য দূর করাই আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে কি উপায়ে দেশের অন্নাভাব ঘুচিতে পারে, কিরূপে আমাদের খাদ্যশস্যের উন্নতি হইতে পারে, সেই বিষয়ে অগ্রে যত্নবান্ হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

তৃতীয় গোল—পুস্তকের ভাষা লইয়া। পুস্তকের ভাষা স্থানে স্থানে দুর্ব্বোধ্য। কোন কোন স্থলে ভাষা অলঙ্কারের ভারে কুব্জ হইয়া পড়িয়াছে। একটা নমুনা দিতেছি;—

"কেশরীর অকস্মাৎ ভীষণ গর্জ্জনে বনমধ্যস্থ শ্বাপদকুল যেমন স্তম্ভিত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে, ক্রূরদর্শন সর্ব্বোপকরণসম্পন্ন নিষাদের দর্শনে ভীত মৃগকুল যেমন ইতস্ততঃ ধাবমান হয়, অলক্ষ গতিবিধি লোলরসন মহাব্যালের সমীপসঞ্চরণে বিটপ-শিখর-সমাসীন নিঃশঙ্কচিত্ত বিহঙ্গকুল যেমত ঘোর কোলাহলে উড্ডীয়মান হয়, তমোময় পাপরাশির আগমনে জ্যোতিস্বরূপ পুণ্যরাশি যেমন লুক্কায়িত হন, অধুনা আমাদের পূর্ব্বকালীন গ্রাম্য সমৃদ্ধি, সুখশান্তি, সারল্য—আশা-ভরসা ভোগাবসানে ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তির লোকান্তর অবতরণবৎ, বিভাবারীসমাগমে ভগবান মরীচিমালীর অন্তর্ধানবৎ, অপার মরুপ্রান্তরে তৃষিত পথিকের নেত্রে মরীচিকাসঞ্চরণবৎ, প্রাণমনবিমোহন

নিষ্কলঙ্ক নিশীথ স্বপ্নবৎ, সমস্তই কর্ম্মফলে, কালপ্রভাবে লোপ পাইয়াছে।” ইহাই কি ভাষার অলঙ্কার? এরূপ অলঙ্কারে ভাষাকে সজ্জিত করা অপেক্ষা তাহাকে নিরাভরণা রাখা শ্রেয়ঃ নহে কি? আবার ‘রাখাল ঠেঙ্গাইয়া’, ‘ঝঞ্ঝাট পোহাইয়া’, ‘আহেলিবেলাত’, ‘সস্তায় কিস্তিমাত’ প্রভৃতি গ্রাম্য এবং বৈদেশিক শব্দ এবং ‘অসাত্ম্য’ প্রভৃতি দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত শব্দ পুস্তকের বহুতর স্থানে দৃষ্ট হয়। আমাদের ধারণা, এই ভাবের পুস্তকের ভাষা সহজ ও প্রাঞ্জল হওয়াই ভাল। সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত গ্রন্থকারের ‘উচিৎ’ লেখা উচিত হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উপক্রমণিকায় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, কিন্তু উহাতে বর্ণিত বিষয়গুলি বেশ শৃঙ্খলার সহিত সাজান হয় নাই, অর্থাৎ যে বিষয়টি যে স্থানে আলোচিত হওয়া উচিত ছিল, যে বিষয়ের পরে যে কথার অবতারণা হওয়া ভাল ছিল, তাহা হয় নাই। সার সম্বন্ধে লেথক বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু সার সম্বন্ধে যাহা প্রধান কথা—কোন্ শ্রেণীর সার কোন্ শ্রেণীর শস্যের পক্ষে উপযোগী, তাহা একেবারেই বলা হয় নাই। আমাদের দেশের কৃষকগণ নানাবিধ সার ব্যবহার করে বটে, কিন্তু কোন্ কোন্ জাতীয় শস্যের পক্ষে কোন্ কোন্ সার বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহা তাহারা সবিশেষ অবগত নহে। আমাদের কৃষকগণকে সার সম্বন্ধীয় অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয় এখনও শিক্ষা করিতে হইবে। সারের প্রয়োগ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের রাসায়ণিকশ্রেষ্ঠদ্বয় মিঃ Lawes ও মিঃ Gilbertএর উক্তি সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তাঁহারা উপদেশ দিয়াছেন,—

“Use phosphates for turnips and such like root-crops, potash for leguminous plants and active nitrogen for grains.”—এত অল্প কথায় সার সম্বন্ধে এমন সদুক্তি আমরা আর কখনও দেখি নাই। সার সম্বন্ধে এইরূপ স্থূল কথাও জানা না থাকিলে, সার প্রয়োগ করিয়া আশানুরূপ ফললাভ করিবার আশা দুরাশামাত্র।

পুস্তক পাঠ করিয়া আমাদের দৃঢ়ধারণা হইয়াছে যে, সার সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই; কারণ কার্পাসের জন্য সারের ব্যবস্থা লিখিবার সময় তিনি তাঁহার পরিচিত সর্ব্বপ্রকারের প্রায় ২০টি সারের উল্লেখ করিয়াছেন, অথচ যে চূণ কার্পাসের প্রধান সার, তাহার উল্লেখ নাই।

গ্রন্থকার লিখিয়াছে, সোরার সংস্কৃত নাম ‘সৌবর্চ্চল লবণ’। কিন্তু

আমাদের বিশ্বাস সোরা ও সৌবর্চ্চল লবণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। কবিরাজ মহাশয়কেই জিজ্ঞাসা করি যে, সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, বিট্, সামুদ্র ও সম্ভার—এই পঞ্চলবণ দ্বারা যখন তিনি কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত করেন, তখন কি সৌবর্চ্চল লবণ বা চলিত কথায় যাহাকে 'সবল' লবণ বলে, তাহার পরিবর্ত্তে সোরা ব্যবহার করিয়া থাকেন? সোরা ও সবল লবণ যে একই পদার্থ এ ধারণা তাঁহার কিরূপে হইল?

গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থকার উদ্ভিদের নামকরণ সম্বন্ধে এক নূতন পন্থার উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা বৈজ্ঞানিক ল্যাটিন নামগুলিকে যতদূর সম্ভব পরিবর্ত্তিত করিয়া সংস্কৃত নামে পরিণত করা। তিনি Andropogon nardusকে য়্যানড্রোপোগণ ভূস্তৃণ, Butea frondosaকে বিউটিয়া পলাশ, Sida acutaকে বলাপীত প্রভৃতি ল্যাটিন-সংস্কৃত অথবা পূরা সংস্কৃত নামে অভিহিত করিতে চাহেন। ইহাতে লাভ? যখন কোন একটি দেশীয় উদ্ভিদকে ভালরূপে চিনিতে হইলে, (Identify) মিঃ প্রেনের "Bengal Plants" আমাদের একমাত্র সম্বল, তখন কেবলমাত্র নামটির পরিবর্ত্তন করিয়া আমাদের কি লাভ হইবে? ইংরাজী উদ্ভিদ শাস্ত্রের সাহায্য না লইয়া কোন কবিরাজের সাধ্য নাই যে বলিয়া দেন—শাস্ত্রোক্ত গাছের এবং চক্ষুর সমক্ষে বর্ত্তমান গাছের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। দুই বেলা দেখিতেছি, বিচক্ষণ কবিরাজগণও 'আয়াপান' জ্ঞানে সেই জাতীয় অন্য গাছ ঔষধার্থে ব্যবহার করিতেছেন, 'অশ্বগন্ধা' বোধে অন্য বন্যগাছ ব্যবহৃত হইতেছে। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উদ্ভিদের গুণাগুণ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উদ্ভিদের সহিত পরিচিত হইবার অর্থাৎ গাছ চিনিবার কোন উপায় বা পন্থা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে লিখিত হয় নাই। সুতরাং যখন কোন একটি উদ্ভিদের আকৃতিগত পরিচয় শিক্ষা করিতে হইলে, বাধ্য হইয়া আমাদিগকে ইংরাজী উদ্ভিদশাস্ত্রের সাহায্য লইতে হয়, তখন সেই শাস্ত্রানুযায়ী নামকরণ থাকিলে ক্ষতি কি?

মিষ্টবর্গের মধ্যে 'ইক্ষু' অতি উপাদেয় প্রবন্ধ, বহু কথার আলোচনায় পূর্ণ। তবে দীর্ঘ ৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী নানা দেশীয় আকের পরিচয়পূর্ণ তালিকা না দিলেও চলিত। লেখক লিখিতেছেন যে, মরিসস্, যাভা প্রভৃতি স্থানের ইক্ষুর চাষ আমাদের দেশে নিষ্ফল হইয়াছে, বহু চেষ্টাতেও ইহাদের চাষ সফল হয় নাই। আমরা কিন্তু তাঁহার মত সমর্থন করিতে না পারায় দুঃখিত। অযোধ্যা

প্রদেশের অন্তর্গত প্রতাপগড় নামক স্থানের সরকারী কৃষিক্ষেত্রে মরিসস্ আকের চাষ হওয়ায় আশাতীত ফল-লাভ হইয়াছে। আমরা স্বয়ং সেই কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন করিয়াছি। তদ্ভিন্ন সরকারী অন্যান্য ক্ষেত্রেও যাভা ইক্ষু বেশ সন্তোষজনকরূপে জন্মাইতেছে। মিষ্টবর্গের মধ্যে তালের গুড় বা চিনির নামোল্লেখমাত্র নাই। দক্ষিণ ভারতে প্রচুর পরিমাণে তালের গুড় ও চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। রবারবর্গ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই, তবে রবার প্রস্তুত-প্রণালী ভাল করিয়া বর্ণনা করা হয় নাই ; অধিকাংশ সময়েই যে, ফট্‌কিরী দিয়া রবারের রস গাঢ় করিতে হয়, এ কথাও লিখিত হয় নাই। সূত্রবর্গের মধ্যে কার্পাস অতি সুলিখিত প্রবন্ধ, তবে কার্পাসের চিরশত্রু কীটাদির বিষয় অতি সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। বিছুতী, আনারস, বেড়েলা, চাড়স প্রভৃতির আলোচনা আরও সংক্ষেপে করিয়া, পাট, শোন, তিসি প্রভৃতি মূল্যবান সূত্রসম্বলিত গাছের চাষের বিষয় অধিকতর বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত ছিল।

আমরা একে একে অনেক কথার আলোচনা করিলাম। পুস্তকখানি সুবৃহৎ, বহু তথ্যে পূর্ণ। ইহার সকল কথার সমালোচনা অসম্ভব, সংক্ষেপে দুইচারি কথা মাত্র বলিলাম। শুদ্ধ কৃষিবিষয়ক নহে, প্রসঙ্গক্রমে পুস্তকমধ্যে লেখক অন্যান্য নানা বিষয়ের গবেষণা করিয়াছেন। পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা বুঝিয়াছি, তিনি দেশের জন্য নানা বিষয় চিন্তা করেন। অর্থনীতি ও সমাজ-নীতিও তাঁহার চিন্তার বিষয়। তিনি পুস্তকের নানাস্থানে ঐ বিষয়ে চিন্তা-শীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি একস্থলে লিখিয়াছেন,—"কল ছাড়িয়া হস্তপ্রস্তুত দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে, কারণ যন্ত্রবলে বহু লোকের কর্ম্ম অল্পলোকের দ্বারা অল্প সময়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ দুঃস্থ-লোকসংখ্যাবহুল দেশ, কল ছাড়িয়া হস্তপ্রস্তুত দ্রব্য ব্যবহার করিলে এই সকল দুঃস্থ লোকের অন্নসংস্থান হইতে পারে, অপরন্তু হস্তপ্রস্তুত দ্রব্যের উপর অসম-প্রতিদ্বন্দ্বিতাবশতঃ শুল্ক না বসিলেও বসিতে পারে।" ইহাই অর্থনীতির একটি কঠিন সমস্যা। অনেকে লেখকের মতাবলম্বী না হইতে পারেন ; কিন্তু ইহাই যে আমাদের বিশেষ ভাবিবার কথা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আবার তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন,—"সর্ব্বাপেক্ষা মহাপাপ অর্থপণে পুত্র বিক্রয় করিতেছি। দুঃস্থ কন্যাভারাক্রান্তগণকে নির্ম্মম হৃদয়ে উৎপীড়ন করিতেছি। মহাপাপের ফলস্বরূপ প্রথম যৌবনেই কতকগুলি অপোগণ্ডভারাক্রান্ত পলিতনতশির বার্দ্ধক্যের বেশ ধারণ করাইতেছি।" শেষের কথাগুলির অর্থ ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও, বেশ অনুভব করিতেছি যে, এই সকল উক্তি লেখকের অন্তরের অন্তস্তল হইতে বাহির হইয়াছে। বাস্তবিকই মনে হয়, তিনি দেশের ও সমাজের দুঃখে ম্রিয়মাণ।

পরিশেষে গ্রন্থকারের নিকটে আমাদের একান্ত অনুরোধ, তিনি যেন ভবিষ্যতে প্রকৃত ব্যবহারিক কৃষিদর্পণ লিখিয়া দেশের যথার্থ মঙ্গল-সাধনে যত্নবান হয়েন। তিনি চিন্তাশীল, বহুদর্শী ব্যক্তি, নিজের অভিজ্ঞতাগুলি গুছাইয়া লিখিলেই এই বিষয়ে সফলকাম হইবেন।

ঋতুবর্ণন।

—:*:—

(১)

নিদাঘের দিবাকর প্রচণ্ড প্রতপ্ত কর
দীর্ণ ধরা উত্তাপে আকুল ;
শুষ্ক শষ্প, গুল্মগুলি প্রান্তরে ধূসর ধূলি ;
স্থলচর খুঁজে জলকূল ;
উন্মুক্ত ভাণ্ডারদ্বার, ধরণীর উপহার
পক্ক ফল পড়ে তরুতলে ;
পবনের দীর্ঘশ্বাস বসন্ত কুসুমহাস
বৃন্তচ্যুত ঝরে দলে দলে।
কখনো দিবস শেষে প্রলয়-আঁধার-বেশে
বজ্রসখ মেঘদল আসে ;
ধরা 'পরে ঝরে ধার ; সুরভিনিশ্বাস তা'র
বৃষ্টিস্নিগ্ধ বায়ু 'পরে ভাসে।
দূর প্রিয় মুখ স্মরি' জাগি' কাটে বিভাবরী
কে অভাগা বিরহী নিদাঘে,
বিরহ-বেদনা তা'র স্থান নাই ঘুচাবার
দীর্ঘশ্বাস ফেলি' নিশি জাগে ?

(২)

বরষার মেঘদল অশ্রান্ত বরষে জল,
মেঘে ম্লান তপন-কিরণ ;
শীতল শিকরভার বহিতে পারে না আর
ধীরে বায়ু করে বিচরণ ;
আকুল আবিল জল, আবর্ত্তের কল কল
নদী চাহে অসীম সাগর ;
গুরু গুরু মেঘস্বরে শিখী কেকারব করে
জলকূলে ভেক-কোলাহল,
নিদাঘের তপ্ত ধরা স্নিগ্ধশ্যামশান্তিভরা,
সরিৎ সরসী ভরা জল।
মৃদু মেঘ গরজনে বেদনা জাগায় মনে,
মেঘালোকে হৃদয় বিকল
কণ্ঠে প্রিয়া-বাহুলতা তবু হৃদে ব্যাকুলতা,
বিরহীর মরণ মঙ্গল।

(৩)

শরতে শেফালিশাখে দোয়েল্ দিবসে ডাকে,
ঝরাফুলে ভরা তরুতল ;
তরুণতপনকরে হীরকের জ্যোতি ধরে
দুর্ব্বাদলে শিশিরের জল ;
হরিৎ শস্যের ক্ষেত্র দেখিলে জুড়ায় নেত্র ;
মাঠে শ্বেত কাশের চামর ;
সরসীর স্বচ্ছ জলে ফুটে পদ্ম শতদলে
মৃদু বাস ভাসে বায়ু'পর।
নিশায় তারকাদলে কর্ব্বুরিত নভতলে
ছায়াপথ প্রশান্ত কেমন।
লঘু মেঘ বায়ু'পরে ভাসি' চলে—খেলা করে ;
রবিশশী অম্লান কিরণ।
সমীরে শেফালিবাসে কি মোহ আবেশ আসে,
প্রিয়ার নিশ্বাস লাগে গায় ;
বিরহ-বেদনভার হৃদয়ে সহে না আর
পূর্ণ হৃদি মিলন-তৃষায়।

(৪)

হেমন্তে পবনশ্বাসে শীতের আভাস আসে
কুন্দমুখে ফুটে শুভ্র হাস ;
স্বর্ণচূড় ক্ষেত্র পরে বায়ু সুখে খেলা করে,
দ্রোণপুষ্প বিরল বিকাশ ;
সাঙ্গ মধু-আহরণ চক্রবদ্ধ মক্ষীগণ
মধুপ-ঝঙ্কার নাই বনে ;
শীতের শিশিরভয়ে পত্র, পক্ষ, তৃণ লয়ে
নীড় রচে বিহগ যতনে ;
মালঞ্চে ফুটে না ফুল, শুধু ক্ষেত্রে লতাকুল
কুসুম ভূষণে শোভা পায়
কেহ প্রাতে, কেহ সাঁঝে বিচিত্র বরণে সাজে
ফলপ্রসূ কুসুম-শোভায় ;
শিশিরশীতল বায় তরুলতা শিহরায়
বৃন্ত হ'তে পত্র পড়ে ঝরি' ;—
শীর্ণ শোভা ধরণীর দীর্ণ হৃদি বিরহীর
কাঁদি কাটে দীর্ঘ বিভাবরী।

(৫)

হিমে ম্লানতেজ রবি ধরার মলিন ছবি ;
কুয়াশায় আঁধার প্রভাত ;
স্বল্পআয়ু দিনমান ত্বরা লভে অবসান,
দীর্ঘ নিশি সহে হিমপাত ;
নাহি নগ্ন শাখা'পর বিহগের মধুস্বর ;
মগ্ন ধরা বিষাদ-পাথারে ;
নিশীথে অম্বরগায় তারাকুল শিহরায়,
ম্লান শশী নিশীথ আঁধারে।
নগ্ন বনে রক্তরাগে ফুটে কোন্ অনুরাগে
গোলাপের অরুণ বরণ !
ক্ষুদ্র কণ্টকের গায় ফুল ফুট' ঝরি' যায়—
ধরণীর বিচিত্র ভূষণ।
বিরহ শয়ন'পরে কে কাটাবে শূন্য ঘরে
শিশিরের সুদীর্ঘ যামিনী—
যবে তপ্ত প্রিয়বুকে আকুল মিলনসুখে
আসে মান তেয়াগি' মানিনী !

(৬)

বসন্তে প্রফুল্ল ধরা আকুলপুলকভরা,
 ফুলে ফুলে উজল কানন ;
শাখীশাখা 'পরে পাখী আকুল সখীরে ডাকি'
 কণ্ঠভরা মধুর কূজন ;
নব পল্লবিত কুঞ্জে ফুটে ফুল পুঞ্জে পুঞ্জে,
 গুঞ্জে অলি মধু আহরণে ;
সুখদ পবনশ্বাসে কুসুম-সুরভি ভাসে
 মেঘহীন সুনীল গগনে ;
পুলকিত সমীরণ বিকশিত উপবন,
 ধরণীর নবীন যৌবন,
তৃষিত হৃদয় টানে তৃষিত হৃদয়-পানে,
 মিলন-তিয়াষী এ ভুবন।
শত বাধাবিঘ্ন টুটি' হৃদি পদ্ম উঠে ফুটি',
 বসন্তের দেবতা প্রণয়,
বিরহ বিষম ব্যথা বসন্তে মিলন প্রথা
 মধু ঋতু মিলন-সময়।

সংগ্রহ।

শিল্প।

য়ুরোপে ও ভারতে শিল্পকলা।

গত জুন মাসের 'ইণ্ডিয়ান রিভিউ' নামক বিখ্যাত মাসিক পত্রে ডাক্তার এ. ওর্স্‌লে Religious Art in India and Europe শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষায় ঐ শীর্ষাখ্যার অনুবাদ করিলে বলিতে হয় "ভারতে ও য়ুরোপে ধর্ম্মসম্পর্কিত কলাবিদ্যা।" ডাক্তার ওর্স্‌লে তাঁহার Concept of Monism (একত্ববাদের ধারণা) শীর্ষক সন্দর্ভে লিখিয়াছিলেন যে, যে আদর্শ হিসাবে প্রাচী দর্শন শাস্ত্রের সূতিকাগৃহ এই অভিখ্যালাভ করিয়াছে, সেই হিসাবেই প্রতীচী দর্শনশাস্ত্রের সমাধিক্ষেত্র এই অভিখ্যালাভের অধিকারী ; প্রাচীতে যে সমস্ত চৈতন্যবাদ ও ধর্ম্মতত্ত্ব উদ্ভূত হইয়া জড়বাদসমাচ্ছন্ন য়ুরোপকে পর্য্যন্ত প্রভাবিত করিয়াছিল এবং য়ুরোপকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল, তাহাও এখন এই সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত রহিয়াছে।

ডাক্তার ওস্‌লের এই উক্তি লইয়া নানা বিতর্কের উদ্ভব হইয়াছে। অনেক সমালোচক এই উক্তি যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত। তাঁহারা বলেন,—এখন য়ুরোপের ধর্ম্মে ও দর্শনে অধ্যাত্মভাব প্রবল রহিয়াছে। ইহার উত্তরে লেখক বলিয়াছেন,—বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপে যে সমস্ত ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে, তাহা সমস্তই জড়বাদসমাচ্ছন্ন,একথা ধর্ম্মব্যাখ্যাতৃগণ অম্লানবদনে স্বীকার করিবেন, এরূপ কখনই আশা করা যায় না। উহা স্বীকারে তাঁহাদের লাভ নাই। আর ধর্ম্মের সমর্থকগণের পক্ষে উহা স্বীকার করা শোভনও হইতে পারে না। অগত্যা বিদ্যার ও জ্ঞানের অন্য ক্ষেত্র হইতে ইহার সমর্থক তথ্য দ্বারা এই উক্তি সপ্রমাণ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

য়ুরোপে জড়বাদ।

যে হিসাবে অধ্যাত্মবাদ (idealism) হিন্দুস্থানের ধর্ম্মচিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, যে ভাবে চৈতন্যবাদ তথাকার ধর্ম্মচিন্তার সহিত ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত রহিয়াছে, সে হিসাবে ও ভাবে অধ্যাত্মবাদ য়ুরোপের ধর্ম্মমতকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করিতেছে কি না,—কলাবিদ্যামাত্র-দ্বারা তাহা বেশ সপ্রমাণ হইতে পারে। কলাবিদ্যা চিন্তারই প্রতিবিম্বিতা মূর্ত্তিমাত্র। সেই চিন্তা যদি চিন্তা নামের যোগ্য হয়, সেই চিন্তা যদি কল্পনামার্গের অনুসারিণী হয়, তাহা হইলে অধ্যাত্মবাদের সেবিকা কল্পনা তদানীন্তন ধর্ম্মসম্পৃক্ত শিল্পকলায় নিশ্চিতই প্রতিবিম্বিতা হইবে।

প্রাচীর চৈতন্যবাদ।

এই বিষয়টির বিচার করিবার পূর্ব্বেই কি হইলে এই ব্যাপারের মীমাংসা হইবে সে সম্বন্ধে আমাদের একমত হওয়া আবশ্যক। নীতিবিজ্ঞান ও দর্শন যেমন একেবারে দ্বৈত পরিহার করিতে পারে না, কলাবিদ্যাও সেইরূপ একেবারে দ্বৈতভাববর্জ্জিত হইতে পারে না। প্রত্যেক কলাশিল্পের বাহ্য অর্থাৎ বস্তুমূলক (objective) এবং আন্তর বা ভাবমূলক (subjective) দুইটি দিক আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। বাহ্য বা বস্তুমূলক প্রতিকৃতি বাস্তব পদার্থের যত অনুরূপ হইবে, ততই তাহা সুন্দর বলিয়া বিবেচিত হইবে। পক্ষান্তরে আন্তর বা ভাবানুস্যূত প্রতিকৃতি আমাদের চিন্তার বা মনোভাবের—আমাদের কল্পনারই চিত্র বা প্রতিকৃতি মাত্র। যাহাতে আমাদের শিক্ষিত সমাজের তৃপ্তি জন্মে, এরূপভাবে যদি আমরা চিরাগত বিশ্বাসকে আমাদের আলেখ্যাদিতে প্রতিফলিত করিতে পারি, তাহা হইলে ভাব-মূলক কলাবিদ্যায় আমরা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছি বলিয়া বিবেচিত হইব।

কলাবিদ্যার দ্বৈতভাব।

কেহ কেহ বস্তুমূলক কলাবিদ্যাকে কলাবিদ্যা বলিয়া স্বীকার করিতেই সম্মত নহেন। এ সম্বন্ধে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ফটোগ্রাফারের শিল্প-কলাকে আমরা উচ্চ অঙ্গের শিল্পকলা বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত নহি। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়; ফটোগ্রাফার বাস্ত-বতার দিক হইতে তাঁহার শিল্পের যতই উৎকর্ষ সংসাধিত করুন না কেন, সেই শিল্পের বিচারকালে আমরা আমাদের ভাবুকতাকে একেবারে পরিহার করিতে

বস্তুমূলক ও ভাবমূলক কলাবিদ্যা।

পারি না। আমরা আমাদের মনের ভাব লইয়া কলাবিদ্যাকে দেখিবই দেখিব। আর এক কথা, যাহা বা বাস্তব প্রতিকৃতি বস্তুর হুবহু নকল হইতেই পারে না। বাহ্য বা বস্তুগত হিসাবে তাহার কিছু না কিছু ত্রুটি থাকিয়াই যায়। সেই ত্রুটিই তাহার ভাবগতভার মানদণ্ড। শিল্পী যাহাকে খাঁটি বাস্তব শিল্পে পরিণত করিবে মনে করে, তাহাতে তাহারই অজ্ঞাতে কল্পনা আসিয়া প্রতিফলিত হয়। সেই জন্য যন্ত্রজ শিল্প ব্যতীত সকল শিল্পই সম্পূর্ণ বাস্তব অথবা সম্পূর্ণ ভাবমূলক হয় না। তবে যাহার সহিত প্রাকৃতিক পদার্থের সৌসাদৃশ্য অত্যন্ত অধিক, তাহাকেই আমরা বস্তুগত এবং যাহা কেবল আমাদের কল্পনা, বিশ্বাস ও পরম্পরাগত ধারণার প্রতিচ্ছবিমাত্র—বস্তুজগতে যাহার সদৃশ কিছুই নাই,—তাহাকেই আমরা ভাবমূলক কলাশিল্প বলিয়া থাকি।

ভ্রান্ত কে?

উপরে নির্দ্দিষ্ট দুইটি চরম বিভক্ত চিত্রশিল্পের মাঝামাঝি অনেক কলাশিল্পের স্তর আছে। য়ুরোপীয়রা সেইরূপ শিল্পেরই সেবা করিয়া থাকেন। যন্ত্রদ্বারা প্রতিফলিত বা নির্ম্মিত কোনও বস্তুর প্রতিকৃতিকে তাঁহারা কলাবিদ্যার মধ্যেই পরিগণিত করিতে সম্মত নহেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, যাহাতে মানবের কোন প্রবল মনোভাব প্রতিফলিত হয় নাই,—তাহাকে কলাবিদ্যা বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে না। ভারতীয় ধর্ম্মসম্পর্কিত শিল্পকলা ভাবমূলক। ঐ শিল্পের যথেষ্ট গুণ আছে; কিন্তু তথাপি য়ুরোপীয়গণ তাঁহাকে "অস্বাভাবিক" বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। তাঁহাদের এই অবজ্ঞার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। বিশ্লেষণে তাঁহাদের ঐ ধারণা পরস্পরবিরোধী মতের উপর প্রতিষ্ঠিত, পূর্ব্বার্জ্জিত ভ্রান্ত সংস্কারদ্বারা আবিল কিম্বা ন্যায়সঙ্গত তাহা প্রতীয়মান হইবে। দুই দিক হইতেই ইহার বিচার করা আবশ্যক।

জড়েরই প্রাধান্য।

চিত্রশিল্প, ভাস্করশিল্প প্রভৃতি শিল্পকলা মানবের আভ্যন্তরীণ ভাবেরই বাহ্যবিকাশ ইহা সত্য; শিল্পকলায় সেই আভ্যন্তরীণ ভাব যখন প্রতিফলিত থাকে, তখন তাহার সহিত খেয়াল, উদ্দামতা ও অবিবেচকতাও প্রতিবিম্বিত হয়। বাস্তব পদার্থের সহিত তুলনা করিয়া সেই অস্বাভাবিকতা পরিহার করা আবশ্যক। ইহা য়ুরোপীয় শিল্পীয় স্বপক্ষীয় উক্তি। ডাক্তার ওস্‌লে এই বিষয়টি কারবারের অংশীদারের দৃষ্টান্তদ্বারা পরিস্ফুট ও বিশদ করিয়া দিয়াছেন। মনে করুন, কোনও কারবারের দুইজন অংশীদার, একজন প্রবীণ আর একজন নবীন। নবীন অংশীদার মহাশয়কে একটা কার্য্য পদ্ধতি স্থির করিয়া অনুমোদনার্থ তাহা প্রবীণ অংশীদারের নিকট উপস্থিত করিতে হয়। প্রবীণ অংশীদার উহার পরিবর্ত্তন ও আংশিক পরিবর্জ্জন করিয়া দিলে, তবে তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ পায়। এ ক্ষেত্রে যেমন প্রবীণ অংশীদারের প্রভাবই প্রবল, সেইরূপ য়ুরোপীয় শিল্পকলায় প্রাকৃতিক পদার্থের প্রভাবই প্রবল। জড়জগতই এস্থলে প্রবীণ অংশীদারের মত প্রভাবসম্পন্ন। মানবের মনোভাব শিল্পকলায় যাহাই প্রতিফলিত করুক না কেন, তাহা পরিশেষে জড়জগতের নিকট অনুমোদনার্থ প্রেরণ করিতেই হইবে। প্রকৃতি তাহাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া যথাসম্ভব আপনার সৃষ্ট পদার্থের অনুরূপ করিয়া দিলে তবে তাহা শিল্পকলা বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। এস্থলে আভ্যন্তরীণ ভাব বাহ্য বস্তুর ছন্দানুবর্ত্তী। এরূপ শিল্পকলায় আভ্যন্তরীণ ভাব অল্পবিস্তর প্রতিবিম্বিত হইলেও উহা বস্তুমূলক বলিয়াই গ্রাহ্য হইবে।

ভারতীয় কলাবিদ্যা

ডাক্তার এ, কে, কুমারস্বামী দেখাইয়াছেন যে, ভারতীয় ধর্ম্মসম্পৃক্ত শিল্পকলা ভাবমূলক। বাহ্য জগতে বহুশীর্ষ ব্রহ্মার ও শিবের ন্যায় কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নাই। সেই জন্য যাহারা পদার্থমূলক শিল্পকলার সেবক, তাহাদের নিকট উহা কিম্ভূতকিমাকার ও অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। ডাক্তার ওস্‌লে বলেন, ভারতীয় ধর্ম্মজীবনে আধ্যাত্মিকতাই প্রবল, সেই জন্য

তাহাদের ধর্ম্মসম্পর্কিত কোনও আলেখ্য, প্রতিকৃতি প্রভৃতিতে জড়জগতের কোনও কিছুই প্রতিফলিত দেখা যায় না। তাহাদের ধর্ম্মচিন্তা মানবচিন্তাতেই নিবদ্ধ নহে। তাহাদের ঈশ্বর—ভক্ত মানুষমাত্র নহেন। হিন্দুর কলা-কারবারে অধ্যাত্মবাদই প্রধান অংশীদার। হিন্দু শিল্পী তাঁহাদের আদর্শকে বাহ্য বস্তুর যূপকাষ্ঠে মস্তক অবনমিত করাইতে চাহেন না। ধর্ম্মসম্পর্কিত শিল্পকলায় ভারতবাসীর আত্মার বিশেষত্ব প্রকাশমান।

য়ুরোপে সেকাল ও একাল।

ডাক্তার ওর্স্লে লিখিয়াছেন,—য়ুরোপে ইহার অনুরূপ কিছুই দৃষ্ট হয় না। সত্য বটে, য়ুরোপের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শিল্পকলা সে কালের বিশ্বাস ও পরম্পরাগত জনশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তাহাদের প্রতিকৃতিগুলি এখন ঠিক প্রাকৃতিক পদার্থপ্রতিকৃতির অনুরূপ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের দেবতাগুলি যেন ঠিক মানুষ। ভগবানের জননী কুমারী মেরি মানবেরই তৃপ্তিসাধকসৌন্দর্য্যে সমুদ্ভাসিতা। যাহা কিছু দিব্য, তাহাই এখন জড়বাদের জোয়ালে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছে। বিজয়ী জড়বাদের প্রভাব সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত। যে সময় খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল, সে সময় এরূপ ছিল না। তখন উহার ভাবমূলক দিকটা বেশ পরিস্ফুট থাকিত। তদানীন্তন আলেখ্যে স্বর্গ তিনস্তরসমন্বিত করিয়া চিত্রিত করা হইত এবং তখনকার দেবতার মুখমণ্ডল ধ্যানী বুদ্ধের মুখ মণ্ডলের ন্যায় প্রশান্ত বিমলানন্দে সমুদ্ভাসিত দৃষ্ট হইত।

জড়বাদের প্রাবল্য।

ইহাতেই ভারতীয় ধর্ম্মচিন্তায় আধ্যাত্মিকতা বা চৈতন্যবাদের প্রভাব সূচিত হইতেছে হিন্দুর ধর্ম্ম-শিল্প যে ভাবমূলক, ইহা তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ ভারতে আধ্যাত্মিকতার জন্য হিন্দুর ধর্ম্ম-বিশ্বাস কেবল শূন্যগর্ভ অনুষ্ঠান বা শুষ্ক শব্দাবরণমাত্র নহে, তাহা জীবন্ত বিশ্বাস। সত্য বটে, মধ্য যুগে খৃষ্ট ধর্ম্ম মানবীয়তায় (anthropomerphism) প্রভাবিত ছিল, সে মানবীয়তা পরিহার করা অসম্ভব—কিন্তু তাহার শিল্প কলায় আবশ্যক ভাবপ্রবণতার অভাব ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপীয় কলাবিদ্যায় বস্তু-মূলকতার প্রভাববিস্তার দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, য়ুরোপে জড়বাদই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে এবং তথায় ধর্ম্মবিশ্বাস লুপ্ত হইয়াছে। তথায় লোক হয় ত এখনও পুরুষপরম্পরাগত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে, কিন্তু যে জীবন্ত বিশ্বাস শিল্পকলাকে অপার্থিব ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিত, তাহা আর নাই।

ইদানীন্তন য়ুরোপীয়গণ তাঁহাদের ধর্ম্ম সম্পর্কিত শিল্পকলায় কতকটা প্রেমোন্মাদের দাবী করিয়া থাকেন। উহার উপর দেবতার দেবভাব রক্ষার উপযোগী অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেই হইল। ধর্ম্মসম্পর্কিত শিল্পকলায় যদি ভাবমূলকতাকে বস্তুমূলকতার অত্যন্ত অধীন করা হইয়া থাকে আর সেই অধীনতা [illegible] ভাবে যদি ইহাই বিবেচিত হয় যে, চিত্রিত বস্তু প্রকৃতিক পদার্থের অনুরূপ না হইলে [illegible] আধ্যাত্মিকতা প্রতিফলিত করা সম্ভবে না, তাহা হইলে তথায় কি আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ [illegible] সূচিত হইতেছে না? ডাক্তার ওর্স্লে বলেন, আমি কি এই সমাধিক্ষেত্রের কথা বলি নাই? উহার [illegible] যদি কেহ বলেন যে, অভিব্যক্তি বাদের প্রভাবে দেবতারা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া [illegible] হইলে আমরাও জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন এবং পরিবর্ত্তিত হইয়া কি হইয়াছেন? ধর্ম্মযাজকগণ যদি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের তুষ্ণীম্ভাবই ইহার চূড়ান্ত উত্তর হইবে।

[illegible]

আর্য্যাবর্ত্ত।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

সম্পাদিত।

—০—

সূচী।

প্রকাশক—শ্রীদুর্গানাথ বসু।

[illegible] আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[illegible]

[বার্ষিক মূল্য [illegible] টাকা।]

দ্রবময়ী চণ্ডালিনী।

জগতে অনেকেই বড় লোকের বড় কথা লইয়া ব্যস্ত; ইতিহাস ত বিশেষ ব্যস্ত। কিন্তু দুই একটা গরীব দুঃখী সামান্য লোকের কথা ইতিহাসে থাকিলে ক্ষতি কি? 'সমরু বেগমের' ইতিহাস বা কাহিনী আর্য্যাবর্ত্তে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, আজিও সর্দ্ধানায় গেলে, মুসলমান-খ্রীষ্টান-মণ্ডলী দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। আমার দ্রবময়ীর পৌত্র বর্ত্তমান; সেই দ্রবময়ী ও তাহার শিশু পৌত্রের কথাই বলিতেছি। ইতিহাসে ক্ষুদ্রের স্মৃতিচিহ্ন থাকিলে ইতিহাসের কলঙ্ক হয় না।

বর্দ্ধমান জেলার কাল্না বিভাগের মধ্যে মহম্মদ আমিনপুর পরগণায় উট্‌রো বা আবাজী দুর্গাপুর একখানি অতি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামে কেবল মুসলমান ও চণ্ডালের বাস। গ্রামখানি আমাদের হুগলী জেলার ৩২০ নং তৌজির একখানি ছিটা মহল। ৩২০ নং তৌজিতে আমার পত্তনী স্বত্ব। আমি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এই পত্তনী লই। সে আজি ২৩ বৎসরের কথা। আমাদের কাগজে ৺ বৈকুণ্ঠ সর্দ্দারের নামে ২০।৴০ জমা এখনও চলিতেছে। বৈকুণ্ঠ সর্দ্দার চণ্ডাল। সে গ্রামের একজন খোদকস্ত প্রজা এবং চৌকীদার ছিল। বৈকুণ্ঠের মৃত্যুর পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠের পুত্র একটি শিশু সন্তান রাখিয়া পরলোকগত হয়। ৩৫।৩৬ বৎসর হইল, বৈকুণ্ঠের মৃত্যু হইয়াছে। তখন তাহাদের সংসারে রহিল—বৈকুণ্ঠের স্ত্রী দ্রবময়ী ও তাহার শিশু পৌত্র রঙ্গলাল। রঙ্গলাল এখনও জীবিত আছে।

৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে, দেশে দস্যু তস্কর বিস্তর ছিল। বিশেষ আমাদের হুগলী জেলার উত্তরাংশ ও বর্দ্ধমানের দক্ষিণাংশ একরূপ অরাজক ছিল বলিলেও চলে। চিতের মার পুকুর, সরালের দীঘী, উচালনের দীঘী বাবনাক-পুরের দীঘী—এই সকল স্থানে দিনের বেলায় সামান্য লাভের লোভে দস্যুরা নরহত্যা করিত। তখন চৌকীদারি একটা 'সত্যিকার' কার্য্য ছিল। এখন-কার দিনের মত সোমবারে সদরে হাজিরা দিয়াই চৌকীদারেরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত না।

বৈকুণ্ঠ একজন নামডাকে পরিচিত সর্দ্দার ছিল। তাহার মৃত্যুতে কে

তাহার কার্য্য করিবে? অপোগণ্ড শিশু রঙ্গলালের ও তাহার পিতামহীর কিসে ভরণপোষণ হইবে? দুর্গাপুর গ্রামখানি ছোট, কিন্তু পার্শ্বস্থ আর একখানি গ্রাম ও পটী লইয়া নিতান্ত ছোট নহে। চৌকীদারের এলাকা বড় কম নহে। দ্রবময়ী স্বামী বর্ত্তমানে, তাহার অসুখ-বিসুখ করিলে, মাঝে মাঝে কর্ত্তৃপক্ষের অগোচরে গ্রামের চৌকীদারি করিত; গ্রামের লোকেরা তাহা জানিত। তাহারা পরামর্শ দিল,—"দ্রবময়ি, তুমি চৌকীদারির জন্য দরখাস্ত কর।" দ্রবময়ী শিশু রঙ্গলালকে ক্রোড়ে লইয়া, একজন প্রতিবেশীর সঙ্গে কাল্‌নায় গিয়া হাজির। কাল্‌নার কর্ত্তৃপক্ষেরা বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু দ্রবময়ীকে উপহাস করিলেন না বা তাড়াইয়া দিলেন না। এই ঘটনার ১০।১২ বৎসর পরে দ্রবময়ী আমাদের বাড়ী আসিয়াছিল। তখনও সে বেশ হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ। গোলমুখে গোল গোল ডাগর চক্ষু, কপালের উপর একরাশি চুল। বিধবার মলিন মোটা কাপড়ে পরিবার আদব-কায়দা বেশ। তাহারই মুখে তাহারই কাহিনী আমি শুনিয়াছিলাম।

কালনার কর্ত্তৃপক্ষেরা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দ্রব, তুমি লাঠি-খেলা জান?" দ্রবময়ী একটু সঙ্কোচে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—সে লাঠি-খেলা জানে। দরখাস্তের অনুকূলে অনেক কথা লিখিয়া, দ্রবময়ীর হস্তে সেই দরখাস্ত তাঁহারা বর্দ্ধমানে পোলিসের "বড় সাহেবের" কাছে পাঠাইয়া দিলেন; বলিয়া দিলেন,—"তুমি তোমার পৌত্রটিকে লইয়া বর্দ্ধমানে যাও।"

"পোলিস্ সাহেব" দরখাস্ত পাইয়া মহা খুসী। তৎক্ষণাৎ ম্যাজিষ্ট্রেট "সাহেবের" কাছে দৌড়িয়া গিয়া খবর দিলেন যে, এক বাঙ্গালি মেয়ে লাঠি-খেলায় পরীক্ষা দিয়া তাহার স্বামীর চৌকীদারি চাকরি লইতে আসিয়াছে। জেলায় মহা গোল উঠিল। দুই কর্ত্তায় দু'খানা কেদারা আনাইয়া কাছারীর মাঠে বৈঠক করিলেন,—আর দাঁড়াইয়া আহেলে মামলা, কেরাণী-আমলা—সহস্র লোক। সকলেই আজি মজা দেখিবে।

দ্রবময়ী এতক্ষণ একটি গাছতলায় দাঁড়াইয়া ছিল; আস্তে আস্তে দর্শক-চক্র-মধ্যে প্রবেশ করিল; কোলের নাতিটিকে প্রতিবেশীর স্কন্ধে বসাইয়া দিল। কোমরে ফাড়ে কাপড় বাঁধিয়া "সাহেবদের" সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিল, আভূমি-নত হইয়া প্রণাম বা সেলাম করিল; চারিদিকে দর্শক-মণ্ডলীকে মাথা নোয়াইয়া অভিবাদন করিল; তাহার পর মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া "সাহেবকে" অতি বিনীতস্বরে বলিল,—"হুজুর! একলা ত লাঠি-খেলা

হয় না! কে আমার সঙ্গে খেলিবে, আসুক্।"—কেহই আসিতে চায় না। আওরতের সঙ্গে খেলিতে গিয়া কি সম্ভ্রম নষ্ট করিবে? শেষে "পোলিস্ সাহেবের" সঙ্কেতে একজন কনষ্টবল্ অগ্রসর হইল। ঠকাঠক্, ঠকাঠক্—কনষ্টবল বড় ধূর্ত্ত; কাণ্ডখানা একটা প্রহসনের মত করিয়া তুলিল। সর্দ্দারণী তাহা বুঝিল; বলিল,—"হুজুর! আমাকে কি সং সাজাইয়া তামাসা দেখিতেছেন? একি লাঠি-খেলা হইতেছে?" "পোলিস্ সাহেব" আবার আর একরূপ সঙ্কেত করিলেন। ঘড়ী দেখিলেন—দশ মিনিট খেলা হইল,—সর্দ্দারণীর লাঠি কনষ্টবলের লাল পাগ্‌ড়ি স্পর্শ করিল। "সাহেব" খেলা বন্ধ করিয়া সর্দ্দারণীর প্রশংসাবাদ আরম্ভ করিলেন,—সর্দ্দারণী কিন্তু এখনও সন্তুষ্ট নহে; করযোড়ে বলিল,—"খেলোয়াড় দুইজন আমাকে মারিতে আসুক্; দেখুন, আমি নিজেকে সামলাইতে পারি কি না?" তাহাই হইল—দুই দিক্ হইতে দুই জনে আক্রমণ করিতে আসিল; দ্রব দুই গাছা লাঠি দুই হাতে লইয়া, তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে লাগিল। পাঁচ মিনিট পরে "সাহেব" খেলা বন্ধ করিলেন।

"সাহেব" দাঁড়াইয়া উঠিয়া সর্দ্দারণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তুমার মরদ্ কি কাম্‌মে তুম্ বাহাল হুয়া।" জনতা আহ্লাদে হলহলা করিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণেরা পৈতা হাতে তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। "সাহেব" বসিয়াছিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত কি পরামর্শ করিয়া, আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"তুমারা বক্‌সিশ্ দশ রূপেয়া।" আর একজন বাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"A *seer* of *methai* for the grand-child." ইহার পৌত্রটিকে এক সের মিঠাই দিতে হইবে।

একসের মিঠাই লইয়া তাহারা সেই দিনই রওনা হইল—আশঙ্কা হইয়াছিল যে, সে রাত্রি বর্দ্ধমানে থাকিলে জনতার জ্বালায় ঘুম হইবে না। দ্রবময়ী এখন স্বর্গের চণ্ডাল-লোকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—রঙ্গলাল জীবিত—দুর্গাপুরে।

সর্দ্দারণী যখন বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাকে এই গল্প বিবৃত করে, তখন তাহার পদ্মপলাশলোচন অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল; আমি আজি লিখিবার সময়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছি। কেন, তোমরা বলিতে পার?

কদমতলা, চুঁচুড়া। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

পুরাতন প্রসঙ্গ।

(১)

৪ঠা আষাঢ়, ১৩১৮।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গিল্যাণ্ডার্সের বাড়ী একশত ত্রিশ টাকা মাহিনায় কর্ম্ম করিতেন। অনেকদিন হইল, তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াছেন এবং উক্ত হৌস্‌ হইতে মাসিক ১৩০৲ টাকা পেন্সন পাইতেছেন। এখন তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর।

তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমি বলিলাম—"অনেকবার আপনার মুখে কলিকাতায় পুরাতন থিয়েটারের গল্প শুনিয়াছি। আজ সেইগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি নিজে অভিনয় করিয়াছিলেন, বোধ হয় আপনার সমসাময়িক অভিনেতা আর কেহ জীবিত নাই।"

তিনি বলিলেন,—"হাঁ, ঠিক বটে; যাঁহাদের সহিত আমি 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নাটক অভিনয় করিয়াছিলাম, তাঁহারা কেহই জীবিত নাই।"

"তখন আমার বয়স ১৬৷১৭ বৎসর মাত্র। চড়কডাঙ্গা রোডে (বর্ত্তমান টেগোর কাস্‌ল রোড) রামজয় বসাকের বাড়ীর উঠানে ষ্টেজ বাঁধা হইয়াছিল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর এজেণ্টের অফিসের বড় বাবু রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হইল। জগদ্দুর্ল্লভ বসাক তাঁহাকে উক্ত কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। রঙ্গমঞ্চের ঠিক সম্মুখের দোতলায় আমাদের Rehearsal হইত, তালিম রাজেন্দ্রবাবুই আমাদিগকে শিক্ষা দিতেন। আমাদের এই Rehearsal প্রত্যহ হইত না, শুধু শনিবার ও বুধবার রাত্রিতে হইত। নাটকের রচয়িতা পণ্ডিত রামনারায়ণ কখনও তথায় আসিতেন না, একদিনমাত্র কেবল নাটকের অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন।

"আমাদের সেই 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটক অভিনয়ের পূর্ব্বে একটিবারমাত্র শ্যামবাজারে থিয়েটার হইয়াছিল। লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একজন ধনকুবের 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয় করাইয়াছিলেন। কিন্তু তখন আমি জন্ম গ্রহণ করি নাই।

'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটক এই বাড়ীতে চারবার অভিনীত হইয়াছিল। রাজেন্দ্রবাবু ও জগদ্দুর্লভবাবু দিব্য ভুঁড়ি লইয়া মাথায় লম্বা টিকি বিলম্বিত করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সাজিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রবাবুর হস্তে একটি শামুকের নস্যাধার। তাঁহারা দুইজনে যখন তর্কবিতর্ক করিতেন, তখন শ্রোতৃবৃন্দ হাসিয়া এ উহার গায়ে পড়িত। একটি সখের দল বাজাইত। আমি কুলাচার্য্য সাজিতাম। আমার বক্তৃতা ছিল—'তার পর সেই আপন অভীষ্ট-দেবাভিনিবিষ্ট আদিশূর—' (ও কি ও, তুমি আমার বক্তৃতাটাও লিখিয়া লইতেছ যে? ছাপাইবে না কি?—আমি বলিলাম, "আজ্ঞা হাঁ, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া যাউন।")

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—"তাহার পর সেই আপন অভীষ্ট-দেবাভি-নিবিষ্ট আদিশূর রাজা কাণ্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক বেদবিজ্ঞ পঞ্চ বিপ্রকে রাজ-ধানীতে আনয়ন করেন। পরে তাঁহারা সদাব্রত হইয়া সমাগমন পূর্ব্বক যজ্ঞ-শীল আদিশূর মহারাজের আদেশানুসারে গৌড়ভূমিতে বসতি করিয়াছিলেন। পরে তাঁহাদিগের বংশপরম্পরা বিস্তৃত হওয়ায়, বল্লাল ভূপাল তন্মধ্যে এই অভিনব কুলপ্রথা প্রচার করেন। যথা শাণ্ডীল্য ভট্টনারায়ণ-বংশজাত আদি বরাহ বন্দ্য। কাশ্যপগোত্রে দক্ষবংশপ্রসূত সুলোচন ভট্ট, ভরদ্বাজ-গোত্রে শ্রীহর্ষবংশোৎপন্ন ধুরন্ধর মুখোটি, সাবর্ণগোত্রে বেদগর্ভবংশোদ্ভব বীরব্রত গাঙ্গুলী ও সুধীর কুন্দ, বাৎস্যগোত্রে ছান্দড়বংশপ্রসূত সুরভি ঘোষাল ও কবি কাঞ্জিলাল।'

"বক্তৃতাটা আর কত লিখিবে? আমি তখন অল্পবয়স্ক, কিন্তু অভিনয় করিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলাম।

"থিয়েটারের দ্বিতীয় পর্ব্ব ছাতুবাবুর (৺আশুতোষ দেব) বাড়ীতে। শকুন্তলার অভিনয় হইল। ছাতুবাবুর নাতি শরৎবাবু শকুন্তলা সাজিয়া-ছিলেন। যখন Stage এর উপরে বিশ হাজার টাকার অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া শরৎবাবু দীপ্তিময়ী শকুন্তলার রাণীবেশ দেখাইয়াছিলেন তখন দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইয়াছিল। পাইকপাড়ার রাজারা—প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ তাঁহাদের নিজ বাটীতে একটি রঙ্গমঞ্চ বাঁধিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, এবং তাঁহাদের রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণ পণ্ডিতের 'রত্নাবলী' ও মাইকেল মধুর 'শর্ম্মিষ্ঠা' অভিনীত হইল। কিন্তু সে কথা পরে বলিতেছি।

"শকুন্তলা সাজিলেন শরৎবাবু। দুষ্মন্ত—প্রিয়মাধব মল্লিক। ইনি র‍্যালিমেব্রোজানির বাড়ী কর্ম্ম করিতেন, Cashier ছিলেন। দুর্ব্বাসা—গ্রে ষ্ট্রীটের অন্নদা মুখোপাধ্যায়, বেশ সুপুরুষ, পরে পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর হইয়াছিলেন। অনসূয়া—অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, ইনি পরে হাইকোর্টের Interpreter হইয়াছিলেন। প্রিয়ংবদা—ভুবনমোহন ঘোষ, স্কুল মাষ্টার। আমি হইতাম কণ্বমুনির আশ্রমের এক ঋষিকুমার। শরৎবাবুর ভগিনীপতি উমেশচন্দ্র দত্ত (Mr. O. C. Dutt) Stage-manager ছিলেন। তখনও তিনি খ্রীষ্টান হয়েন নাই। তাঁহার কায ছিল whistle দেওয়া, পট-ক্ষেপণ ও উত্তোলন ইত্যাদি।

"একটি কৌতুককর ব্যাপার লইয়া সংবাদপত্রে তীব্র সমালোচনা হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ যখন টিকিট দেখাইয়া উঠানে নাটমন্দিরে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন এক ব্যক্তি অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের পোষাক দেখিয়া 'মহাশয়, Front seat,' 'মহাশয়, Side seat' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকেন। অবশ্যই বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই ব্যাপারের জন্য মোটেই দায়ী ছিলেন না।

"একব্যক্তি 'শকুন্তলা'র গান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমরা কবিচন্দ্র বলিয়া ডাকিতাম। তাঁহার ভাল নামটি কি, তাহা আমি এখন ভুলিয়া গিয়াছি। ঐ রকম দেখ, ধীরাজের সঙ্গে অনেকদিন একত্র নিমন্ত্রণপার্টিতে ও বড়লোকদিগের আসরে ফূর্ত্তি করিয়াছি ও গান গাহিয়াছি, কিন্তু ধীরাজের আসল নামটা কি, তাহা জানি না; কখনও জানিতাম কি না, তাহা বলিতে পারি না।

"কবিচন্দ্র ছাতুবাবুর নিকটে আসিলে বাবু বলিলেন—'দেখ কবিচন্দ্র, গানগুলি যেন সুন্দর সুরুচিসঙ্গত হয়।' কবিচন্দ্র বলিল—'জয় জয় রাম সীতারাম, (এই বুলি তাহার মুখে চব্বিশ ঘণ্টাই ছিল) আমি কি জানি না যে, আপনি সপরিবারে এখানে বাস করেন? এমন গান গাহিব যে মেয়েরা উঠিয়া যাইবেন?"

"৩।৪ বৎসর পরে ছাতুবাবুর বাড়ী আমরা 'মহাশ্বেতা' অভিনয় করি। অন্নদা বন্দ্যোপাধ্যায় নায়ক এবং ক্ষেত্রমোহন সিংহ নায়িকা হইয়াছিলেন।

"থিয়েটারের তৃতীয় পর্ব্ব—পাইকপাড়ার রাজবাড়ীতে। 'রত্নাবলী' ও 'শর্ম্মিষ্ঠা' অভিনীত হইল। আমি দর্শক হিসাবে গিয়াছিলাম। দৈত্য

সাজিয়াছিলেন তারাচাঁদ গুহ, শিবচন্দ্র গুহের পুত্র। বাগ্‌বাজারের যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় যযাতি সাজিয়াছিলেন। গায়ক কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পরে কুচবিহার-রাজে একটা বড় চাকরি পাইয়াছিলেন, সাজিয়াছিলেন শর্ম্মিষ্ঠা। মাইকেল মধুর নাম তখন খুব জাহির হইয়াছিল।

"চতুর্থ পর্ব্ব—কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ী। ক্ষেত্রমোহন সিংহ ও মণিমোহন সরকার ওরফে 'মণিলাড়্' অভিনয়ে বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। রামনারায়ণ পণ্ডিতের 'বেণীসংহার' নাটক অভিনীত হয়। আমি কর্ণ সাজিয়াছিলাম। দুর্য্যোধনের স্ত্রী ভানুমতীর রূপ যেন Stageএর উপর ঝল্‌মল করিতে লাগিল। পট উত্তোলিত হইলে যখন ভানুমতীকে দণ্ডায়মানা দেখা যাইত, সমগ্র দর্শকমণ্ডলী আনন্দে হাততালি দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিত। তেমন Applause আর কেহ কখনও পাইয়াছে কি না, জানি না।

"এইস্থানে একটি কথা, মজার কথা বলি শুন। কালী সিংহ একটি ভদ্রলোকের ছেলেকে এমন স্নেহ করিতেন যে, তাহাতে সাধারণ মোসাহেবের দল ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিল। সেইজন্য ঝাল ঝাড়িবার ব্যবস্থা করা হইল এই অভিনয়ের দিনে। যখন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ টিকিট দিয়া একে একে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের সকলকেই এক এক খণ্ড মুদ্রিত কাগজ দেওয়া হইল। তাহাতে লিখা ছিল—

'আর না পাইব যেতে,
না পাব Lemon খেতে,
তুমি ত এ সব সাধে
বিসম্বাদ ঘটালে।
পেয়েছ ইংরাজি জুতো,
মনোমত মজবুত,
আমার কপালে জুতো
আর নাহি ঘটালে॥
বিলাতি এসেন্স নানা,
দেখেনি তোর নানী নানা,
আপনি মেখেছ কত,
আমারে না মাখালে।
পুরাতন মদ যত.
সব তব বাসগত,
আপনি খেয়েছ দাদা,
আমারে না খাওয়ালে॥

কে লিখিয়াছে এবং কাহাকে উদ্দেশ করিয়া লিখা হইয়াছে, তাহা কাহারও জানিতে বাকি রহিল না।

"পঞ্চম পর্ব্ব—সিঁদুরিয়া পটিতে মেট্রোপলিটান কলেজে 'বিধবা-বিবাহ' নাটক অভিনীত হইল। বিহারী চট্টোপাধ্যায় নায়িকা হইয়াছিলেন। পরে বিহারীবাবু বেঙ্গল থিয়েটারে খুব যশস্বী হইয়াছিলেন।

"ষষ্ঠ পর্ব্ব—ঠাকুরবাড়ী।

"প্রথমে গোপীমোহন ঠাকুরের পুরাতন বাড়ীর দোতালার নাচঘরে ষ্টেজ বাঁধা হইল। রামনারায়ণ পণ্ডিত মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে (তখনও তিনি মহারাজা হ'ন নাই) বলিলেন—"আমি আপনাকে ঠিক রত্না-বলী'র মত একখানা নাটক লিখিয়া দিব।" তাঁহার রচিত 'মালবিকাগ্নি-মিত্র' নাটক আমরা প্রথম অভিনয় করিলাম। ছোটরাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সেই একবার মাত্র Stageএ অভিনয় করিয়াছিলেন; বড় রাজার অনুরোধে তিনি 'কঞ্চুকী' সাজিয়াছিলেন, দৌড়িয়া Stageএ আসিয়া করযোড়ে তিনি বলিলেন—"মহারাজ, মহারাজ, বড় বিপদ! ছোটরাণী নীলবাঁদর দেখে মূর্চ্ছা গিয়েছেন, আপনি শীঘ্র অন্তঃপুরে আসুন।"

"আমি বিদূষক সাজিয়াছিলাম, শরৎবাবু ছিলেন আমার Understudy। আমার অভিনয় দেখিয়া রাজা প্রতাপ নারায়ণ সিংহ এত প্রীত হইলেন যে, তিনি গ্রীন্ রুমে আসিয়া আমাকে কোলে করিয়া লইয়াছিলেন। বড় রাজাও খুসী হইয়া আমাকে বলিলেন—"Mohendra Babu, you are the second best বিদূষক I have seen." কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী,ফিনান্স আপিসের কর্ম্ম-চারী, বড় রাজার বিশিষ্ট বন্ধু, তখনকার দিনে সব চেয়ে সেরা বিদূষক ছিলেন। পাইকপাড়ায় 'শর্ম্মিষ্ঠা' ও 'রত্নাবলী'র অভিনয়ে তিনি বিদূষক হইয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তিনি আমাদের শিক্ষাগুরু ছিলেন,—Motion, স্বগতঃ, চমকে ওঠা ইত্যাদি বিষয়ে আমাদিগকে শিক্ষা দিতেন।

"ফিনান্স্ আপিসের দীননাথ ঘোষ ছিলেন Stage Manager; শরৎ বাবু Prompter। তিনি Stageএর ভিতর হইতে বাঁয়া-তবলা বাজাইতেন। এইস্থানে বলিয়া রাখি যে, শরৎবাবুর মত পাখোয়াজ বাজাইতে সে সময়ে খুব কম লোক পারিত; বরোদা হইতে আগত পাখোয়াজের ওস্তাদ মৌলা বক্স ঠাকুরবাড়ীতে শরৎবাবুর বাজনা শুনিয়া তারিফ করিয়াছিল।



শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

"ঠাকুরবাড়ীতে থিয়েটরের জন্য একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহার সভ্য ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়, মাইকেল মধুসূদন, কেশব গাঙ্গুলী, দীন ঘোষ। এই কমিটি বাছাই করিয়া দিত, আমাদের মধ্যে কে কি সাজিবে।

(খ) "ঠাকুরবাড়ীর দ্বিতীয় পর্ব্ব—মহারাজ (তখন তাঁহাকে আমরা বড় রাজাই বলিতাম) নিজ বাড়ীতে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করাইলেন। তথায় তাঁহার স্বরচিত 'বিদ্যাসুন্দর' প্রথম অভিনীত হইল। কমিটি বাছাই করিলেন,—বিখ্যাত ধ্রুপদ খেয়ালের ওস্তাদ মদনমোহন বর্ম্মন্ হইলেন 'বিদ্যা', আমি হইলাম 'সুন্দর'।

"তৎপরে 'রুক্মিণী-হরণ' ও 'মালতীমাধব' অভিনীত হইল। মালতী-মাধবে আমি 'মকরন্দ' সাজিয়াছিলাম। ক্ষেত্র সেন 'মালতী', ও যদু চাটুয্যে 'মাধব' সাজিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে কৌতুকনাট্যও অভিনীত হইত, যথা,—'উভয় সঙ্কট', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'বুঝ্‌লে কি না'। শেষোক্ত নাটিকা মহারাজের স্বরচিত। এইটিকে লক্ষ্য করিয়া একটা ছোঁড়া দুষ্টুমি করিয়া একখানা কেতাব লিখিল, 'কিছু কিছু বুঝি'।

(গ) "মহারাজের বাগানে,—'মালতীমাধব' অভিনীত হইল। এইবার আমি 'মাধব' সাজিয়াছিলাম। 'মালতী' ক্ষেত্র সেন, আর হরি বন্দ্যোপাধ্যায় 'অঘোরঘণ্ট যোগী'। বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক্ অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন, ইহার পূর্ব্বে রাজবাড়ীতেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। পালা শেষ হইলে আমরা বেশ পরিবর্ত্তন করিতে যাইতেছি, এমন সময় মহারাজ বলিলেন—'পোষাক ছাড়িবেন না, লাট সাহেব তলব দিবেন। কথা কহিতে হইলে খবরদার Sir বলিবেন না, My Lord বলিবেন।' মাইকেল মধুও খুব করিয়া আমাকে শিখাইলেন, My Lord বলায় ভুল না হয়।

"হঠাৎ আমাকেই ডাকা হইল। বড়লাট ডাকিতেছেন! মাথা ঘুরিয়া গেল। স্বপ্নাবিষ্টের মত চলিলাম। যাইবার সময় মনে হইল, যেন কাণের কাছে বড় রাজা বলিলেন 'My Lord' ভুলিবেন না; মনে হইল যেন মাইকেল মধু বলিয়া দিলেন সাবধান, 'My Lord'। লাট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—'Were you the hero when I came to his residence?' কম্পিতকণ্ঠে উত্তর হইল 'Yes, Sir!' তৎক্ষণাৎ মহারাজ বলিয়া উঠিলেন 'Yes my Lord; there were two heroes, he was one of them.'

বস্! সব মাটি! সহস্র দর্শকের সম্মুখে দীপালোকিত রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া মনে বড় সাহস হইয়াছিল। এই লাট সাহেবের সম্মুখেও ত দুইবার অভিনয় করিলাম। তবে কেন এমন হইল? এমন না হইলে গিল্যাণ্ডার্স হৌসে কেরাণীগিরি করিব কেন?

"আর একটি ব্যাপার বলি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, আমার বামুনে কপাল কত মন্দ। দর্শকবৃন্দের মধ্যে রেওয়ার মহারাজা ছিলেন। তিনি দু' গাঁটরি কাশ্মীরী শাল ও এক থাল মোহর আনিয়া বড় রাজাকে বলিলেন—'আপনি যদি কিছু মনে না করেন, এইগুলি আমি অভিনেতৃগণের মধ্যে বিতরণ করি।' বড়রাজা বলিলেন 'ও কথা মনেও আনিবেন না, উঁহারা সকলেই আমারই মত ভদ্রলোক, উঁহারা কখনই এরূপ দান গ্রহণ করিবেন না।' আমরা সকলেই বড় রাজার সমকক্ষ! দান গ্রহণে অসমর্থ। ওগো বিদেশী রাজা! কেমন করিয়া তোমায় বুঝাইব যে, আমি ঠাকুরবাড়ীর বড় রাজাবাহাদুরের সমকক্ষ নই, নই, নই! আমি অত্যন্ত দীন হীন ব্রাহ্মণ, গিল্যাণ্ডার্স হৌসের সামান্য কেরাণী মাত্র। ব্রাহ্মণ-সন্তান আমি, রাজার দান গ্রহণে অসমর্থ হইব কেন?

"লাট সাহেবের কাছে মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। কাশ্মীরী শাল ও মোহরের থাল বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দিল। বড় রাজার prestige অক্ষুণ্ণ রহিল। সমস্ত আকাশ জুড়িয়া নক্ষত্রপুঞ্জ আমার দুঃখে হাসিতে লাগিল।

"ইহার অল্পকাল পরেই যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর রাজা হইলেন, এবং তদুপলক্ষে আমাদিগের প্রত্যেককেই এক এক যোড়া গঙ্গাজলে শাল উপহার দিলেন।

"সপ্তম পর্ব্ব। অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি সান্যালদিগের বাড়ীতে পেশাদারি থিয়েটার খুলিলেন। 'নীলদর্পণ' অভিনীত হইল। তখনও পুরুষে স্ত্রীলোক সাজিত।

আমরা retire করিলাম।

* * *

৭ই আষাঢ়, ১৩১৮।

মহেন্দ্রবাবুকে বলিলাম "মুখুয্যে মহাশয়, আজ এই প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিখানি পূজ্যপাদ পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিলেন 'মহেন্দ্র বাবু আমার বাল্যবন্ধু, বোধ হয়

আমার চেয়ে এক বৎসরের বড়। তিনি তোমাকে যে বাঙ্গালা Stageএর ইতিহাস দিয়াছেন, এমনটি আর কেহ দিতে পারিবে না। তাঁহার যখন, ১৪ বৎসর বয়স, তখন তিনি 'চার এয়ারের তীর্থযাত্রা' নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। আমার দাদা সেই পুস্তক পাঠ করিয়া বলিলেন 'মহেন্দ্র যে এমন বই লিখিতে পারে, তাহা কে জানিত? বাস্তবিক ছেলেটি একটি genius।' 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের অভিনয় যখন দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন ধরিতে পারি নাই যে, মহেন্দ্র অভিনয় করিল।'

"মুখুয্যে মহাশয়, আপনার সেই পুস্তক একখানি দেখিতে পাই কি?"

তিনি বলিলেন—"দুঃখের বিষয়, আমার নিকট একখণ্ডও নাই। আর যে থিয়েটরে মাতিয়াছিলাম, তখন আর ওসব খেয়াল করি নাই। শনিবারে প্রায়ই বড় রাজার Emerald Bowerএ, কিম্বা ছোট রাজার "প্রমোদ-কাননে" কিম্বা ছাতুবাবুর পেনিটির বাগানবাড়ীতে গান, বাজনা, আনন্দ উৎসবে কাটাইতাম। বড় রাজার জন্মদিন অক্ষয় তৃতীয়া। ঐ উপলক্ষে কিছু বেশী ধূমধাম হইত। ধীরাজ (ও ইদানীং প্যারীমোহন কবিরত্ন) গান বাঁধিতেন, আমি তাহাদের সহিত গাহিতাম। ছাতুবাবুর বাগানে নীলমাধব ডাক্তার আমার সাক্‌রেদ ছিলেন।

"এক এক দিন ছোট রাজা আসিয়া আমাদের গানে যোগ দিতেন। এক দিন তিনি বলিলেন 'ধীরাজের সেই গানটার অর্থ আমি আজ নিশ্চয়ই বাহির করিব, তোমরা সেই গানটা গাও ত?' আমরা গান ধরিলাম—

আমায় হের হর-অঙ্গনা,
আমি ফলার করব না,
তুমি কালশশী, গোকুলবাসী,
ঘরে চা'ল বাড়ন্ত ঘুচ্‌লো না।
গেল ভজার মা'র কাঁথা যোলো রাজ্য বাজ্জাতা,
ইচ্ছের আরব্ধ হবে ওষধ পাই কোথা?
আবার নদের রাজার রাজ্য গেল,
আমার আইবুড় নাম ঘুচ্‌ল না।
আমি ফলার করব না।
কাগে নিয়ে গেল কাণ,
তোমায় দিব খইয়েন ধান,
আউটে ক্ষীর কোরো,
না হয় পেতে শুয়ো প্রাণ।

শিবে শুঁড়ি কাটা গেল,
আমার খেউরি হওয়া হোলো না।
আমি ফলার করব না।

দেখ, যার মাথামুণ্ড কোনও অর্থই করা যায় না, ছোট রাজা তার একটা সোজা মানে বাহির করিবেন কি করিয়া?

"ধীরাজ আবার গান ধরিত—এই স্থানে বলিয়া রাখি যে, কোনও একটি ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া এই গান রচিত হইয়াছিল—ধীরাজ গান ধরিত—

কোম্পানীর চাকরি গেছে, আ মরি,
নাই সে শরীর
রাই কিশোরীর,
আগে পৃথিবীতে পা দিতেন না
এম্নি ছিলেন অহঙ্কারী।
পিরু গরু নাই বিচার,
চপ্ কট্‌লেট্ অনিবার,
আহার হোতো না বাবুর
বিনে সে 'ফাউল করি'।
বৌমায়ের Beer খেতো,
Moselle এতে মাথা ধরতো,
বাজে লোকের বরাদ্দ ছিল ব্রাণ্ডি।
এখন dish হয়েছে কলাপাত,
চাম্‌চে হয়েছে হাত,
ব্রাণ্ডির বদলে এখন
যা করেন মা খান্যেশ্বরী।

"আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, কিন্তু এই সকল গান যখন আমার মাথার মধ্যে গুঞ্জরিয়া উঠে, তখন আমারও দেহে চাঞ্চল্য অনুভূত হয়। Auld Lang Syneএর মাহাত্ম্য তোমরা কি বুঝিবে? কিন্তু যদি আমার কথায় সে সময়কার সমাজের একটি চিত্রও তোমাদের মনোমধ্যে পরিস্ফুট হয়, তাহা হইলে কৃতার্থ হইব।"

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

মৃত্যু-মিলন।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রণান্তে।

রাজা রণক্ষেত্রে উপনীত হইয়া দেখিলেন, উভয় দল প্রস্তুত। দুইটি সিংহ সম্মুখীন হইলে যেমন আক্রমণের পূর্ব্বে রোষরক্ত লোচনে পরস্পরকে লক্ষ্য করে, দুইদল সেইরূপ পরস্পরকে লক্ষ্য করিতেছিল। রাজার আগমনে রাজপুত সেনা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—অপর দিকে মোগল সেনাপতির আদেশে গোলন্দাজ কামানের রঞ্জুতঘরে দীপ্ত শলিতা প্রদান করিল। রাজা তাহা লক্ষ্য করিলেন, সেনাপতিকে বলিলেন, "কামান অধিকার না করিলে উপায় নাই।" সেনাপতি তদনুসারে আদেশ প্রচার করিলেন। রাজপুত সেনা বীরবিক্রমে অগ্রসর হইল। মোগলের অগ্নিবর্ষণ অবহেলা করিয়া রাজপুত সৈনিকগণ কামান অধিকার করিল; অগ্নিবর্ষণ বন্ধ হইল; কিন্তু ততক্ষণে বহু হতাহত রাজপুত সৈনিক রণস্থল পূর্ণ করিয়া পড়িয়াছে।

তখন সম্মুখ-যুদ্ধ আরব্ধ হইল। যে সকল আহত রাজপুত রণক্ষেত্রে শায়িত হইয়াছিল, তাহারা কোনরূপে ফিরিয়া, কেহ বা মস্তক উত্তোলন করিয়া, কেহ বা করে ভর দিয়া যুদ্ধ লক্ষ্য করিতে লাগিল।

সম্মুখ-যুদ্ধে রাজপুত বিশেষ পারদর্শী। কিন্তু রাজপুত সৈনিক সকলেই সুশিক্ষিত নহে; বিশেষ মোগল বাহিনী সংখ্যায় রাজপুত বাহিনীর দশগুণেরও অধিক। সুতরাং রাজপুতের পরাজয় অনিবার্য্য।

রাজপুতের অস্ত্রাঘাতে মোগল বাহিনী ক্ষয় হইতে লাগিল; কিন্তু সমুদ্রের

বারিরাশির ন্যায় সে ক্ষয় অনুভূত হইল না। এদিকে রাজপুত সৈনিক-দল ক্রমেই সংখ্যায় কমিতে লাগিল।

মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গেল। রাজা চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, আর অধিকক্ষণ সংগ্রাম অসম্ভব। তিনি বেগে অশ্বচালনা করিয়া শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। শত্রুদল তাঁহাকে বেষ্টিত করিল। বিষম যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ যুদ্ধের পর রাজা বুঝিলেন. তাঁহাকে নিহত করা মোগলের অভিপ্রেত নহে—তাঁহাকে বন্দী করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। তিনি মনে মনে হাসিলেন,—যে জীবন বিসর্জ্জন করিতেই আসিয়াছে, মৃত্যু ব্যতীত আর কে তাহাকে বন্দী করিতে পারে? তিনি শত্রু-বূ্যহ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আরও কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলিল। রাজার দেহ শোণিতস্রাবে ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, এ অবস্থায় অল্পক্ষণের মধ্যেই শত্রুর বন্দী হওয়া অনিবার্য্য। তিনি মুহূর্ত্ত চিন্তা করিলেন; তাহার পর যে প্রভুভক্ত, সুশিক্ষিত সৈনিকগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া ছিল, সেই অল্লায়মান সৈনিকদলকে সময়োপযোগী আবশ্যক আদেশ প্রদান করিলেন।

বিদ্যুদ্বেগে শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া রাজপুত সৈনিকদল রাজাকে লইয়া বাহির হইয়া গেল, তাহার পর পরিচিত পার্ব্বত্য পথে বিদ্যুতেরই মত মিলাইয়া গেল। মোগল সৈনিকগণ তাহাদিগের অনুসরণ করিতে পারিল না; সে পথ তাহাদিগের একান্ত অপরিচিত। শেষে তাহারা দূতের নির্দ্দেশমত পথে নগরাভিমুখে চলিল। সে পথ দীর্ঘ ও সঙ্কটসঙ্কুল।

সেতুমুখে অজয় সিংহ একদল সৈনিকসহ অপেক্ষা করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে রণক্ষেত্র হইতে দূতমুখে সংবাদ আসিতেছিল; সে সংবাদ আশাপ্রদ নহে। তিনি নানা অমঙ্গলের চিন্তায় কাতর। সম্মুখে প্রান্তর;—পশ্চাতে সেতু, স্তম্ভচ্ছেদনহেতু দুর্ব্বল। একবার পশ্চাৎদিকে চাহিয়া অজয়সিংহ দেখিলেন—মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত সেতু অতিক্রম করিয়া আসিতেছেন। অজয় সিংহ বিস্মিত হইলেন। বৃদ্ধ নিকটে উপনীত হইলে অজয় সিংহ প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথা হইতে আসিলেন?"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, "আমি তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া একবার রাজধানীতে আসিতেছিলাম। পথে এই সংবাদ পাইয়া দ্রুত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। শেষ সংবাদ কি?"

অজয় সিংহ বলিলেন, "রাজপুত সেনা সংখ্যায় ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে।"

"বৎস, রাজা এ সংগ্রামের অনিবার্য্য ফল নিশ্চয়ই জানিতেন।"

"জানিতেন; জানিয়া আমাদের নিষেধ সত্ত্বেও এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।"

অজয় সিংহ সংক্ষেপে রাজার উদ্দেশ্য ও উপদেশ বৃদ্ধকে বুঝাইলেন। বৃদ্ধ স্থিরভাবে তাহা শুনিলেন, তাহার পর অজয়সিংহের কথা শেষ হইলে গদগদ কণ্ঠে বলিলেন,—"বৎস, বহুদিনের দুর্ব্বলতা একদিনে যায় না; কিন্তু যে প্রথম দুর্ব্বলতাকে পদাঘাতে দূর করিতে সচেষ্ট হয়—গৌরব তাহার। আজ সে গৌরব—তোমার ভ্রাতার—আমার রাজার। আজ আমরা ধন্য।"

অজয়সিংহ বলিলেন, "কিন্তু জয়ের কোন আশা ত নাই।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "জয় আর গৌরব এক নহে। জগতের ইতিহাসে অনেক স্থলে দেখিবে—সমুজ্জ্বল সাফল্য অপেক্ষা অবনত অসাফল্যের গৌরব অধিক। জয় পরাজয় অনিশ্চিত। রাজপুত কি সর্ব্বত্রই জয়ী হইতে পারিয়াছে? কিন্তু রাজপুত কখনও আপনার স্বাতন্ত্র্য, সম্ভ্রম, সম্মান বিসর্জ্জন দেয় নাই। তাহাতেই রাজপুতের গৌরব। রাজপুত সেই আদর্শ অতলতলে বিসর্জ্জন করিয়া অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছিল; আজ একজন রাজপুত নৃপতি সেই আদর্শের উদ্ধার-চেষ্টায় আপনার জীবন বিসর্জ্জন করিতেছেন। বৎস, তাঁহার মত গৌরব কাহার? এমন আদর্শ কি নিষ্ফল হইবার?"

"কিন্তু আপনি শুনেন নাই, রাজা রাজপুত-সঙ্ঘগঠনের চেষ্টায় নিষ্ফল হইয়াছিলেন। যাহারা ঈর্ষ্যাবশে বা ভয়ে তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হয় নাই—তাহারাই মোগলকে সংবাদ দিয়াছে—ইহাই রাজার বিশ্বাস।"

"আমার সহিত পথে শঙ্কর সিংহের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি সব শুনিয়াছি। বহুদিনের আবর্জ্জনা কি একদিনে দূর হয়? কিন্তু এতদিনে আবর্জ্জনার স্তূপে অগ্নিসংযোগ হইল—তাহার ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। হতাশ হইও না। যিনি বিপন্নের একমাত্র শরণ—তিনিই রাজাকে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন। তাঁহার কার্য্য তিনিই করাইবেন।" বৃদ্ধ উদ্দেশে দেবতাকে প্রণাম করিলেন।

পার্ব্বত্য পথে দূরে ধূলি লক্ষিত হইল। এ পথ মোগলের অপরিজ্ঞাত; কিন্তু বিশ্বাস নাই। অজয় সিংহ মুষ্টিমেয় সৈনিক লইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

অল্পকালমধ্যেই দূরে রাজপুতের পরিচিহ্ন বেশ লক্ষিত হইল। তাহার পর সৈনিকগণ আরও নিকটবর্ত্তী হইলে অজয়সিংহ ও পুরোহিত দেখিলেন, তাহারা রাজাকে লইয়া আসিতেছে।

সেই মুষ্টিমেয় সৈনিক রাজাকে লইয়া যখন সেতুর নিকট উপনীত হইল—তখন দেহের নানাস্থানে ক্ষতমুখে শোণিতপাতে রাজা অবসন্ন—অশ্বপৃষ্ঠে আর বসিয়া থাকিবার সাধ্য নাই; দুইদিকে দুইজন তাঁহাকে ধরিয়া অশ্বচালনা করিতেছে।

অজয় সিংহ সযত্নে জ্যেষ্ঠকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া লইলেন; তার পর তাঁহাকে সেই তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে শায়িত করিলেন। রাজা দেখিলেন, সম্মুখে বৃদ্ধ পুরোহিত। তিনি গভীর আক্ষেপের স্বরে বলিলেন, "আজ আর কি দেখিতে আসিয়াছেন?"

বৃদ্ধ উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলেন, "আজ আমি আমার রাজাকে দেখিতে আসিয়াছি; আজ আমি রাজপুত গৌরবের তরুণ-অরুণ-বিকাশ দেখিতে আসিয়াছি। আজ আমি ধন্য, আজ তুমি ধন্য, আজ এ রাজ্য ধন্য।"

এই সময়ে বৃদ্ধ দেখিতে পাইলেন, পরপারে আশ্রমসীমায় পার্ব্বতী শিলা-খণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছেন। অজয়সিংহ সৈনিকদিগকে একে একে সেতু পার হইয়া নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উপদেশ দিলেন—তাহারা সেই আদেশ পালন করিতে লাগিল।

রাজা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার দেহ হইতে জীবনীশক্তি প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। তিনি অজয় সিংহকে বলিলেন, "মোগল সেনা অল্পক্ষণমধ্যে আসিবে। আমার উপদেশমত কার্য্য কর।" অজয়সিংহ তাঁহাকে তুলিতে উদ্যত হইলেন। রাজার কুঞ্চিত ভ্রূযুগে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল; তিনি বলিলেন "কি করিতেছ?"

অজয়সিংহ উত্তর করিলেন, "আপনাকে নগরে লইয়া যাইব।"

রাজা বলিলেন, "আমি রাজপুত; যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নগরে ফিরিব না। মোগল আমাকে মারিবে না জানিয়া—আপনাকে মরণাহত বুঝিয়া আমি এইস্থানে আসিয়াছি। আমার মস্তক ছেদন করিয়া লইয়া যাও।"

অজয়সিংহ মৃত্তিকা-লগ্ন-দৃষ্টি হইয়া রহিলেন।

রাজা উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পারিবে না?"

অজয়সিংহ নিরুত্তর রহিলেন।

রাজা উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলেন—পারিলেন না; সেই চেষ্টায় তিনি আরও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি পদতলে দণ্ডায়মান একজন সৈনিককে ইঙ্গিতে আপনার আদেশ জানাইলেন।

আজ্ঞাবহ ভৃত্য তরবারি কোশমুক্ত করিল—দিনান্ত-রবিকরে শাণিত ফলক ঝলকিয়া উঠিল। সেই সময় রাজা একবার পরপারে চাহিলেন,—দেখিলেন—আশ্রমসীমার শিলাখণ্ডের উপর হইতে গৈরিক অঞ্চল উড়িয়া নিম্নে—নদীগর্ভে পড়িল।

রাজার উন্নত কপালে যাতনার চিহ্ন লক্ষিত হইল—মৃত্যু-মূর্চ্ছায় তাঁহার নয়নদ্বয় মুদিয়া আসিল।

অজয় সিংহ ত্বরিতে উঠিয়া সৈনিকের আঘাতে উদ্যত হস্ত ধারণ করিলেন; তাহার পর ভ্রাতার শবদেহ তুলিয়া লইয়া সেতু পার হইলেন।

সেই সময়ে দূরে মোগলসেনার বর্শায় রবিকর-দীপ্তি দেখা গেল।

মোগলসেনা দেখিল, রাজার দেহ লইয়া কে সেতু পার হইল। সেই দেহলাভের আশায় তাহারা আরও বেগে অশ্বচালনা করিল।

মোগলের শত শত অশ্বারোহী সেনা এককালে সেতুর উপর উপনীত হইল। দুর্ব্বল সেতু বজ্রনাদে ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিজয়ী মোগলসেনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ নদীগর্ভে পতিত হইল। কেহ বা নদীগর্ভে প্রোথিত শূলে বিদ্ধ হইয়া গতপ্রাণ হইল; কেহ বা নদীস্রোতে শিলায় আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। অবশিষ্ট মোগলসেনা তীরে দাঁড়াইয়া সেই শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

পরপার হইতে শোক-কাতর রাজপুতগণ এই দৃশ্যে দারুণ দুঃখেও আনন্দ অনুভব করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শুদ্ধান্তে।

অন্তঃপুরে রাজার বিশ্রামকক্ষে প্রিয়স্পর্শপূত পালঙ্কে বসিয়া রাণী ভাবিতেছিলেন। সে ভাবনার অন্ত নাই। সহসা সেতুভঙ্গের ভীম নাদে তিনি চমকিয়া উঠিলেন। উমা সেই কক্ষেই ছিল,—তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উমা, এ শব্দ কিসের?"

উমা বলিল, "আমি জানি না।"

রাণী বলিলেন, "এ যে ভীষণ শব্দ!"

উমা বলিল, "যদি বলেন, আমি যাইয়া আমার জ্যেষ্ঠের নিকট জানিয়া আসি। তিনি বোধ হয় জানেন।"

রাণী বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শঙ্কর সিংহ কি প্রাসাদে? তিনি যুদ্ধে গমন করেন নাই?"

উমা উত্তর করিল, "রাজার আদেশে তিনি প্রাসাদেই অবস্থান করিতেছেন।"

"তিনি কোথায়?"

"প্রাসাদ-চূড়ায়।"

"কেন?"

"তিনি নগর-সীমায় সেনাদলের গতি লক্ষ্য করিতেছেন। প্রাসাদ ও দুর্গ রক্ষার ভার তাঁহার।"

রাণী বলিলেন, "তুমি এখনই যাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আন।"

উমা চলিয়া গেল। রাণীর বোধ হইতে লাগিল, তিনি একান্ত একা। একবার তাঁহার মনে হইল, রেবা আসিয়া তাঁহার নিকট থাকিতে চাহিয়াছিল, তিনি বারণ না করিলেই ভাল করিতেন।

কিছুক্ষণ পরে উমা প্রত্যাবৃত্তা হইল; জানাইল, শঙ্কর সিংহ বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। রাণী বলিলেন, "তাঁহাকে আসিতে বল।" উমা শঙ্কর সিংহকে ডাকিতে গেল।

শঙ্কর সিংহ কক্ষে প্রবেশ করিলে রাণী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনই যে দারুণ শব্দ শুনিলাম, উহা কিসের?"

শঙ্কর সিংহ সংক্ষেপে বলিলেন, "সেতুভঙ্গের।"

রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেতু কি দুর্ব্বল ছিল?"

"না।"

"তবে কি সেনাভরে ভাঙ্গিয়া পড়িল?"

শঙ্কর সিংহ ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। রাণী বলিলেন, "শঙ্কর সিংহ, আমি এ রাজ্যের রাণী—আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি আমার সহোদরাধিক উমার ভ্রাতা—আমার স্বামীর প্রিয় সুহৃৎ—আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, আজ আর আমার নিকট কিছু গোপন করিও না।"

রাণীর স্বরের আকুলতায় শঙ্কর সিংহ বিচলিত হইলেন; ভাবিয়া দেখিলেন, আজ আর কিছু গোপন করা নিষ্প্রয়োজন। তিনি ভগিনীর নিকট রাণীর পরিবর্ত্তনের কথাও শুনিয়াছিলেন; আজ তাহা অনুভব করিলেন। আজ রাজার ও রাণীর জন্য শঙ্কর সিংহের হৃদয় বেদনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

শঙ্কর সিংহ তখন রাণীকে সকল কথা বলিলেন। সেতু সম্বন্ধে রাজার ব্যবস্থা—তাঁহাকে রাজার উপদেশ—রাজ্য রক্ষার উপায়বিধান—অজয় সিংহকে রাজার আদেশ—শঙ্কর সিংহ একে একে রাণীকে সব বলিলেন।

শঙ্কর সিংহের কথা শেষ হইতে না হইতে রাণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তাভা ধারণ করিল—তাঁহার চক্ষু জ্বলিতে লাগিল। রাণী উচ্ছলিত স্বরে বলিলেন,—"শঙ্কর সিংহ, তুমি রাজপুত?"

রাণীর প্রশ্নে শঙ্কর সিংহ বিস্মিত হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে এ প্রশ্ন কেন?"

রাণী বলিলেন, "আজ যখন রাজপুত রাজা—রাজপুতের কল্যাণ-চেষ্টায় স্বয়ং বিপন্ন, তখন তুমি রাজপুত—কাপুরুষের মত—রমণীর মত রণবিমুখ কেন?"

এই তিরস্কারে—অপমানে শঙ্কর সিংহের শিরায় রক্তস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি স্বাভাবিক স্থির ভাব হারাইলেন না; বলিলেন, "রাণী, আমি রাজার আদেশে রাজপুতের বিলাসক্ষেত্র রণক্ষেত্রে যাইতে পারি নাই। আমি তিরস্কারের পাত্র নহি।"

রাণী বলিলেন, "কিন্তু তোমার রাজপুতহৃদয় কি তোমাকে কোন আদেশ দেয় নাই। রাজার দেব-দেহ শত্রুকরে লাঞ্ছিত হইবে জানিয়াও তুমি তাঁহার আদেশে স্থির হইয়া আছ? রাজার আদেশ কি কেবল তোমার কাপুরুষতার বর্ম্মমাত্র?"

"আমি সকল কথাই নিবেদন করিয়াছি।"

"তুমি রাজপুত, তুমি প্রজা, তুমি রাজার বন্ধু—সখা—তুমি কি সেই দেহ উদ্ধার করিয়া আনিবে না—তুমি কি সে চেষ্টা করিবে না?"

বলিতে বলিতে রাণীর রোষ-কঠোর কণ্ঠস্বর অনুনয়-বিগলিত হইয়া গেল, তাঁহার প্রদীপ্ত নয়ন অশ্রুসজল হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "শঙ্কর সিংহ, আমার শেষ অনুরোধ—সানুনয় প্রার্থনা, আমার স্বামীর দেহ আমাকে আনিয়া দাও।" বলিতে বলিতে রাণীর দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল।

শঙ্কর সিংহ কি করিবেন—ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময় শুদ্ধান্তদ্বারে অজয় সিংহের ভেরীতে সঙ্কেতধ্বনি ধ্বনিত হইল।

"অজয় সিংহ আসিয়াছেন"—বলিয়া শঙ্কর সিংহ ব্যস্তভাবে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

রাণী অবসন্নভাবে সেই পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন এক এক মুহূর্ত্ত এক এক যুগের মত দীর্ঘ।

অদূরে পদধ্বনি শুনিয়া রাণী দ্বারে চাহিলেন। শঙ্কর সিংহের পশ্চাতে অজয় সিংহ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখে বিষন্নভাব—দৃষ্টি হর্ম্মতলবদ্ধ—মস্তক নত।

দেবরকে দেখিয়া রাণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কাতরস্বরে বলিলেন, "অজয় সিংহ, আমার স্বামীর—আমার দেবতার দেহ আমাকে আনিয়া দাও।"

অজয় সিংহ মুখ তুলিতে পারিলেন না? অশ্রুর উচ্ছ্বাসে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। তিনি বলিলেন, "রাণী—দেবী"—

রাণী বাধা দিয়া বলিলেন, "অজয় সিংহ—আমি রাণী নহি—দেবী নহি—আমি নারী। আমার স্বামীর দেহ আনিয়া দাও।"

অজয় সিংহ ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি সে দেহ আনিয়াছি!"

রাণী ব্যাগ্রভাবে বলিলেন, "কোথায় সে দেহ? আমাকে তথায় লইয়া চল।"

অজয় সিংহ কক্ষ হইতে নিস্ক্রান্ত হইলেন। রাণী বাহ্যজ্ঞানহতবৎ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। শঙ্কর সিংহ ও উমা পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন।

কক্ষের পর কক্ষ অতিক্রম করিয়া অজয় সিংহ সোপানশ্রেণী অবতরণ করিলেন—তাহার পর পথ বাহিয়া অন্তঃপুরের ও বহির্ব্বাটীর মধ্যবর্ত্তী উদ্যানে উপনীত হইলেন। প্রহরী রাণীকে দেখিয়া সরিয়া গেল। রাণী আর কিছুই দেখিতেছিলেন না। উদ্যানের পর গৃহ। সেই গৃহের অপরিচিত পথে অজয় সিংহের অনুসরণ করিয়া রাণী রাজার উপবেশন গৃহে উপনীত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আদর্শ।

যে কক্ষে রাজা সাধারণতঃ অবস্থান করিতেন অজয় সিংহের সঙ্গে রাণী সেই কক্ষে উপনীতা হইলেন। হর্ম্মতলে বহুমূল্য আস্তরণ আস্তৃত।

তাহারই মধ্যস্থলে—স্বর্ণসূত্রখচিত রাজাসনে রাজার শবদেহ শায়িত। কেশরাশি বিশৃঙ্খল—মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ—নয়ন মুদিত।

রাণী সেই দেহ দেখিয়া মুহূর্ত্ত প্রস্তর-মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। জীবনে যে প্রেম ঘটনাক্রমে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই—আজ মৃত্যুমুখে তাহা আত্মপ্রকাশ করিল; তাহার প্রবল স্রোতে আজ রাণীর সকল সঙ্কোচ ভাসিয়া গেল। রাণী উন্মত্তবৎ যাইয়া শবদেহের মস্তক আপনার অঙ্কে তুলিয়া লইলেন—তাহার পর প্রগাঢ় প্রেমচুম্বনে সেই মৃত্যুশীতল—গৌরবোজ্জ্বল উন্নত কপাল প্লাবিত করিয়া দিলেন।

আজ রাণীর মনে হইল—এতদিনে তিনি আপনার ঈপ্সিতকে পাইয়াছেন। আজ রাজা রাজ্যের নহেন—একান্ত তাঁহারই। আজ তিনি ধন্য—কেন না, রাজার সহিত মরিবার অধিকার আর কাহারও নাই। যে জীবন এতদিন তাঁহার নিকট একান্ত ব্যর্থ বোধ হইয়াছিল—আজ তাহা সার্থক বোধ হইল। আজ সীমাহীন দুঃখের মধ্যে রাণী অসীম সুখ পাইলেন—দুর্দ্দশার প্রলয়ের মধ্যে তিনি আনন্দের অলোকরশ্মি দেখিলেন। রণহত পতিদেহ লইয়া রাজপুতনারী আজ গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিলেন।

অজয় সিংহ ও শঙ্কর সিংহ পরস্পরের মুখে চাহিলেন—উভয়েই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন।

উমা কাঁদিতে লাগিল।

দীর্ঘদিনব্যাপী জলদজাল দিনান্তে অপসৃত হইয়া যদি রবিকরবিকাশের অবসর দেয় তবে যেমন কমল-কোরক সেই রবিকরে একবার প্রস্ফুটিত হইয়া অচিরে নিশার তিমিরে আবার মুদিত হইয়া যায়—দেখিতে দেখিতে তাহার কুসুম-জীবনের সকল দশার শেষ হয়—তেমনই রাণীর পত্নী-জীবনের সকল দশাই দেখিতে দেখিতে শেষ হইতে লাগিল। অবস্থা পরিবর্ত্তনের—শোকের প্রথম—প্রবল আঘাতের পর রাণীর নয়নে শান্তিসহচর অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সেই অশ্রু-প্রবাহে শোকের আতিশয্য—বাহ্যজ্ঞানহীনভাব ভাসিয়া গেল; দীর্ঘ অবর্ষণের পর বর্ষণস্নিগ্ধ প্রকৃতির মত শান্ত—আত্মস্থ নারীপ্রকৃতি দেখা দিল। রাণী কাঁদিতে লাগিলেন।

এদিকে রজনীর তিমিরাবরণ ধীরে ধীরে ধরাবক্ষে বিস্তৃত হইতে লাগিল। অজয় সিংহের আদেশে কক্ষে বহুদীপ দীপাধারে দীপরাশি প্রজ্জ্বালিত হইল।

কিছুক্ষণ রোদনের পর রাণী অজয় সিংহকে বলিলেন, "অজয় সিংহ,

আমার শেষ কর্ত্তব্য পালনের উদ্যোগ করিয়া দাও। চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ প্রদান কর।"

অজয় সিংহ মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন—তাহার পর কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অল্পক্ষণ পরেই গৃহবিগ্রহের মন্দির-প্রাঙ্গণে রাশি রাশি ঘৃতসিক্ত চন্দন কাষ্ঠে চিতা প্রস্তুত হইল। সকল আয়োজন সম্পন্ন হইল।

রাণী অজয়সিংহকে প্রত্যাবৃত্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার চিতা-শয়ন—কুসুম শয়ন প্রস্তুত হইয়াছে?"

অজয়সিংহ উত্তর করিতে পারিলেন না।

রাণী বুঝিতে পারিলেন। তিনি রাজার মস্তক সযত্নে উপাধানে ন্যস্ত করিয়া আপনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

* * * * * * * * *

তাহার পর নৈশ তিমির ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে ঘৃতাহুতিপুষ্ট পাবকের শতশিখা শত রক্ত নাগিনীর মত আকাশে ফণা তুলিতে লাগিল—সেই আলোকে নৈশ অন্ধকার বিকট দেখাইতে লাগিল। আর রাজপুত রমণীর অশ্রুবিকম্পিত কণ্ঠে "লাজহরণ—তাপবারণ"—হুতাশনের স্তুতিগান গীত হইল।

সেই চিতায় দুরাসদ দেশপ্রীতি ও প্রগাঢ় প্রেম মিলিত হইল; কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কান্ত কমনীয়তা একত্র মিশিল; আদর্শ আত্মত্যাগের ও সীমাহীন সৌন্দর্য্যের শেষ মর্ত্ত্যবাসগৃহ ভস্মে পরিণত হইয়া রাজপুতানার পুণ্য ভূমির পূত ধূলিতে পরিণত হইল। যাহারা জীবনে অসীম আগ্রহ সত্ত্বেও পরস্পর মিলিত হইতে পারে নাই—মৃত্যু তাহাদিগকে মিলনে মিলিত করিল।

আর সব গেল—রহিল কেবল আদর্শ।

সম্পূর্ণ।

পাষাণের কথা।

(৮)

কণিষ্ক চলিয়া যাইবার পর কিছুকাল নানাদিগ্দেশ হইতে শরীরগর্ভস্তূপ-দর্শন-মানসে বহু যাত্রী আমাদিগের নিকটে আসিত। শুনিয়াছি, কণিষ্কের দ্বিতীয় পুত্র হুবিষ্কের রাজত্বকালে সদ্ধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অধিকার আর্য্যাবর্ত্তে প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল। এই সময়ে স্তূপবেষ্টনীর চতুষ্পার্শে বিত্তশালী তীর্থযাত্রিগণ কর্ত্তৃক অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। তোমরা প্রাচীনস্তূপের বহির্দ্দেশে এখনও যে সমস্ত মূর্ত্তির ভগ্নাংশ দেখিতে পাও, তাহা এই ক্ষুদ্র মন্দিরগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হুবিষ্কের মৃত্যুর পর পুনরায় সদ্ধর্ম্মের অবনতি আরব্ধ হইল; কারণ, নূতন সম্রাট বাসুদেব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পরেই আর্য্যাবর্ত্তে সমুদায় বিহারে ও সঙ্ঘারামে বিলাপধ্বনি শ্রুত হইল; কোনও স্থানে বৃত্তির অভাবে, কোনও স্থানে বা রাজশক্তির সাহায্যের অভাবে ও ব্রাহ্মণগণের প্রতিকূলাচরণে সঙ্ঘারামগুলি ভিক্ষুশূন্য হইয়া উঠিল। বাসুদেবের অব্যবহিত পরে যে সকল কুষাণবংশীয় রাজা সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা নামমাত্র সম্রাট ছিলেন। তাঁহাদের অধিকার পঞ্চনদ ব্যতীত অপর কোনও দেশে বিস্তৃত হয় নাই। ক্রমে বিশাল কুষাণ সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া গেল। প্রকৃত কুষাণবংশীয়দিগের হস্তে পঞ্চানদ ব্যতীত অপর কোনও দেশের অধিকার রহিল না। ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল; এবং পৃষ্ঠ-পোষণের অভাবে সদ্ধর্ম্মের তদনুরূপ ক্ষতি হইতেছিল। ক্রমে স্তূপের সন্নিহিত ক্ষুদ্র সঙ্ঘারামে স্থবিরগণের দেহাবসানের পর নূতন ভিক্ষুর অভাব ঘটিতে লাগিল ও ধীরে ধীরে সঙ্ঘারামবাসীদিগের সংখ্যার হ্রাস হইতে লাগিল। যে কয়েকজন অবশিষ্ট ছিলেন তাঁহাদেরই মুখে শুনিতাম যে, পাটলীপুত্রে নূতন সম্রাজ্যের বীজ উপ্ত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় নূতন রাজবংশ স্পষ্টভাবে সদ্ধর্ম্মের বিরোধী না হইলেও তৎপ্রতি বিশেষ অনুরাগী নহেন।

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সহিত লিচ্ছবিকন্যা কুমারদেবীর পরিণয় সম্পন্ন হইবার পর হইতেই নূতন রাজ্যের আকার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; একে একে ক্ষুদ্র শকরাজ্যগুলি নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল, পশ্চিম সাগরতীরে সৌরাষ্ট্র মাত্র আর্য্যাবর্ত্তে সদ্ধর্ম্মের একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়া রহিল। ক্রমে তীর্থযাত্রিগণেরও সংখ্যার অত্যন্ত হ্রাস হইল। পাটালীপুত্রে লিচ্ছবি-দৌহিত্র সমুদ্র গুপ্ত যখন আসমুদ্র ক্ষিতিজয়ের পর অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তখন আর্য্যাবর্ত্তে সদ্ধর্ম্মের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়; যে কয়েকজন ভিক্ষু ভিক্ষোপজীবিকা অবলম্বন করিয়া বনমধ্যস্থ সঙ্ঘারামে বাস করিতেছিলেন তাঁহাদিগের এক মুষ্টি অন্নের সংস্থানও অসম্ভব-প্রায় হইয়া উঠিল। সমুদ্র গুপ্তের পর চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই আনর্ত্তে ও সৌরাষ্ট্রে শকাধিকার লোপ করিলেন, ভারতে শকাধিকারের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল, কামরূপ হইতে সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত তাঁহার পদানত হইল ও দক্ষিণে নীল গিরি পর্য্যন্ত দক্ষিণাপথবাসী রাজগণ তাঁহার চক্রবর্ত্তিত্ব স্বীকার করিলেন। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর উত্তরাপথে এরূপ বিশাল সাম্রাজ্য আর দেখা যায় নাই। কিন্তু গুপ্ত সম্রাটগণের অধীনে তথাগতের ধর্ম্ম দিন দিন ক্ষীণতর হইতেছিল।

বহুকাল যাবৎ ভারতবর্ষে বিজাতীয় শত্রু প্রবেশ লাভ করে নাই। সুদূর অতীতে শকজাতির আক্রমণ সকলে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। শকগণও আর্য্যাবর্ত্তের আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম ও ভাষা অবলম্বন করিয়া, আর্য্য জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। কেহই ভাবে নাই যে, প্রবল পরাক্রান্ত গুপ্ত সম্রাটগণের শাসনাধীন আর্য্যাবর্ত্ত কোনও বিদেশীয় জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে। মরুপ্রান্তে তুষারময় উত্তরে বর্ব্বর জাতির অশ্বপদ-শব্দ শ্রুত হইল। সহস্র সহস্র—লক্ষ লক্ষ হূণ অশ্বারোহী মরুভূমি হইতে বহির্গত হইয়া বাহ্লীক ও কপিশা আক্রমণ করিল, ধূলিমুষ্টির ন্যায় সেই প্রবল ঝটিকার সম্মুখে গান্ধারের কুষাণ রাজ্য উড়িয়া গেল, গান্ধারের ও উদ্যানে শকজাতীয় সামন্ত রাজগণ হূণ আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টাও করিল না। এই সময়ে পাটলীপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের দেহাবসান হইল। প্রৌঢ় কুমার গুপ্তের উপরে এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনভার অর্পিত হইল। মগধে যখন কুমার গুপ্তের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে, তখন হূণগণ ধীরে ধীরে পঞ্চনদ, কাশ্মীর, দরদ ও খসদেশ শশ্মানে পরিণত করিতেছে। হূণগণের

নাম তোমরা অতি অল্পদিন শুনিয়াছ, কিন্তু কুমার গুপ্তের রাজত্বকালে হূণগণের নাম করিলে ভীতি-বিহ্বলা গর্ভিণীর গর্ভপাত হইত, স্কন্দ গুপ্তের শাসনকালে তাহাদিগের নাম শুনিলে দেশবিখ্যাত বীরগণ প্রহরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নপর হইতেন। খর্ব্বাকার, স্থূলদেহ, গুম্ফশ্মশ্রুবিহীন, পেচকের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট, পশুচর্ম্মাচ্ছাদিত হূণগণকে দেখিলে মনে অত্যন্ত ভয় হইত। সে সময়ে হূণগণের নাম শুনিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় জগতের সকল জাতিকেই শঙ্কিত হইতে হইয়াছিল। শুনিয়াছি, হূণদর্শনে প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের জনৈক বিখ্যাত ধর্ম্মযাজক বলিয়াছিলেন যে, তাহারা তাতারবাসী নহে—নরকবাসী।

হূণগণ যখন গুপ্তসাম্রাজ্যের পশ্চিমপ্রান্ত আক্রমণ করিল, তখন কুমার গুপ্ত পাটলীপুত্রের প্রাসাদে সুষুপ্তিমগ্ন; কুমার স্কন্দ গুপ্ত মথুরার শাসনকর্ত্তা। স্কন্দ গুপ্ত সিন্ধুতীরে যথাসাধ্য হূণগণের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; চন্দ্র গুপ্তের সুশিক্ষিত সৈন্যবৃন্দও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। ইরাবতী, বিতস্তা ও শতদ্রুতীরে উত্তরাপথবাসী সহস্র সহস্র সৈনিক স্বদেশরক্ষার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল, কিন্তু বাত্যাতাড়িত সাগরোর্ম্মিরাশির ন্যায় হূণ অশ্বারোহিগণ স্কন্দ গুপ্তের সৈন্যবল ভাসাইয়া লইয়া গেল। শতদ্রুপারে আসিয়া কুমার বিশ্রাম করিবার অবকাশ পাইলেন। বিতস্তাতীর হইতে যে দূত সাহায্য-প্রার্থনার জন্য মগধে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া শতদ্রুতীরের স্কন্ধাবারে যুবরাজকে বিষম সংবাদ জ্ঞাপন করিল,—বৃদ্ধ কুমার গুপ্ত তরুণীর রূপজ মোহে আবদ্ধ হইয়াছেন, পঞ্চাশৎবর্ষীয় বৃদ্ধ চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া উন্মত্ত হইয়াছেন এবং স্কন্দ গুপ্তের মাতা ক্রোধে ও ক্ষোভে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। দারুণ সংবাদ শুনিয়া স্কন্দগুপ্ত স্তম্ভিত হইলেন, অসম দ্বন্দ্বে তাঁহার বিলক্ষণ বলক্ষয় হইয়াছিল, তিনি মগধ হইতে বহু সৈন্যের আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, সম্রাট্ তখন নূতন মহিষীর আবাসে; মাসাধিক কাল কেহ তাঁহার দর্শন পায় নাই। হতাশ হইয়া স্কন্দ গুপ্ত মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও তথায় তদীয় খুল্লতাত মহারাজ-পুত্র গোবিন্দ গুপ্তের প্রেরিত দূতমুখে সংবাদ পাইলেন যে, গোবিন্দ গুপ্ত স্বয়ং বলসংগ্রহ করিতেছেন; তিনি সম্রাটের আদেশের জন্য অপেক্ষা করেন নাই; কারণ, তখনও পর্য্যন্ত কেহই সম্রাটের সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হয় নাই। সুখের বিষয় শতাদ্রুতীর হইতে হূণগণ উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল,

সুতরাং স্কন্দ গুপ্ত মথুরায় আসিয়া নগর রক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ গুপ্ত অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া মথুরায় আসিয়া স্কন্দ গুপ্তের সহিত মিলিত হইলেন। খুল্লতাত ভ্রাতুষ্পুত্র একত্র হইয়া হূণগণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

নব-পরিণীতা বালিকা মহিষীকে লইয়া কুমার গুপ্ত পাটলীপুত্র হইতে মহোদয়ে আসিলেন। পাটলীপুত্রের প্রাসাদবাসিগণের বাক্যযন্ত্রণা তাঁহার মহিষীর পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল; গঙ্গাতীরবর্ত্তী কান্যকুব্জের প্রাচীন প্রাসাদে আসিয়া বর্ষীয়ান্ সম্রাট্ শান্তি লাভ করিলেন। হূণগণ ধীরে ধীরে মথুরার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। স্কন্দগুপ্ত ও গোবিন্দ গুপ্তকে সাহায্য করিবার জন্য আর কেহই চেষ্টা করিল না। শকপ্লাবনের ন্যায় হূণপ্লাবন আসিয়া প্রাচীন সৌরসেন রাজ্য ভাসাইয়া লইয়া গেল, নানাবিধ প্রাচীন কারুকার্য্য-শোভিত রক্তবর্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত মথুরার নগরপ্রাকার হূণগণের আক্রমণ রোধ করিতে সমর্থ হইল না। গোবিন্দ গুপ্ত ও স্কন্দ গুপ্ত সন্তরণে যমুনা পার হইয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। ভিখারীর ন্যায় চীর পরিধান করিয়া কুমার ও মহারাজপুত্র মহোদয় নগরীর তোরণে উপস্থিত হইলেন। দৌবারিকগণ তাঁহাদিগকে দেখিয়া চিনিতে পারিল না বা সম্ভ্রম প্রদর্শন করিল না। তাঁহারা নগ্নপদে সুদীর্ঘ রাজবর্ত্মগুলি অতিক্রম করিয়া জাহ্নবীতীরে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। সামান্য ভিক্ষুক জ্ঞানে প্রতীহারিগণ তাঁহাদিগকে দূর করিয়া দিতেছিল; রোষে গোবিন্দ গুপ্ত অসি মুক্ত করিলেন। সমুদ্র গুপ্তের নামাঙ্কিত তরবারি দেখিবামাত্র প্রতীহারিগণ নতশির হইল, তাহারা সিপ্রা ও ভাগীরথীতীরে গোবিন্দ গুপ্তের ক্ষিপ্রহস্তে সেই অসিচালনা দেখিয়াছিল। কোষমুক্ত অসিহস্তে নিবারণোন্মুখ মহল্লিকাবর্গপরিবৃত হইয়া মেঘমুক্ত ভাস্করের ন্যায় উভয়ে সম্রাটের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, বর্ষীয়ান্ সম্রাট্ মহিষীর জন্য মাল্য রচনায় নিযুক্ত আছেন। পুত্রকে ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিয়া বৃদ্ধ অতি লজ্জিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া গোবিন্দ গুপ্তের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি জ্যেষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া পূর্ব্বজীবনের কথা বলিতে লাগিলেন। উন্মত্তের জ্ঞানোদয় হইল না; বৃদ্ধ সম্রাট্ অপরাধ স্বীকার করিয়া কুমার ও মহারাজ-পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিতে চাহিলেন, কিন্তু তরুণী মহিষীর ভ্রূভঙ্গী দেখিয়া তাহাও করিতে পারিলেন না। অনেক অনুরোধের পর স্কন্দ গুপ্ত ও গোবিন্দ গুপ্ত মহিষীসমভিব্যাহারে বৃদ্ধ সম্রাট্কে মন্ত্রণাগৃহে আনয়ন করিতে

সমর্থ হইলেন। মহিষীর অনুজ্ঞাক্রমে রাজশ্যালক হূণযুদ্ধে সেনাপতি নির্দ্দিষ্ট হইলেন। ইহার অতি অল্পদিন পরেই নিশীথকালে অল্পসংখ্যক হূণ অশ্বারোহী নগর আক্রমণ করিল, হূণনাম শ্রবণমাত্র বৃদ্ধ সম্রাট্ মহিষী ও শিশুপুত্রকে লইয়া হস্তিপৃষ্ঠে নগর ত্যাগ করিলেন। মুষ্টিমেয় হূণ অশ্বারোহী রাত্রিকালে প্রাচীন মহোদয় নগরীকে শ্রীহীন করিয়া গেল, স্তম্ভিত নগর-বাসিগণ আত্মরক্ষা করিতেও সমর্থ হইল না।

শরৎকালে একদিন প্রত্যুষে সঙ্ঘারামবাসী ভিক্ষুগণ পরিক্রমণের পথ মার্জ্জনা করিতেছেন, এমন সময়ে কনিষ্কনির্ম্মিত পাষাণাচ্ছাদিত পথে বহুরথচক্রের নির্ঘোষ শ্রুত হইল। অর্থলোলুপ ভিক্ষুগণ ভাবিলেন যে, নিশ্চয়ই কোন আঢ্য শ্রেষ্ঠী তীর্থযাত্রায় আসিতেছেন। কিন্তু সমাগত ব্যক্তিগণকে দেখিবামাত্র তাঁহাদিগের অর্থলালসা দূর হইয়া গেল, তাঁহারা সভয়ে দেখিলেন যে, অসংখ্য রাজপুরুষসমাবৃত হইয়া সিন্ধুদেশীয় অশ্বচতুষ্টয়-বাহিত রথে আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর কুমার গুপ্ত মহিষী ও পুত্র সমভিব্যাহারে ধীরে ধীরে স্তূপাভিমুখে আসিতেছেন। সৈনিকগণ শীঘ্রই ভিক্ষুগণকে স্তূপসন্নিধান হইতে দূর করিয়া দিল, সম্রাট্ পাষাণনির্ম্মিত প্রাচীন সঙ্ঘারামে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে বহু বস্ত্রাবাস স্থাপিত হইল। তখন সাম্রাজ্যের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, হূণগণ প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার করিয়াছে। পূর্ব্বে পাটলীপুত্রে গোবিন্দ গুপ্ত ও দক্ষিণে সৌরাষ্ট্রে স্কন্দ গুপ্ত বহু কষ্টে সাম্রাজ্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছিলেন। বৃদ্ধ রাজ মহিষীর অনুরোধে যুদ্ধবিগ্রহ হইতে দূরে থাকিবার জন্য বিন্ধ্যাটবীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

একদিন বনপথ অতিক্রম করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে গোবিন্দ গুপ্ত ও স্কন্দ গুপ্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন, বৃদ্ধ কঠিন পাষাণের উপর উপবেশন করিয়া মহিষীর কেশদামের পরিচর্য্যা করিতেছেন ও স্তূপবেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়াইয়া ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালক পুর গুপ্ত প্রাচীন জাতকের চিত্রগুলির প্রতি শরসন্ধান করিতেছে। দক্ষিণ তোরণের নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া জ্যেষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া গোবিন্দ গুপ্ত বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, মহাদেবী ধ্রুবস্বামিনী আপনাকে ভ্রমক্রমে পালন করিয়াছিলেন। যে স্তন্যপানে আমার দেহ বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই স্তন্যপানে আপনারও দেহ পুষ্ট হইয়াছে, সে কথা স্মরণ করিয়া আপনার কি লজ্জাবোধ হইতেছে না? যাঁহার বাহুবলে একদিন বাহ্লীক হইতে বঙ্গ পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত মহারাজাধিরাজ

চন্দ্র গুপ্তের পদানত হইয়াছিল, সেই ব্যক্তির বাহুবল অন্য রমণীর আর্দ্র কুন্তল শুষ্ক করিবার জন্য প্রযুক্ত হইতেছে, ইহাও আমাকে দেখিতে হইল? যাঁহার বাহুবলে শকগণ সৌরাষ্ট্র পরিত্যাগ করিয়া চিরকালের জন্য মরুমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, সে ব্যক্তিকে ভগবান্ কি পাপের জন্য বৃদ্ধবয়সে রমণীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়াছেন? উঠ, মহারাজ, ভূমিশয্যা পরিত্যাগ কর; চল, উভয় ভ্রাতায় পিতামহপ্রদত্ত দিগ্বিজয়ী তরবারি গ্রহণ করিয়া বিজাতীয় হূণগণকে সিন্ধুর পরপারে রাখিয়া আসি। মহারাজ, পাটলীপুত্র, মহোদয়, মথুরা, অবন্তী ও জলন্ধর পরিত্যাগ করিয়া কেন বিন্ধ্য পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ? শৈশবের আবাসভূমি পাটলীপুত্র, পবিত্র কান্যকুব্জ, মথুরা ও অবন্তী ও সুন্দর জলন্ধর পরিত্যাগ করিয়া আসিতে তুমি কি কষ্ট বোধ কর নাই? উঠ, প্রহরণ গ্রহণ কর, তরুণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া জড়ের ন্যায় বহুকাল বাস করিয়াছ; তোমার জড়তা দূর করিবার সময় আসিয়াছে।" নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া বর্ষীয়ান সম্রাট মহিষীর কৃষ্ণবর্ণ কেশগুচ্ছের প্রান্তে উপবিষ্ট রহিলেন। মহিষী মহারাজপুত্রের প্রতি বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন; রোষে গোবিন্দ গুপ্তের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ও স্কন্দ গুপ্তের চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। উভয়ে ধীরে ধীরে স্তূপবেষ্টনীর বহির্দ্দেশে গমন করিলেন।

বেষ্টনীর বহির্দ্দেশে শ্বেতবস্ত্র-পরিহিত কয়েকজন বৃদ্ধ দণ্ডায়মান ছিলেন। গোবিন্দ গুপ্ত ও স্কন্দ গুপ্তকে বহির্গত হইতে দেখিয়া তাঁহাদিগের মধ্য হইতে একজন অগ্রসর হইলেন, তিনি বিশাল গুপ্ত-সাম্রাজ্যের একমাত্র মন্ত্রী যুবরাজ ভট্টারকপাদীয়কুমারামাত্যাধিরণ দামোদর শর্ম্মা। তাঁহাদের শুষ্ক মুখ ও রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিয়াই বহুদর্শী মন্ত্রী তাঁহাদিগের সাধনার ফল অবগত হইলেন। খুল্ল-তাতের বা ভ্রাতুষ্পুত্রের বাক্য নিঃসৃত হইবার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, অধঃপতনের সময় হইলেই এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে, ইহা নিবারণ করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে; তবে তিনি স্বয়ং রাজসদনে উপস্থিত হইয়া রাজবংশীয় কোন ব্যক্তির যুদ্ধক্ষেত্রে উপ-স্থিতির প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করিবেন। প্রধান সেনাপতি মহাবলাধিকৃত অগ্নি গুপ্ত ও প্রধান বিচারপতি মহাদণ্ডনায়ক রাম গুপ্ত মন্ত্রীর বাক্য সমর্থন করিলেন। পরক্ষণেই পলিতকেশ সচিব তোরণমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কুমার গুপ্ত তখনও সেই ভাবে বসিয়া আছেন, মহিষী নিদ্রিতা; বালক

পুর গুপ্ত আলম্বনের উপরে আরোহণের চেষ্টা করিতেছে। বৃদ্ধ সচিব ও বৃদ্ধ সম্রাটে প্রায় একদণ্ডের অধিক কাল কথোপকথন হইল। বহু বাক্যব্যয় করিয়া রাজনীতিকুশল দামোদর শর্ম্মা বৃদ্ধ সম্রাট্‌কে কুমার স্কন্দগুপ্তের প্রতিনিধিত্বে সম্মত করাইলেন, কিন্তু সপত্নীপুত্রের নাম শ্রবণমাত্র মহিষীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। বর্ষীয়ান্ সম্রাট্ সভয়ে বলিয়া উঠিলেন যে, গুরুতর রাজকার্য্যে মহাদেবীর পরামর্শ আবশ্যক। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রোষে কম্পিত হইয়া উঠিলেন। মহাদেবীর আদেশ হইল, ত্রয়োদশবর্ষীয় কুমার পুর গুপ্ত হূণযুদ্ধে সম্রাট্ কুমার গুপ্তের প্রতিনিধিস্বরূপ মহাবলাধিকৃতের সঙ্গী হইবে। দামোদর শর্ম্মা অপেক্ষাকৃত গুরুতর বিপৎপাতের আশঙ্কা করিয়া বেষ্টনী হইতে বহির্গত হইলেন। শুষ্ককণ্ঠে যুবরাজপাদ দামোদর শর্ম্মা যখন সর্ব্বসমক্ষে মহাদেবীর আদেশ প্রচার করিলেন, তখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, সমুদ্র গুপ্তের রাজত্বের শেষ দশা আগতপ্রায়। বিষণ্ণবদনে সকলে স্তূপসন্নিধান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, ও এক প্রহর সময়ের মধ্যেই গোবিন্দ গুপ্ত অশ্বারোহণে পাটলীপুত্রাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রভাতে সকলে সবিস্ময়ে শুনিল যে, রাত্রিকালে স্কন্দ গুপ্ত অজ্ঞাতসারে স্কন্ধাবার পরিত্যাগ করিয়াছেন। তখন হইতেই বিচক্ষণ সেনানীগণের মুখ ভাবী বিপৎপাতের আশঙ্কায় গম্ভীর হইয়া উঠিল।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

য়ুরোপ-ভ্রমণ।

প্যারিস।

(২)

এপর্য্যন্ত প্যারিসের দ্রষ্টব্য বিষয়গুলির কথা কিছু বলি নাই। বোধ হয়, পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছে। এইবার প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়গুলির কথা কিছু বলিব। প্যারিসে দেখিবার জিনিষ বাস্তবিকই সংখ্যাতীত, সকলের বিশদ বর্ণনা করিতে হইলে মহাভারতের ন্যায় একখানি পুস্তকের অবতারণা করিতে হয়; আবার কোন্‌টা, ছাড়িয়া কোন্‌টার বিষয় লিখিব, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। ভারতবাসীর নিকট সবই অপূর্ব্ব, সবই সুন্দর লাগিয়াছিল। তবে এই পত্রিকার কলেবর স্মরণ করিয়া এবং সম্পাদক মহাশয়ের উপর যাহাতে অত্যাচার না হয় সেজন্য আমি এই কয়টি মাত্র বিষয়ের সামান্য বিবরণ দিব ঃ—

(১) লুভর প্রাসাদ, (২) ভার্সেল্স প্রাসাদ (৩) ঈফেল্ টাওয়ার, (৪) বোয়া ডি বুলঁ, (৫) পালে ডু জুষ্টিস্, এবং (৬) নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সমাধি-মন্দির।

(১) লুভর প্রাসাদ পৃথিবীতে অতুলনীয়। দেড় শত বিঘা জমির উপর এক প্রকাণ্ড রাজবাটী, ঘরের সংখ্যা প্রায় ১২০০, শুধু ঘরগুলি অতিক্রম করিতে দুই ঘণ্টা সময় লাগে; এই প্রকাণ্ড বাড়ীতে আছে কেবল পুস্তক, চিত্র ও মর্ম্মর-পুত্তলিকা। সহজেই অনুমিত হইবে যে, এত বড় পুস্তকাগার বা চিত্রশালা বা ভাস্করকীর্ত্তিগৃহ পৃথিবীতে আর কোথাও থাকা সহজ নহে। কেবল পুস্তকাগার হিসাবে বোধ হয়, লণ্ডনের British Museum লুভর অপেক্ষা বৃহৎ কিন্তু এত ছবি ও এত মর্ম্মর-মূর্ত্তি বাস্তবিকই আর কোথাও নাই। য়ুরোপ জয় করিয়া নেপোলিয়ন যে স্থানে যে উৎকৃষ্ট চিত্র বা উৎকৃষ্ট মর্ম্মর-মূর্ত্তি পাইয়াছিলেন, সবই এই স্থানে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যাবসানের পর সামান্য কিছু কিছু পূর্ব্বাধিকারীদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু অধিকাংশই প্যারিসে রহিয়া গিয়াছে এবং প্রায় সমস্তই এই লুভর প্রাসাদে সংরক্ষিত। য়ুরোপের যত বিখ্যাত চিত্রকরের বা মর্ম্মর-শিল্পীর নাম শুনা যায়, সকলেরই কীর্ত্তি এক লুভরে আসিলেই দেখা যায়।

এই প্রাসাদে চিত্রের সংখ্যা প্রায় চারি সহস্র। ইহার মধ্যে এমন অনেক ছবি আছে, যাহার প্রত্যেকটির মূল্য এক কোটী টাকার অপেক্ষাও অধিক। রাফেল, টিসিয়ান, পেরুজিনো, বেলিনি, লেনার্ডো ডা ভিঞ্চি, কোরেজিও, মুরিলো, ভেলাস্কে, ভ্যান ডাইক, রুবেন্‌স্‌, টেনিয়ার, রেম্ব্রাণ্ট, হোল-বাইন, প্রভৃতি ইটালীয়, স্পেন দেশীয়, ফ্লেমিস্‌, ওলন্দাজ, জর্ম্মান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান চিত্রকরের শত শত অতুল্য কীর্ত্তি লুভর প্রাসাদের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। এক এক খানি চিত্রের দিকে চাহিলে বাস্তবিকই চক্ষু জুড়ায়। চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে চিত্র অঙ্কিত,—দেখিলে মনে হয়, চিত্রকর যেন এই মাত্র তুলিকাহস্তে উঠিয়া গিয়াছেন; ছবির বর্ণ এমনই সুন্দর ও এতই তাজা!

মর্ম্মর-মূর্ত্তি যতগুলি আছে, তাহার মধ্যে Venus de Milo এবং হোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। প্রথমটির বিষয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। উহা খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে কোনও অজ্ঞাতনামা গ্রীক শিল্পীর গঠিত। মূর্ত্তিটি ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মাইলো নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে ভগ্ন অবস্থায় পাওয়া যায়। যদিও ইহার হস্ত দুইটি নাই, তথাপি এই সুন্দরীর মুখের ভাব ও অঙ্গসৌষ্ঠব জগতে অতুলনীয়। হস্ত দুইটি কি অবস্থায় ছিল, সে সম্বন্ধে বহু শিল্পী অজস্র জল্পনা প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

(২) য়ুরোপে যতগুলি রাজাবাস দেখিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে ভার্সেল (বা ফরাসি ভাষায় ভেয়ারসাই) প্রাসাদ গাম্ভীর্য্যে ও সম্পদে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। প্রকাণ্ড গৃহ;—অতি সুন্দর সুন্দর বহুমূল্য আসবাবে পরিপূর্ণ, দেখিলে বাস্তবিকই ফ্রান্সের রাজাদিগের ঐশ্বর্য্যের একটু আভাস মনে আসে। তাঁহারা যে কিরূপ বিলাসী ছিলেন, তাহা এই স্থানে আসিলে বুঝা যায়। আগ্রায় ও দিল্লীতে প্রাসাদগুলি খুব বৃহৎ বটে, কিন্তু বাসভবনের কক্ষগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র! আর এই প্রাসাদে প্রত্যেক কক্ষ অতি প্রকাণ্ড। এ প্রাসাদেও অনেক চিত্র ও মর্ম্মর মূর্ত্তি আছে। অধিকাংশই ফ্রান্সের ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছে; ফ্রান্সের ইতিহাসের প্রধান প্রধান ব্যক্তির ও প্রধান প্রধান ঘটনার প্রতিকৃতি। গৃহসংলগ্ন বাগানটি এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। বাগানের দিকে রাজবাড়ীর দেওয়াল ১২৭০ হাত লম্বা, তাহাতে প্রায় চারিশত জানালা দেখা যায়। তাহার পরে ত্রিতল উদ্যান। মধ্যে মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফোয়ারা, (দুই একটির

জল ৭৫ ফুট উর্দ্ধে উঠে) এবং অসংখ্য প্রস্তর-মূর্ত্তি। সর্ব্বনিম্ন তলে এক প্রকাণ্ড ঝিল, অর্দ্ধ মাইল অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ এবং ২৫০ গজ বিস্তৃত। তাহার পরে আবার বাগান। ঝিলের দুই ধারে বড় বড় ও ছোট ছোট অনেক ফুলের গাছ। গাছগুলি মাথায় সরু ও ক্রমে মোটা ভাবে ছাঁটা। চারি দিকে অসংখ্য ফুলের গাছ অতি সুশোভনভাবে সজ্জিত। দেখিতে যে কি সুন্দর, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ছবি আঁকিয়াও সে সৌন্দর্য্যের একাংশ দেখান কঠিন। প্রাসাদের চারি পার্শ্বে পাতর দিয়া বাঁধান উঠান; এবং উঠানে অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি। বাস্তবিক এই ভের্সারসাই প্রাসাদ ঐশ্বর্য্যের, বিলাসের ও সুরুচির লীলাভূমি।

বাগানের মধ্য দিয়া ট্রিয়ানন নামক দুইটি উপবনবাটিকায় যাওয়া যায়। সে দুইটি অতি মনোহর। রাজা চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ লুই তাঁহাদের দুইজন প্রিয়পাত্রের (Favourite) জন্য এই বাটী দুইটি নির্ম্মাণ করান। ছোট বাড়ী—বিচিত্র কারুকার্য্যময়। গৃহসংলগ্ন বাগানগুলিও অতি পরিপাটী।

(৩) ঈফেল টাওয়ারের প্রতিমূর্ত্তি বা প্রতিকৃতি অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। চারি কোনে চারিটি পায়ার উপর এক বিরাট স্তম্ভ বিরাজমান। সমস্তটাই ইস্পাতে গঠিত; কেবল পায়াগুলির নিম্নের ভিত্তি চুণসুরকীতে প্রস্তুত। স্তম্ভটির আয়তন এই পায়াগুলির মধ্যবর্ত্তী স্থানের পরিমাণ হইতেও বুঝিতে পারা যাইবে। সেই চতুষ্কোণ ভূমিখণ্ডের প্রত্যেক পার্শ্ব তিন শত হস্ত দীর্ঘ। স্তম্ভটি ৯৮৪ ফুট উচ্চ (কলিকাতার অক্টারলোনি মন্থুমেণ্টের সাত গুণ)। এই স্তম্ভটি চারিতল। প্রত্যেক তলে খাবার ও বিচিত্র দ্রব্যের (Curios) দোকান, ডাকঘর প্রভৃতি আছে। প্রথম তল ভূমি হইতে ১৯০ ফুট উচ্চে, তাহার পর আর ১৯০ ফুট উপরে দ্বিতীয় তল; ৯০৫ ফুট উচ্চে তৃতীয় তল। এই তলে একটি চতুষ্কোণ বারাণ্ডা আছে, তাহার চারিদিকে কাচ দেওয়া। এই বারাণ্ডায় ৮০০ শত লোক দাঁড়াইবার স্থান হয়। ইহার উপর আর এক তল। তথায়ও একটি গোল বারাণ্ডা আছে তদূর্দ্ধে প্রকাণ্ড বৈদ্যুতিক আলোক; রাত্রিকালে ৪৫ মাইল দূর হইতে দেখা যায়। এই টাওয়ারে উঠিবার সোপান ত আছেই, অধিকন্তু এক প্রকার রেলও আছে। একটা দোতলা বাক্স চাকায় বসান এবং তলা দিয়া প্রকাণ্ড লোহার শিকল লাগান। কলে এই শিকল টানা হয় এবং আরোহিসহ বাক্স চাকার উপর গড় গড় করিয়া উর্দ্ধে উঠে। আমি এই রেলেই উঠিয়াছিলাম।

দোতলা পর্য্যন্ত সিঁড়ির সংখ্যা ৭০০। আমার সঙ্গী দুইজন এই সিঁড়ি দিয়া নামিয়াছিলেন। টাওয়ারের উপর হইতে চতুর্দ্দিকের শোভা অতি অপূর্ব্ব। প্রায় ৫০ মাইলের অধিক দেখা যায়। এই ডাকঘরে প্রিয়জনকে চিঠি লিখিলে স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে, স্বর্গের অর্দ্ধপথ হইতে চিঠি লিখিলাম। বোধ হয়, রাজা হরিশ্চন্দ্র ইহার নিম্নে বাস করেন। উপরের দোকানে টাওয়ারের মূর্ত্তি-সম্বলিত পোষ্টকার্ড, দেশলাই, ঘড়ি, লকেট, ঘণ্টা, নস্যদানি প্রভৃতি অনেক জিনিষ পাওয়া যায়। আহার ও পানীয়ের ত কথাই নাই। দোতলায় একটি থিয়েটারও আছে।

(৪) বোয়া ডি বুলঁকে বন বলিব কি বাগান বলিব, জানি না। ১০০০ হাজার বিঘা পরিমিত একটি পার্ক। গাছ অবশ্য পূর্ব্ব হইতেই ছিল, প্যারিস ম্যুনিসিপালিটি ৩৩ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া ইহাকে নাগরিকদিগের সান্ধ্য বায়ু সেবনের স্থানে পরিণত করিয়াছেন। নগর-সংলগ্ন এত বড় কানন পরিষ্কৃত অবস্থায় রাখা আর কোনও দেশে সম্ভব কি না বলিতে পারি না। অপরাহ্ণে প্যারিসের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এইস্থানে বেড়াইতে আইসেন। ইহার ভিতর ২।৩টি হ্রদ, ২।১টি রেস্তরাঁ ও ঘোড়দৌড়ের মাঠও আছে। এই স্থানে বেড়াইতে গিয়া সাড়ী-পরিহিতা দুইজন পার্শি রমণীকে দেখিয়াছিলাম।

(৫) পালে ডু জুষ্টিস্ অথবা হাইকোর্ট প্রসিদ্ধ নোটারডাম নামক গির্জ্জার সন্নিকটে ও সেন নদীর মধ্যে এক দ্বীপে নির্ম্মিত। অন্যান্য প্রাসাদের ন্যায় ইহাও অতি বিশাল। ব্যারিষ্টারবর্গ যে হলে মক্কেলের সহিত কথাবার্ত্তা বলেন, তাহাই প্রায় ২৫০ শত ফুট লম্বা। এই বাটীতে প্যারিসের নিম্নতর বিচারালয় ব্যতীত উচ্চতম আদালত কুর ডে ক্যাসাসিয়ঁ (Cour de Cassation) অবস্থিত। তাহার প্রধান বিচারপতিকে দেখিতে ঠিক বোম্বাই হাইকোর্টের পার্শি জজ ডাভারের ন্যায়। এই আদালতে দেখিলাম, সাক্ষীর কাটরা ঘরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। সাক্ষী প্রথম আসিয়া দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া হলপ পাঠ করেন, তাহার পর হাত নামাইয়া সাক্ষ্য দেন। অন্যান্য কামরা যদিও খুব বড় কিন্তু এজলাসগুলি আমাদের কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির এজলাস অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন বোধ হইল।

(৬) নেপোলিয়ঁর সমাধি। আঁভালিদে (Invalides) প্রাসাদ

সংলগ্ন বৃহৎ গম্বুজের নিম্নে বিশ্ববিজয়ী মহাপরাক্রমশালী নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মর্ম্মর-রচিত সমাধি। এইস্থানে আসিলে বাস্তবিকই মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। এই স্থানে দাঁড়াইয়া নগ্নমস্তকে ঐ বীরবরের সমাধির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে মনুষ্য-জীবনের অসারতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ থাকে না। কুড়ি ফিট নিম্নে, ছত্রিশ ফিট পরিধি-বিশিষ্ট এক গোলাকার স্থানে সম্রাটের purple মার্ব্বেলের প্রকাণ্ড সমাধি। চতুর্দ্দিকে তাঁহার বিজয়-পতাকা সকল উড্ডীয়মান। উপরে তাঁহার ভ্রাতার, পুত্রের এবং সেনানীগণের সমাধি এবং তাঁহার স্ত্রীর হৃৎপিণ্ড রক্ষিত। চারি দিকে বন্ধুবর্গের মধ্যে এবং তাঁহার প্রধান প্রধান যুদ্ধের বিজয়-কীর্ত্তিস্তম্ভের মধ্যে মহাবীর মহানিদ্রায় নিমগ্ন। কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি মর্ম্মর-নির্ম্মিত। গম্বুজের উপরিভাগ নীলকাচমণ্ডিত। সূর্য্যালোক স্নিগ্ধভাবে সমাধিতে পতিত হয়। ইহাতে স্থানটি আরও গাম্ভীর্য্য-গৌরবময় হইয়াছে। যাঁহার বীরত্বগৌরব য়ুরোপের ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়াছে—এই তাঁহার শেষ ভূমিশয়ন—"গৌরবের পথ শুধু মৃত্যুর সোপান।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্যারিসে দ্রষ্টব্য জিনিস অসংখ্য। অধিক বর্ণনা করিতে চাহি না। তবে প্যারিসে একটি ব্যাপার দেখিয়াছিলাম, তাহা পৃথিবীতে আর কোথাও দেখা যায় কি না, জানি না। সেই সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া প্যারিসের কথা শেষ করিব। বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, প্যারিস্ আর্টিষ্টদিগের প্রিয় আবাসভূমি। আর্টিষ্ট বলিতে শুধু চিত্রকর বুঝায় না; চিত্র, গীত, বাদ্য, সাহিত্য, সর্ব্ববিধ বিদ্যার উপাসকদিগকেই Artist বলে। এই সব যাঁহারা চর্চ্চা করেন বা শিখেন, তাঁহারাই শিল্পশিক্ষার্থী। ইঁহাদের অধিকাংশই অতি দরিদ্র। স্ত্রী পুরুষ উভয়বিধ শিল্পশিক্ষার্থী প্রায় এক সঙ্গে বাস, আহার, বিদ্যাচর্চ্চা প্রভৃতি করেন। Bohemian lifeএর কথা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। কাহারও কাহারও বিশ্বাস, এই Bohemian life অতি কদর্য্য ও পাপপঙ্কিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমি Bohemian lifeএর একাংশ যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর এবং স্বর্গীয়। দুইজন দরিদ্র শিল্পী বন্ধুর সহিত এক রেস্তরাঁয় আহার করিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, ছয় সাত জন শিল্পী উপস্থিত, দুইজন স্ত্রীলোক—আর সব পুরুষ। একজন পুরুষের ভাব দেখিলাম, অর্দ্ধক্ষিপ্তপ্রায় লোকটির বড় বড় দাড়িচুল, মলিন অর্দ্ধছিন্ন পোষাক, কোটের অর্দ্ধেক বোতাম নাই ও অঙ্গে রঙ মাখা; পকেটে

সিকি পয়সাও নাই। রেস্তর্‌াঁর অধিকারী ও অধিকারিণী সকলকেই চিনেন, পয়সা কাহারও নিকট চাহেন না; জানেন, যাহার যেদিন পয়সা হইবে, সে সে দিন সমস্ত দেনা শোধ করিবেই। ইহার মধ্যে একজন স্ত্রীলোক গায়িকা; তিনি একজন সংবাদপত্র লেখকের বাগ্‌দত্তা। তাঁহার নিকট সেদিন কিছু পয়সা ছিল। তিনি অধিকারিণীকে ডাকিয়া ঐ ক্ষিপ্তপ্রায় ভদ্রলোকের পয়সা দিলেন এবং উঠিয়া যাইবার সময় তাঁহাকে জড়াইয়া চুম্বন করিলেন ও সেই সময় দেখিলাম, হাতে কয়টি টাকা লইয়া ঐ ভদ্রলোকের অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে তাঁহার পকেটে রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন; যে যে দেখিতে পাইল, তাহাকে তাহাকে চোখ টিপিয়া নিষেধ করিলেন, কেহ কিছু না বলে। এই অপার্থিব দৃশ্য দেখিয়া আমি বাস্তবিকই মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

পরদিন প্রাতে প্যারিস ত্যাগ করি।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু।

ভ্রান্ত।

কহে মরীচিকা-ভ্রান্ত
শুষ্কতালু পান্থ শ্রান্ত—
"গেল প্রাণ, যাক্‌,—শুধু এই দুঃখে মরি—
যে সৌন্দর্য্য হেরি, হায়!
উপনীত এ দশায়,
কোথায় স্বপন মম সেও গেল সরি!"

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ভণ্ড।

(১)

শিখাগতপ্রাণ ভবেন্দ্রনারায়ণের প্রাণে আজ সাঙ্ঘাতিক আঘাত লাগিয়াছিল। ভবেন্দ্রনারায়ণের একমাত্র পুত্র সুকুমার আজ কলেজ হইতে ফিরিবার সময় জননীর উৎসাহে এবং বন্ধুবান্ধবগণের প্ররোচনায় "হেয়ারকাটারের" সাহায্যে তাহার আজন্মের সহচর পিতার লোচনানন্দ স্থূল শিখাটিকে সম্পূর্ণ নির্ম্মূল করিয়া আসিয়াছিল।

মাধ্যাহ্নিক নিদ্রাভঙ্গে মুখ প্রক্ষালনের অবসরে ভবেন্দ্রনারায়ণ পুত্রকে চকিতের ন্যায় তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন; সহসা চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "সুকুমার!" শাসন-ভয়-ভীত অপরাধীর ন্যায় অতি সঙ্কুচিত ভাবে সুকুমার সম্মুখে আসিয়া অবনত মস্তকে দাঁড়াইল।

বিস্ময়ে কিয়ৎকাল ভবেন্দ্রনারায়ণের মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কিন্তু প্রতিক্রিয়া যখন আরম্ভ হইল, তখন তাঁহার সুগোল লোচনদ্বয় রক্তিম হইয়া উঠিল—"নাসা হইতে প্রলয়-বায়ু" বহিতে লাগিল—স্থূল, চিক্কণ, পুষ্পশোভিত দীর্ঘ শিখা সাজারু-গাত্রস্থ কণ্টকের ন্যায় মস্তকের উপর 'লম্ব' ভাবে উত্থিত হইল।

সুকুমার প্রমাদ গণিল। "হতভাগা" "পাজি" "ম্লেচ্ছ" "নাস্তিক"— ভবেন্দ্রনারায়ণ বজ্রনিনাদে গর্জ্জিয়া উঠিলেন।

সুকুমার বাতাহত কদলীপত্রের ন্যায় কাঁপিয়া উঠিল—সুশীলা স্বরচিত একটা নূতন ছবি দাদাকে দেখাইবার জন্য আসিতেছিল, সে হুহুঙ্কার শুনিয়া বিপরীত দিকে ছুটিয়া পলাইল—বালক ভৃত্যের কম্পিত হস্ত হইতে তাম্রকূটপাত্র সশব্দে পতিত হইয়া চতুর্দ্দিক বহ্নিময় করিয়া দিল।

তখন সুদক্ষ সেনানীর ন্যায় গৃহিণী জগদম্বা ধীরপদক্ষেপে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া কহিলেন, "এত চেঁচামেচি কিসের জন্যে?" তাঁহার হৃদয়কম্পী মূর্ত্তি দেখিয়া ভবেন্দ্রনারায়ণ আপনার অজ্ঞাতসারে সহসা অর্দ্ধপথে ক্ষান্ত হইলেন।

সুকুমার সুযোগ বুঝিয়া নিঃশব্দে দ্বার অতিক্রম করিল। ভবেন্দ্রনারায়ণ আজ সাঙ্ঘাতিক ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং গৃহিণীর মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তিও

তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করিতে পারিল না। তিনি অগ্নিগর্ভ ভূধরের ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া গর্জ্জিতে লাগিলেন,—"তোমা হইতে এ সংসারের সর্ব্বনাশ হইল; পিতৃপিতামহ 'লুপ্তপিণ্ডোদক' হইলেন—ধর্ম্ম লাঞ্ছিত হইলেন—হায় হায়! কি কুক্ষণেই তোমাকে ঘরে আনিয়াছিলাম! ছেলেটা উৎসন্ন গেল; ধর্ম্ম মাহাত্ম্যের শেষ স্মৃতিচিহ্ন—ভগবানের পবিত্র মন্দির—শিখা-দেবও আমাদের পরিত্যাগ করিয়া গেলেন—হায় হায়! আমি আত্মহত্যা করিয়া এ জ্বালা জুড়াইব।"

কিন্তু হতভাগ্য ভবেন্দ্রনারায়ণ অধিকক্ষণ ক্ষোভ প্রকাশের অবসর পাইলেন না। তাঁহার সেই ধিক্কার ও ক্ষোভের প্রতিধ্বনিরূপে গৃহিণীহৃদয়োত্থিত ক্রোধ-হুঙ্কার যখন অশনি-নিনাদে গর্জ্জিয়া উঠিল—তখন মুক্তকচ্ছ ভবেন্দ্রনারায়ণকে ত্রস্তভাবে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে হইল।

দোদুল্যমান-শিখা ভবেন্দ্রনারায়ণকে ব্যস্তসমস্তভাবে সভাগৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সভ্যবৃন্দশিরে সহসা টিকির তরঙ্গ খেলিয়া গেল। বলা বাহুল্য ভবেন্দ্র বাবুর সভাগৃহে কোন শিখাহীনের প্রবেশের অধিকার ছিল না। ভবেন্দ্রবাবুর ক্রোধোচ্ছ্বাস তখনও শমিত হয় নাই। ভবেন্দ্রবাবু সবেগে স্বস্থান অধিকার করিয়া প্রস্তাবনামাত্র না করিয়াই সোচ্ছ্বাসে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা বোধ হয় শিখাকে সামান্য একগুচ্ছ কেশমাত্র বিবেচনা করিয়া থাক। সনাতন ধর্ম্মের প্রতি তুচ্ছ বিষয় পর্য্যন্ত গভীর আধ্যাত্মিকমাহাত্ম্য-পূর্ণ। তোমরা কোন কথা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা কর না, তাই আজ আমাদের পরম পবিত্র আর্য্যধর্ম্মের এই নিদারুণ অবনতি। এত দেশ থাকিতে সমস্ত শরীরের মধ্যে একগুচ্ছ কেশ এত পবিত্র হইল কেন? কখনও কি এ কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ? কেহ ইহার প্রকৃত উত্তর দিতে পার?" ভবেন্দ্রবাবু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রত্যেকের মুখের দিকে চাহিলেন। সে প্রজ্জ্বলন্ত ধর্ম্মতেজোদীপ্ত দৃষ্টি যাঁহার উপর পড়িল, তিনিই বদন অবনত করিয়া মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে ভবেন্দ্রবাবু বলিতে লাগিলেন, "এইজন্যই তোমাদের এই দুর্দ্দশা! হায় হায়! আমাদের পরম পূজনীয় তত্ত্বদর্শী প্রপিতামহগণ এইজন্যই কি প্রাণপাত করিয়াছিলেন?" প্রবল ভাবোচ্ছ্বাসে ভবেন্দ্রবাবুর নয়নে জল আসিতেছিল। ভয়ে ও লজ্জায় পারিষদবৃন্দের চক্ষুও অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। তখন ভবেন্দ্রনারায়ণ জলদপ্রতিমস্বরে

জলের মত বুঝাইয়া দিলেন, শিখা ধর্ম্মের দৃঢ় স্তম্ভ এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়াই ধর্ম্ম বৃক্ষশাখাবলম্বী বাদুড়ের ন্যায় অধর্ম্মের অতলস্পর্শ গহ্বরের উপর ঝুলিতেছে। যখন এই স্তম্ভ হইতে সে চ্যুত হইবে, সেই দিনই ধর্ম্ম অতল রসাতলে নিমগ্ন হইবে।

অজ্ঞাতসারে সকলে ধর্ম্মের এই বিপুল স্তম্ভের দৃঢ়তার পরিমাণ যুগপৎ হস্ত দ্বারা অনুভব করিয়া লইলেন। রাত্রি এক প্রহরের পর সভাভঙ্গ হইল।

(২)

স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া পুষ্পশোভিত-শীর্ষ-শিখা-সনাথ ভবেন্দ্রনারায়ণ আপনার অভ্যস্ত আসনে সবেমাত্র উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময় এক শিখামাল্যধারী যুবা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে "গুরো" "গুরো" কহিতে কহিতে দুই হস্তে তাঁহার চরণদ্বয় জড়াইয়া ধরিল। ভবেন্দ্রবাবু ব্রাহ্মণ ছিলেন না। সুতরাং সহসা একজন মাল্য-তিলক-শোভিত ব্যক্তিকে চরণ স্পর্শ করিতে দেখিয়া কিছু সন্ত্রস্ত হইয়া সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ভক্ত তাঁহাকে ছাড়িল না; ভক্তি-গদগদ-কণ্ঠে গলদশ্রুলোচনে কহিল—"গুরুদেব! ভক্তকে পরিত্যাগ করিবেন না—বহুকষ্টে আপনার সন্ধান পাইয়াছি—'গুরুস্তু ভগবান্ স্বয়ম্', 'শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্' প্রভু! প্রভু!" দরবিগলিত অশ্রুধারা ভক্তের বদন-মণ্ডল অভিষিক্ত করিতেছিল।

ভবেন্দ্রবাবু সমাদরে ভক্তকে উঠাইয়া বসাইলেন। ভক্ত যুক্তকরে ভবেন্দ্র-বাবুর সম্মুখে বসিয়া একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; চাহিয়া চাহিয়া আপনার মনে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "সত্য! সত্য! স্বামীজি আপনার কথাই সত্য! আপনি যে যে লক্ষণ কহিয়াছিলেন, সমস্তই ইঁহাতে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।" থাকিয়া থাকিয়া সে প্রকাশ্যে চীৎকার করিয়া কহিল, "জয় জয় প্রভু গুরু-কুল-গুরু শ্রীশ্রীমদ্‌ভগবান্ শুকদেব গোস্বামী জয় প্রভু! অধমকে দয়া কর! অধমের মায়া মোহ দূর করিয়া দাও!" উদ্বেলিত-ভাবোচ্ছ্বাস ভক্ত পুনরায় ভবেন্দ্রবাবুর চরণ ধারণ করিল। ভবেন্দ্র আবার ব্যস্ত হইয়া ভক্তের প্রবল ভক্তিস্রোত কথঞ্চিৎ সংযমিত করিয়া দিলেন।

গদগদকণ্ঠে ভক্ত গুরুর নিকট আত্মনিবেদন করিল। ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাস এবং মুহুর্মুহুঃ উৎসারিত দীর্ঘশ্বাস ও প্রেমাশ্রুধারার মধ্য হইতে মোটের উপর বুঝা গেল যে, ভক্তপ্রবরের নাম শ্রীগরিবদাস ঘোষ; তিনি হুগলি জিলার অন্তর্গত স্থানবিশেষের জমিদারপুত্র—জমিদারীর বার্ষিক আয় আনুমানিক চল্লিশ সহস্র মুদ্রা—বয়ঃক্রম চতুর্ব্বিংশতি বৎসর। বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় আসক্তি, কিন্তু সমুদ্রবিশেষ শাস্ত্ররাশির মধ্যে তিনি আত্মহারা। এই অকূল সমুদ্রে কূল পাইবার জন্য "ভেলা"র অনুসন্ধানে তিনি বাহির হইয়াছিলেন। তিন বৎসর কাল ভারতের সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়াও সে তরণী তিনি পায়েন নাই। অবশেষ ভগবৎকৃপা—স্বামী দয়ালদাস তাঁহাকে বলিয়া দেন, ভারতবর্ষে একজন ব্যতীত তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন, এমন কেহ নাই, বঙ্গদেশে—গ্রামে শ্রীশ্রীভগবান শুকদেব গোস্বামী গৃহস্থরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—একমাত্র যদি তিনি কৃপা করেন তবেই তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। আজ এতদিনে তিনি তাঁহার আজন্মপোষিত আশাবৃক্ষের মূলদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এখন ভগবানের কৃপা! গরিবদাস সানুনয় দৃষ্টিতে ভবেন্দ্রবাবুর মুখের দিকে চাহিলেন। ভক্তের সরল ভক্তি পূর্ণ বদন এবং সর্ব্বোপরি তাহার শিরোদেশশোভী স্থূল চিক্কণ শিখার মাধুরী অবলোকন করিয়া ভবেন্দ্রনারায়ণের নয়নে বাৎসল্যের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। পারিষদবৃন্দ ম্লান মুখে শিখাস্পর্শ করিলেন; তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন তাঁহাদের অন্ন উঠিয়াছে।

(৩)

গরিবদাস অতি অল্পদিনের মধ্যেই ভবেন্দ্রবাবুর পরিবারমধ্যে আপনার স্থান করিয়া লইল। সুকুমার সুমহৎ অপরাধ করিয়া পিতার বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিল। গরিবদাস সেস্থান সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিল। ভবেন্দ্রবাবু তাহাকে পুত্রাপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

গরিবদাসের অনেক গুণ ছিল। গরিবদাস নিরন্তর আপনার মুখ খানিকে বর্ষার জলভরা মেঘের ন্যায় আঁধার করিয়া রাখিত (হাসির রেখা কেহ এ পর্য্যন্ত সে মুখে অঙ্কিত দেখে নাই) প্রত্যহ স্থূল শিখাটির উপযুক্ত সংস্কার-সাধন করিত; নিত্য নিয়মিত পূজা ধ্যান তিলক ধারণ করিত—ভবেন্দ্র-বাবুর আদেশে নবগৃহীত উপবীতগাছির প্রাথমিক শুভ্রতা সর্ব্বদা

অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিত; সন্ধ্যাকালে অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভবেন্দ্রবাবুর উপদেশামৃত অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিত এবং রাত্রিকালে ভবেন্দ্রবাবু শয়ন করিলে যাবৎ তিনি নিদ্রা না যাইতেন তাবৎ একান্তমনে তাঁহার চরণ-সংবাহন করিত—শত অনুযোগেও ইহা হইতে বিরত হইত না। এ হেন গরিবদাসকে স্নেহ না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না। তথাপি মনুষ্য চরিত্র বিচিত্র। গৃহিণী প্রথম দর্শনাবধি তাহার উপর বীতরাগ হইয়া উঠিয়াছিলেন। গরিবদাস যখন ভক্তি গদ্‌গদ কণ্ঠে সুর করিয়া তাঁহাকে ডাকিত, "মা জননি।" তখন কি জানি কেন স্নেহ-বাক্যের পরিবর্ত্তে অতি রূঢ় গালি তাঁহার ওষ্ঠপুট ভেদ করিয়া বাহির হইবার জন্য প্রাণপণ করিত।

সুকুমার আকারে ইঙ্গিতে সুযোগ পাইলেই তাহাকে পরিহাস করিত এবং আসন্নযৌবনা সুশীলা তাহাকে দেখিলে ভয়ে পাণ্ডুর হইয়া উঠিত। এমনই করিয়া বৎসর কাটিয়া গেল। গরিবদাস ভবেন্দ্রবাবুর হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিল। কিরূপে গরিবদাসকে স্থায়ী বন্ধনে বাঁধিতে পারিবেন এখন সেই চিন্তাই ভবেন্দ্রবাবুর প্রধান চিন্তা হইয়া উঠিল।

সুশীলা ত্রয়োদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ইহার পূর্ব্বেই তাহার বিবাহ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বহুদিন হইতেই এক প্রকার স্থির হইয়াছিল, প্রতিবেশিপুত্র রমানাথের পাঠ সমাপ্ত হইলেই তাহাদের বিবাহ হইবে। সুশীলাও তাহা জানিত, রমানাথও জানিত। কাযেই কর্ত্তা বা গৃহিণী এজন্য অধিক ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন নাই।

রমানাথ এই বৎসর এম, এ, পাস করিয়াছে। তাহার পিতামাতার এক্ষণে বিবাহ দিতে আর আপত্তি নাই।

কর্ত্তা শয়ন করিয়াছেন, গরিবদাস নিয়মিত চরণসেবা করিয়া এই মাত্র চলিয়া গিয়াছে; এমন সময় সুস্পষ্ট কণ্ঠে গৃহিণী ডাকিলেন, "বলি ঘুমুলে?"

"না না"—বলিয়া কর্ত্তা চক্ষুরুন্মীলন করিলেন।

"বলি সুশীলার বিয়ে আর ত ফেলে রাখা যায় না"।

কর্ত্তা ধীরে ধীরে বলিলেন, "পাত্র কই?"

গৃহিণী আকাশ হইতে পড়িলেন, "তুমি কি জেগে ঘুমুচ্চো না কি? রমানাথকে কি ভুলে গেলে না কি? আজও ত 'ভীমরতি' হয়নি।"

কর্ত্তা দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "রমানাথের সঙ্গে সুশীলার বিয়ে হবে না।"

স্তম্ভিতা গৃহিণী কহিলেন, "কেন?"

কর্ত্তা ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "তার চেয়েও ভাল পাত্র পাওয়া গেছে।"

"কে ?"

কর্ত্তা একটি একটি অক্ষর স্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করিয়া বলিলেন "গরিবদাস।"

শুনিয়া গৃহিণী বিস্ময়-বিস্ফারিত বদন বহুক্ষণ রুদ্ধ করিতে পারিলেন না; তাহার পর গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তোমার কি বাতাত্ত্বরে ধর্‌ল না কি ? ওই হতভাগা, পোড়ারমুখো, শুঁটকো মিন্‌সে, বয়সের গাছ পাতর নেই, মুখ দেখ্‌লে গায়ে জ্বর আসে, ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে ?"

কর্ত্তা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সে জমীদারের ছেলে, তার বয়স চব্বিশ বছর।"

উত্তেজিতা গৃহিণী কহিলেন, "তার চোদ্দ পুরুষে কখনো জমিদার ছিল না,—জমিদারের ছেলের ওই রকম চাষাড়ে হাত পা আর শুঁটকো মড়িপোড়ার মত চেহারা হয়! চ'খের মাথা কি খেয়েচো ? ওর বয়েস চব্বিশ বছর ? ওর সময়ে ছেলে হ'লে তার বয়েস চব্বিশ হোতো!"

গৃহিণী যথাসাধ্য প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু কর্ত্তা "নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্।" আজ কর্ত্তা বজ্রে হৃদয় বাঁধিয়াছিলেন—গৃহিণীর ক্ষুরধার বাক্য, অশনি-নিনাদ-নিন্দী বিলাপধ্বনি, পাষাণবিদ্রবী অশ্রুজল কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। কর্ত্তা দৃঢ়কণ্ঠে আদেশ দিলেন, এক পক্ষ পরে সুশীলার সঙ্গে গরিবদাসের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইবেক, ইহাতে সৃষ্টি থাকুক আর যাউক। শুনিয়া গৃহিণী ধরাশায়িনী হইলেন।

(৪)

পরদিন সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল, গরিবদাসের সঙ্গে সুশীলার শুভ বিবাহ ১৯শে আষাঢ় সম্পন্ন হইবে। শুনিয়া গরিবদাসের চির-অন্ধকার মুখে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল—পারিষদবৃন্দ হতাশাভরে শিখা স্পর্শ করিল, সুশীলা ভয়ে পাণ্ডুর হইয়া উঠিল, রমানাথ দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিল—সুকুমার রুদ্ধকণ্ঠে গালি দিল! কিন্তু ইহার প্রতীকারের উপায় কি ? অতুল-প্রতিভা-শালিনী গৃহিণী পর্য্যন্ত হতাশ হইলেন। সুশীলার অবিরল অশ্রুধারা দেখিয়া এবং রমানাথের সুন্দর সুগঠিত মুখ স্মরণ করিয়া তাঁহার বুক ফাটিয়া

যাইতে লাগিল। হতাশার ঘন-কৃষ্ণ মেঘে ভবেন্দ্রবাবুর গৃহ-প্রাঙ্গণ অন্ধকার হইয়া গেল।

তখন সুশীলার সখী সুন্দরী ইন্দুলেখা এই হতাশা-ঘনাচ্ছন্ন কৃষ্ণাকাশতলে স্বর্ণজ্যোতি দামিনীরূপে অবতীর্ণা হইলেন। ইন্দু রমানাথের ভগিনী—সুশীলার প্রিয়তমা হিতৈষিণী—প্রখরবুদ্ধিশালিনী।

ইন্দু বলিল, "সুশীলা, কেঁদে মর্‌চিস্ কেন? আমি এর উপায় কোরে দিচ্চি।" কাতরকণ্ঠে সুশীলা বলিল, "কি উপায়, বোন্?" ইন্দু বলিল, "সে যাই হোক্, তোর সঙ্গে গরিবদাসের বিয়ে কিছুতেই হবে না—সে বিষয়ে তুই নিশ্চিন্ত থাক্।" ইন্দুর প্রতিভার উপর সুশীলার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। সে প্রবোধবাক্যে চক্ষু মার্জ্জনা করিল। তাহার পর দুই সখীতে কি পরামর্শ হইল, জানি না। পরামর্শ-শেষে কিন্তু সুশীলার ম্লানমুখে মধুর হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। সুশীলা হাসিয়া সখীকে বলিল, "দূর পোড়ারমুখী!"

(৫)

প্রাতঃস্নাত গরিবদাস স্তুতিপাঠ করিতে করিতে অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে পুষ্পচয়ন করিতেছিল,এমন সময়ে কোকিল-বিনিন্দিত কণ্ঠে কে ডাকিল,"জামাই বাবু!" চমকিয়া গরিবদাস মুখ ফিরাইল। হায় হায়! গরিবদাস কি দেখিল! জ্যোৎস্না-ধবলিত শুভ্র মেঘখণ্ডের মত—পুষ্পাভরণভূষিত স্বর্ণব্রততীর মত—রবিকরফুল্ল প্রস্ফুটিত কমলিনীর মত, মরি মরি, হাস্যপুলকোজ্জ্বল কি স্বর্গীয় দেবী-প্রতিমা! গরিবদাস নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে প্রতিমার দিকে চাহিয়া রহিল। যুবতী কহিল, "কি জামাইবাবু! হাঁ ক'রে দেখ্‌চ কি? আমি কি সুশীলার চেয়েও সুন্দর?" গরিবদাস উত্তর দিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। ইন্দু তখন গম্ভীর হইয়া বলিল, "সইএর সত্যিই ভাগ্যি ভাল। কি মুখ, কি চোখ, তার উপর ভগবানে এমন ভক্তি, আহা যেন সাক্ষাৎ ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ! জামাই বাবু! সুশীলা আমার সই, সুশীলাকে বড় ভালবাসি, তাই আপনার সঙ্গে যেচে আলাপ কর্ত্তে এসেচি, মুখরা ব'লে ঘৃণা ক'র্‌বেন না। আপনি ঋষিতুল্য, আপনার কাছে লজ্জাই বা কি?"

ঋষিতুল্য গরিবদাসের তখন মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল—তিনি সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছিলেন। সূর্য্যকরস্পর্শগলিত তুষারের ন্যায় ইন্দুর মায়ানেত্র-পাতে গরিবদাসের বহুদিবসাভ্যস্ত বাহ্য কপটতা মুহূর্ত্তে গলিয়া গিয়াছিল; তাহার স্বাভাবিক দুর্ব্বল হৃদয়ের বাহ্যভক্তির শুভ্র যবনিকা ক্ষণমধ্যে অপসৃত

হইয়াছিল। ইন্দু তাহার ভাব দেখিয়া মনে মনে খুব হাসিল; ভাবিল, এ অধম পশুটাকে বশীভূত করিতে অধিক সামর্থ্যের প্রয়োজন হইবে না।

(৬)

গরিবদাস আর সে গরিবদাস নাই। বাহিরে অপরের নিকটে সে এখনও তেমনই ধর্ম্মরত ভক্তিপূর্ণ; কিন্তু সুন্দরী ইন্দুলেখার নিকটে সে আজ্ঞানুবর্ত্তী নৃত্যপরায়ণ মর্কটমাত্র। ইন্দুলেখা সম্রাজ্ঞীর মত ঘাটের প্রস্তরবেদীতে বসিয়াছিল এবং গরিবদাস প্রভুভক্ত কুক্কুরের ন্যায় তাহার আরক্ত চরণতলে উপবেশন করিয়া সেই অপূর্ব্ব সুষমারাশির দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। কিছু দূরে এক যুবতী পরিচারিকা বসিয়া অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনে বদনচন্দ্র আবৃত করিয়া রঙ্গ দেখিতেছিল।

অপাঙ্গে ঈষৎ হাসির বিদ্যুৎ খেলাইয়া চারু বিম্বাধর স্ফুরিত করিয়া অনুযোগের কণ্ঠে ইন্দু বলিল, "কিন্তু সইকে তুমি সত্যি ভালবাস না, জামাই বাবু! সে প্রত্যহই আমার কাছে দুঃখ করে।" সোচ্ছ্বাসে গরিবদাস বলিল, "অ্যাঁ কেন? সে কি কথা? আমি ভালবাসি না? অ্যাঁ—এও কি সম্ভব? আমি তাঁর জন্য কুল-শীল-মান-প্রাণ—কি না বিসর্জ্জন দিতে পারি? আপনি প্রায়ই আমায় এ অনুযোগ দেন, আচ্ছা বলুন, কি করিলে আপনাদের বিশ্বাস হয়, আমি সুশীলাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসি।" গম্ভীর হইয়া ইন্দু বলিল, "আপনারা পুরুষ মানুষ, কথায় আপনাদের আমরা আঁটিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু সত্যি যদি ভালবাসিতেন—"

উৎসাহে গরিবদাস বলিল, "কি কি? বলুন বলুন!" ক্ষণেক চুপ করিয়া ইন্দু মুখ ভার করিয়া বলিল, "সত্যি যদি ভালবাস্‌তেন, তা হ'লে সইএর একটা সামান্য অনুরোধ আর রক্ষা ক'র্‌তেন না? সই কতদিন ব'লেচে, 'আহা এমন সুন্দর চেহারা—যদি মাথায় টিকিটি না থাকৃত!" গরিবদাস নীরবে মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে লাগিল।

মৃদুস্বরে অনুযোগের সুরে ইন্দু বলিল, "এই ত, জামাইবাবু, এই সামান্য অনুরোধটাও রাখ্‌তে পারেন না—এখনি ত প্রাণ দিতে যাচ্ছিলেন—সামান্য দুগাছা চুল দিতে যাঁরা পারেন না, তাঁদের আবার ভালবাসা! আর তাঁদের জন্যে আমরা জীবন যৌবন ইহকাল পরকাল বিসর্জ্জন দি!" (হায় মায়াময়ী নারী!) ইন্দুর বিশাল নয়নতট অশ্রুতে ভরিয়া আসিল। যে কুহকমন্ত্রের প্রবল শক্তি ঋষিকে বিচলিত করে, ভণ্ড কপট লালসার দাস

গরিবদাসের পক্ষে সে শক্তিকে বাধা দিবার সম্ভাবনা ছিল না। গরিবদাস—আত্মহারা গরিবদাস—মূঢ়ের মত বলিয়া উঠিল, "যা বল্‌বেন তাই কর্‌ব, তবু এ অপবাদ আর সইব না।"

হাসিয়া কৌতুকোজ্জ্বল চক্ষু গরিবদাসের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া মায়াবিনী পিককণ্ঠে কহিল, "এ কথা মনে থাকে যেন।" গরিবদাস সে অমৃতবর্ষী দৃষ্টিসম্পাতে সংজ্ঞা হারাইল, আপনার অজ্ঞাতসারে বলিয়া উঠিল, "যদি দেখাবার হ'ত, তা'হলে হৃদয় বিদীর্ণ করে দেখাতাম, সে কথা রক্তের অক্ষরে বুকের মধ্যে লেখা হয়ে গেছে।" বিদ্রূপ-প্রিয়া ইন্দু মনে মনে বলিল, "আহা গরিবদাস না হ'য়ে নামটি রামদাস হ'লেই ঠিক মানাত। যেমন রূপ তেমনই গুণ।" তাহার পর ইন্দু এবং বিশ্বাসী পরিচারিকার সঙ্গে গরিবদাসের কি এক পরামর্শ হইল। নিমজ্জনোম্মুখ হতভাগ্যের মত দুই একবার ক্ষীণ আপত্তি করিয়া গরিবদাস সকল কথাতেই সম্মত হইল। সহসা অন্তরাল হইতে সুশীলা আসিয়া ইন্দুর সঙ্গে যোগ দিল। তখন দুই সখীতে লঘুপদে গরিবদাসের দৃষ্টিরেখা অতিক্রম করিল। চাহিয়া চাহিয়া গরিবদাস চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। তাহারা দৃষ্টির বাহির হইয়া গেলে সে কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, "উঃ এ যদি কপালে ঘটে ত খুব জোর কপাল। বাবা! এত দিনে পা টেপা সব সার্থক।" উল্লাসে তার গোঁফে তা দিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু হতভাগ্য ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে সে সুখে বঞ্চিত করিয়াছিল। ইন্দু বাড়ী ফিরিয়া রমানাথের নিকট সব গল্প করিল। রমানাথ প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া বলিল, "তু'ই দেখ্‌চি বিসমার্ক হ'য়ে উঠ্‌লি।" সুকুমারও সে হাসিতে প্রাণ খুলিয়া যোগ দিল।

(৭)

আগামী কল্য সুশীলার গাত্রহরিদ্রা। আজ অপরাহ্নে গরিবদাসের প্রতিজ্ঞারক্ষার দিন। ইন্দু আজও সকালে আসিয়া সেই ভুবনমোহিনী হাসির সাহায্যে আর একবার সে কথা তাহাকে মনে করাইয়া দিয়া গিয়াছে। সুতরাং গরিবদাসের নিষ্কৃতির উপায় ছিল না। অগত্যা গরিবদাস আহারান্তেই গৃহত্যাগ করিয়াছিল।

বহুদিনের সুদীর্ঘ শিখাকে আমূল অপসারিত করিয়া এবং ইংরাজি ফ্যাসানে চুল ছাঁটিয়া গরিবদাস দর্পণে একবার আপনার মুখচন্দ্রখানি প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইল। মরি! মরি! কি অপরূপ মাধুরী! হায়, হায়

এমন সৌন্দর্য্যশিখা সে মৃৎপাত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়াছিল! গরিবদাস ভাবিয়া হৃদয়ে বেদনা পাইতেছিল। প্রাণ ভরিয়া আপনার মূর্ত্তিখানি দেখিয়া গরিবদাস বসিয়া বসিয়া মনোমত করিয়া আপনার কেশের প্রসাধন করিল; পরে সেস্থান হইতে উঠিয়া চারিদিক চাহিয়া ত্রস্তপদে একটি দোকানে প্রবেশ করিল।

গরিবদাস যখন বাটী ফিরিল তখন অপরাহ্ন। বাটীর দ্বারের নিকটে আসিয়া গরিবদাসের বক্ষস্পন্দন দ্রুততর হইয়া উঠিল। গরিবদাস তাড়াতাড়ি মস্তকের উপর উত্তরীয় খণ্ড জড়াইয়া আনীত খাদ্যসম্ভার অতি সঙ্গোপনে হাতে লইয়া অতি দ্রুতবেগে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল।

ইন্দু আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিল। সে আপনার সম্মোহন সৌন্দর্য্যরাশি লইয়া অপরাহ্নের চিরবিচিত্র আকাশতলে সেই প্রস্তর বেদীর উপর বসিয়া ছিল। সুশীলা তথায় উপস্থিত ছিল না। কেবল একজন পরিচারিকা বৃক্ষান্তরালে অবস্থান করিতেছিল।

গরিবদাসের নয়নে আনন্দের বিদ্যুৎ খেলিতেছিল। সে ইন্দুর সম্মুখীন হইয়াই সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া দুই হস্তে কাগজমণ্ডিত প্রিয় শিখাটিকে তাহার চরণতলে স্থাপিত করিয়া কৌতুকের সুরে গাহিয়া বলিল "দেবি, ধর উপহার, দেবি ধর উপহার!"

ইন্দু গরিবদাসের প্রসাধিতকেশ মস্তকের পাশ্চাত্যশোভা দর্শন করিয়া মনে মনে একবার খুব হাসিয়া লইল; প্রকাশ্যে বলিল, "জামাইবাবু, বাস্তবিক আপনাকে এইবার কি সুন্দরই মানিয়েছে। এবার সই আপনার শ্রীচরণে চিরদিন বন্দী হয়ে থাকৃবে।"

উল্লসিত 'জামাইবাবু' হাসিয়া বলিলেন, "আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।" ইন্দু তখন বলিল, "আর যা বলেছিলাম?" গরিবদাস উত্তরীয়মধ্যস্থ কাগজ মোড়কের দিকে সগর্ব্ব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "আলবৎ"! ইন্দু বলিল, "তবে একটু বসুন আমি সব যোগাড় করে দি। বলিয়াই ইন্দু ভক্তপ্রদত্ত উপহারটি গ্রহণ করিয়া দ্রুতবেগে সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

ভবেন্দ্রনারায়ণ নিদ্রাভঙ্গে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে একটি ছোট টেব্‌লের উপর রজত রিকাবিতে একটি কাগজের মোড়ক রহিয়াছে। তাহার উপর মোটা মোটা করিয়া লিখা "ভক্তি উপহার"; এবং

তাহারই এক পার্শ্বে ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখা "ভক্ত গরিবদাস।" লেখা গরিবদাসের নিজের। বিস্মিত ভবেন্দ্রনারায়ণ মোড়কটি হস্তে লইলেন। মোড়কটি খুলিয়া তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে আর তাঁহার মস্তিষ্কের স্থিরতা রহিল না। সেই কাগজ মোড়কের ভিতর গরিবদাসের স্থূল, চিক্কণ, সুদীর্ঘ শিখা! তন্মধ্যে গরিবদাসের কঙ্কাল দেখিলেও তিনি তাদৃশ বিস্মিত হইতেন না। ভবেন্দ্রবাবু নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; সহসা নিজ চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; অবশেষে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন "গরিবদাস!" প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিল, গরিবদাসের উত্তর পাওয়া গেল না।

গৃহিনী আসিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "তোমার ভক্তের লীলা একবার দেখে যাও।"

ভবেন্দ্রনারায়ণ গৃহিনীর সঙ্গে নীরবে যে স্থানে গরিবদাসের সভা বসিয়াছে তাহার নিকটে এক কামিনী বৃক্ষের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইলেন। গরিবদাসের পুলকস্রোতে তখন পূর্ণ জোয়ার আসিয়াছিল। টেব্‌লের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুইহস্তে দুইটি পাঁউরুটির করতালি গ্রহণ করিয়া চুরুট মুখে বাউলের সুরে সমবেতা যুবতীসখীবৃন্দের নিকটে—সে গাহিতেছিল—

"তোমরা সবাই ভালো
যার অদৃষ্টে যেম্‌নি জুটুক সেই আমাদের ভালো।"

সুন্দরীকণ্ঠে কলহাস্য উথলিয়া উঠিয়া তাহাকে ক্রমাগত উৎসাহিত করিতেছিল এবং সে কশাহত অশ্বের ন্যায় ক্রমেই অধিকতর উত্তেজিত হইয়া স্বরকে উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে চড়াইতেছিল। এমন সময়ে রক্তচক্ষু ভবেন্দ্র নারায়ণ পাদুকাহস্তে দ্রুতবেগে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন।

"উত্থিত কৃপাণকর হইল অচল
সম্মুখচরণদ্বয়
পবনে উত্থিত হয়
দাঁড়াল, নবাব সৈন্য হইল অচল।"

কাদম্বিনীবক্ষে বিদ্যুতের ন্যায় রমণীবৃন্দ নিমিষমধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। মুহূর্ত্তে গরিবদাস পাষাণ-পুত্তলিকায় রূপান্তরিত হইয়া গেল।

ব্যাঘ্রগর্জ্জনে ভবেন্দ্রনারায়ণ কহিলেন, "তোমার টিকি কোথায়?" যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত গরিবদাস হস্তদ্বারা শিখার পূর্ব্ববাসস্থান নীরবে স্পর্শ করিল।

"তেমনি বারেক যদি টলিল যবন
ইংরাজ সঙ্গিন করে
ইন্দ্র যেন বজ্র ধরে
ছুটিল পশ্চাতে যেন কৃতান্ত শমন!"

ক্রোধকম্পিত ভবেন্দ্রনারায়ণ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। লম্ফ দিয়া তাহার গ্রীবা ধারণ করিলেন এবং "পাষণ্ড, ভণ্ড, কপটী" বলিতে বলিতে নির্দ্দয় পাদুকাঘাতে তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিলেন। গরিবদাস অতি প্রবল উত্তেজক প্রয়োগে চৈতন্য-লাভ করিয়া দ্রুতবেগে স্থান ত্যাগ করিল!

* * * * * *

১৯শে আষাঢ় তারিখেই সুশীলার বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু বলা বাহুল্য সে রমানাথের সহিত! সেই হইতে ভবেন্দ্র বাবুরও ভাবান্তর হইয়াছে। তিনি বুঝিয়াছেন, ধর্ম্ম অন্তরের; তাহার বাহ্য আবরণের প্রতি অতিরিক্ত অবস্থা স্থাপন করিলে অনেক সময় ভ্রান্ত হইতে হয়। সুকুমার নষ্ট পিতৃস্নেহ ফিরিয়া পাইয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

রামায়ণ ও মহাভারত।

মহাভারত ও রামায়ণ আমাদের দেশের অতি প্রাচীন মহাকাব্য। প্রাচীন গ্রীসের যেমন ইলিয়াড ও ওডেসি, ভারতের তেমনই রামায়ণ ও মহাভারত। এই উভয় গ্রন্থেই প্রাচীন ভারতবাসীর রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম ও সভ্যতার আভাস পাওয়া যায়। সুতরাং, এই গ্রন্থ দুইখানি কত কালের তাহা জানিবার জন্য লোকের মন স্বতঃই ঔৎসুক্যে ও কৌতূহলে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। সেই জন্য রামায়ণ ও মহাভারতের প্রণয়নকাল লইয়া সুধীসমাজে যেরূপ আন্দোলন হইয়াছে ও হইতেছে বুঝি ভারতের আর কোনও বিষয় লইয়া সেরূপ আন্দোনের ও আলোচনার উদ্ভব হয় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তই সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নাই। এমন কি দুইজন মনস্বী সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে গবেষণা করিয়া একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। সুতরাং মনে হইতেছে, এখনও এ বিষয়ে লোক অনিশ্চয়তার গোলক ধাঁধায় ঘুরিতেছে।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে ঐ দুইখানি পুস্তকের প্রণয়ণ-কালের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস লোকের মনে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। হিন্দুর বিশ্বাস ত্রেতাযুগে বাল্মিকী রামায়ণ এবং কলির আরম্ভেই মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন মহাভারত রচিত করিয়াছেন। য়ুরোপীয়রা এদেশে আসিয়া নূতন পদ্ধতিতে গ্রন্থাদির কাল নির্দ্দিষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য ভারতবাসীও গতানুগতিকের ন্যায় য়ুরোপীয়-দিগের যুক্তিপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এ দেশীয় গ্রন্থের বয়স স্থির করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখন শিক্ষিত মার্জ্জিতবুদ্ধি ব্যক্তিগণের নিকট প্রাচীনদিগের বিশ্বাস কুসংস্কার বলিয়া উপেক্ষিত ও উপহসিত; য়ুরোপীয়-দিগের মত আপ্তবাক্যের ন্যায় অভ্রান্ত বলিয়া সম্মানিত।

কিন্তু য়ুরোপীয়গণের সিদ্ধান্তে একটি বিষম ভ্রমের সম্ভাবনা দৃষ্ট হয়। প্রায় বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তাঁহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই পৃথিবী ছয় হাজার বর্ষমাত্র মানব জাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত হইয়াছে। ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সহিত এই বিশ্বাস তাঁহাদের মনে দৃঢ় সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল। এখনও

পরম্পরাগত সংস্কার অধিকাংশ য়ুরোপীয়ের মনকে অধিকৃত করিয়া রাখিয়াছে। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা ভূতত্ত্ববিদ্যা পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও শিখিয়াছিলেন, এই পৃথিবী ছয় হাজার বর্ষমাত্র সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা ভিন্ন য়ুরোপীয় ছাত্রগণ বাল্যকালে এই শিক্ষা লাভ করেন যে, ব্যাবিলন, গ্রীস ও মিশর মানব সভ্যতায় আদিস্থান। ঐ সভ্যতা সাড়ে তিন হাজার বর্ষ অপেক্ষা অধিক পুরাতন নহে। বাল্যকালের সে শিক্ষা সহজে অন্তর্হিত হইবার নহে। সুতরাং, ভারতীয় সভ্যতা তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার বৎসরাপেক্ষা অধিকতর পুরাতন হইতে পারে,—তাঁহারা আদৌ এ বিশ্বাস করিতে পারেন না। এরূপ স্থলে ঋক্‌বেদের বয়ঃক্রম তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার বর্ষকালমাত্র সিদ্ধান্ত করিলে, রামায়ণ ও মহাভারতের কালকে খৃষ্ট-পূর্ব্ব পাঁচ ছয় শত বর্ষের অধিক প্রাচীন বলিয়া কল্পনা করিতে পারা যায় না। কারণ, তাঁহারা সাধারণতঃ বেদের পর উপনিষদ, কল্পসূত্র, মনুস্মৃতি প্রভৃতির কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া পরে রামায়ণ ও মহাভারতের কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন। সেই জন্য তাঁহারা ঐ গ্রন্থ দুইখানিকে খৃষ্ট জন্মিবার পাঁচ ছয় শত বর্ষের পূর্ব্বকার গ্রন্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কেহ কেহ মহাভারতকে খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে কুণ্ঠিত নহেন। কিন্তু এই সকল সিদ্ধান্ত নিতান্ত অপর্য্যাপ্ত প্রমাণের উপর ন্যস্ত বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যাদির আলোচনা করিলে মনে হয়, রামায়ণের কাল-নির্দ্দেশ করা যত কঠিন, মহাভারতের কাল-নির্দ্দেশ করা তত কঠিন নহে। কারণ, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পরই যে মহাভারত রচিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। ভারত যুদ্ধের সময় মহাভারত-প্রণেতা মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন জীবিত ছিলেন, মহাভারত ও অন্যান্য গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান। আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে অব্দ গণনা করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। প্রথমতঃ, কলিযুগ প্রবর্ত্তিত হইলেই একটি অব্দ গণিত হইতে আরম্ভ হয়। উহা কলিগতাব্দ নামে পরিচিত। তাহার পর বিক্রম-সংবৎ প্রচলিত হয়। ইহার পরই শালিবাহনের শকাব্দা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এ দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে জন্ম-পত্রিকা বা কোষ্ঠী প্রস্তুত করিবার রীতি প্রচলিত আছে। বিক্রম-সম্বৎ প্রবর্ত্তিত হইবার

পূর্ব্বে কলিগতাব্দ ধরিয়া কোষ্ঠী প্রস্তুত হইত। পরে শকাব্দা প্রচলিত হইলে সম্বৎ পরিত্যক্ত হয়। এখন জন্ম-পত্রিকায় শকাব্দাই লিখিত হয়। আবার রাজা যুধিষ্ঠির একটি শক প্রবর্ত্তিত করিয়া যায়েন। 'জ্যোতির্ব্বিদাভরণ' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে ;—

যুধিষ্ঠিরো বিক্রমশালিবাহনৌ
নরাধিনাথৌবিজয়াভিনন্দনঃ।
ইমেঽনু নাগার্জ্জুনমেদিনীবিভু
র্বলিঃক্রমাৎ ষট্ শক-কারকা নৃপাঃ॥

যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জ্জুন এবং বলি এই ছয় জন নৃপতি শক প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সে শক বিস্মৃতির সাগরে বিলীন হইয়াছে। ইনি বলিয়াছেন, যুধিষ্ঠিরের অব্দ ৩০৪৪ বৎসর প্রচলিত ছিল, তাহায় পর সম্বৎ প্রচলিত হয়। ইহা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরাব্দ নির্ণয় করা কঠিন নহে। এখন ১৯৬৮ সম্বৎ। উহাতে ৩০৪৪ বৎসর যোগ করিলেই যুধিষ্ঠিরের অব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং, এখন ৩০৪৪+১৯৬৮=৫০১২ অতএব যুধিষ্ঠিরাব্দের এখন দ্বাদশাধিকপঞ্চসহস্রতম বর্ষ চলিতেছে। এখন কলিগতাব্দারও ঠিক ঐ বয়স। তবে কলি প্রবর্ত্তিত হইতেই যুধিষ্ঠির সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন; এই হিসাবে সম্বতের ও শকের পার্থক্য ঠিক নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু তাহার পর যাহা আছে, তাহা বুঝা কঠিন। এই গ্রন্থখানির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিশেষ সংশয় বিদ্যমান। গ্রন্থখানি ৩০৬৭ কলিগতাব্দে লিখিত হইয়াছে বলিয়া ইহাতে লিখিত আছে। সুতরাং সম্বৎ প্রবর্ত্তনের ২৩ বর্ষমাত্র পরে 'জ্যোতির্ব্বিদাভরণ' লিখিত হয়। সে গ্রন্থে শকাব্দার কথা ঠিক নির্দ্দিষ্ট হইল কিরূপে? যে শক ১১২ বৎসর পরে প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহা উক্ত গ্রন্থকারের পক্ষে নিশ্চিত রূপে বলা কখনই সম্ভবে না। এই জন্য অনেকে এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা অস্বীকার করেন। কিন্তু একটি কথা আছে। 'জ্যোতির্ব্বিদাভরণ' গ্রন্থ লিখিত হইবার পর শালিবাহন যখন শকাব্দা প্রচলিত করেন, তখন সম্ভবতঃ ঐ গ্রন্থ বিশেষ প্রামাণিক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থে সম্বতের উল্লেখ ছিল; শকাব্দার উল্লেখ ছিল না। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত প্রামাণ্য গ্রন্থে যাহাতে শকাব্দার কথাটি সন্নিবিষ্ট হয়, তাহার জন্য শালিবাহনের যত্ন ও প্রয়াস স্বাভাবিক।

পূর্ব্বকালে সম্মানিত ও প্রামাণ্য গ্রন্থে ভবিষ্যদুক্তির ছলে এরূপ ভাবে প্রবল পরাক্রান্ত রাজগণের কথা প্রক্ষিপ্ত হইত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে কলির রাজগণের কথা এইরূপেই প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। বেদব্যাসের কলমে, ঋষিগণের উক্তিতে সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে "আমার" আবির্ভাবকথা উক্ত হইয়াছে, এই অভিমান রাজগণকে এইরূপ প্রক্ষেপ-কার্য্যে উৎসাহিত করিত। এরূপ কার্য্যে উক্ত রাজগণের আর একটি সুবিধা হইত। প্রতিকূলাচারী প্রকৃতিপুঞ্জ মনে করিত যে, যখন বেদ-ব্যাস এই রাজবংশের আবির্ভাব-কথা বহু পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন, তখন ইহাদের বিরুদ্ধাচরণ নিষ্ফল। আর এক কথা, বৌদ্ধ বিপ্লবের সময় প্রাচীন ঋষিগণের ভবিষ্যদ্দর্শনশক্তি সপ্রমাণ করিবার অভিপ্রায়ে এরূপ প্রক্ষেপ অসম্ভব নহে। যাহা হউক, এই সকল প্রক্ষিপ্ত বচনের একটি বিশেষ লক্ষণ বিদ্যমান। অন্যান্য উক্তির সহিত স্থানে স্থানে উহাদের সামঞ্জস্য নাই। আমরা পরে ইহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। আপাততঃ বলা যাইতে পারে যে, 'জ্যোতির্ব্বিদাভরণের' শকাব্দসম্পর্কিত উক্তি পরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আর এক কথা, কলির ৩০৬৭ বর্ষ গত হইলে কালিদাস উক্ত গ্রন্থ রচনা করিতে উপক্রম করিয়াছিলেন, * ইহাই উক্ত গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। উহা কবে, কাহার দ্বারা শেষ হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। সুতরাং এই গ্রন্থে তৎপরবর্ত্তী কালের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ আছে বলিয়া ইহার উক্তি একে-বারেই অপ্রামাণ্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। যাহা হউক, যখন এই প্রমাণে সংশয়ের কিঞ্চিৎ অবকাশ আছে,—তখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটনকাল সম্বন্ধে প্রমাণান্তর অবলম্বনই শ্রেয়ঃ।

মহাভারতের আদি পর্ব্বের প্রথম অধ্যায়েই ঐ যুদ্ধের কাল লিখিত আছে ঃ—

"অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ
স্যমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডব সেনয়োঃ।"

এই স্থলে মহাভারত স্পষ্টাক্ষরেই লিখিয়াছেন যে, "দ্বাপর ও কলির সন্ধি-সময়ে কুরুপাণ্ডব সেনার যুদ্ধ হইয়াছিল।" এখন জিজ্ঞাস্য এই উক্তিতে অবিশ্বাস করিবার কি প্রবল কারণ বিদ্যমান? যে গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা

* বিহিতো গ্রন্থোক্রিয়োপক্রমঃ।

কুরুপাণ্ডবের কীর্ত্তি-কথা জানিতে পারি, বিশেষ বলবৎ প্রমাণ ব্যতীত তাহা অগ্রাহ্য করা সঙ্গত নহে। সন্দেহের কয়েকটি কারণ আছে। যথা 'রাজ-তরঙ্গিণীতে' লিখিত আছে,—

গতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন কুরুপাণ্ডবাঃ

কলির ছয় শত ৫৩ বৎসর অতীত হইলে কুরুপাণ্ডবগণ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই 'রাজতরঙ্গিণীতে' উক্ত আছে যে, কাশ্মীরাধিপতি গোনর্দ্দ যুধিষ্ঠিরের সমকালীন লোক। তিনি কৃষ্ণের হস্তে নিহত হয়েন। মহাভারতাদিতে গোনর্দ্দ রাজার কোনও উল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণের হস্তে তাঁহার নিধন কথা সত্য হইলে কোনও না কোন গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ থাকিত। সুতরাং এ সম্বন্ধে 'রাজতরঙ্গিণীর' কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না। পণ্ডিত শ্রীযুত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"কহ্লণ মিশ্র যখন রাজ-তরঙ্গিণী প্রণয়ন করেন, তখনও প্রচার ছিল ভারত যুদ্ধ দ্বাপরান্তে সংঘটিত হয়। তখন কেহ কেহ হিসাব করিতেন, কুরু পাণ্ডবের সময় হইতে ৫২ জন নৃপতি ২১৬৮ বৎসর কাল রাজত্ব করিলে তৃতীয় গোনর্দ্দ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজ-তরঙ্গিণীপ্রণেতা ঐ প্রচলিত মতের প্রতিবাদ করিতে গিয়া যত গণ্ডগোল বাধাইয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীর প্রথম তরঙ্গ পাঠ করিলে তাঁহার ভ্রম সহজে উপলব্ধি হইতে পারে।" *

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত হইয়াছে ;—

যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরং ॥

অর্থাৎ পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক কাল পর্য্যন্ত এক হাজার পনর বৎসর মাত্র।

* * * * *

তেতু পরীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ ॥

"হে দ্বিজোত্তম, পরীক্ষিতের সময় তাঁহারা (সপ্তর্ষি মণ্ডল) মঘা নক্ষত্রে অবস্থিত ছিলেন তখন কলির দ্বাদশশততম বর্ষ প্রবৃত্ত হইয়াছিল।"

* এসম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তৃত আলোচনা পাঠ করিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী কৃত 'পৃথিবীর ইতিহাস' ২৮৭-৮৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ে লিখিত আছে শুকদেব পরীক্ষিতকে বলিতেছে,—

আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরং ॥
* * * *
যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তিহি
তদা প্রবৃত্তস্তু কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ ॥

"হে পরীক্ষিত তোমার জন্মকাল হইতে আরম্ভ করিয়া নন্দ রাজের অভিষেক কাল পর্য্যন্ত এই এক হাজার এক শত পঞ্চদশ বৎসর; * * * যে সময় সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে বিচরণ করিতেছে সেই সময় কলির দ্বাদশ শত বর্ষ প্রবৃত্ত হয়।"

এই উভয় স্থলেই কলিযুগের প্রসঙ্গক্রমে মহারাজ নন্দের কথা উপস্থিত করা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণেরও ভাগবতের ভাষা প্রায় এক। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবৎ, বায়ুপুরাণ ও মৎস্য পুরাণ এই চারিখানি পুরাণেই মগধরাজ-বংশের কথা উল্লিখিত আছে। অন্যান্য সকল বিষয়েই অনৈক্য থাকিলেও এই বিষয়টির ভাষায় পর্য্যন্ত অবিকল মিল। ব্রহ্ম পুরাণ, হরিবংশ ও অগ্নি পুরাণেও অন্যান্য বিষয়ের বিশেষ অনৈক্য থাকিলেও এ বিষয়ে একেবারেই পার্থক্য নাই। তবে কোথাও "এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম;"* আর কোথাও "এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম। † আবার কোথাও "এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চাশদুত্তরম" এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। ইহা হয় লিপিকরপ্রমাদ, না হয় ত শ্রুতি-প্রমাদ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যেস্থানে ভাষাগত এরূপ অপূর্ব্ব মিল, সেখানে কি স্বতঃই মনে সন্দেহের উদ্ভব হয় না? তাহার পর এই উক্তির সহিত ঐ সকল পুরাণের ঠিক পরবর্ত্তী উক্তির সামঞ্জস্য করা কঠিন। কারণ উক্ত উক্তির পরই বিষ্ণু পুরাণ লিখিতেছেন,—

যদৈব ভগবদ্বিষ্ণোরংশো যাতো দিবং দ্বিজ
বসুদেবকুলোদ্ভূতস্তদৈব কলিরাগতঃ॥
* * * * *
যস্মিন কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি
প্রতিপন্নং কলিযুগং তস্য সংখ্যাং নিবোধ মে ॥

"হে দ্বিজ যখন বাসুদেব কুলোদ্ভূত ভগবান বিষ্ণু স্বর্গে গিয়াছেন, তখনই

* ভাগবত।

† বিষ্ণু পুরাণ।

কলি আসিয়াছে। * * যে দিন কৃষ্ণ স্বর্গে গিয়াছেন, সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে কলি আসিয়াছে, সেই কলির সংখ্যা আমার নিকট শ্রবণ কর।" তথাচ শ্রীমদ্ভাগবতে ;—

যস্মিন কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ ।।

"যে দিন কৃষ্ণ স্বর্গে গিয়াছেন সেই দিন সেই মুহূর্ত্তেই কলি প্রবৃত্ত হইয়াছে এ কথা পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন।"

পাঠক দেখুন, এখন পূর্ব্বপর এই দুই উক্তির সামঞ্জস্য করা কিরূপ কঠিন। কুরু-ক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন অভিমন্যু নিহত হয়েন, তখন পরীক্ষিত গর্ভস্থ। মাতৃগর্ভেই শ্রীকৃষ্ণ পরীক্ষিতকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণেরই উক্তি। সুতরাং যে ব্যক্তি দ্বাপরে গর্ভস্থ ছিলেন সেই ব্যক্তির পক্ষে কলির দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান থাকা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। কলিতে মানবের পরমায়ু একশত বিশ বৎসরের অধিক নহে। অথচ পুরাণকার ইহা জানিয়া শুনিয়া এমন অযৌক্তিক কথা কেন বলিলেন? ভাগবতের টীকাকার শ্রীধর স্বামী ইহার সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া একটু গোলে পড়িয়াছেন। "তদা প্রবৃত্তস্তুকলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ" এই শ্লোকের "দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ" পদটি "কলি" শব্দের বিশেষণ। কলি কিরূপ? উহা "দ্বাদশাব্দশতাত্মক।—" অর্থাৎ দ্বাদশশতবর্ষব্যাপী। তবে কি কলির শেষ হইয়া গিয়াছে? না; দিব্য পরিমাণের দ্বাদশ শত বর্ষ উহার ব্যাপ্তিকাল। অর্থাৎ দেবতাদের বর্ষ হিসাবে উহার অব্দ গণিত হইয়াছে। ভাল, তাহাই যদি হইবে, তবে পুরাণকার তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিলেন না কেন? পুরাণকার তাহা লিখিয়া দিয়াছেন। পরের শ্লোকেই লিখিত আছে;—

দিব্যাব্দানাং সহস্রান্তে চতুর্থেতু পুনঃ কৃতম।
ভবিষ্যতি তদানৃণাং মন আত্মপ্রকাশকম ।।

ইহার অর্থ, কলি প্রবৃত্ত হইবার পর দেবতাদিগের এক সহস্র বৎসরের পর চতুর্থ বৎসরে পুনরায় নরলোকে সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে।—ইহাতে পুরাণকার যে দিব্য বৎসরের কথা বলিতেছেন, তাহা বেশ বুঝা গেল। কিন্তু আবার নূতন গোল বাধিল। উপরে বলা হইল, কলি দ্বাদশ শত বর্ষ ব্যাপী, পরেই বলা হইল উহার প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কালের এক সহস্র তিন

বর্ষ মাত্র ব্যাপ্তি। সেই জন্য শ্রীধর স্বামী "কলি" "দ্বাদশাব্দ শতাত্মকঃ" এই শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—কলির সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশ সমেত "বারশত বর্ষ কাল ব্যাপী কলি।" সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ কাহাকে বলে? এখানে জানা আবশ্যক যে কলির কতকগুলি লক্ষণ আছে। যথা—

ধর্ম্ম সঙ্কুচিতঃ তপো বিচলিতং সত্যঞ্চ দূরং গতং
ক্ষৌণী মন্দফলা নৃপাশ্চ কুটিলাঃ শাস্ত্রেতরা ব্রাহ্মণাঃ
লোকাঃ স্ত্রীবশগাঃ স্ত্রীয়োপি চপলাঃ পাপানুরক্তা জনাঃ।
সাধুঃ সীদতি দুর্জ্জনঃ প্রভবতি প্রায়ঃ প্রবৃত্তে কলৌ॥

কিন্তু জন-সমাজে এই সকল লক্ষণ অকস্মাৎ এক দিনেই প্রকট হইয়া উঠে নাই। দ্বাপরের শেষ ভাগে ধর্ম্মাধর্ম্মরত প্রলাপী চপল ও জ্ঞাননিষ্ঠ লোক ক্রমশঃই যুগধর্ম্মে কলির লক্ষণ প্রকাশ করিতে থাকে। তাহার পর এখন হইতে প্রায় পাঁচহাজার বার বৎসর পূর্ব্বে মাঘী পূর্ণিমা শুক্রবারে যে দিন কলিযুগ আরম্ভ হয়,—সেই দিনই কলির সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। এই দ্বাপর ও কলি ধর্ম্মের মিশ্রণ কালকে কলির সন্ধ্যা সময় কহে। আবার সত্য ও কলির মিশ্রণ কালকে কলির সন্ধ্যা কহে। শ্রীধর স্বামী এই অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্যবিধানকল্পে লিখিয়াছেন, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সমেত কলির পরমায়ু দিব্যাব্দের বার শত বর্ষ আর খাঁটি কলির ব্যাপ্তিকাল দিব্যাব্দের এক হাজার তিন বৎসর। *

শ্রীধর স্বামীর এই ব্যাখ্যায় যাঁহারা সন্তুষ্ট, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, পরীক্ষিতের রাজত্ব-কালেই কলি প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যাঁহারা ইহাতে সন্তুষ্ট না হইবেন,—তাঁহাদের এই কয়টি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত, বিকৃত বা ব্যাসকূট বলা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কারণ কলির দ্বাদশশততম বর্ষ প্রবৃত্ত হইলে পরীক্ষিত রাজা হইয়াছিলেন,—এইরূপ অর্থ যাঁহারা করিবেন,—তাঁহারা দেখিবেন যে, ঐ উক্তির সহিত বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের অধিকাংশ উক্তিরই বিষম বিরোধ ঘটিবেই ঘটিবে। বিষ্ণুপুরাণে ও ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে ১৫শ অধ্যায়ে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, কলিকে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া যুধিষ্ঠির পৌত্র পরীক্ষিতের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত এবং ভ্রাতৃগণসহ মহা-প্রস্থান করিলেন। যে ভাগবতকার এক স্থলে এইরূপ লিখিয়াছেন,—অন্যস্থলে

* উল্লিখিত উক্তির আর একটি শাস্ত্রীয় সমাধান আছে। প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধিভয়ে আবশ্যক হইলেও আমরা এ স্থলে সে কথার আলোচনা করিলাম না।

তিনি যে এরূপ অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকিবেন এরূপ অনুমান করা সঙ্গত নহে। সুতরাং এই শ্লোক কয়টি প্রক্ষিপ্ত বা বিকৃত বা ব্যাসকূট বলা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের উপর্য্যুক্ত কয়টি শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া যুধিষ্ঠিরের কাল নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,—সেই জন্য ঐ কয়টি শ্লোক লইয়া এত কথা বলিবার প্রয়োজন হইল। তিনি "তদাপ্রবৃত্তশ্চকলির্দ্দ্বাদশাব্দ শতাত্মকঃ" কথাটি কোনরূপে পরিহার করিয়াছেন। তিনি

যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরং ॥

এই শ্লোকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন যে পরীক্ষিতের রাজত্বকাল হইতে মহাপদ্ম নন্দের অভিষেককাল পর্য্যন্ত এক সহস্র পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র। মহাপদ্ম নন্দ ও তাহার পুত্রগণ শত বর্ষকাল মগধে রাজ্য করেন। তাহার পর চন্দ্রগুপ্ত। এই চন্দ্রগুপ্তের সময় আলেকজণ্ডার পঞ্চনদ আক্রমণ করিয়াছিলেন। মেগেস্থেনিস ইহাঁরই রাজ-সভায় উপস্থিত ছিলেন। আলেকজণ্ডার ৩২৫ খৃঃ পুঃ অব্দে ভারত আক্রমণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত খৃঃ পুঃ ৩১৫ অব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন। এই চন্দ্রগুপ্ত ভারত-ইতিহাসের সময় নির্ণয়ে প্রধান অবলম্বন, * ইহা ম্যাক্সমূলার প্রমুখ পণ্ডিতগণের মত। সুতরাং ১০১৫+৪১৫=১৪৩০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল ইহাই বঙ্কিম বাবুর সিদ্ধান্ত।

এ সম্বন্ধে আমাদের নানা আপত্তি আছে। সকল আপত্তির আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। তবে আপাততঃ এই মাত্র বলা যাইতে পারে—বঙ্কিম বাবু যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে নানা পাঠান্তর বিদ্যমান। বঙ্কিম বাবু ইহার মধ্যে এই পাঠটি বাছিয়া লইলেন কেন,? ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন "মঘা হইতে পুর্ব্বাষাঢ়া দশম নক্ষত্র, অতএব যুধিষ্ঠির হইতে নন্দ ১০×১০০=সহস্র বৎসর অন্তর।" কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই তিনি আবার বলিয়াছেন,—"যেমন ইংলণ্ড কখনও ভারতবর্ষে থাকিতে পারে না; তেমন সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না।" যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তিনি ঐ ভ্রান্ত উক্তি দ্বারা আপনার গৃহীত পাঠ সমর্থনে প্রয়াস

* Sheet anchor of Indian chronology.

পাইয়াছেন কেন? আর যদিই তিনি ঋষিবাক্য মানিয়া লয়েন, তাহা হইলে কল্যন্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে সপ্তর্ষি-মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে অবস্থিত ছিল, এই উক্তিই বা অগ্রাহ্য করেন কেন? আমাদের ধারণা এই গণ্ডগোলযুক্ত শ্লোক কয়টি হইতে বঙ্কিমবাবু যে সিদ্ধান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা নিষ্ফল হইয়াছে। আর এক কথা, ম্যাগাস্থেনিস যাহাকে স্যান্ড্রোকোট্টাস বলিয়াছেন, তিনি কে, সে সম্বন্ধে বিষম সন্দেহ উপস্থিত। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় সপ্রমাণ করিয়াছেন যে ম্যাগাস্থেনিস অশোকের রাজ সভায় উপস্থিত ছিলেন,—চন্দ্রগুপ্তের সভায় ছিলেন না। * যুগনির্দ্ধারণে যাহা প্রধান অবলম্বন, তাহাই খণ্ডিত হইয়া গেল।

ইহার পর বঙ্কিমবাবু গণিত জ্যোতিষের সাহায্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল নির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে ও নানা আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। উজ্জয়িনীর বিখ্যাত জ্যোতিষী দীননাথ শাস্ত্রানুসারে শ্রীকৃষ্ণের কোষ্ঠী বিচার করিয়া গণিত জ্যোতিষের সাহায্যে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ খ্রীঃ পূঃ ৩১৮৫ অব্দের ভাদ্র মাসে বুধবারে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে মধ্য রাত্রিতে জন্মগ্রহণ করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় তাঁহার বয়স ৮৪ বৎসর হইয়াছিল তিনি ঐ যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে যদি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কালনির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে যাঁহারা ভারতীয় ও য়ুরোপীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, তাঁহাদের দ্বারাই উহার মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। সেই জন্য আমরা এ স্থলে সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী দীননাথের কথার উল্লেখ করিলাম।

মহাভারতের প্রণেতা স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। ইনি দ্বাপরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন,—ইহা সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণে স্পষ্ট ভাবেই লিখিত আছে। মহাভারতেই উক্ত আছে,—বিব্যাস বেদান্ যস্মাৎ স তস্মাদ্ ব্যাস ইতি স্মৃতঃ" ইনি শাখা ভেদে বেদ বিভাগ করিয়া উহার বিস্তৃতি সাধন করিয়াছেন,—সেই জন্য ইহার নাম ব্যাস। প্রতি দ্বাপরেই ইনি বেদ বিভাগ করিয়া থাকেন। যথা বিষ্ণুপুরাণে পরাশর, মৈত্রেয়কে বলিতেছেন ;—

"দ্বাপরে দ্বাপরে * বিষ্ণুর্ব্যাসরূপী মহামুনে।
বেদমেকং স বহুধা কুরুতে জগতো হিতঃ ॥"

* আর্য্যাবর্ত্ত, ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা দেখুন।

* এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। হিন্দুমতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি

"বীর্য্যং তেজো বলঞ্চাল্পং মনুষ্যাণামবেক্ষ্য বৈ।
হিতায় সর্ব্বভূতানাং বেদভেদান করোতি সঃ॥
যয়া স কুরুতে তন্বা বেদমেকং পৃথক প্রভুঃ।
বেদ ব্যাসাভিধানা তু সা মূর্ত্তির্মধুবিদ্বিষঃ॥" বিষ্ণুপুরাণ।৩।৩।৫—৭

যে মহামুনে,—ব্যাসরূপী বিষ্ণু প্রতি দ্বাপর যুগে জগতের হিতকল্পে এক বেদকে বহুধা বিভক্ত করিয়া থাকেন। মানব জাতির বীর্য্য, তেজ এবং বল অল্প হইয়া আসিতেছে দেখিয়া সর্ব্ব জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি বেদ বিভাগ করেন। সেই প্রভু যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বেদ ভাগ করেন, সেই মূর্ত্তির নাম বেদব্যাস।

দেবী-ভাগবত গ্রন্থ য়ুরোপীয় দিগের মতেও অতি প্রাচীন। সুতরাং য়ুরোপীয়দিগের দেশীয় শিষ্য সমাজে ইহার প্রাচীনত্ব অস্বীকৃত নহে। সেই দেবী-ভাগবত কি বলিতেছেন শুনুন ;—

"দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণুর্ব্যাসরূপেণ সর্ব্বদা।
বেদমেকং স বহুধা কুরুতে হিত কাম্যয়া॥
অল্পায়ুষোহল্প বুদ্ধিঞ্চ বিপ্রান্ জ্ঞাত্বা কলাবথ।
পুরাণ সংহিতাং পুণ্যাং কুরুতেহসৌ যুগে যুগে॥
স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং নবেদ শ্রবণং মতম্।
তেষামেব হিতার্থায় পুরাণানি কৃতানি চ॥"

সূত ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—"জগতের হিতার্থ বিষ্ণু স্বয়ং প্রতি দ্বাপরেই ব্যাসরূপে এক বেদকে বহুধা বিভক্ত করিয়া দেন। কলি-কালের বিপ্রগণের আয়ু অল্প এবং বুদ্ধি হীন হইবে জানিয়াই ভগবান প্রতি দ্বাপর যুগে পুণ্য পুরাণ সংহিতা সকলের প্রণয়ন করেন। স্ত্রী, শূদ্র, এবং পতিত ব্রাহ্মণগণের বেদ শ্রবণে অধিকার নাই, সেইজন্য তাহাদের হিতার্থই তিনি পুরাণ সকল প্রণীত করেন।"

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদের বিভাগ ও মহাভারতের প্রণয়ন করিয়াছিলেন, পুরাণাদিতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইনি সুমন্ত, জৈমিনী, পৈল, শুক এবং বৈশম্পায়নকে উহা অধ্যাপনা করান। বৈশম্পায়ন উহা জনমেজয়ের সভায় প্রথম প্রচারিত করেন। (আদি-

---

এই চারি যুগে এক মহাযুগ হয়। ষড়-ঋতু-সমন্বিত সম্বৎসরের ন্যায় যুগচতুষ্টয় সমন্বিত মহাযুগ পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন করিয়া থাকে। সেই জন্য এক এক মহাযুগে এক একটি দ্বাপর থাকে। এক সহস্র মহাযুগে এক কল্প হয়। প্রতি মহাযুগযুগান্তে খণ্ড প্রলয় ও প্রতি দ্বাপরেই এক জন করিয়া ব্যাসদেবের আবির্ভাব হয়, ইহাই পুরাতনী বার্ত্তা।

পর্ব্ব ৬৩ অধ্যায়) এই কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস দ্বাপরের শেষ ভাগে এবং কলিযুগের প্রথমেই বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। ভারত যুদ্ধের পরই ইনি মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। আর ভাগবতে স্পষ্টই লিখিত আছে,—যে দিন শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গে গিয়াছেন সেই দিনই কলি আরব্ধ হইয়াছে, পুরাতত্ত্ববিদ্গণ ইহাই বলিয়া গিয়াছেন (ইতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ)। তবেই সপ্রমাণ হইল, যে সময় ভাগবতে ঐ কথা গুলি লিখিত হয় তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই ঐ মত প্রচলিত ছিল। রাজতরঙ্গিণীকার কহ্লণ মিশ্রও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, দ্বাপরান্তেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, ইহাই প্রাচীন মত। সম্ভবতঃ তদানীন্তন পুরাণ ইতিহাসাদিতে ঐ কথা উক্ত ছিল। তৃতীয়তঃ কলি আগত দেখিয়াই যুধিষ্ঠির মহা প্রস্থান করেন। ইহাতেই সপ্রমাণ হইতেছে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর হইতেই কল্যব্দ গণিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো শ্রীযুত বৈদ্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, খৃঃ পূঃ ৩১০১ অব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উপনিষদ (ব্রহ্মতত্ত্ব) নামক পুস্তকে মনস্বী লেখক শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত "জ্যোতিষিক প্রমাণে" সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রায় ৫০০০ বৎসরের প্রাচীন ব্যাপার।"

এখন দেখা যাইতেছে যে, যুক্তি প্রমাণের উজ্জ্বল আলোকে মহাভারতের প্রাচীনত্বই অনুভূত হইতেছে। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস মূল মহাভারত প্রায় পঞ্চ সহস্র বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থ।

অতঃপর আমরা রামায়ণের রচনাকাল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

রাজা মটুক রায়।

(১)

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ বাঙ্গালাদেশে মোগল সুবাদারীর যুগ আরব্ধ হইবার পূর্ব্বেই আমরা মধ্য-বঙ্গে অনেকগুলি স্বাধীন হিন্দুরাজার অস্তিত্ব দেখিতে পাই। রাজা মটুক রায় সেই সময়ের অথবা তাহার কিছু পূর্ব্বের একজন স্বাধীন ব্রাহ্মণ হিন্দু নরপতি ছিলেন। এই সমস্ত প্রাচীন হিন্দু রাজার রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ বাস্তভিটাগুলি পরিদর্শন করিতে গিয়া একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে, এক সময়ে এই সকল তেজস্বী নরপতির গতিবিধির উপর প্রখর দৃষ্টি রাখিবার জন্যই রাজধানীর সন্নিকটে পাঠান রাজ কর্ত্তৃক মুসলমান-প্রধান গণ্ড গ্রামসকল স্থাপিত হইয়াছিল। সে সকল গ্রাম অদ্যাপি বিদ্যমান। পঞ্চদশ-শতাব্দীর মধ্যভাগে যেমন পাঠানদিগের অবনতি আরব্ধ হইল, অমনই প্রবল প্রতাপান্বিত হিন্দু জমীদারগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন আর পাঠান রাজা, অথবা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসী মুসলমানগণ তাঁহাদিগকে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। মধ্যবঙ্গে হিন্দুরাজগণের রাজধানীর নিকটস্থ মুসলমানপ্রধান গ্রামগুলি কত পুরাতন, তাহার প্রকৃত বিবরণ পাওয়া দুষ্কর। প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে কোন কোন বৃদ্ধ মুসলমান বলিয়া থাকেন, এই সকল গ্রাম গাজী সাহেবের স্থাপিত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই গাজী সাহেবের কথারও আলোচনা করিব। গত বৎসর আমরা মটুক রাজার পুরাতন রাজধানী বর্ত্তমান লাউজিনি গ্রামে উক্ত রাজার প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিতে গিয়াছিলাম। এখন আর তথায় প্রাসাদাদি কিছুই নাই; আছে কেবল কতকগুলি মজা দীঘী, গাজীর দরগা, রাজার কালীবাড়ী এবং কচিৎ কোথাও বিক্ষিপ্ত প্রাচীন ইষ্টকখণ্ডের ভগ্নাংশ। তাহারাই সেই প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু রাজার অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। রাজবাটীর ইষ্টকখণ্ডগুলি খুঁটি নাটি করিয়া দেখিলে, যিনি সুন্দরবন সর্ব্বাগ্রে জনাবাসে পরিণত করিতে সচেষ্ট হয়েন, সেই খাঁ জানের সাত গম্বুজ মসজেদের ইষ্টকের ন্যায় "five to six inches square and not quite two inches in thickness" বলিয়াই বোধ হয়।

যশোহর জিলার অন্তর্গত ঝিকারগাছার সন্নিকটে লাউজিনি গ্রাম অবস্থিত। এই লাউজিনি গ্রামেই মটুক রাজার বাটী ছিল। লাউজিনি গ্রামের পশ্চিমে কপোতাক্ষ নদ, পূর্ব্বে ও উত্তরে গাজীর রাস্তা এবং দক্ষিণে হরিহর (হড়্‌হড়ে) নদী, কড়িজাঙ্গাল, মেঘ্‌লা গ্রাম ও একটি বিল। হরিহর নদীর কথা গ্রামবাসীরা বিস্মৃত হইয়াছে। একদিন এই হরিহর নদী স্রোতস্বিনী ইচ্ছামতী নদীর ন্যায় কপোতাক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া ঝিকারগাছার দক্ষিণে, মিয়া ও খরিয়ার—বিলের পশ্চিমে কেশবপুরের মধ্য দিয়া ভদ্রা নদীতে মিলিত হইয়া প্রবল বেগে যাইয়া রূপশাতে অঙ্গ ঢালিয়া দিত। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, হরিহর (হড়্‌হড়ে) নদীর বাঁধ বাঁধিয়া মটুক রাজার রাজধানী ব্রাহ্মণানগরে—বর্ত্তমান লাউজিনি গ্রামে প্রবেশ করিবার জন্য গাজী সাহেবকে 'কড়ি জাঙ্গাল' প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। গাজী সাহেবের আদেশ অনুসারে যে সকল মজুর এই নদীর বাঁধ বাঁধিতে আসিত তাহারা তৎকাল-প্রচলিত নিয়মে পারিশ্রমিক বাবদ কড়ি পাইত বলিয়াই এই কালু ও গাজী সাহেব কৃত বাঁধের নাম 'কড়ি জাঙ্গাল' হইয়াছিল। এখনও এ প্রদেশে 'জাঙ্গাল' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সার্ভে মানচিত্র দেখিলে মটুক রাজার রাজধানী যে অতীত কালে কপোতাক্ষ নদ, হরিহর নদী, কয়েকটি বিল ও ভৈরব নদীর শাখা প্রশাখার দ্বারা চতুর্দ্দিকে যেন গড় দিয়া বেষ্টিত ছিল এবং রাজধানীর উপযুক্ত স্থানই ছিল—সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। বর্ত্তমানে মধ্যবঙ্গ রেল পথ ও যশোহর জিলা বোর্ডের রাস্তা কপোতাক্ষ নদের পশ্চিমে যেস্থানে এই মটুক রাজার প্রাসাদ ছিল, সেই স্থান দিয়াই পরস্পরের উপর দিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। এই দুইটি রাস্তার সন্ধিস্থলের উত্তর দিকে রাজবাটীর এক আধটুকরা ইষ্টক পাওয়া যায়। লাউজিনি হাটের পূর্ব্ব দিকে রাজার কালীবাড়ী ও একটি পুষ্করিণী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বে যেস্থানে রাজার কালীবাড়ী ছিল তাহার সামান্য উত্তরে বর্ত্তমান কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

লাউজিনি গ্রাম গবর্ণমেণ্টের খাস মহল। এস্থানে গবর্মেণ্টের আর কোন খাস মহল নাই, কেবল এই সামান্য গ্রামটুকু গবর্মেণ্ট খাসে রাখিয়াছেন। এক্ষণে কালীমন্দিরের সেবাইৎ একজন পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ—সন্ন্যাসী। তিনি প্রায় ৪০ বৎসর এই সেবা কার্য্য চালাইতেছেন, প্রচলিত কিম্বদন্তীর বিষয় প্রায় কিছুই তিনি অবগত নহেন। সন্ন্যাসী বলেন, তিনি স্বপ্নাদিষ্ট

হইয়াই এই স্থানে আসিয়াছিলেন। গবর্মেণ্টের খাস মহলের মধ্যে আবার দেবীর সেবার জন্য কয়েক বিঘা দেবত্তর ছাড়িয়া দেওয়া আছে, তদ্দ্বারা দেবীর সেবা চলিয়া থাকে। কালী মূর্ত্তি পূর্ব্বে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘরে স্থাপিত ছিল, বর্ত্তমানে ঝিকারগাছার ষ্টেশন মাষ্টার অট্টালিকা নির্ম্মিত করাইয়া দিয়াছেন। ভক্ত মটুক রাজার "কালী মাতা" শত শত বর্ষের ঝঞ্ঝাবাত মস্তকে করিয়াও তাঁহার প্রিয় ভক্তের স্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

যশোহর জিলা বোর্ডের রাস্তার উত্তরে লাউজিনি হাটের নিকটে যেস্থানে অনুসন্ধান করিলে কখনও কখনও এক আধখানা মৃত্তিকামগ্ন ইষ্টকখণ্ড দৃষ্টিগোচর হয়, সেই স্থানে যদি রাজবাটীর অন্দর ছিল বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্ব দিকে কালীবাড়ী ও উত্তর দক্ষিণে—লম্বা অন্দরের খিড়কীর দীঘী ছিল বলিয়া বোধ হয়। রেল পথের দক্ষিণে মেঘলা গ্রামের মধ্যে যে সমস্ত বড় বড় মজা দীঘী দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলিকে রাজবাটীর দক্ষিণ দিকে সদরের দীঘী বলিয়া বোধ হয়। রেল পথের দক্ষিণ দিকে গাজী সাহেবের দরগা, এস্থানে কয়েকটি ফকির সেবাইৎ আছেন। দরগার সেবা নির্ব্বাহের জন্য মেঘ্‌লা গ্রামে কিছু পিরত্তর ধানের জমী দেওয়া আছে। গাজী সাহেবের দরগার পার্শ্বেই মটুক রাজার 'জীবৎ কুণ্ড' দৃষ্ট হয়। কূপের নিকট যে সিমুলগাছের কথা প্রবাদে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার স্থানে একটি বিল্ব বৃক্ষ জন্মাইয়াছে। ফকিরগণ বলেন, এই কূপের জলেই রাজার আহত সৈনিকগণ পুনর্জ্জীবন লাভ করিত। আর গাজী সাহেব এই জীওৎ কূপের জল অপবিত্র করিয়াই মটুক রাজার সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন। পৌষ মাসের শেষে এস্থানে ফকিরগণের চেষ্টায় একটা ক্ষুদ্র মেলা বসিয়া থাকে। গাজী সাহেবের দরগার পার্শ্বে ৮।১০টি পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে কতকগুলি মটুক রাজার ও কতকগুলি গাজী সাহেবের খনিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কড়ি জাঙ্গালের পার্শ্বেই যোড়া পুকুর দেখা যায়। প্রবাদ—গাজী সাহেব মটুক রাজার পুত্র ঠাকুর দাস ও কন্যা চম্পাবতীকে (সুভদ্রা) মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহার স্মৃতি রক্ষার্থ এই জোড়া পুকুর খনন করিয়াছিলেন। মটুক রাজার প্রাসাদের উত্তরে ঝিনাইদহ মহাকুমার দক্ষিণ গয়েশপুর গ্রামে এক প্রকাণ্ড দীঘী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় এক পোয়া এবং প্রস্থে অর্দ্ধ পোয়া এই দীঘীকে স্থানীয় লোক মটুক রাজার দীঘি বলে, কেহ কেহ ঢোল সমুদ্রও

কহিয়া থাকে। ইহাও মটুক রাজার একটি স্মরণীয় কীর্ত্তি। এরূপ প্রকাণ্ড বাঁওড় সদৃশ পুষ্করিণী এ অঞ্চলে আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না।

যদি মটুক রাজার রাজপ্রাসাদ দক্ষিণদ্বারী ধরা যায়, আর পাকা রাস্তার উত্তর দিকটা অন্দর মনে করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্ব দিকে খিড়কীর দীঘী ও ঠাকুরবাড়ী পড়ে। আর রেল পথের দক্ষিণ দিক সদর ধরিলে সম্মুখে প্রকাণ্ড বিস্তৃত ময়দান পাওয়া যায় এবং সেই ময়দানের মধ্যে অনেকগুলি সরোবর পাওয়া যায়। রাজবাটীর আরও একটু দক্ষিণ-পশ্চিমে সরিয়া আসিলে আমরা কড়ি-জাঙ্গাল দেখিতে পাই। কড়ি-জাঙ্গাল হরিহর নদীর বাঁধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। মটুক রাজার পক্ষে এই বাঁধ বাঁধাইবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। বরং বাঁধ থাকিলে শত্রুর আক্রমণ হইতে পুরী রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার পক্ষে বাঁধ তুড়িয়া দিয়া নিঃশঙ্ক হইয়া গড়ের মধ্যে বাস করাই বাঞ্ছনীয় ছিল। কড়ি-জাঙ্গাল যাহার দ্বারাই গঠিত হউক—উহা স্বাভাবিক বাঁধ নহে, পরন্তু নবহস্তরচিত।

মটুক রাজার অরাতি যদি সুন্দরবন হইতে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া হরিহর নদী পার হইবার উপায় করিতে হইয়াছিল। হরিহর নদী পার না হইতে পারিলে তিনি কখনও মটুক রাজার সেই সেকালের ব্রাহ্মণনগর বা বর্ত্তমানের লাউজিনি গ্রামে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। হরিহর নদী তখন সংকীর্ণ ছিল না; কাযেই উহাকে মাটীর বাঁধে বাঁধা দুই এক দিনের কর্ম্ম ছিল না। বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া কোন আক্রমণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে দুর্গম পথ অতিক্রমের সময় কিছু দিনের জন্য অবস্থিতিরও প্রয়োজন সুতরাং হরিহর নদী বাঁধার পরই শত্রুপক্ষীয় রাজধানীর আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তবে মুসলমানদিগকে রাজ্য আক্রমণ করিতে হইয়াছিল। তখন ত আর সৈন্য শিবির স্থাপন করিবার জন্য এখনকার মত ব্যবস্থা ছিল না। সৈন্যদিগের আশ্রয়ের জন্য শত্রু-হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য গাজী সাহেবকে অবশ্য ছোট খাট গড়-খাই ইত্যাদিও করিতে হইয়াছিল। সেই গড়খাইয়ের জন্যই হউক, আর কড়ি-জাঙ্গালের জন্যই হউক, মটুক রাজার প্রাসাদের দক্ষিণ দিকে কড়ি-জাঙ্গালের সন্নিকটে মটুক রাজা বা গোরা গাজীর নামে কতকগুলি খন্দক অথবা পুষ্করিণী সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

এক্ষণে মটুক রাজা সম্বন্ধে প্রচলিত কিম্বদন্তীর মধ্যে যতটুকু সত্য নিহিত

আছে তাহাই দেখা যাউক। ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত এই সকল জনশ্রুতির কোনরূপ ঐক্যতা আছে কি না দেখাইতে পারিলেই আমরা সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব। রাজা মটুক রায় ও গাজী সাহেব সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানদিগের মধ্যে নানারূপ কিম্বদন্তী এ প্রদেশে প্রচলিত আছে। সে সমস্ত কিম্বদন্তীর প্রধান প্রধান বিষয়গুলিতে সামঞ্জস্য আছে, তবে মুসলমানগণ হিন্দু রাজার নিন্দা ও হিন্দুগণ গাজী সাহেবের নিন্দা করিয়াছেন। মুসলমানদিগের মধ্যে বহু প্রাচীন কাল হইতে গাজী সাহেবের কাহিনী-সম্বলিত পুঁথি প্রচলিত আছে। আমরা সেই পুঁথি একখানি সংগ্রহ করিয়াছি। বর্ত্তমানে ইহা মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় মুসলমানী ধরণে উন্টা রূপে মুদ্রিত ও পঠিত হইয়া মুসলমানদিগের ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে। আমরা আমাদিগের প্রাচীন পুঁথিখানি মূল ধরিয়া সমস্ত বিষয় আলোচনা করিব। পুঁথি ভিন্ন যখন আমাদিগকে কিম্বদন্তীর কথা আলোচনা করিতে হইবে, তখন যে প্রবাদের সহিত হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে চলিত কিম্বদন্তীর সামঞ্জস্য আছে, আমরা তাহাই গ্রহণ করিব।

মুসলমানী কেতাবের নাম "কালুগাজী ও চম্পাবতী"। সাধারণতঃ এই কেতাবকে মুসলমানগণ "গাজীর কেচ্ছা" বলিয়াই অভিহিত করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন 'বেহুলার ভাসান' গীত হইয়া থাকে, সত্যনারায়ণের ব্রতপাঠ হইয়া থাকে, রামায়ণ-মহাভারত পঠিত হয়, পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানগণ সেইরূপ গাজীর কেচ্ছায় যাত্রা গাহিয়া বেড়ান ও গাজীর কেচ্ছা ঘরে ঘরে পাঠ করিয়া থাকেন। গাজীর কেচ্ছা পাঠ করিবার সময় পাঠকের চতুষ্পার্শ্বে বহু শ্রোতার সমাগম হইয়া থাকে। এই গ্রন্থখানি অত্যন্ত অতিরঞ্জিত এবং স্থানে স্থানে অত্যন্ত অশ্লীল। সম্ভবতঃ পুঁথি হইতে নূতন করিয়া গ্রন্থ ছাপাইবার সময় এই সকল অশ্লীল অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। এক্ষণে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে দেখা যাউক, মুসলমান পুস্তক মটুক রাজার সম্বন্ধে কি বলিতেছে। কয়েকটি বিষয় ভালরূপ বুঝাইবার জন্য স্থানে স্থানে পুস্তকের বাঁধা গৎ উদ্ধৃত করিতে হইবে। পুস্তকের আখ্যায়িকা সম্যকরূপ উল্লেখ না করিলে মটুক রাজা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ সমালোচনা হইতে পারে না। মুসলমান গ্রন্থের উদ্ধৃত অংশের বাণান বা ভাষার কোন পরিবর্ত্তন করিলাম না।

শ্রীজগৎ প্রসন্ন রায়।

সমালোচনা।

—:•:—

যূথিকা। *

গত বৎসর একজন মহিলার গল্পসংগ্রহের সমালোচনায় আমরা বলিয়াছিলাম—বাঙ্গালা সাহিত্যে ছোট গল্প অল্পদিন প্রচলিত হইয়াছে। সুখের বিষয়, ইহাতে আমাদের লেখক-লেখিকাগণ অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানিও তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমরা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি।

গ্রন্থখানিতে আটটি গল্প আছে। গল্পগুলির বিশেষত্ব এই যে—এগুলিতে যে একটা অবাধ প্রবাহ আছে,তাহা সচরাচর গল্পে দৃষ্ট হয় না ; ইংরাজীতে যাহাকে freshness কহে, সেই সজীব নূতনত্বে গল্পগুলি সুন্দর। আমাদের দেশে মহিলারচিত উপন্যাসে ও গল্পে সাধারণতঃ যে অকারণ সঙ্কোচ ও অনাবশ্যক সংযম সাহিত্য-শিল্পকে সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে দেয় না, বর্ত্তমান গ্রন্থে সে সঙ্কোচ ও সংযম বহুল পরিমাণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহা গ্রন্থ-লেখিকার পক্ষে বিশেষ প্রশংসার কথা।

এই নিঃসঙ্কোচ সরলতা লেখিকার স্বাভাবিক বর্ণনা-নিপুণতার বিকাশে সহায়তা করিয়াছে। বর্ণনাগুলি বিশেষত্বব্যঞ্জক। আমরা তিনটি দৃষ্টান্ত দিলাম—

"দুপুরবেলা নিধিরাম মণ্ডল উঠানে বসিয়া বাঁখারি চাঁচিতেছিল, প্রখর রৌদ্রে তাহার ঘর্ম্মাক্ত কলেবর বার্ণিশ করা আবলুশ কাঠের মত জ্বলিতেছিল ও তাহার কপাল বাহিয়া ঘাম টস্ টস্ করিয়া মাটিতে ঝরিয়া পড়িতেছিল।" (৫৮ পৃঃ)

"সন্ধ্যাবেলা দরজা খুলিয়া দিয়া আমি তখন বসিয়া ছিলাম, চাঁদের আলো আসিয়া আমার মুখে চোখে পড়িতেছিল, ধুনো তুলোর চাপের মত সাদা মেঘ নীল আকাশে ভাসিয়া ফিরিতেছিল, বারান্দার সামনে গাছের ছায়া কাঁপিতেছিল, এক রাশ হাস্নেহানার ফুল জানালার কাছে ফুটিয়া ঘরখানা গন্ধময় করিয়া তুলিতেছিল, বাহিরে চাঁপাগাছের ডালে কোথায় একটা দোয়েল অনবরত শীষ দিতেছিল, হঠাৎ দুখানা কুসুম-পেলব বাহু আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া মধুর হাস্যে বলিল, 'দিদি আমি এসেছি'।" (২৯৫ পৃষ্ঠা)

"আকাশে চাঁদের উপর হইতে মেঘ সরিয়া গেল, গালানো রূপার মত জ্যোৎস্না ঘর দুয়ার সব ভরিয়া দিল।" (২৯৬ পৃষ্ঠা)

উদ্ধৃত অংশত্রয় হইতে লেখিকার গুণ ও দোষ সুস্পষ্ট দেখা যাইবে। গুণ বর্ণনায় বাস্তবত্ব ও সরসত্ব ; দোষ ভাষার প্রাদেশিকত্ব, সঙ্করত্ব এবং বিরামচিহ্ন সংস্থাপনে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অভাব।

---

* যূথিকা—শ্রীআমোদিনী ঘোষ প্রণীত ; ঢাকা সূত্রাপুর হইতে শ্রীরাখালদাস ঘোষ এম. এ. কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

সকল দেশেই প্রদেশ-ভেদে ভাষার রূপভেদ হয়। যে ভাষা সকল প্রদেশে সহজ-বোধ্য নহে, তাহাতে পাঠক-সাধারণের কার্য্যনির্ব্বাহ হয় না, পরন্তু তাহা সঙ্কীর্ণ স্থানেই ব্যবহৃত হয়, সমাদৃতও হইতে পারে। টেকচাঁদের খাস কলিকাতার 'ককনি' ভাষা চট্টগ্রামে সহজে সমাদৃত হইতে পারে না; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ও নবীনচন্দ্রের ভাষা "বঙ্গে যথা তথা" সমাদৃত। আশা করি, লেখিকার বর্ত্তমান রচনায় যে অল্পসংখ্যক প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাঁহার পরবর্ত্তী রচনায় সে সকল বর্জ্জিত হইবে। লেখিকা যেরূপে গম্ভীর ও সংস্কৃত শব্দের সহিত চলিত কথোপকথনে ব্যবহৃত শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন—তাহাতে তাঁহার রচনারীতির সৌন্দর্য্যহানি হইয়াছে। ছোট ছোট খাঁটি বাঙ্গালা শব্দে ভাবপ্রকাশ ও সৌন্দর্য্যসৃষ্টি বিশেষ দক্ষতার পরিচায়ক। যিনি তাহা পারেন—তিনি বরেণ্য, কিন্তু সকলের সে ক্ষমতা নাই। ইংরাজীতে nervous Anglo-Saxon English ষ্টিভেন্সনের অসাধারণ সমাদরের কারণ, খাঁটি বাঙ্গলার ভাব-প্রকাশ-সাফল্যে ইন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র যশ অর্জ্জন করিয়াছেন; কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে ষ্টিভেন্সন ও বাঙ্গালা সাহিত্যে ইন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র অধিক নাই। খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার প্রশংসনীয়; সুসংস্কৃত শব্দের প্রয়োগও বাঞ্ছনীয়; কিন্তু উভয়ের মিশ্রণে অসাধারণ সতর্কতার ও নিপুণতার প্রয়োজন; সেই সতর্কতার ও নিপুণতার অভাব হইলেই রচনার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়।

লেখিকা বলিয়াছেন, ইহার মধ্যে কয়টি গল্প এত বৃহদায়তন হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদিগকে ছোট গল্প বলা যায় না। মাসিক পত্রের সম্পাদকের নিকট ৮।১০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত গল্পের অধিক আদর হইলেও ছোট গল্পের ছোটগল্পত্ব কেবল আয়তনের উপর নির্ভর করে না। দৃষ্টান্তস্বরূপে জর্জ্জ এলিয়টের ছোট গল্প তিনটির—বিশেষতঃ Janet's Repentanceএর, শ্রীমতী ষ্টীলের Ferozaর ও বলজাকের বহু গল্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উপন্যাসে ও ছোট গল্পে প্রভেদ আয়তনে নহে—প্রকৃতিতে।

আলোচ্য পুস্তকে সব গল্পগুলিতেই ছোট গল্পের বিশেষত্ব সপ্রকাশ এবং সবগুলিই চিত্তাকর্ষক।

সংগ্রহ।

—:*:—

সাহিত্য।

—:•:—

থ্যাকারে।

—:o:—

শত বৎসর পূর্ব্বে—১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই জুলাই তারিখে কলিকাতায় থ্যাকারের জন্ম হয়। তিনি ইংরাজী সাহিত্যে বহু উপন্যাস রচনা করিয়া যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সুলভ নহে। সমগ্র সভ্য জগতে তাঁহার শতবার্ষিক উপলক্ষে তদীয় রচনার ও প্রতিভার আলোচনা ও সমালোচনা হইয়াছে। আমরা নিম্নে একটি প্রবন্ধের সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম। ইংরাজী সাহিত্যে থ্যাকারের স্থান অতি উচ্চে। বহু সমালোচকের মতে ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার 'এসমণ্ড' ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা সহজ নহে। কল্পনার কুসুমে ইতিহাসের শুষ্ক শরীর শোভিত করিয়া তাহাতে সাধারণ পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করা সকলের পক্ষে সুসাধ্য নহে। আবার যে সময়ের ঘটনা লইয়া উপন্যাস রচিত সেই সময়ের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া গ্রন্থ রচনা করা আরও দুঃসাধ্য। থ্যাকারে সেই দুঃসাধ্য সাধনে সফলপ্রযত্ন হইয়াছিলেন। যদিও লেলিপ্রমুখ এক সম্প্রদায়স্থ সমালোচক ইহাকেও অনিন্দ্যসুন্দর ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিতে সম্মত নহেন, তথাপি এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, এ ক্ষেত্রে থ্যাকারের প্রতিদ্বন্দী নাই।

পরিহাস-রসিক।

পরিহাস-রসিক হিসাবেও থ্যাকারে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক এই পরিহাস-রসিকতাই তাঁহার রচনায় নূতন রসের সঞ্চার করিয়াছে। ইহারই গুণে ডিকেন্সের মত থ্যাকারে স্কটের পর ইংরাজ পাঠক-সম্প্রদায়কে মুগ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পরিহাস-প্রবাহে সমাজের আবর্জ্জনা দূর করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সমাজের অনাচারের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। আজ কাল মেরী করেলি-প্রমুখ এক দল লেখক যে ভাবে সমাজের দোষ প্রদর্শিত করেন, থ্যাকারে সেভাবে কার্য্য করিতেন না। তিনি বিদ্রূপের তুলিকায় সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিতেন, তাহাতে সমাজের বিকৃত অংশ এমন সমুজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট ভাবে—কখন বা এমন একটু অতিরঞ্জিত ভাবে দেখাইয়া দিতেন যে, তাহার প্রতি প্রথমেই দর্শকের দৃষ্টি পড়িত।

নারী-চরিত্র।

আজ কাল—এই কর্ম্মবহুল—উত্তেজনাপ্রিয় পাঠক-সমাজে থ্যাকারের আদর যে একটু কমিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদিও সুধীসমাজে—সমজদারদলে তাঁহার আদর কমে নাই, তথাপি সাধারণ পাঠক-সমাজে তাঁহার অপেক্ষাকৃত অনাদরের কারণ সন্ধান করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলেন, তাঁহার নারীচরিত্রে পাপের প্রগাঢ়তাই এই অনাদরের কারণ। সত্য বটে থ্যাকারে স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন—তিনি দেখিয়াছেন, অধিকাংশ রমণীর চরিত্রে দৃঢ়তা নাই, অনেকে চরিত্রহীনা। কিন্তু সে সামাজিক অবস্থা বিবেচনায়। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন,—নিষ্কলঙ্ক নারী-হৃদয়ের ভালবাসার তুলনায় আর সকল সম্পদ "ধরার ধূলার চেয়ে হীন।" উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি, ধন, মান, আনন্দ—এই সকল লাভ করিবার জন্য মানুষ প্রাণান্ত চেষ্টা করে সত্য, কিন্তু পূত ভালবাসার তুলনায় এ সকল একান্তই তুচ্ছ। যিনি এই মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাকে কেমন করিয়া নারীচরিত্রানভিজ্ঞ বলিব?

রচনারীতি।

কেহ কেহ আবার তাঁহার রচনারীতির নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহারা ওয়াল্‌টার প্রেটারের ও ষ্টিভেন্‌সনের রচনারীতিকেই আদর্শ বিবেচনা করেন। কিন্তু স্বয়ং ষ্টিভেন্‌সনই বলিয়াছেন তিনজন লেখক স্রষ্টার তুলিকার চিত্র চিত্রিত করিয়াছিলেন—বাল্‌জাক, স্কট ও থ্যাকারে। আর সকলেই হয় চিত্রের বর্ণ ফিকা করিয়া ফেলেন, বা চিত্র অসম্পূর্ণ রাখেন বা একান্ত উত্তেজিত ভাবে চিত্র চিত্রিত করেন। বাস্তবিক থ্যাকারের রচনারীতিতে যে অনায়াস-লব্ধ সরলতা ও শক্তি সপ্রকাশ, তাহা অন্যত্র দুর্ল্লভ। এমন কি, ষ্টিভেন্‌সনের রচনারীতিও যেন বিশেষ চেষ্টায় সম্পূর্ণ করা হইয়াছে।

নরঘৃণক।

আবার কেহ কেহ এমন কথাও বলেন যে, থ্যাকারে নরঘৃণক ছিলেন। তাঁহার পরিহাসপ্রিয়তা, তাঁহার শাণিত বিদ্রূপ, তাঁহার সমাজচিত্র এই সকলের জন্য সাধারণ লোক মনে করে, তিনি নরঘৃণক ছিলেন। কিন্তু সে কথার ভিত্তি নাই। যাঁহার রচনায় করুণরস উছলিয়া উঠে, যিনি পাঠকের নয়ন অশ্রুসজল করিতে পারেন, তাঁহার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনা অসঙ্গত। একবার কোন প্রদর্শনীতে পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকাদিগকে দেখিয়া থ্যাকারে সাগ্রহে তাহাদিগকে কিছু কিছু অর্থ দিয়াছিলেন। কোন বন্ধুর মৃত্যু হইলে তিনি তাঁহার পুত্রের শিক্ষার ব্যয়ভার সানন্দে বহন করিতে চাহিয়াছিলেন। লেডি ব্লেসিংটনের সম্পদসম্পন্ন অবস্থায় অনেকেই তাঁহার গৃহে সমাগত হইতেন। তিনি যখন সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার অনুপস্থিতিকালেও থ্যাকারে এক দিন তাঁহার শূন্য গৃহে আসিয়া পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার অবস্থান্তরের জন্য অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। যাঁহার হৃদয় এমন কোমল, তাঁহাকে কে নরঘৃণক বলিতে পারে?

ইতিহাস।

ডাইস সম্বার।

গত বৎসর 'আর্য্যাবর্ত্তে' বেগম সমরুর বিচিত্র বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে তাঁহার উত্তরাধিকারী ডাইস সম্বারের নামও উল্লেখ করা হইয়াছিল। তাঁহার জীবন-কথাও বিস্ময়কর। সম্প্রতি 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে মিষ্টার ম্যাজ ও মিষ্টার ধর সেই কথা বিবৃত করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাহারই সারসংগ্রহ।

পরিচয়।

বেগম সমরুর স্বামী ওয়াণ্টার রেণার্ড ওরফে সমরুর প্রথম পক্ষের উন্মাদিনী পত্নীর পুত্র ওয়াণ্টার ওরফে জাফর ইয়াব খাঁ কর্ণেল লে ফেভারের কন্যা জুলিয়া অ্যানকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের কন্যা জুলিয়ানার (কীনের মনে অ্যান) সহিত বেগমের সেনাধ্যক্ষ আলেকজাণ্ডার ডেভিড ডাইসের বিবাহ হয়। ডাইস সম্বার তাঁহাদের পুত্র। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ডিসেম্বর তাঁহার জন্ম হয়। বেগমের নিকট পালিত হওয়ায় তিনি বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্ট, লর্ড বেণ্টিঙ্ক, জঙ্গীলাট সার এডওয়ার্ড প্যাজেট, লর্ড ড্যালহৌসী, সার্ এডওয়ার্ড বার্ণেস প্রভৃতির সহিত পরিচিত ছিলেন। মিসেস্ সার্উডের আত্মজীবনীতে ডাইস সম্বারের উল্লেখ আছে। তিনি যখন বেগমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়েন, তখন ডাইসের বয়স ৫।৬ বৎসর। বালক বেগমের পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিল এবং সাক্ষাতান্তে বেগমের আদেশে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই মত সৌজন্যসহকারে আগন্তুকদিগকে বাহিরে রাখিয়া আসিয়াছিল।

শিক্ষাদি।

চেম্বারলেন ও ফিসার নামক দুইজন খৃষ্টধর্ম্মযাজকের নিকট ডাইসের শিক্ষা হয়। তিনি পার্শি ও ইংরাজী ভালই জানিতেন। তিনি কিছুদিন দিল্লী কলেজের ছাত্রও ছিলেন। বেগমের গৃহস্থালী প্রাচ্য প্রথায় পরিচালিত হইত, তাই তিনি পাশ্চাত্য আচার-ব্যবহার শিক্ষার্থ ডাইসকে কিছুদিন শিক্ষক ফিসারের গৃহে রাখিয়াছিলেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ভরতপুর অবরোধকালে বেগম ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট লর্ড মেটকাফের সহিত তথায় গিয়াছিলেন। সেনাপতি লর্ড কম্বার-মিয়ারের সহিত বেগমের বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। তিনি বালকের হস্ত তাঁহার হস্তে দিয়া বলেন—তাঁহার মৃত্যুর পর সে বিলাতে যাইলে তিনি যেন তাহাকে সাহায্য করেন। কম্বারমিয়ার ইহাতে স্বীকৃত হয়েন। মৃত্যুর পূর্ব্বে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে উইলে বেগম ডাইসকে তাঁহার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু ইষ্টইণ্ডিয়া

উত্তরাধিকারী।

কোম্পানী স্থাবর সম্পত্তি লইয়া ৭৫০০০০০ টাকার অধিক মূল্যের অস্থাবর সম্পত্তিমাত্র তাঁহাকে দেন। ঐ টাকা কোম্পানীর নিকট গচ্ছিত ছিল। ডাইস বেগমের স্থাবর সম্পত্তির জন্য কোম্পানীর সহিত মোকর্দ্দমা করিয়া বিফলপ্রযত্ন হইয়াছিলেন।

বেগমের মৃত্যুর পর ডাইস সার্দ্ধানা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আইসেন এবং মেকলে প্রভৃতির সহিত পরিচিত ও মেসনসম্প্রদায়ভুক্ত হয়েন। এই সময় তাঁহার পিতার সহিত তাঁহার বিবাদ বাধে। পিতা বেগমের উত্তরাধিকারী হইবেন, আশা করিয়াছিলেন। সে আশায় হতাশ হইয়া তিনি বাকি বেতনবাবদ পুত্রের নামে নালিশ করেন। ঐ ১৪০০০০০ টাকার জন্য অসময়ে—শনিবার সন্ধ্যায় জামিন দিবার নোটিস পাইয়াও ডাইস জামিন দেন। তখন কোম্পানীর নিকট তাঁহার প্রায় ৪০০০০০০ টাকা মজুদ। তিনি পিতাকে ১৫০০ টাকা মাসহারা দিতে সম্মত হইয়া মামলা মিটাইয়া ফেলেন; কিন্তু যেদিন সোলেনামা সহি হইবে, সেই দিন বিসূচিকায় পিতার মৃত্যু হয়। চীনভ্রমণান্তে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিরিয়া ডাইস বিলাত যাত্রা করেন ও আগষ্ট মাসে ব্রিষ্টল নগরে উপনীত হয়েন। প্রসিদ্ধ কর্ণেল জেম্‌স্ স্কিনার এক পার্শি কবিতা লিখিয়া তাঁহাকে বিদেশ গমনে নিরস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া ছিলেন।

পরবর্তী ঘটনা।

ইংলণ্ডে লর্ড কম্বারমিয়ারের চেষ্টায় তিনি সহজেই সম্ভ্রান্ত সমাজে সমাদৃত হইয়াছিলেন। তিনি য়ুরোপের নানা স্থান পর্য্যটনের পর ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও ২৬শে সেপ্টেম্বর লর্ড সেণ্টভিন্‌সেণ্টের কন্যা মেরী অ্যানের পাণি গ্রহণ করেন। কথিত আছে, লর্ড ওয়েলিংটন প্রভৃতি তাঁহার প্রণয়প্রার্থী ছিলেন। কম্বারমিয়ার এই বিবাহের বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য সভ্যতায় অনভ্যস্ত যুবকের পক্ষে এরূপও পরিণয় সুখের হইবে না। ফলেও তাহাই হয়। একাধিকবার সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইবার পর বিবাহ হয়। ডাইসের বর্ণ মলিন ও দেহ স্থুল হইলেও, তাঁহার বিপুল অর্থই বিবাহের কারণ হয়। এরূপ বিবাহ সুখের হইতে পারে না।

বিবাহ।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে সবার পার্লামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচিত ও কয়মাস পরে অনাচার-হেতু ঐ পদ হইতে অপসারিত হয়েন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বিকৃত-মস্তিষ্ক বলিয়া অবরুদ্ধ হয়েন ও পরে জজ ও জুরীর বিচারে বিকৃত-মস্তিষ্ক সাব্যস্ত হয়েন। স্ত্রীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। তিনি রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নিকট আবেদনে জানাইয়াছিলেন যে, নির্জ্জন অবরোধে তিনি ছয় মাস দারুণ কষ্টভোগ করেন ও পরে পলাইয়া যাইলে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কিছুই প্রাপ্ত হয়েন নাই; অথচ তাঁহার পত্নীকে বার্ষিক ৬০০০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। নানা কারণে নানা লোককে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান ও লর্ড ফরেষ্টারের সহিত পত্নীর অবৈধ সম্বন্ধ সম্বন্ধে সন্দেহ তাঁহাকে উন্মাদ স্থির করিবার কারণ। কিন্তু বিধবা হইয়া তদীয় পত্নী এই লর্ড ফরেষ্টারকেই বিবাহ করেন। তাই বোধ হয়, সন্দেহটা ভিত্তিহীন ছিল না।

উন্মাদ।

স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে চিকিৎসকের সহিত ভ্রমণে বাহির হইয়া তিনি ফ্রান্সে পলায়ন করেন। বৃটিশ গভর্মেণ্টের অনুরোধে সত্ত্বেও ফরাসী সরকার তাঁহাকে ইংরাজের করে অর্পিত করেন নাই। এই সময়ে তিনি লর্ড চান্‌সেলার লর্ড লিণ্ডহার্ষ্টকে সম্বোধন করিয়া কতকগুলি গাত্রোদ্দীপক কবিতা লিখেন; তাহার আরম্ভে ইংলণ্ডের নিন্দা ছিল—

ফ্রান্সে।

"I hate your dreary English land
Its clime and hearts so cold !"

ফ্রান্সে তিনি সম্রাট লুই ফিলিপ ও সমস্ত অভিজাতসম্প্রদায় কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়াছিলেন। তিনি সাত বৎসর ফ্রান্সে বাস করেন—মধ্যে মধ্যে বিশেষ অনুমতি লইয়া ইংলণ্ডে যাইতেন। এই সময়ে তাঁহার স্ত্রীর বার্ষিক বৃত্তি ব্যতীত সম্পত্তির আয় তিনি পাইতেন। তিনি ৬০০ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ এক পুস্তকে স্বীয় বিকৃতমস্তিষ্কাপবাদের প্রতিবাদ করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বন্ধুগণের চেষ্টায় আবার তাঁহার মস্তিষ্ক-বিষয়ে বিচার হয়।

এই বিচারের ফল জানিবার জন্য তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তখন তিনি পদে ক্ষতে কষ্ট পাইতেছিলেন। ইংলণ্ডে সেই ক্ষত বাড়িয়া উঠে এবং ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ১লা

অন্তিমে।

জুলাই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি লর্ড কম্বারমিয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন; কিন্তু লর্ড বাহাদুর যথাকালে সংবাদ পায়েন নাই। তাঁহার শব কেনসল গ্রীন সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হয় ও পরে—তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে—তুলিয়া আনিয়া সার্দ্ধানায় সমাধিস্থ করা হয়। তাঁহার পত্নী তাঁহার মৃত্যুর কয় দিন পূর্ব্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়া এক পত্র লিখিলে উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন—এখন তিনি স্বামীর জন্য যেরূপ উৎকণ্ঠা ও স্বামীর প্রতি যেরূপ অনুরাগ দেখাইতেছেন—পূর্ব্ব হইতে সেরূপ উৎকণ্ঠা ও অনুরাগ দেখাইলে বিচ্ছেদের প্রয়োজন হইত না। এখন আর উপায় নাই। এখন বিবাহ-বিচ্ছেদই প্রার্থনীয়।

মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি উইলে সমস্ত সম্পত্তি—তাঁহার মত বর্ণসঙ্করগণ যাহাতে

শেষ।

সুশিক্ষার অভাবে বিপন্ন না হয়—তজ্জন্য সার্দ্ধানায় বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য দান করেন। সার্দ্ধানার প্রাসাদে সেই বিদ্যালয় হইবার কথা ছিল। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সভাপতি ও সহকারী সভাপতিকে উইলের কার্য্যনির্ব্বাহক নিযুক্ত করেন ও প্রত্যেককে ১০০০০০ টাকা দিবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার পত্নী ও দুই ভগিনী উইলে আপত্তি করেন। দীর্ঘকালব্যাপী মামলার পর বিকৃত-মস্তিষ্কের উইল বলিয়া উহা নাকচ হয়। তাঁহার বিধবা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়েন ও পূর্ব্বোক্ত লর্ড ফরেষ্টারকে বিবাহ করিয়া পুনরায় বিধবা হইয়া ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিতা হয়েন। ডাইস দীর্ঘকায় স্থূলদেহ—মলিনবর্ণ ছিলেন। তিনি সদাশয়,বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন ও বেগমের প্রতি ভক্তিশীল ছিলেন। তাঁহার জীবনকথা উপন্যাসের মত অদ্ভুত—করুণরসে সিক্ত—অশ্রুজলে অভিষিক্ত।

সুন্দরী।

—ঃ—

সুন্দর তা'রে হেরিছিনু—যবে
বিমল-জ্যোছনা করে
দেখেছিনু তা'র সরল দৃষ্টি
কুসুম-শয়ন'পরে।

সুন্দরতর হেরেছিনু—যবে
শিশুরে লইয়া বুকে
কুসুমনম্র লতিকার মত
এসেছিল হাসিমুখে।

সুন্দরতম হেরেছিনু—যবে
বিষাদ-বেদন মাখি'
সাশ্রু নয়নে দেখেছিনু তা'র
মরণ-মুদিত আঁখি।

———

আশ্বিন, ১৩১৮

আর্য্যাবর্ত্ত।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

সম্পাদিত।

—০—

সূচী।

প্রকাশক—শ্রীদুর্গানাথ বসু।

[illegible] কলিকাতা।

[illegible] [illegible]



---

১ হইতে ৮ ফর্ম্মা এবং কভার ও বিজ্ঞাপন,

এস, এন, প্রেস,—২৪ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

৯ হইতে অবশিষ্ট ফর্ম্মা লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ৬৪।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



সরস্বতী

Printed by K. V. Seyne & Bros.

নীরস ধরা—সরস করা, হরষধারা বহি
সকল শোক-দুঃখহরা, আয় মা দয়াময়ী
আমার দয়াময়ী ॥

মা তোর আবাহনের লাগি'   নিখিল আজি আছে জাগি'
শ্যামল ধানে, আলোর বানে, পাখীরগানে ভরা,
ও তার—ফুটিয়া উঠে শুক্‌নো ঝরা, উঠিয়া ছুটে মরা
নীরস ধরা,—

*   *   *

নদীতরঙ্গ পূর্ণ নীরে ;   উছলে পড়ে চূর্ণ তীরে,
অমল জলে, কমলদলে, কলমরালকুলে,
লুটিয়ে পড়ে সোহাগভরে মা তোর চরণমূলে ॥
নীরস ধরা,—

*   *   *

মা তোর আগমনীর গানে   দোয়েল শ্যামা জাগায় প্রাণে,
ছাতিম ফুলের পরাগ মেখে মাতিয়ে বেড়ায় অলি,
ঐ—শিউলি কুসুম শিউরে ঝরে ফেলবে চরণ বলি' ॥
নীরস ধরা,—

*   *   *

আঁকবে জবা স্থলকমলে,   আলতা, মা; তোর চরণতলে,
পল্লীমা যে কাশের দুধে ও পদ যুগল ধুয়ে,
ও যে—উথ্‌লে উঠে ফলফসলে উঠান মাচান ভূঁয়ে।
নীরস ধরা,—

*   *   *

মা তুই প্রেমে এম্‌নি মাতাস্‌'   হতাশ সে পায় আশার বাতাস,
আতুরক'ভাই জুটবে সবাই, মা তোর আঁচল ছায়ে,
বাতুল হ'য়ে লুটবে মা তোর রাতুল রাঙ্গা পায়ে।
নীরস ধরা,—

*   *   *

শ্রীকালিদাস রায়।

পুরাতন প্রসঙ্গ।

(১০)

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—"তোমার মুখে আমি শুনিতেছি যে, কেহ কেহ বলিতেছেন, বিদ্যাসাগরের প্রতি আমার কিছু আন্তরিক আক্রোশ আছে; সেই কারণেই আমি তাঁহার সম্বন্ধে ২।১টি কথা এরূপ বলিয়াছি যাহাতে তাঁহার চরিত্রে কিঞ্চিৎ reflection হয়। আমি আপনি ত বুঝিতে পারি না, এমন কি কি কথা বলিয়াছি। আমি মনে মনে জানি যে, আমি তাঁহার একান্ত ভক্ত এবং তাঁহার চরিত্রের মহত্ব ও ঔদার্য্য সর্ব্বাঙ্গীন বলিয়া স্বীকার করি। তবে হয়ত দুই এক বার তোমাকে বলিয়াছি যে, He could not bear a brother near the throne. কিন্তু এই সামান্য দুর্ব্বলতাটুকু পৃথিবীর বিস্তর বড় লোকের চরিত্রে দেখা যায়। বড় লোকের স্বভাবে, বিশেষতঃ যাঁহারা বিশিষ্ট বড় লোক তাঁহাদিগের স্বভাবে এ দুর্ব্বলতাটুকু হইবে বলিয়া যেন বিধিনির্ব্বন্ধ আছে। যাঁহারা বিশিষ্ট বড় লোক, তাঁহারা নিজের ভাবভঙ্গি লইয়া এতই বিভোর হইয়া পড়েন যে, অন্য ধরণের ভাবভঙ্গি উৎকৃষ্ট হইলেও উহা appreciate করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের থাকে না। এই নিমিত্তই বোধ হয় মেকলে স্থল বিশেষে বলিয়াছেন যে, যাঁহারা অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন লেখক তাঁহারা পরের লেখা বিষয়ে ভাল সমালোচক হয়েন না—'Great authors are seldom good critics.' মাঝামাঝি গোছের বুঝদার লোক হইলে সমালোচক ভাল হয়। ইহা যেন হইবারই কথা। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় একটা প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়ম যে উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই, ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? আর আক্রোশের কথা যে বলিতেছ, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, চল্লিশ বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে আমার জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহাতে নির্বুদ্ধিতাবশতঃ আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ তফাৎ হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং সেই বিপ্রকৃষ্ট ভাব (distance) নিজের দোষ বুঝিতে পারিয়াও ঘুচাইবার চেষ্টা করি নাই। কিন্তু তুমি জান, তোমাকেই আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে, আমার জীবনের

পূর্ব্বোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে আমারই সম্পূর্ণ ভুল এবং তিনিই সম্পূর্ণ ঠিক, ইহা আমি ঘটনার দুই এক বৎসর পরেই কথা উঠিলেই সকলের নিকট স্বীকার করিয়াছিলাম এবং এখনও করি। আমি কায়মনোবাক্যে বুঝি যে, তিনি আমার ভালই করিয়াছিলেন। সুতরাং সে আক্রোশের লেশমাত্র এক্ষণে আমার মনে নাই এবং তৎপ্রবর্ত্তিত হইয়া কিছুমাত্র মালিন্য মনে ধারণ করি না এবং কোনও বিরুদ্ধ কথাও আমার মুখে আইসে না।"

কথাটা অন্য দিকে ফিরাইবার জন্য আমি বলিলাম, "দেখুন, বৈশাখ মাসের 'ভারতী'তে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর পয়ার ছন্দে একটি কবিতা লিখিয়াছেন। বহুকাল পরে মাসিক পত্রিকায় সাবেক ধরণের পয়ার পাইয়া আমার বড়ই ভাল লাগিল। আমার মনে হয় আবার কিছুদিন খাঁটি নির্ভেজ পয়ার যদি আমাদের কবিরা চালাইতে পারেন, তাহা হইলে অন্ততঃ আর কিছু না হউক, মুখ বদলান হয়।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—"তোমার কথায় বিদ্যাসাগরকে মনে পড়িল। বিদ্যাসাগর ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনা অতিশয় পছন্দ করিতেন। আমার বোধ হয়, যখন রসময় দত্তের সহিত অকৌশল হওয়াতে তিনি সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরির পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত একযোগে ছাপাখানার ব্যবসা আরম্ভ করেন, তখন ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থই তাঁহার ছাপাখানার সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। আমি তাঁহাকে কোনও কোনও সময়ে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলের' কবিতা গদগদভাবে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। আমার বেশ মনে হইতেছে একদিন তিনি 'হেথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া' ইত্যাদি কবিতাটি বিশেষ আনন্দের সহিত পড়িতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—'দেখদেখি কেমন পরিষ্কার ঝর্‌ঝরে ভাষা।'

"আমার বিশ্বাস মদনমোহনের 'বাসবদত্তা' তাঁহার পঠদ্দশায় বিরচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি 'রসতরঙ্গিণী' নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থখানি বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন। পদ্য ও গদ্য লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার অতি অদ্ভুত ছিল। আমি তোমাকে প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এবং এখনও বলিতেছি যে, আমার মনে হয়, তিনি যদি ডিপুটিগিরি চাকরী করিতে না গিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যসেবায় রত থাকিতেন তাহা হইলে এক্ষণে আমরা যে প্রশংসাপুষ্পাঞ্জলি কেবল বিদ্যাসাগরের চরণে অর্পণ করিতেছি তাহা অর্দ্ধেক ভাগ করিয়া দুই জনকে দিতে হইত। Genius অর্থাৎ প্রতিভা

নামক যে পদার্থ আছে, মদনমোহনের স্বভাবসিদ্ধ তাহা ছিল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু অনুশীলনের অভাবে উহার তাদৃশ খোল্‌তা হইতে পারিল না।

"বিদ্যাসাগর ও মদনমোহনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে, ইহ সংসারে উন্নতিলাভের পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তির উপযোগিতা অপেক্ষা যাহাকে character (চরিত্র) কহে, অর্থাৎ অধ্যবসায়, বিবেচকতা এবং অকুতোভয়তা এই সকল বৃত্তির উপযোগিতা অধিক। বিদ্যা বুদ্ধি সম্বন্ধে তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর দুইজনেই বোধ হয় কাছাকাছি ছিলেন, কিন্তু চরিত্র অংশে আস্‌মান জমিন্‌ প্রভেদ। যাহাকে backbone কহে,বিদ্যাসাগরের তাহা পূর্ণমাত্রায় ছিল, কিন্তু সে বিষয়ে তর্কালঙ্কার হয় ত Vertebrate শ্রেণীর অন্তঃর্গত হয়েন যে কি না সন্দেহ।

"বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিবিলিয়নদিগকে বাঙ্গালা পড়াইতেন, তখন তাঁহাকে 'বিদ্যাসুন্দর' পড়াইতে হইত। 'বিদ্যাসুন্দরের' খেউড়্‌অংশ পড়াইবার সময় তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিতভাব প্রদর্শন করিতেন; কিন্তু এক এক জন য়ুরোপীয় তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন, 'কেন তুমি কাতুমাতু করিতেছ? আমাদের ভাষাতে কি সেক্সপীয়রের Venus and Adonis, Rape of Lucrece, এবং পোপের January and May, এই সকল বহি নাই? আর আমরা কি ঐ সকল বহি আদরে পড়ি না; শিকায় তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছি? অতএব ইহাতে আর লজ্জার বিষয় কি?' এই কথা আমি বিদ্যাসাগরের মুখে শুনিয়াছি।

"বিদ্যাসাগর এ দিকে পাকা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু তাঁহার সাংসারিক লোকজ্ঞতা এবং সাধারণ বিষয়বুদ্ধি বড় কম ছিল না। একসময়ে শ্রীহট্ট জিলা নিবাসী কোনও এক ব্যক্তি চাকরীর প্রার্থনায় তাঁহার শরণাগত হয়। অন্ততঃ তিনি সুপারিস দিয়া তাহাকে কোথাও একটা চাকরী করিয়া দেন, সে এ প্রকার বাঞ্ছাও প্রকাশ করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃতকলেজের বড় চাকরী ত্যাগ করিয়াছেন। নিজে চাকরী দিবার ক্ষমতা বিশেষ কিছু ছিল না, আর সুপারিসের দ্বারা যে চাকরি করিয়া দিতে পারিবেন এ ভরসাও তিনি বড় করিতেন না। উমেদারটি নিজের কার্য্য সিদ্ধি ও বিদ্যাসাগরের মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহাকে একখানি উৎকৃষ্ট সিলেটী পাটি উপহার দিল। বিদ্যাসাগর প্রথমে কিন্তু উহা লইতে চাহেন নাই; উমেদারের পীড়াপীড়িতে শেষে লইলেন। আমার নিকট এই গল্প করিবার সময় বিদ্যাসাগর কহিলেন, 'আমি বেশ বুঝলুম যে, চাকরী না হোলে উমেদার পাটির দাম চা'বে। এই ভেবে আমি সে পাটি

ব্যবহার করলুম না, তুলে রাখলুম। ফলে আমি যা ভেবেছিলুম তাই ঘট্‌ল। উমেদার যখন কিছুদিন হাঁটাহাঁটী করে চাকরীর বিষয়ে হতাশ্বাস হোলো, তখন বিদায় নেবার সময় বল্লে, 'মশাই, তবে পাটির দামটা পেলে ভাল হয়'। আমি বল্লুম, 'বাপু, আমি তোমার পাটি একদিনের জন্যে ব্যবহার করি নি, ঐ দেখ, তোলা রয়েছে, তুমি ফেরত নিয়ে যাও।' উমেদার কতকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পাটি নিয়ে বিদেয় হোলো।'

"সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের প্রতি শেষাশেষি, বিশেষতঃ বিধবাবিবাহ ব্যাপারের পর, বিদ্যাসাগরের বিলক্ষণ অশ্রদ্ধা হইয়া গিয়াছিল। আমি বড় বড় দিগ্‌গজ অধ্যাপকদিগের বিষয় বলিতেছি না; তাঁহাদিগকে তিনি যাবজ্জীবন পূজনীয় জ্ঞান করিতেন, যথেষ্ট ভক্তি করিতেন এবং অকাতরে অর্থদানও করিতেন। কিন্তু যাঁহারা দু' দশ পাতা সংস্কৃত পড়িয়া ডেপোমি করিয়া বেড়ান, এবং বিদায়ের লোভে চারিদিকে হাঁটাহাটি করেন, তাঁহাদিগকে তিনি ইদানীং 'ল্যাজকাটা' বা 'টিকিদাস' এ ছাড়া অন্য নাম দিতেন না। চাণক্যের একটি শ্লোক আছে—'পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষাহি কেবলং' এই শ্লোকটির প্রকৃত ব্যাখ্যা উল্টাইয়া দিয়া একটি পরিহাসের ব্যাখ্যা লালমোহন নামক এক ব্যক্তি বাহির করিয়াছিলেন। লালমোহন প্রসিদ্ধ দুর্গাচরণ ডাক্তারের ভ্রাতা ছিলেন, সহোদর কিনা ঠিক বলিতে পারি না। অর্থটা হইল এই—পণ্ডিতের সবই গুণ, দোষের মধ্যে খালি মূর্খ। বিদ্যাসাগর এই পরিহাসের ব্যখ্যাটি লইয়া সর্ব্বদাই আমোদ করিতেন এবং বলিতেন যে, লালমোহন শ্লোকের অর্থটা ঠিকই করিয়াছে। বিধবাবিবাহ ব্যাপারের পর অশ্রদ্ধা হইবার আরও কারণ এই যে, প্রথমে অনেকে তাঁহার পক্ষে সায় দিয়া শেষে অর্থলোভে স্বচ্ছন্দে বিপক্ষের দলে মিশিয়া গেল। ইহাতে তিনি ঐ পণ্ডিত জাতির উপর হাড়ে চটিয়া গিয়াছিলেন।

"প্রথম বয়সে বিদ্যাসাগরের দেহটি বেশ মজবুৎ ছিল। আকার খর্ব্ব বটে, কিন্তু এ দিকে খুব গ্যাঁটাগোঁটা যাহাকে সংস্কৃতে 'অবষ্টব্ধ' বলে, সেই গোছের ছিল। তিনি শারীরিক পরিশ্রমও খুব করিতে পারিতেন, এবং খুব পথ চলিতে পারিতেন। তাঁহার জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রাম কলিকাতা হইতে বিশ ক্রোশ দূরে; কিন্তু বিদ্যাসাগর প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া সদ্যাই হাঁটা পথে বাড়ী পৌছিতেন, পায়ে কেবল এক চটি জুতা, হয় ত বার আনা পথ শুধু পায়েই যাইতেন, গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে রৌদ্রও ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। এই হাঁটাপথে যাইবার সময়ে

এক দিনের একটি বৃত্তান্তের গল্প অতি করুণভাবে তিনি বলিতেন। তিনি বলিতেন, 'আমি একদিন বাড়ী যাবার সময় দুপুরের রোদে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের জন্যে একটি খোড়ো বাড়ির বাহিরের রোয়াকে বোসে আছি,এমন সময় বাড়ীর ভেতর থেকে গুটি দুই তিন ছেলে নাচতে নাচতে আর গানের সুরে চেঁচাতে চেঁচাতে বেরিয়ে এল। তাদের মুখে এই বুলি—আজ আমাদের ডাল হয়েছে, আজ আমাদের ডাল হয়েছে। আমি ত দেখে শুনে অবাক। ভাবলুম যে, এদের এত দুরবস্থা যে বছরের মধ্যে পাল পার্ব্বণের মত দু' এক দিন ডাল রান্না খেতে পায়! আর বোধ হয় এমন অনেকেই আছে।' এই গল্প করিতে করিতে কখনও কখনও তাঁহার চক্ষুতে জল আসিত।

"তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকালে বিদ্যাসাগরের উক্ত প্রকার গ্যাঁটাগোঁটা শরীরের জন্য তাঁহারা সকলে উহাঁকে 'টিপ্‌লে' বলিয়া ডাকিতেন; এবং বিদ্যাসাগর যখন কোনও একটা শাস্ত্রের—বিশেষতঃ স্মৃতিশাস্ত্রের-ভালরূপ মীমাংসা করিয়া দিতেন, তখন তাঁহারা বলিতেন, 'আমাদের টিপ্‌লে না হোলে এরকম আর কে করে দিতে পারে।'

"বিদ্যাসাগর যখন বহু বিবাহের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন, তখন তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিজের মুখে শুনিয়াছি যে, শূদ্রস্য ভার্য্যা শূদ্রেব সা চ সা চ বিশঃ স্মৃতে এই মনুবচনের বিদ্যাসাগর যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সম্পূর্ণ সম্মত। শেষে কিন্তু তর্কবাচস্পতি মহাশয় বহুবিবাহের সমর্থনপক্ষে লেখনী ধারণ করিলেন, এবং বিদ্যাসাগরের সহিত বাদে (controversy) প্রবৃত্ত হইলেন!

"পদব্রজে পথপর্য্যটনে বিদ্যাসাগর কখনও ক্লান্তি বোধ করিতেন না। শেষাবস্থায় যখন তিনি অত্যন্ত কাহিল হইয়াছিলেন, কিছুই পরিপাক হইত না, তখন ডাক্তারদিগকে ইহার উপায় জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা কহিলেন, 'খুব হাঁটিতে আরম্ভ করুন।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কতক্ষণ করিয়া হাঁটিব?' ডাক্তার বলিলেন, 'যতক্ষণ না ক্লান্তি বোধ করেন।' বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন, তাহ'লে ত রাত্রিদিন হাঁটতে হয়, কারণ হেঁটে আমি কখনও ক্লান্তি বোধ করি না।'

"কলেজের প্রিন্সিপাল হইবার পর তিনি কিছুদিন কলেজের ইমারতেই বাসা করিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। সেই সময়ে মালির ঘরের দিকে মাটি ফেলিয়া

মস্ত একটি কুস্তির আখড়া তৈয়ার করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যহ দেশীধরণের কুস্তি বিলক্ষণ অভ্যাস করিয়াছিলেন। জীবহিংসা পরিহারের জন্য তিনি কিছুকাল মৎস্যমাংসও ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং বাছুরকে কষ্ট দিতে হয় বলিয়া দুগ্ধ পর্য্যন্তও বোধ হয় ছাড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, এ বাতিক বোধ হয় অধিক দিন চলে নাই, নচেৎ বাঙ্গালা ভাষাকে তাঁহার লেখনীপ্রসূত অনেক অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইতে হয়ত বঞ্চিত হইতে হইত; তিনি কখনই বেশীদিন বাঁচিতে পারিতেন না। এ বিষয়ে কোম্‌ৎ বলিয়া গিয়াছেন যে সৃষ্টিকাণ্ডে ইহা একটি অসম্পূর্ণতা (imperfection) এবং সৃষ্টিকর্ত্তার অসীম করুণাময়ত্ব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধযুক্ত যে, জীবহিংসা ব্যতীত মনুষ্যজাতির মস্তিষ্কের আবশ্যকমত পুষ্টিসাধন হইবার যো নাই। কিন্তু মানুষ করিবে কি? কেবল এই পর্য্যন্ত করিতে পারে যে, যে সকল জন্তুর দেহ হইতে আমরা আহার পাইয়া থাকি তাহাদিগকে যত কম হয় কষ্ট দিতে হইবে; যাবজ্জীবন তাহাদিগকে যথেষ্ট যত্ন করা উচিত; এবং সেই যে চরম মুহূর্ত্ত—যখন আমরা তাহাদিগকে বধ করিতে যাইতেছি, তখন যেন তাহারা মৃত্যুর বিভীষিকা আদৌ না টের পায়; এই চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; এবং প্রাণসংহার ব্যাপারও এরূপ অনিষ্ঠুর ও যন্ত্রণাশূণ্য রীতিতে সম্পাদন করা উচিত যে, তাহাদিগের কিছুমাত্র ক্লেশ না হয়। আমি জানি যে, এখনকার উদ্ভিজ্জভোজীর দল কোম্‌তের এই সিদ্ধান্ত হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু এখনও শরীরবিধান শাস্ত্রদ্বারা (physiology) উদ্ভিজ্জ ভোজনের সর্ব্বাভিপ্রায়সাধনতা সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

"এই প্রসঙ্গে সুরাপান সম্বন্ধে কোম্‌তের মত প্রকটন করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি বলেন, alcoholএর এমনই একটি ধর্ম্ম আছে যে, পেটে পড়িলেই পেট ও মস্তিষ্ক উভয়সংযোজক ganglionic nerve কে তৎক্ষণাৎ বিকৃত করিয়া দেয়, এবং সেই বিকার মস্তিষ্কে নীত হয়। এইরূপে পুনঃ পুনঃ alcohol সংযোগ ঘটিলে উহা স্থায়ী ভাবে বিকৃত হইয়া যায়। এই জন্য মহম্মদ সুরাপান তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পক্ষে ঐকান্তিক নিষিদ্ধ কার্য্য বলিয়া ব্যবস্থা করাতে কোম্‌ৎ মহম্মদকে আকাশে তুলিয়া দিয়াছেন, এবং কথায় কথায় বলেন 'The incomparable Mohammad' অর্থাৎ মহম্মদের জুড়ি নাই।

"আজকাল শুনিতেছি যে, ডাক্তার চুনিলালবসু নাকি সবিস্তারে সেই

সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিতেছেন। তাঁহার মতে মস্তিষ্ক ও যকৃৎ এই উভয় করণই (organs) alcoholএর দ্বারা উচ্ছন্ন যায়। এতদ্দেশে নব্যযুবকের দল কিন্তু আজও একথা বুঝিতেছেন না। য়ুরোপীয়দিগের মধ্যেও অনেকে ইহা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। তাঁহারা বলেন যে, পরিমিতমাত্রায় alcohol সেবার দ্বারা উপকার বৈ অপকার নাই। তাঁহাদের মতে স্ত্রীপুরুষের শারীরিক সম্বন্ধও তদ্রূপ আবশ্যক। আমি কিন্তু এই দুইটি মতই ঘোরতর অপসিদ্ধান্ত বলিয়া জ্ঞান করি। শেষোক্তটি পরিহার করিলে যে শরীর ও মস্তিষ্কের উৎকর্ষই সাধিত হইবে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে আমাদিগের প্রাচীন ঋষিদিগের ও স্নাতক ব্রাহ্মণদিগের আচার। ইদানীন্তনকালে স্যর আইজাক্ নিউটনের মত মস্তিষ্কচালনা কে কবে করিয়াছে? তিনি ৮৪ বৎসর জীবিত ছিলেন, বিবাহ করেন নাই। যতদূর জানা আছে তাঁহার চরিত্রও নিষ্কলুষ ছিল।

"কোম্‌তের মত ও ইহাই ছিল। ঐ শারীরিক সম্বন্ধ যাহাতে এককালেই উঠিয়া যায়, ইহা বিজ্ঞানচর্চ্চাকারী ব্যক্তিমাত্রের visionary idea স্বরূপ মনে ধারণ করিয়া রাখা উচিত, তিনি এইরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন; এবং সেই জন্য বিড়ম্বরসিকদিগের বিদ্রূপের পাত্র হইয়াছিলেন। এমন কি জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলও তাঁহার প্রতি একটু ঠাট্টার বারি বর্ষণ করিয়াছেন। মিল বলেন 'এবিষয়ে কোম্‌ৎ একটা কথা বলিয়াগিয়াছেন, সে যে কি তাহা আমি বলিতে চাহি না।' কোম্‌ৎ বলেন, রোমান ক্যাথলিক দিগের কুমারী জননী (Virgin Mother) একটা Theological Conception বটে, কিন্তু জিনিষটা কি তাহা আমি Physiologist দিগকে অনুসন্ধান করিতে বলি। নিষ্কলঙ্কচরিত্র কুমারীর সন্তান উৎপন্ন হয়, এ বিশ্বাসটি য়ুরোপে ত এক্ষণে হাস্যাস্পদ হইয়াছে এবং বিস্তর লোক এই কারণেই খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা করিয়াছে। অশ্রদ্ধা আমি এই ভাবে বলিতেছি যে, খ্রীষ্টান ধর্ম্মের ধর্ম্মনীতির উপর কাহারও বিরাগ, ঘৃণা বা অবজ্ঞা হয় নাই; কিন্তু ঐ ধরণের মূলীভূত বিশ্বাসগুলির উপর—যথা কুমারীর সন্তান উৎপত্তি, একখানি রুটীতে বিস্তর লোক খাওয়ান, কথার দ্বারা উৎকট রোগ আরাম করা ইত্যাদি বিষয়ে ক্রমেই লোকের অশ্রদ্ধা হইয়া আসিতেছে। হিউম এই অশ্রদ্ধা প্রথম রচনায় প্রকাশ করেন। তখন গোঁড়া খৃষ্টানদিগের তরফ হইতে তাঁহার উপর বিস্তর গালিগালাজ বর্ষণ হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে দেখিতেছি যে, তাঁহার কথাই সর্ব্বত্র বিস্তার হইয়া যাইতেছে। আমেরিকার কোনও এক মণ্ডলীতে বক্তৃতা দিবার সময় একজন পাদ্রি বলিয়া

উঠিলেন, আজ ১৮০০ বৎসর হইল কেহ মরিয়া জীয়ন্ত হয় নাই। সেই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রোতৃবর্গের মধ্য হইতে আকাশবাণীর ন্যায় একজন আওয়াজ দিলেন, 'কখনও কেহ হয় নাই।' যীশুখৃষ্টের গোর হইতে উত্থান—ইহার প্রতি লোকের ত এইরূপ শ্রদ্ধা। আমাদের দেশে কিন্তু এরূপ সন্তান উৎপত্তির ideaটি ততদূর হাস্যাস্পদ হয় নাই। তাহার সাক্ষ্য ভগীরথের জন্মবৃত্তান্ত, মন্ধাতার জন্মবৃত্তান্ত আর কাদম্বরী আখ্যায়িকাতে পুণ্ডরীকের জন্ম। ইহা ব্যতীত পুরাণের মধ্যে মানসপুত্র ত কথায় কথায় দেখা যায়।

"কোম্‌তের কথা এক্ষণকার দিগ্‌গজ শারীরবিধানবেত্তাদিগের নিকট কতদূর অনুমোদিত তাহা আমি জানি না এবং সে মীমাংসা করিবার ক্ষমতাও আমার নাই। মানুষের দেহযন্ত্র (বা organism) একটি নানাব্যাপারসঙ্কুল অতি জটিল (complex) কাণ্ড; বহু সংখ্যক factor একত্র হইয়া ইহা চালিত হইতেছে। একটি factor বদল করিয়া দাও, অমনই ইহার চলনক্রিয়া বদলিয়া যাইবে। এরূপ জটিল কাণ্ডের মধ্যে চেষ্টা করিলে অনেক প্রকারের অদল বদল আনয়ন করা যাইতে পারে। আজ কাল surgery দ্বারা যে সকল অত্যদ্ভুত ব্যাপার সাধিত হইতেছে, সে গুলিই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া কোম্‌ৎ বলিয়া গিয়াছেন যে, কুমারীর সন্তান উৎপত্তি কেনই বা একেবারে ঐকান্তিক নিরবচ্ছিন্ন অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে করা যাইবে। যদি বল, সে চেষ্টায় দরকার কি? উত্তর—দেহের ও মস্তিকের ক্ষয় নিবারণ করা উচিত নহে কি? একজন ফরাসি ডাক্তার এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। আর এক উত্তর এই যে, সন্তান উৎপত্তি যদি আমাদিগের ইচ্ছার আয়ত্ত হয়, তাহা হইলে ম্যাল্‌থসের Population difficulty অনেকটা ঘুচাইয়া দিতে পারা যায়। কোম্‌ৎ কিন্তু ম্যাল্‌থস্‌কে মানিতেন না। তিনি এক স্থলে বলিয়াছেন যে, ম্যাল্‌থসের সিদ্ধান্তে (Theory) গণনায় ভুল (arithmatical mistake) আছে। এই অংশে অদ্যাপি আমি কোম্‌ৎকে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই; এবং কোন্ স্থানে যে ম্যাল্‌থসের গণনায় ভুল আছে তাহাও ঠিক করিতে পারি নাই। ফলতঃ ম্যাল্‌থসের রচনার সহিত প্রথম পরিচয় হওয়া অবধি আমি যেন একটা নূতন আলো পাইয়াছি, মনে হইয়াছে; এবং তাঁহার সকল সিদ্ধান্তই অখণ্ডনীয় বলিয়া বোধ হয়। যাবৎ সাধারণে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিতেছে, তাবৎ পৃথিবীর বিস্তর লোককে অর্দ্ধাশনের যন্ত্রণা ও দুর্গতি ভোগ করিতেই হইবে; হয় ত শতকরা

১০ জন পেট ভরিয়া খাইতে পায়, আর ৯০ জন ক্ষুধায় যন্ত্রণা ভোগ করে; এই যে বর্ত্তমান অবস্থা ইহা ঘুচাইবার উপায়ান্তর নাই। অনেকে ভাবেন, বড় মানুষরা ঘরের টাকার থলি বাহির করিয়া দিলে এ যন্ত্রণা ঘুচিতে পারে; শুদ্ধ বড় মানুষদিগের স্বার্থপরতাবশতঃ এ অবস্থা বদ্ধমূল হইয়া আছে। কিন্তু এটা কাযের কথা নহে। বড় মানুষরা আপনাদের সমস্ত টাকা বাহির করিয়া দিলে হয় ত ৫।৭ বৎসর একটু স্বচ্ছল দেখা যাইবে। কিন্তু তাহার পরেই আবার যে কে সেই। এত সন্তান জন্মিবে, অল্পবয়সে মৃত্যুর সংখ্যা এত কমিয়া যাইবে, যে আবার খাদ্যদ্রব্যের পূর্ব্ববৎ টানাটানি আসিয়া উপস্থিত হইবে। এক্ষণে ভালরূপ না খাইতে পাওয়ার দরুণ বিস্তর শিশু এবং বিস্তর বয়স্ক ব্যক্তি পর্য্যন্ত কালগ্রাসে পতিত হয়। দিন কতক যদি এই অবস্থা বন্ধ হয়, তবে সেই সকল শিশু ও সেই সকল বয়স্ক ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিয়া আবার টান ধরাইবে এবং বড় মানুষদিগের টাকা অল্পকালমধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। এ কথা ম্যাল্‌থস্‌ এবং তাহার পরে ষ্টুয়ার্ট মিল অতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। অতএব বড়মানুষদিগের উপর স্বার্থপরতা দোষ আরোপ করা বৃথা।

"তবে কোম্‌ৎ এ কথা বলেন বটে যে, পৃথিবীতে এখনও বিস্তর জমী পতিত রহিয়াছে। পাহাড় কাটিয়া জমী বাহির করা যাইতে পারে। সাহারা প্রভৃতি মরুভূমিকে উর্ব্বরা করা যাইতে পারে। সমুদ্রকে হটাইয়া দিয়া আবাদের জমী বাহির করা যাইতে পারে। মৎস্য-মাংসাদি খাদ্যের পরিমাণও অপরিসীমরূপে বাড়াইবার উপায় আছে। এই সমস্ত কার্য্য সমাধা করিবার জন্য বড় মানুষদিগের স্বার্থপরতা ত্যাগ করা আবশ্যক। হয় ত এখন হইতে দশ হাজার বৎসর পরে পৃথিবীর সমস্ত resource নিঃশেষিত হইবে এবং তখন এই জনসংখ্যার সমস্যা মালুম হইতে আরম্ভ হইবে। উপস্থিতকালে আমাদিগকে ও বিষয়ে মনোযোগ করিতে হইতেছে না।

"অতএব সাধারণ ধর্ম্মনীতির উন্নতি এমন আবশ্যক। কোম্‌তের অভিপ্রায় বোধ হয় এই প্রকার ছিল। আর সংযমের জন্য তিনি এক উপায় বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন,—আহারের খর্ব্বতা করিলেই রিপুর দমন হয়; যে পরিমাণ খাইতেছ, তাহার অর্দ্ধেক কর, না হয় সিকি কর, গায়ের জোর-টুকু যাহাতে বজায় থাকে তাহার অতিরিক্ত আদবে খাইবে না—এই নিয়ম কর, তাহা হইলে নিশ্চয় রিপুর দমন হইবে। এ কথা তাঁহার নিজের নহে।

তিনি একখানি গ্রন্থ পড়িতে বড়ই ভাল বাসিতেন, নাম Imitation of Christ, ভাষা Latin, গ্রন্থকার Thomas a Kempis—লোকটা ভগবান লইয়া বিভোর হইয়া ছিল। ঐ গ্রন্থ হইতে কোম্‌ৎ আহার-লাঘবের উপদেশটি সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে লিখা আছে, বুভুক্ষাবৃত্তিকে দমন কর, তাহা হইলে আর সকল দুর্দ্দান্ত রিপুরই দমন হইয়া আসিবে।

"এই উপলক্ষে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক্ হইবে না, যে Thomas a Kempis গ্রন্থের যে যে স্থানে ভগবানের নাম করিয়াছেন, কোম্‌ৎ সেই সেই স্থলে Humanity এই শব্দটি বসাইতে বলেন। তাহা হইলেই গ্রন্থের পূর্ব্বতন উপদেশপূর্ণতা সম্পূর্ণ বজায় থাকিবে। কোম্‌ৎ এই ভাবেই গ্রন্থখানি লইয়া উন্মত্ত হইয়া থাকিতেন। Kempis যেমন ভগবানে বিভোর, কোম্‌ৎ তেমনি Humanity লইয়া বিভোর। ভগবদ্ভক্ত যেমন ভগবানের হস্তচিহ্ন সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান দেখিতে পায়েন, কোমৎ তেমনি আহার, আচ্ছাদন, বাড়ী, ঘর, আইন, আদালত, হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদি সর্ব্বত্র Humanityর হস্তচিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়া গদ্‌গদ হইয়া যাইতেন এবং আনন্দপরিপ্লুতভাবে তাহা কীর্ত্তন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকিতেন। সুইডেনবর্গকে লোকে বলিত God-intoxicated man—ভগবান লইয়া মাতোয়ারা। কোম্‌ৎকেও তদ্রূপ বলা যাইতে পারে, Humanity-intoxicated man—humanity লইয়া মাতোয়ারা।

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

কবিকঙ্কণের যুগের সমাজ।

—:•:—

বর্ণ ও জাতির বিভাগ এবং পরিচয়।

—•—

সকল দেশের কাল্পনিক সাহিত্যে (Imaginative literature) দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার রচনাকালের সমাজের আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম কর্ম্ম, রীতি নীতি, জ্ঞান ও নৈতিক জীবনের একটি চিত্র তাহার মধ্যে অঙ্কিত থাকে। মনীষী Taine এই নীতি অবলম্বন করিয়াই তাঁহার 'ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস' সঙ্কলন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।* সাহিত্যের বিষয়-নির্ব্বাচনানুসারে এই চিত্র সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের আদিম প্রকৃতিকবি কবিকঙ্কণের কাব্যে ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর জীবনের একটি উজ্জ্বল চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়; প্রয়োজনমত কল্পনার লীলা বাদ দিলে তৎকালীন বঙ্গসমাজের একটি বিস্তারিত বিবরণ আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—বিষয়-নির্ব্বাচনের উপর কাব্যের বা সাহিত্যের এই গুণ নির্ভর করে। কবিকঙ্কণ একজন ব্যাধ ও একজন বণিককে আপনার কাব্যের নায়ক করায়, পল্লীসমাজের অবস্থা তিনি অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন। Imperial Gazetteerএ লিখিত হইয়াছে,—"In his (Kabikankana's) works, we may find a picture of Bengali village-life as it actually existed in the sixteenth century, before any European influence had begun to affect the national character or widen its intellectual and moral horizon. * * * The poem forms in itself a store-house of materials for the social history of the people as apart from their rulers".†

---

* "Any considerable literary work will exhibit, under careful analysis, not only the writer's state of mind, his experiences and way of life, but also the long-descended influences of race and tradition, the temper of his time, and the general intellectual condition of his nation."

Englishmen of Letters—Tennyson.

† Indian Empire, Vol. II, P. 426.

এই কবিকঙ্কণের কাব্য হইতেই আমরা তৎকালের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব।

হিন্দু সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মণ চিরদিনই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত। কবিকঙ্কণের কাব্যে আমরা কেবলমাত্র রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণের উল্লেখ দেখিতে পাই। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই শাস্ত্রচর্চ্চা ও পূজা অর্চ্চনা করিতেন। নগরের মধ্যে যে স্থানে ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর বর্ণ বাস করিতেন, সেটি "কুলস্থান" নামে পরিচিত ছিল। অধিকাংশ ব্রাহ্মণ চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিতেন; অবশিষ্টের মধ্যে কতকগুলি "কথকতা" করিতেন ও "ভারতপুরাণ" পাঠ করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতেন। আর কতকগুলি পুরোহিতের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া, নিত্যসেবা ও শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিতেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে "বাপুলি বিশালমুণ্ড" ধনে ও মানে প্রধান ছিলেন।* কবিকঙ্কণের ভাষা দেখিয়া মনে হয়, "গ্রামযাজী" ব্রাহ্মণরা সমাজে একটু হীন হইয়া থাকিতেন। কবি বলিতেছেন,—

"মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে, নগরে যাজন করে,
শিখয়ে পূজার অধিষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে, দেব পূজে ঘরে ঘরে,
চাউলের বোচকা বান্ধে টান॥
ময়রা ঘরে পায় খণ্ড, † গোপঘরে দধিভাণ্ড,
তেলিঘরে তৈল কুপী ভরি।
কোথায় মাসড়া কড়ি, কেহ দেয় দালি-বড়ি,
গ্রামযাজী আনন্দে সাঁতরি॥
গুজরাট নগরে, নগরিয়া শ্রাদ্ধ করে,
গ্রামযাজী হয় অধিষ্ঠান।
সাঙ্গ করি দ্বিজ কয়,— কাহণ দক্ষিণা হয়,
হাতে কুশে দক্ষিণা ফুরাণ॥"

আমাদের এখনকার সমাজেও "গ্রামযাজী"র এইরূপ অবস্থা দেখিতে পাই।

ঘটক ব্রাহ্মণগণ সমাজে নিতান্তই হীন ছিলেন। তাঁহাদের জীবিকা ছিল "কুলপঞ্জী" (geneology) পাঠ। আর, কেহ তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট না করিলে,

* "ধনে মানে অতিচণ্ড বাপুলি বিশালমুণ্ড।"

† খণ্ড অর্থে "খাড়ভজ্জ" সেকালের প্রচলিত খাদ্য।

সভার মধ্যে তাহাকে তাঁহারা অপদস্থ করিতেন। সভায় মধ্যে নিন্দার ভয়ে অনেকেই ঘটকদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে প্রাণপণ যত্ন করিত।

"গ্রহবিপ্র" বা জ্যোতিষীরা নগরের এক পার্শ্বে মঠে বাস করিতেন। তাঁহারা "দীপিকা ভাস্বতি" হাতে লইয়া, শাস্ত্রাদি বিচার করিতেন এবং বালক-বালিকাদিগের কোষ্ঠী-ঠিকোজী প্রভৃতি লিখিতেন।

ব্রাহ্মণরা প্রধানতঃ নিষ্কর ভূমিতেই বাস করিতেন। বৈষ্ণবরাও এইরূপ ভূমি লাভ করিয়া "কাঁথা-কম্বল-লাঠী" লইয়া ও "গলায় তুলসী কাঁঠী" বাঁধিয়া সর্ব্বদা "গীতনাটে" সময় অতিবাহিত করিতেন। উপরি উক্ত সকলেই "কুলস্থানে" বাস করিতেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণরাই বেদ-চর্চ্চা করিতেন।*

ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে প্রায় সকলেই যুদ্ধাদি ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেন। 'চণ্ডী'তে দেখিতে পাই,—

"ক্ষত্রি বৈসে ভানুবংশ, সর্ব্বলোক অবতংস,
চন্দ্রবংশে বৈসে মহাজন।
পুরাণ শ্রবণ আশে, বসিল বিপ্রের পাশে,
অনুদিন দ্বিজে দেয় ধন॥"

কেবল রাজপুতগণ মল্লবিদ্যার গুরুরূপে "আখড়াঘরে" মল্লবিদ্যা শিক্ষা দিতেন।

বৈশ্যদিগের মধ্যে সকলেই বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ গোরক্ষা করিয়া দুগ্ধের ব্যবসা করিতেন, কেহ বা ক্ষেত্রকর্ষণ করিতেন। কেহ বৃষ-স্কন্ধে ধান্য বহন করাইতেন, কেহ বা ধান্য কিনিয়া বাজারদর বৃদ্ধি হইলে বিক্রয় করিবার আশায় রাখিয়া দিতেন। কেহ "হীরানীলামতিপলা" প্রভৃতি বহুমূল্য মণিমুক্তাদি নানা সহরে বিক্রয় করিতে যাইতেন, কেহ বা তরণীযোগে সফরে যাইয়া শঙ্খ, চামর, চন্দন, চামরীভোট, সগল্লাদ,† করণ্ড, পট্টিশ, অজ-রাখি প্রভৃতি আনয়ন করিতেন। এইরূপ ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবসায়ে বৈশ্যরা তৎকালে প্রচুর বিত্তশালী ছিলেন।

তৎকালে চিকিৎসাবিদ্যা অতি অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণকার

---

* "বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শত শত।
ব্যবহারে বড় ঋজু, নিত্য পড়ে বেদ যজু,
বেদ বিদ্যা পড়ে অবিরত॥"

† তৎকালে প্রচলিত সূক্ষ্মকারুকার্য্যসমন্বিত বহুমূল্য বস্ত্র বিশেষ।

শিক্ষিত, ধনী, বৈদ্যদিগের সহিত সেকালের বৈদ্যদিগের তুলনাই হয় না। তখন বৈদ্যরা প্রভাতে উঠিয়া, কপালে "উর্দ্ধ ফোঁটা" করিয়া, মাথায় কাপড় বাঁধিয়া, "জর্জ্জর ধুতি" পরিয়া নানা পুঁথি কাঁধে নগরে নগরে ঘুরিয়া বেড়াইত। কবিকঙ্কণ অতিশয় কৌতুকের সহিত বৈদ্যদিগের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন,—

"কার দেখি সাধ্যরোগ, ঔষধ করায় যোগ,
বুকে ঘা মারিয়া অর্থ চায়।
অসাধ্য দেখিয়া রোগ, পলাইতে করে যোগ,
নানা ছলে করয়ে বিদায়॥
কর্প্পূর পাঁচন করি, তবে জীয়াইতে পারি,
কর্প্পূরের করহ সন্ধান।
রোগী সবিনয়ে বলে, কর্প্পূর আনিতে চলে,
সেই পথে বৈদ্যের পয়াণ॥"

অগ্রদানীরা বৈদ্যদিগের সহিত তাহাদের পার্শ্বে বাস করিত। কেন না, "হাতুড়ে" চিকিৎসকের নিকট তাহাদের সর্ব্বদাই রোগীর সন্ধান রাখিতে হইত। অগ্রদানীরা রাজকর দিত না, শ্রাদ্ধের সময় "বৈতরণীধেনু", হেম, রজত, তিল প্রভৃতি দান গ্রহণ করাই তাহাদের জীবিকা ছিল। বৈদ্য ও অগ্রদানীরা "কুলস্থানে" বাস করিত।

কায়স্থরা নগরের দক্ষিণ দিকে থাকিতেন। তাঁহারা এই বলিয়া গর্ব্ব করিতেন,—

"প্রসন্ন সভারে বাণী, লেখা পড়া সবে জানি,
ভব্যজন নগরের শোভা।"

তৎকালে কায়স্থরা পেয়াদা, মুহুরি প্রভৃতির কার্য্য হইতে রাজদরবারে লিখা-পড়া বিষয়ে অতি উচ্চকর্ম্ম করিতেন। ইহার প্রমাণ প্রাচীন কাব্যসমূহে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।*

কবিকঙ্কণ দুই শ্রেণীর গোপের উল্লেখ করিয়াছেন,—প্রথম, "বণিক্‌গোপ"; ইহারা অত্যন্ত ধার্ম্মিক এবং সরল ছিল, কপটতার লেশমাত্র ইহারা জানিত না। এই শ্রেণীর গোপরা ক্ষেত্রে চাষ করিত, এবং গম, তিল, মুগ, মাস,

---

* "কাণে কলম হাতে দোত, আইলা কায়স্থ সুত।"
"বিচারিয়া কেহ লেখে, কাগজে কায়স্থ লেখে।"
কবিকঙ্কণের এই বর্ণনা ভিন্ন, রামেশ্বরাদির কাব্যেও এই কথা দেখিতে পাই।

ঘৃত, সর্ষপ, কার্পাস প্রভৃতিতে গৃহ পূর্ণ করিয়া রাখিত। দ্বিতীয়, "পল্লবগোপ"; ইহারা "ভার" কাঁধে করিয়া ফসলাদি বিক্রয় করিত।

তেলিদিগের মধ্যে কেহ চাষের কায করিত, কেহ "ঘানি" সাহায্যে তৈল বাহির করিত। যাহারা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ছিল, তাহারা তৈল অগ্রে কিনিয়া পরে বিক্রয়াদি করিত।

দুই জাতির পাণের কারবার ছিল। (ক) বারুই,—ইহারা বরজ নির্ম্মাণ করিয়া পাণের চাষ করিত। (খ) তাম্বুলী,—ইহারা নগরে নগরে বাস করিত। ইহারা "বীড়া" নির্ম্মাণ করিয়া দেশের লোককে যোগাইত।

কুম্ভকাররা হাঁড়ি কুঁড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া মৃদঙ্গ, দগড়, কাড়া, পড়া প্রভৃতির "খোল" প্রস্তুত করিত।

তন্তুবায়গণ ভুনী,* ধুতি, থাদি ও গড়া প্রস্তুত করিত। আর সূক্ষ্ম শিল্পজাত দ্রব্যাদি "সরাক" জাতি বয়ন করিত। এই সরাকজাতি প্রাণিহিংসা পরিত্যাগ করিয়া, নিরামিষ আহার করিত। ইহারা প্রধানতঃ রেশমী বস্ত্রাদি বয়নে পারদর্শিতা দেখাইত।

মালীদিগের ব্যবসায় এখনকার সময় অপেক্ষা উন্নত ছিল। এখন ফুলের মালা ভিন্ন অন্য সূক্ষ্ম খেলানাদি প্রস্তুত হয় না; কিন্তু তখন, "মোড়", "ফুলঘর" ও অন্যান্য ফুলের খেলানা প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইত।

আগরী বা উগ্রক্ষত্রিয় জাতি আপনার বৃত্তি অবলম্বন করিত; কখনও অন্য বিষয়ে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে যাইত না।

এক্ষণকার মোদকরা দুই একজনমাত্র গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করে, কিন্তু সেকালে দেশে বহুল পরিমাণে চিনির কারখানা ছিল। প্রত্যেক মোদকই প্রায় চিনি তৈয়ারি করিত। এতদ্ভিন্ন সেকালে প্রচলিত খণ্ড-নাড়ু প্রভৃতি মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইত। মোদকরা খাদ্যদ্রব্য লইয়া নগরে নগরে ফিরি করিত।†

পাঁচ শ্রেণীর বণিকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (ক) শঙ্খবণিক। ইহারা শঙ্খ কাটিয়া শাঁখা, আংটি প্রভৃতি দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করিত। ইহাদের মধ্যে দরিদ্র প্রায় একেবারেই ছিল না। (খ) গন্ধবণিক। ইহারা ধূপ

---

* ভুনী—শাটী।

† "পসরা করিয়া শিরে, নগরে নগরে ফিরে,
শিশুগণ কররে যোগান॥"

ধুনা প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যাদি লইয়া হাটে বিক্রয় করিতে যাইত। ইহারা দরিদ্র ছিল। (গ) মণিবণিক। ইহারা মুণিমুক্তাদি বহুমূল্য প্রস্তরাদির ব্যবসায় করিত। ইহারা ধনী ছিল। (ঘ) কংসবণিক। এই বণিকরা "শলে" পাতিয়া ঝারী, খুরী, থাল, বাটী, খোরা, বাগুী, সীপ, সাপুড়ী চুণাতি, বাটা, ঘাঘর, ঘণ্টা, সিংহাসন, পঞ্চপ্রদীপাদি নির্ম্মাণ করিত। ইহারা অপেক্ষাকৃত ধনী ছিল। (ঙ) সুবর্ণবণিক। এই শ্রেণীর বণিকরা স্বর্ণরত্নাদির ব্যবসায় করিত। ইহারা—

"কিছু বেচে কিছু কেনে, মনুষ্যের ধন আনে,
পুরমধ্যে যাদের নিলয়॥"

এতদ্ভিন্ন স্বর্ণকাররা আভরণাদি প্রস্তুত করিত। "পশ্যতোহর"গণের একটি সুন্দর চিত্র কবিকঙ্কণ অঙ্কিত করিয়াছেন,—

"নিবসে পশ্যতোহর, পুরমধ্যে যার ঘর,
নির্ম্মাণ করয়ে আভরণে।
দেখিতে দেখিতে জন, হরয়ে সভার ধন,
হাত বদলিতে ভাল জানে॥"

উপরি-উক্ত ব্যবসায়ীরা নগরের একদিকে সকলে মিলিয়া বাস করিত। ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদির সহিত ইহাদের এক সঙ্গে এক স্থানে বাস ছিল না।

এতদ্ভিন্ন, কামার, নাপিত প্রভৃতি জাতিরা বণিগাদির সহিত একত্র বাস করিত।

ইতর জাতিদিগের মধ্যে দুই জাতি "দাস" ছিল। এক শ্রেণী মৎস্যের ব্যবসায় ও অন্য শ্রেণী চাষ করিত। কলু ও ভাটদিগকে কবিকঙ্কণ ইতর জাতির মধ্যে সান্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

বাইতি জাতি বিবাহপূজাদি উৎসবব্যাপারের সময় বরের জন্য "দোলা" যোগাইত।*

বাগ্দীরা সেকালে বেশ বলবান্ ছিল। জমিদারের লাঠীয়াল, পাইক প্রভৃতির কায এই বাগ্দী জাতিই করিত।

ডোমেরাও বলশালী ছিল। এই জাতির স্ত্রীপুরুষ সকলেই লাঠী, তীরধনু প্রভৃতিতে পারদর্শী ছিল। এই কায ভিন্ন ডোমরা প্রধানতঃ মজুরি করিয়া

* "বিবাহ-গমন বেলা, বাইতি যোগায় দোলা।"

জীবিকা উপার্জ্জন করিত। তাহারা বয়নী, চালুনী, ঝাটা, টোকা, ছাতা প্রভৃতির নির্ম্মাণ ও ব্যবসায় করিত।*

সিউলীরা আজ কাল কেবল গাছ কাটিয়া রসই বাহির করে; কিন্তু তৎকালে তাহারা খর্জ্জুরাদির রস বাহির করিয়া গুড় প্রস্তুত করিত।

ছুতার জাতি পূর্ব্বে কাঠের দ্রব্যাদি তৈয়ারী করা ভিন্ন চিড়া, খই প্রস্তুত করিত। প্রায় সকল ছুতারই চিড়া প্রভৃতির ব্যবসায় করিত।

কবিকঙ্কণ ভাটজাতিকে ইতরজাতির মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন এবং তাহাদের জীবিকার মধ্যে ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিত। এই ভাট ভাটব্রাহ্মণ কি না স্থির করা সুকঠিন। বহুদিন পূর্ব্বে গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় ইহাদিগকে ভ্রমণশীল গায়ক বা চারণ (Bard) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।†

চণ্ডাল বা চাঁড়ালজাতি নগরের মধ্যে উক্ত জাতিদিগের সহিত বাস করিত। ইহারা লবণ, পানীফল, কেসুর প্রভৃতি ক্রয়বিক্রয়াদি করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিত।

কতকগুলি নীচজাতির উল্লেখ কবিকঙ্কণে দেখিতে পাই; তাহারা নগরের বাহিরে বাস করিত। চূণারি, মাঝি, কোরাঙ্গা, ভরদ্বাজী, মাল, কোয়ালি, মারাটা এবং কোল এই নীচজাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। উক্ত জাতিদিগের ব্যবসায় বিস্তারিতভাবে কবিকঙ্কণ লিপিবদ্ধ করেন নাই; সুতরাং এখন তাহা জানিবার উপায় একেবারেই নাই বলিলে হয়। মারাটাদিগের কার্য্যের মধ্যে দেখিতে পাই—

"ফিরে তারা গুজরাটে, শোলঙ্গে পিলীহা কাটে,
ছানি কাটে দিয়া চক্ষে কাঁটা॥"

---

* "বয়ণী চালুনী ঝাটা, ডোম গড়ে টোকা ছাতা,
জীবিকার হেতু এক চিতে।"
"চেটা ঝাটা ঝুড়ি পেড়ি বেচা হবে সার।
লখে বলে জাতিবৃত্তি ভূষণ আমার॥"—ধর্ম্মমঙ্গল।

† "The bards settle there, and beg from house to house."
Calcutta Review, October, 1891,

কোয়ালিদিগকে "জায়জীবী" বলা হইয়াছে। এই "জায়জীবী"র অর্থ কি, তাহা এখন ঠিক নিরূপণ করা কঠিন।

এতদ্ভিন্ন হাড়ি ও চামাররাও নগরের বাহিরে বাস করিত। হাড়িরা ঘাস কাটিয়া বিক্রয় করিত। চামাররা মোজা, জুতা, জীন প্রভৃতি চর্ম্মের দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করিত। মাছুয়া, কোচ, ও দরজীরা নগরের ভিতরে বাস করিত।

মুসলমানদিগের জাতিবিচার প্রধানতঃ ব্যবসা হইতেই স্থির হইয়াছিল। যে যেরূপ ব্যবসা করিত, সে সেরূপই জাতির ভিতর পড়িত। নগরের পশ্চিমদিকে মুসলমানরা বাস করিত। যেদিকে মুসলমানদিগের বাস ছিল তাহার পশ্চিমপ্রান্ত "হাসনহাটী" নামে কথিত হইত। সেই স্থানে মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইত। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া, লোহিত পাটী বিছাইয়া তাহারা নমাজ পড়িত। দিনের মধ্যে যথাসময়ে পাঁচবার নমাজ পড়া তাহাদের কর্ত্তব্য ছিল। তাহারা "ছিলিমিলি মালা" লইয়া "পীর পগম্বরের" নাম জপিত। আর সকলেই পীরের "মোকামে" সন্ধ্যার সময় প্রদীপ দিত। পাড়ার মধ্যে কিছু বিচার করিতে হইলে তাহারা দশবিশজন মিলিয়া, সর্ব্বদা কোরাণের সাহায্যে বিচার করিত। আর কেহ কেহ সন্ধ্যার পর হাটে পীরের "শীরিনি" বাঁটিত, সঙ্গে সঙ্গে বাদ্য বাজিত এবং নিশান পোতা হইত। ইহারা বড়ই "দানিশবন্দ" ছিল। আপনারা যাহা ভাল বুঝিত, তাহা কখনও ত্যাগ করিত না। প্রাণ গেলেও তাহারা "রোজা" ত্যাগ করিত না। মুসলমানদিগের কথা একটু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—

তাহারা—

"না ছাড়ে আপন পথে, দশরেখা টুপি মাথে,
ইজার পরয়ে দঢ় করি।
যার দেখে খালি মাথা, তা সনে না কহে কথা,
সারিয়া, ঢেলার মারে বাড়ি॥

* * *

বসিলা অনেক মিয়া, আপন তরফ লৈয়া,
কেহ নিকা, কেহ করে বিয়া।
মোল্লা পড়ায়্যা নিকা, দান পায় সিকা সিকা,
দোয়া করে কলমা পড়িয়া॥

করে ধরি খর ছুরি কুকুড়া জবাই করি,
দশগণ্ডা দান পায় কড়ি।
বকরি জবাই যথা, মোল্লারে দেই মাথা,
দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি॥”

মুসলমানদিগের জাতিবিভাগের মধ্যে দেখিতে পাই,—যাহারা রোজা-নামাজ না করিত, তাহারা “গোলা” নামে কথিত হইত; যাহারা তাঁতির কায (তাসন) করিত, তাহারা জোলা হইত; যাহারা বলদে দ্রব্যাদি লইয়া যাতায়াত করিত, তাহারা হইল মুকেরি; যাহারা পিঠা বেচিত, তাহারা হইল পিঠারী; যাহারা মাছের ব্যবসায় করিত, তাহারা কাবারি; এই “কাবারি”রা নিরন্তর মিথ্যা কথা বলিত এবং দাড়ি রাখিত না। যে সকল হিন্দু মুসলমান হইত, তাহারা গয়সাল নামে পরিচিত ছিল; যাহারা সানা বাঁধিত, তাহারা সানাকর; যাহারা শর নির্ম্মাণ করিত, তাহারা তীরকর; যাহারা কাগজ কুটিত, তাহারা কাগজি; আর যাহারা সর্ব্বদা পথে পথে ঘুরিত তাহারা কলন্দর (ফকির) নামে পরিচিত হইত। কেহ কেহ, কাপড় রঙ্গ করিয়া রঙ্গরেজ নাম ধারণ করিত। গোমাংসের ব্যবসায় করায় কেহ কসাই এবং কাপড় কাটিয়া জামাদি তৈয়ার করায় কেহ দরজী বলিয়া পরিচিত হইত। আর, যাহারা নানাবর্ণের ফিতা (নেয়াল) বুনিত, তাহাদিগকে লোকে বেনটা বলিত। কবিকঙ্কণের কাব্যে মুসলমানদিগের উক্তরূপ জাতিবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

কবিকঙ্কণের সময়ে হিন্দুমুসলমানে বেশ মিশামিশি হইয়াছিল। আমাদের মনে হয়, ঐ সময়ে সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের পূজার প্রচার হইয়াছে। তখনকার কালে হিন্দুরা মুসলমানের অনেক আচার এবং মুসলমানরা হিন্দুর অনেক আচার গ্রহণ করিয়াছিল। হিন্দুরা সত্যপীরের শীরিনি দিত; মুসলমানরা ওলাইচণ্ডী, ষষ্ঠী প্রভৃতি হিন্দুর দেবদেবীর নিকট “মানত” করিত। বাঙ্গালার নানাস্থানে এখনও উক্তরূপ আচার দেখিতে পাওয়া যায়। হুগলী জিলার মুসলমানরা এখনও গোপাল, গোবিন্দ প্রভৃতি নাম রাখে। একজন মুসলমানকে গঙ্গার নিকট দুধ “মানত” করিতে দেখিয়াছি। নদীয়া জিলায়ও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

সেকালের সহিত একালের সমাজের তুলনা করিলে দেখিতে পাই,

তখনকার সকল জাতিরই ব্যবসায় বেশ প্রচলিত ছিল। সকলেই আপনাপন জাতিবৃত্তি করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিত। সেকালের সমাজে এত দারিদ্র্য ছিল না; সকলেই কিছু না কিছু সঞ্চয় করিতে পারিত। এখনকার দিনে বিদেশী পণ্যে দেশীয় পণ্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে। তখনকার দিনে দেশে যে পরিমাণে পণ্য জন্মিত, অর্থও সেই পরিমাণে দেশে সঞ্চিত হইত। মোটের উপর দেশের সকল লোকই অল্পাধিক পরিমাণে ধনী ছিল। তখন এত দুঃখের হাহাকার, দুর্ভিক্ষের এরূপ ভয়াবহ নিষ্পেষণ, দারিদ্র্যের এরূপ সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা নিরন্তর দেশবাসীকে জীবন্মৃত করিয়া রাখে নাই। তখন বাঙ্গালীর অন্তরে সুখ ছিল, শান্তি ছিল। এক একটি তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে লোকের আয়ু এত কমিয়া যাইত না, পরন্তু আমোদ-উৎসবে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া বাঙ্গালীকে সুখ-শান্তিতে নিমগ্ন রাখিয়াছিল।

শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

সংশয়।

এই রঙ্গমঞ্চে আসি' দু'দিনের তরে
চলিতেছি কত অঙ্ক করি' অভিনয়,
শৈশব-যৌবন-লীলা করি' সমাপন
বার্দ্ধক্যের অভিনয়ে উপজে সংশয়—
খেলা সাঙ্গ হ'বে যবে—অন্ধ যবনিকা
এই রঙ্গমঞ্চ'পরে পড়িবে যখন,
চারিদিকে ঘনাইয়া আসিবে আঁধার!
কোথায় আবাস, কোথা করিব গমন?

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

মৃন্ময়।

—:০:—

কোন প্রবীণ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, "পুরাতন স্থান ও পুরাতন কথা অতীত স্মৃতির উদ্বোধন করিয়া থাকে। সেই জন্য এমন কি, যখন কোন ভগ্ন স্তূপ বা ধ্বংসপ্রায় স্থান আমাদের নয়ন সমক্ষে পতিত হয়, অথবা কোন অসংলগ্ন প্রাচীন উপকথায় আমরা কিছুক্ষণের জন্য মনোনিবেশ করি, তখন আমরা যেন তাহাদেরও মধ্যে অতীতের মনোমুগ্ধকর ছবি দেখিতে পাই। সে ছবি অস্পষ্ট হইলেও মধুরতাময়।" তাই আজ আমি মহাপ্রাণ সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুরে আসিয়া সীতারামের দক্ষিণহস্তস্বরূপ বীরবর মৃণ্ময় বা মেনাহাতীর সমাধিস্থলে বসিয়া, কল্পনা-নেত্রে সেই বহু বৎসরের পুরাতন দৃশ্য দেখিতেছি এবং হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতেছি। মানস নয়নে দেখিতেছি, সীতারামের আদেশে বীর মৃন্ময় অত্যাচারী, পরপীড়ক গর্ব্বোদ্ধত আবু তোরাবের মস্তকছেদন করিয়া তাঁহার প্রভুর পদতলে উপহার দিতেছেন; দেখিতেছি, দোলমঞ্চে বসিয়া ভক্ত মৃন্ময় সন্ধ্যাহ্নিকদ্বারা স্বীয় পারত্রিক মঙ্গলের বিধান করিতেছেন। দেখিতেছি, জনপ্রিয় মৃন্ময় সীতারামকে পুষ্করিণী খননে প্ররোচিত করিয়া প্রজাবৃন্দের জলকষ্ট নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন; আর দেখিতেছি, "ইচ্ছামৃত্যু" ভীষ্মের ন্যায় আমাদের মৃন্ময়, বিশ্বাসঘাতকগণের হস্তে পড়িয়া নিজ মৃত্যুবাণের সন্ধান দিতেছেন। কল্পনানয়নে দেখিতেছি, অতীতের মনোহর মনোমুগ্ধকর ছবি; আর সম্মুখে দেখিতেছি, কালের ভীষণ অত্যাচার।

বঙ্কিমের মৃন্ময় বাস্তবিক কি নামে অভিহিত হইতেন, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। মেনাহাতী, মেলাহাতী, রামরূপ, রূপরাম ও রঘুরাম ইহার প্রকৃত কোন্ নামে তিনি পরিচিত ছিলেন, তাহার স্থির করা যায় না। নামের বিভিন্নতা থাকিলেও মৃন্ময় যে প্রকৃত বীর ছিলেন, তিনি যে অসমসাহসিক ছিলেন, এবং তাঁহার বিরাট বপু যে অমানুষিক ছিল সে সম্বন্ধে কোন মতভেদই দেখা যায় না। কিন্তু অধুনা আমরা আর বড় কেহ মৃন্ময়ের কথা মনে করি না। স্মৃতি জাগাইবার জন্যই আজ আমরা মৃন্ময়ের ইতিহাস পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

কিন্তু মৃন্ময়ের বিশেষ কোন ইতিহাস নাই। অন্যান্য কাহিনীর ন্যায় এ কাহিনীও তিমিরে আচ্ছন্ন। সৌভাগ্যবশতঃ একজন ইংরাজ নিজগ্রন্থে এই বীরের কিছু কিছু কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাই আমরা ইঁহার বিষয় কথঞ্চিৎ অবগত আছি। প্রথমতঃ ইংরাজ-লিখিত কথাই পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

"সীতারাম যখন লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা প্রাপ্ত হইলেন, তখন আপামর-সাধারণ তাঁহাকে দেবানুগৃহীত বলিয়া মনে করিতে লাগিল এবং দলে দলে লোক তাঁহার অনুগামী হইতে লাগিল। ইহার মধ্যে মেনাহাতীই সর্ব্বপ্রধান। মেনাহাতী দানবাকৃতি ও যুদ্ধা ছিলেন। হস্তীর ন্যায় বলশালী বলিয়া তাঁহাকে লোকে মেনাহাতী বলিত।

"মেনাহাতীর সাহায্যেই সীতারাম ধীরে ধীরে রাজ্যবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। নবাবী সৈন্য সীতারামকে পরাজয়ে অশক্ত হইলে নবাব নিজ জামতা আবু তোরাবের অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু বীর মেনাহাতীর ভীষণ পরাক্রমে মোগল সৈন্য বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল এবং মেনাহাতী স্বহস্তে আবু তোরাবের শিরশ্ছেদ করিয়া সীতারামকে উপহার দিলেন।

"নবাব ইহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া সুবিখ্যাত সেনাপতি সংগ্রাম সাহের অধীনে একদল সুশিক্ষিত সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সংগ্রাম সাহ ভূষণায় আসিয়া ছাওনি স্থাপন করিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী সেনাপতিগণের দৃষ্টান্তে সাবধান হইয়া সংগ্রাম সাহ প্রথমতঃ মেনাহাতীকে ধৃত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মেনাহাতী যখন প্রাতঃকৃত্য সমাপনার্থ দোল মন্দিরের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তখন সংগ্রাম সাহ তাঁহাকে বন্দী করিলেন। অথবা, গুপ্তার মুখে সংবাদ পাইয়া তিনি রাত্রিতে নদী পার হইয়া সিংহদ্বারের নিকট যে স্থানে মেনাহাতী শয়ন করিয়া থাকিতেন, সেই স্থানে সুষুপ্ত বীরকে বন্দীভূত করিলেন।

"নিরস্ত্র মেনাহাতী এই প্রকারে সপ্তদিবস শত্রুহস্তে বন্দী রহিলেন। এই সপ্তাহকাল তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে অনবরত অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু মেনাহাতীর নিকট এক অদ্ভুত ঔষধ থাকিত। এই ঔষধ তাঁহার দক্ষিণ স্কন্ধের চর্ম্মের নিম্নে থাকিত এবং এই ঔষধের গুণে তিনি অস্ত্রাঘাতের দারুণ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি না পাইলেও তাঁহার শরীরে অস্ত্রচিহ্ন হইত না। অবশেষে এই প্রকার ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তিনি শত্রুর নিকট ঔষধের কথা বিবৃত করিলেন; বলিলেন, রাম-সাগরের নিকট লইয়া এই ঔষধ তাঁহার

শরীর হইতে বিচ্যুত করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিলেই ঔষধের গুণ দূর হইবে। তাই তাঁহাকে রাম-সাগর-তীরে লইয়া ঔষধ সেই সরোবরে নিক্ষেপ করিলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

"প্রবাদ এই যে, তাঁহার মস্তক মুর্শিদাবাদে নবাবের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল; এবং নবাব তাঁহার বৃহৎ মস্তক দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'এ প্রকার ব্যক্তিকে আমার নিকটে জীবিত আনাই তোমাদের কর্ত্তব্য ছিল; ইহাকে হত্যা করা সমীচীন হয় নাই।' নবাব ঐ মস্তক মহম্মদপুরে প্রত্যর্পণের আদেশ দেওয়াতে উহা মহম্মদপুরে প্রেরিত হয়। তথায় ঐ মস্তক ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া উহার উপর এক সমাধিগৃহ নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমান বাজারের সন্নিকটেই উত্তরপূর্ব্ব কোণে এখনও মেনাহাতীর সমাধিসৌধের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।"

ওয়েষ্টল্যাণ্ডকৃত যশোহরের ইতিহাস হইতে আমরা এই বিবরণ সংগ্রহ করিলাম। অবশ্য তিনি উহা জনশ্রুতি বা কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়াই রচনা করিয়াছেন। উহা প্রকৃত কি অপ্রকৃত তাহাও জানিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু তিনি যে ঐ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া নিজ গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। ইহা বাঙ্গালীর সৌভাগ্য বলিতে হইবে। কারণ, তাহা না হইলে যে যে সামান্য বৃত্তান্তে আমরা মৃন্ময়ের সন্ধান পাই, তাহা ও হয়ত বিস্মৃতির প্রগাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া পড়িত।

মৃন্ময় যে মহাবীর ছিলেন ইহা সকলেই স্বীকার করেন। মৃন্ময়ের যে বিশাল দেহ ছিল তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মত। শুনা যায়, তাঁহার পদের নলা ৩৬ ইঞ্চ ছিল। সে হিসাবে মেনাহাতী পূরা ৭ হাত ছিলেন। কিন্তু মেনাহাতী হিন্দু কি মুসলমান সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে এবং সে মতভেদ যে চিরকাল থাকিবে, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই।

মেনাহাতীকে যাঁহারা মুসলমান বলিয়া ধার্য্য করেন, তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই যে, মেনাহাতীকে যখন সমাধিস্থ করা হইয়াছে, তখন তিনি কিছুতেই এবং কোন প্রকারেই হিন্দু হইতে পারেন না এতদুত্তরে যাহারা মেনাহাতীকে হিন্দু বলিতে চাহেন। তাঁহারা বলেন যে, উহা কবর নহে; পরন্তু সুযোগ্য সেনাপতির কীর্ত্তিচিরস্মরনীয় করিবার জন্যই সীতারাম ঐ সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মিত করাইয়া দিয়াছিলেন। আর একটি কথা। মেনাহাতী প্রত্যহ দোলমঞ্চের নিকট বসিয়া আহ্নিকাদি বা সন্ধ্যা বন্দনা করিতেন। মুসলমান মেনাহাতীর



দোলমঞ্চ—মহম্মদপুর।

কদাচ দোলমঞ্চের পার্শ্বে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিবার আবশ্যকতা ছিল না; সুতরাং মেনাহাতী হিন্দুই ছিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এ সম্বন্ধে স্থির নির্ণয় দুরূহ ব্যাপার। সীতারাম যেরূপ অভেদ ভাবে হিন্দুমুসলমানকে স্নেহ করিতেন, হিন্দুমুসলমান মিলিত হইয়া যেরূপ ভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাতে মুসলমান সৈনিক যে তাঁহার নিকট আদর পাইবেন তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই; এবং তাঁহার প্রিয়পাত্র মুসলমান সৈনিকের মৃত্যু হইলে যে তিনি কবর ও সেই স্থলে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ স্মারক মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন, তাহাতেও কিছু সন্দেহের কারণ নাই। বিশেষতঃ যে স্থানে মেনাহাতীকে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল, সে স্থান দেখিলে এক্ষণে সমাধিস্তম্ভ কি মসজিদ তাহাও বুঝিবার কোনই উপায় নাই। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে একটি কথা মনে হয়। মেনা-হাতী যখন প্রত্যহ দোলমঞ্চের নিকট যাইতেন, তখন সম্ভবতঃ তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। আমি দেখিয়াছি, কোন কোন বৈষ্ণবের মৃত্যুর পর শব দাহ করা হয় না; "গোর" দেওয়া হয় এবং ঐ সমাধি স্থানে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় অন্নব্যঞ্জনাদি প্রদান করা হয়। মেনাহাতী বৈষ্ণব ছিলেন, ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাঁহাকে এরূপ সমাধিস্থ করা অসম্ভব নহে।

যাঁহারা মেনাহাতীকে হিন্দু বলিতে চাহেন তাঁহারা বলেন যে, মেনাহাতী যশোহরের অন্তর্গত রায়গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ ঘোষবংশীয়। ঘোষমহাশয়দিগের বংশ-তালিকায় মেনাহাতী বা রূপরাম নাম পাওয়া যায় না। রঘুরাম নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। বংশ-তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

এই রঘুরামই যে মেনাহাতী ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই বংশেরই একজন যুবক বহু চেষ্টা করিয়াও আমাকে এ সম্বন্ধে প্রমাণ দিতে পারেন নাই। তবে বংশপরম্পরাক্রমে রঘুরামই মেনাহাতী এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত।

আমরা রঘুরামের সমসাময়িক যে রামশঙ্করের নাম বংশ-তালিকায় দিয়াছি, এই রামশঙ্করকৃত জোড়-বাঙ্গালা ও শিবমন্দির এখনও রায়গ্রামে দৃষ্ট হয়। শিবমন্দিরগাত্রে নিম্ন লিখিত শ্লোক ক্ষোদিত আছে—

"ষষ্ঠ বেদাঙ্গ চন্দ্রে মেষকে শ্রীশঙ্করালয়ঃ।
অকারি শঙ্করাখ্যেন ঘোষেনাপি সুভক্তিতঃ॥
সন ১১৩১"

সন ১১৩১ সাল—ইংরাজী ১৭০৪ এবং শক ১৬৪৬ হয়। এক চন্দ্র, চতুর্ব্বেদ প্রভৃতি হইতে ১৬৪৬ পাওয়া যায় এবং বাঙ্গালা সন ১১৩১ও ঐ.শকাব্দ হয়। এদিকে সীতারামের দশভূজালয়েও যে লিপি ছিল উহাতে ১৬২১ শকের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৬২১ শক হইলে ইংরাজী ১৬৯৯ ও বাঙ্গালা ১১০৬ আন্দাজ হয়। অর্থাৎ তাহা হইলে সীতারামের মন্দিরাদি নির্ম্মাণের পঁচিশ বৎসরমধ্যে রায়গ্রামের শিবমন্দির ও জোড়-বাঙ্গলা নির্ম্মিত হয়। রায়গ্রামে ঘোষবংশের রঘুরাম নিঃসন্তান। প্রবাদ এই যে, তিনি অবিবাহিত ছিলেন। রায়গ্রামস্থ মন্দির ও জোড়-বাঙ্গালা সীতারামের মন্দিরানুসারেই নির্ম্মিত; তবে আকারে ক্ষুদ্র। যদি রঘুরামই আমাদের মেনাহাতী হয়েন, তবে নিঃসন্তান রঘুরাম নিজ জ্ঞাতি রামশঙ্করের দ্বারা জন্মভূমিতে যে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

রায়গ্রামের জোড়-বাঙ্গালায় কোন স্মারক লিপি পাওয়া যায় না। জোড়-বাঙ্গালার গাত্রস্থ চিত্রগুলি অনেকাংশে মহম্মদপুরের গৃহাদির চিত্রের ন্যায়। আর একটি কথা; মেনাহাতী বৈষ্ণব ছিলেন এরূপ প্রকাশ আছে। রায়গ্রামে "রঘুরামের" জন্মভূমিতে নির্ম্মিত শিব-মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইলেও প্রতিষ্ঠাতা যে কৃষ্ণ-ভক্তও ছিলেন তাহার একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। জোড়-বাঙ্গালায় কৃষ্ণপ্রস্তরের শ্যামরায় ও শালগ্রাম শিলা আছেন; জোড়-বাঙ্গালায় পিত্তলের দশভূজা মূর্ত্তিও পূজিতা হইয়া থাকেন। এই স্থানে আর একটি কথা মনোমধ্যে উদিত হয়। মহম্মদপুরেও শ্যামরায় ও দশভূজা আছেন। তবে মহম্মদপুরের দশভূজা অষ্টধাতুনির্ম্মিত। কিন্তু সীতারামের দক্ষিণ-হস্ত-স্বরূপ মেনাহাতী যে তাঁহার প্রভুর আদর্শের অনুকরণ করিয়া একাধারে শিব, দুর্গা ও নারায়ণ ভক্ত হইবেন তাহাতে বিশেষ বিচিত্রতা দেখা যায় না। তাঁহার পক্ষে তদনুসারে স্বগৃহে ঐ সকল দেবতা প্রতিষ্ঠাও সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ, এই সকল বিষয়ই অনিশ্চয়তার অন্ধকারাবৃত। ওয়েষ্টল্যাণ্ড গুরুতর রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, বিদেশী হইয়াও আমাদের জন্য যে ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, উহার শতাংশের একাংশও যদি আমরা সময় মত স্বীকার করিতাম, তাহা হইলে আজ আমাদের এ দুর্দ্দশা হইত না। তাহা হইলে এই সকল মহাপুরুষের কীর্ত্তি-কাহিনীর জন্য আজ আমাদিগকে হা হুতাশ করিতে হইত না।

মৃন্ময় বা মেনাহাতীর মৃত্যু-সম্বন্ধে অন্য একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। মেনাহাতী প্রত্যহ যেরূপ দোলমঞ্চের নিকট সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিতেন, একদিন তদ্রূপ

করিতে যাইয়া দেখেন, একটি রুগ্ন ব্যক্তি ঐ দোলমঞ্চের নিকট শায়িত রহিয়াছে। মেনাহাতীকে দেখিয়া সে ভিক্ষাপ্রার্থী হইল। মেনাহাতী ভিক্ষা প্রদানে উদ্যত হইলে, অকস্মাৎ ঐ ব্যক্তি দীর্ঘ ছুরিকা মেনাহাতীর উদরে আমূল বসাইয়া দেয়। এই অবস্থায় যন্ত্রণাভোগে অশক্ত হইয়া, মেনাহাতী নিজ "মৃত্যুবাণের" কথা বলিয়া দিলে, তাঁহার শরীর হইতে ঔষধ বাহির করিয়া ফেলা হয় এবং তিনি শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

দোলমঞ্চের প্রতিকৃতি আমরা এই প্রবন্ধের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলাম। এ দোলমঞ্চ পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইবার জন্য এখনও একপ্রকার অটুট রহিয়াছে। দোলের সময় এখনও এই দোলমঞ্চ ব্যবহৃত হয়। ইহার সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র মাঠে এখনও মেলা হয়। সীতারাম-উৎসবের উদ্যোক্তৃবর্গ এই মাঠেই উৎসব করিয়াছিলেন।

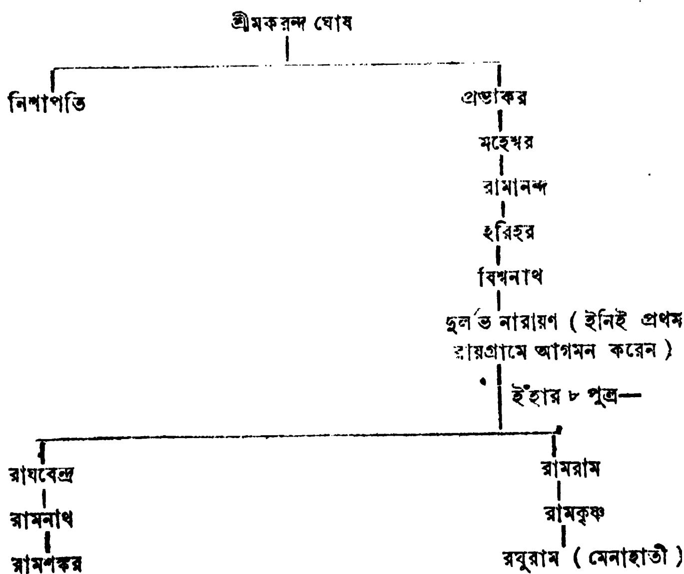
প্রবন্ধের সহিত আমরা সীতারামের মহম্মদপুরের দুইখানি ইষ্টকের প্রতিকৃতি দিলাম। একখানিতে পাঠক তৎকালীন স্ত্রীলোকের বসন-ভূষণের আভাস পাইবেন। অন্যটি একটি বীরের মূর্ত্তি—ভগ্ন। পৃষ্ঠ দেশের তূণীর হইতে বীর তীর লইবার চেষ্টা করিতেছেন। জানি না এ কোন বীরের প্রতিকৃতি। মুখভঙ্গি দেখিয়া, বীরত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয় যে, এককালে এই বীর শত্রু-দমন করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। অর্দ্ধমাইল ব্যাপিয়া যে সরোবর আজিও মেনাহাতীর তীর নিক্ষেপের ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে, যে সরোবর তীরে দাঁড়াইলে সেই বীরের অদ্ভুত তীর-নিক্ষেপের ক্ষমতা ও সঙ্গে সঙ্গে বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, এ কি সেই বীর? পথপ্রদর্শক তাহাই বলিলেন বটে, কিন্তু সত্য মিথ্যা জানিবার উপায় নাই। সত্যই কি যিনি একদিন বীরদর্পে, মুসলমান সৈনিকের ভীতির কারণ ছিলেন, যাঁহার বীরত্বেই সীতারাম যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, নদীয়া ও পাবনায় রাজ্য-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং যাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সীতারামেরও পতন ও মৃত্যু হইয়াছিল, ইহা কি সেই বীরের প্রকৃতি? আশ্চর্য্যই বা কি?

"যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রয়াতি,
যচ্চেতসা ন গণিতং তদিহাভ্যুপৈতি।
প্রাতর্ভবামি বসুধাধিপ চক্রবর্ত্তী,
সোঽহং ব্রজামি বিপিনে জটিলস্তপস্বী॥"

যদি সেই রঘুকুলপতি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রেরই অদৃষ্টে এইরূপ ঘটিতে পারে,

তবে কালের কুটিল চক্রে ক্ষুদ্র মানব মেনাহাতীর প্রতিকৃতির এই দশাপ্রাপ্তিতে বিস্ময়ের কারণ কোথায় ?

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।



রায়গ্রামের বৃত্তান্ত সোদরপ্রতিম শ্রীমান্ শচীন্দ্রভূষণ ঘোষ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট ঋণী।

১ মহম্মদপুরের ইষ্টক। ২



সমুদ্র-বক্ষে

—*—

(গী দে মোপাঁসা)

—:০:—

মধ্যাহ্ন-রৌদ্রের খরতাপে অবসন্ন হইয়া আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সমুদ্রের বিমল বিরাম উপভোগ করিতেছি, এমন সময়ে বার্ণার্ড মৃদুস্বরে বলিল, "সম্মুখের ঐ দ্বিমাস্তল জাহাজখানির পাইলে বেশ হাওয়া পাইয়াছে।"

সত্য বটে অ্যাগের সম্মুখভাগে সাগরের অপর পার্শ্ব হইতে একখানি দ্বিমাস্তল জাহাজ আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। আমি দূরবীক্ষণ যোগে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে, বাতাসে ফুলিয়া সেই জাহাজখানির ভরা পাইল গোলাকৃতি ধারণ করিয়াছে।

রেমণ্ড অবজ্ঞাভাবে বলিল, "ইস্, ও ত অ্যাগের দিকের বাতাস। রু অন্তরীপের কাছে একেবারেই বাতাস নাই।"

বার্ণার্ড উত্তর দিল, "যাহা খুসী বল; দেখিও পশ্চিমে বাতাস বহিবে।"

আমি দেহ অবনত করিয়া পোতকক্ষস্থিত বায়ুমানযন্ত্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম; দেখিলাম, পারদস্তম্ভ অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যেই অনেকটা নামিয়া গিয়াছে। বার্ণার্ড শুনিয়া আমার কাণে কাণে বলিল, "মহাশয়! পশ্চিমে বাতাসের মতই বোধ হইতেছে।"

এখন আমারও কৌতূহল জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ সমুদ্র-বক্ষে যাহারা বিচরণ করে, তাহারা সকলেই এইরূপ কৌতূহলগ্রস্ত। এই কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা সকল বিষয়ই লক্ষ্য করে—সকল বিষয়ই মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করে, সামান্য সূক্ষ্মাংশেও তাহাদের ঔৎসুক্য উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। চক্ষু হইতে দূরবীক্ষণ যন্ত্র আর অপসৃত করিতে পারিতেছি না। আমি অভিনিবেশপূর্ব্বক দিগন্তবিস্তারী জলরাশির বর্ণ নিরীক্ষণ করিতেছি। বারিরাশি পূর্ব্বেরই মত উজ্জ্বল, মসৃণ ও বীচিবিক্ষোভশূন্য। যদি বাতাস আইসে তবে তাহা এখনও বহু দূরে রহিয়াছে।

নাবিকদিগের উপর বায়ুদেবতার কি আশ্চর্য্য প্রভাব! তাহারা বায়ুকে মনুষ্যধর্ম্মার্পণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না। বায়ু তাহাদের নিকট অধৃষ্য-

শ্চাভিগম্যশ্চ—সর্ব্বশক্তিমান সম্রাটের ন্যায় কখনও বা ভীতিপ্রদ কখনও বা দয়াপরবশ। আমরা পবনদেবকে যেরূপ ভালবাসি সেইরূপ ভয়ও করিয়া থাকি; কারণ, আমরা তাঁহার ক্রোধ ও বিবেষ-বুদ্ধির কথা সম্যক অবগত আছি। অম্বুধিগর্ভে ও আকাশপটে যে সকল প্রাকৃতিক-চিহ্ন প্রকটিত হইয়া উঠে, তাহাই আমাদিগকে সতর্ক হইতে শিক্ষা দেয়। বায়ুর সহিত আমাদের যে অহরহঃ বিরোধ চলিতেছে তাহা আমরা এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারি না। আমরা সর্ব্বদাই যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকি। এই নিমিত্ত আমাদের ইন্দ্রিয়-শক্তি সর্ব্বক্ষণ প্রখররূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আমরা চক্ষুদ্বারা অদৃশ্যপ্রায় প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের পর্য্যবেক্ষণ, গাত্রত্বকের সাহায্যে সমীরণের মধুর স্পর্শ বা ঝটিকার ভীষণ সংঘাতের অনুভূতি এবং আমাদের অন্তরাত্মার সহযোগে এই অব্যবস্থিতচিত্ত দেবতাটির চিত্তবৃত্তি নিরূপণের জন্য সচেষ্ট।

সমুদ্রের উপর বায়ুর একাধিপত্য। এই অপ্রতিহত প্রভাবের কখনও ব্যতিক্রম হয় না। আমরা স্বীয় কার্য্যসাধনে বায়বশক্তির প্রয়োগ করিতে শিখিয়াছি; এমন কি বায়বিক বিপ্লবে আমরা কৌশলে আত্মরক্ষা বা পলায়ন করিয়া অব্যাহতি লাভ করিতে পারি। কিন্তু বায়ুকে আমরা কখনও সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীনে আনিতে সমর্থ হই না। স্ত্রী বা শক্রবশীকরণ অপেক্ষা ইহা সহস্রগুণ আয়াসসাধ্য ও সমধিক ভবিষ্যদৃষ্টির পরিচায়ক। উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেণীবিশেষ ঐশীশক্তিকে যেরূপ ভীষণ ও ক্রোধান্ধ বলিয়া ধারণা করে, নাবিক-গণের মধ্যেও বায়ু সম্বন্ধে সেইরূপ অলৌকিক ধর্ম্মমিশ্রিত ভয় ও ভক্তি বিরাজমান।

বর্ণার্ড বলিল, "ওই দেখুন, বাতাস আসিতেছে"। দূরে—বহু দূরে দিগন্তের শেষসীমায় জলরাশির উপরিভাগে অনতিদীর্ঘ একটি নীলকৃষ্ণরেখা ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। সহসা দেখিলে তাহাকে অদৃশ্যপ্রায় ছায়া বলিয়া ভ্রম জন্মে। ইহাই সেই চিরঈপ্সিত বায়ুস্রোত। ইহারই প্রত্যাশায় আমরা এই প্রখর সৌরকরতাপে নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতেছিলাম। ঘটিকায় আটটা মাত্র বাজিয়াছে দেখিয়া আমি বলিলাম, "কি আশ্চর্য্য। পূর্ব্বাহ্নেই পশ্চিমে বাতাসের আবির্ভাব!" উত্তরে বার্ণার্ড আমাকে জানাইল যে, বৈকালে বায়ুর বেগ বিশেষ বর্দ্ধিত হইবে। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, জাহাজের বাতবস্ত্র শ্লথ ও অসম্বদ্ধভাবে দোদুল্যমান। পাইলসংলগ্ন বৃহদাতনয় দারুনির্ম্মিত ত্রিভুজটি গগনমার্গ স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছিল। আকাশ মেঘমুক্ত

দেখিয়া আমরা সম্মুখবর্ত্তী গুণবৃক্ষে জাহাজের সর্ব্বোচ্চ পাইলটি তুলিয়া দিয়াছিলাম। সেই পাইল-দণ্ডটি মাস্তলের সর্ব্বোচ্চাংশ অতিক্রম করিয়াও প্রায় চারি হাত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল।

চারিদিক স্থির নিস্তব্ধ—যেন আমরা কঠিন ভূপৃষ্ঠোপরি অবস্থিত। বায়ুমান যন্ত্রের পারদরেখা এখনও নিম্নগামী। দূরদৃষ্ট সেই শ্যামলবর্ণ রেখাটি ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে। সমুদ্রজলের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য অকস্মাৎ নিষ্প্রভ হইয়া অরসকান্তিতে পরিণত হইল। আকাশ এখনও নির্ম্মল ও নিরভ্র।

মসৃণ সমুদ্রগাত্রে সহসা রোমাঞ্চ-সঞ্চারের ন্যায় বারিরাশি সহসা হিল্লোলিত হইয়া উঠিল; যেন অসংখ্য বালুকাকণাবর্ষণে মহাসিন্ধু বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। অদৃশ্যপ্রায় তরঙ্গমালার ত্বরিতাপসরণে মনে হইতে লাগিল, কে যেন সেগুলিকে সহসা মুছিয়া ফেলিয়াছে।

বায়ুবেগে বাতবস্ত্রখানি কাঁপিয়া উঠিল এবং অল্পক্ষণপরে প্রধান পাইলের প্রসারক দণ্ডটি জাহাজের দক্ষিণপার্শ্বে হেলিয়া পড়িল। আমি মুখমণ্ডলে সমীরণের মৃদু স্পর্শ অনুভব করিলাম। ক্রমেই চারিদিকে তরঙ্গ-হিল্লোল বিস্তৃত হইতে লাগিল; যেন বালুকাবর্ষণ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছে। এখন আমরা অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলাম। তরণীখানি ঋজুগতিতে চলিতেছিল। আমরা পোতপার্শ্বে মৃদুজলোচ্ছ্বাসশব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম। আমার হস্তস্থিত কর্ণদণ্ড ক্রমেই দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল এবং কর্ণসংলগ্ন সুদীর্ঘ ক্রুশাকৃতি পিত্তলদণ্ডটি সূর্য্যালোকে অগ্নিময় বৃন্তের ন্যায় বোধ হইতেছিল।

দেখিতেছি, আমাদিগকে পোতের দিক্-পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? তরণীখানি যেন বায়ুর সহিত সন্নদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। যদি বাতাসের বেগ মন্দীভূত না হয় তাহা হইলে আমরা সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই সেণ্ট র‍্যাফেলে পৌঁছিতে সমর্থ হইব।

আমরা ক্রমে নৌবহরের সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিলাম; দেখিলাম, নঙ্গরবদ্ধ ছয়খানি লৌহমণ্ডিত রণপোত এবং দুইখানি সংবাদবাহী তরণী মৃদুগতিতে দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া পশ্চিমাভিমুখী হইল। উপসাগরের মধ্যভাগে অবস্থিত চূড়াচিহ্নিত 'ফরমিসনাস্' পাহাড় অতিক্রমকরণাভিপ্রায়ে আমরা নির্ম্মুক্ত সমুদ্রবক্ষে জাহাজের গতি-নির্দ্দেশ করিলাম। বায়ুস্রোত তীব্রবেগে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং তরঙ্গস্ফীত সমুদ্রবক্ষ ক্ষুদ্রকায় ক্ষণাবভগ্ন তরঙ্গমালায় সমাবৃত হইল।

পূর্ণপাইলভরে অবনতমুখী তরণীখানি তীরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং

তৎপশ্চাতে ফেনরাশি বিদীর্ণ করিয়া সেই রজ্জুসন্নদ্ধ ডিঙ্গিখানি ধাবমান। ডিঙ্গির গলুই শূন্যমার্গে এবং পশ্চাদ্‌ভাগ সমুদ্রাভ্যন্তরে। বন্ধনরজ্জু আকর্ষণবেগে প্রসারিত। সেণ্ট হনরাটসন্নিধ্যে উপনীত হইলে আমরা রক্তবর্ণ তীক্ষ্ণ প্রস্তর-খণ্ডসমাচ্ছাদিত একটি পাহাড় অতিক্রম করিলাম। শল্লকীর ন্যায় কণ্টকিত তীক্ষ্ণদন্তনখরযুক্ত এই বন্ধুর শৈলটি প্রথম দৃষ্টিতে আরোহণসাধ্য বলিয়া মনে হয়। আরোহণকামী ব্যক্তিকে দুইটি উদ্গত শিলাখণ্ডের মধ্যদেশে পদ প্রবিষ্ট করাইয়া সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে হয়। এই দ্বীপের নাম সেণ্ট টরিয়ল। কি জানি কি প্রকারে পাহাড়ের ফাটলে ও গর্ত্তে কিয়ৎ পরিমাণ মৃত্তিকা সঞ্চিত হইয়াছে। এই অনুর্ব্বর দুরধিগম্য স্থানেও কুমুদ ও মনোহর নীল আইরিস পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া কুসুমসুষমায় চারিদিক সুশোভিত করে। বুঝি বা সেগুলি স্বর্গভ্রষ্ট বীজ হইতে উৎপন্ন।

বিমুক্তসাগরমধ্যবর্ত্তী এই অপূর্ব্ব শৈলদ্বীপে বাদকশ্রেষ্ঠ প্যাগানিনির মৃতদেহ পাঁচ বৎসরকাল জনসমাজের অজ্ঞাতসারে প্রোথিত ছিল। এই অভূতপূর্ব্ব পরিণাম এরূপ অদ্ভুত-চরিত্র প্রথিতযশা ললিতকলাবিশারদের উপযোগী বলিয়াই মনে হয়। প্যাগানিনির চরিত্রগত বৈষম্য একাধারে অমায়িক ও অমানুষিক ব্যবহার তাঁহার ভূতগ্রস্ততা প্রবাদের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার বিসদৃশ আকৃতি, অপরূপ মুখাবয়ব, অলোকসামান্য প্রতিভা এবং অত্যধিক কৃশতা এই সকল কারণপরম্পরায় তাঁহার অস্তিত্ব উপকথাবর্ণিত অলীক চরিত্রে বা হফ্‌ম্যানের অঙ্কিত অপচ্ছায়ামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। পুত্রসমভিব্যাহারে তাঁহার বাসভূমি জেনোয়া নগরীতে প্রত্যাগমনকালে তিনি নাইস নগরে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ২৭শে মে তারিখে বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। ইদানীং তাঁহার কণ্ঠস্বর এত ক্ষীণ হইয়াছিল যে, তাঁহার কথা তাঁহার পুত্রব্যতীত আর কাহারও কর্ণগোচর হইত না। পুত্র পিতার শবদেহ একটি অর্ণবপোতে স্থাপন করিয়া ইটালি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু জেনোয়ার যাজক সম্প্রদায় ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে কোনক্রমেই স্বীকৃত হইলেন না। এ সম্বন্ধে রোম-দরবারে আবেদন করা হইয়াছিল; কিন্তু কেহই অনুমতি প্রদানে সাহসী হয়েন নাই। এই সকল বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও শবাধার তীরে লইয়া যাওয়ার আয়োজন করা হইতেছে, এমন সময় জেনোয়ার মিউনিসিপ্যালিটী অকস্মাৎ এক নূতন আপত্তি উত্থাপিত করিলেন। তৎকালে জেনোয়া নগরীতে ভয়ানক ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল এবং মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃ-

পল্লীয়গণ ছলপূর্ব্বক এই হেতুবাদের আশ্রয়গ্রহণ করিলেন যে, বৈদেশিক ওলাউঠা-বিষদুষ্ট শবদেহ তথায় আনয়ন করিলে এই ভীষণ সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতে পারে।

প্যাগানিনির পুত্র বিফলমনোরথ হইয়া মার্শেলসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু তথায়ও তিনি পূর্ব্বোক্ত কারণে বন্দরে প্রবেশের অনুমতি পাইলেন না। তথা হইতে তিনি ক্যানে যাত্রা করিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই প্রবেশাধিকার লাভে সমর্থ হইলেন না। অগত্যা তাঁহাকে পোতমধ্যেই আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইল এবং মনুষ্যপরিবর্জ্জিত এই অদ্ভুতপ্রকৃতি বাদকের মৃতদেহ তরঙ্গসঙ্ঘাতে আন্দোলিত হইতে লাগিল। প্যাগানিনির পুত্র কোথায় যাইবেন, কি করিবেন কিরূপে পবিত্র পিতৃশবের সৎকার হইবে তাহা কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। অকস্মাৎ তরঙ্গাভিহত নগ্নকায় সেণ্ট টেরিয়ল শৈল তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। তিনি এই স্থানেই পোত হইতে অবতরণ করিয়া দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে শবাধার সমাহিত করিলেন।

অবশেষে ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে তিনি পিতৃদেহাবশেষ সমাধি হইতে উত্তোলন করিয়া জেনোয়াস্থ গেজোনা পল্লী নামক আবাসে স্থানান্তর করণ মানসে দুই জন বন্ধুর সহিত পুনরায় এই দ্বীপে ফিরিয়া আইসেন। এই অসাধারণ বেহালাবাদক এরূপ বন্ধুর কঙ্করসঙ্কুল স্থানে শৈলবিভগ্ন লহরীমালার অবিরাম সঙ্গীতে চিরসুষুপ্তিমগ্ন থাকিলে অনেকের মতে অধিক সঙ্গত বলিয়া মনে হইত, সন্দেহ নাই।

পুরোভাগে বিরাজমান সিন্ধুগর্ভস্থিত সেণ্ট হনরাট দুর্গ অ্যাণ্টিবস অন্তরীপ বেষ্টন কালেই আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। ইহারই কিয়দ্দূরে অর্দ্ধ-নিমজ্জিত শৈলশ্রেণীর অন্তর্ভাগে লামইনস নামক একটি সমুচ্চ দুর্গ-মন্দির দণ্ডায়মান। এক্ষণে এই সুতীক্ষ্ণ শিলাসমুচ্চয় আপতিত তরঙ্গসমুৎপন্ন শ্বেতফেন-পুঞ্জে সমাবৃত এবং ভীষণ বারিধি-কল্লোলে প্রতিশব্দিত। অন্ধকারময়ী রজনীতে উপকূলভাগের এই অংশই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং আলোকচিহ্নিত নহে বলিয়া প্রায়শঃ পোতধ্বংশের কারণ-স্বরূপ হইয়া থাকে। সহসা দমকা বাতাসে তরীখানি পার্শ্বে হেলিয়া পড়ায় তরঙ্গোচ্ছ্বাসে অনাবৃত পাটাতন জলসিক্ত হইয়া গেল। আমি আকর্ষিবিশিষ্ট উর্দ্ধতন পাইলটি অবনত করিতে আদেশ করিলাম; নতুবা গুণবৃক্ষ ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল। দিগন্ত-প্রসারী বারিরাশি উত্তাল তরঙ্গাকারে উত্থিত, অধঃপতিত এবং ফেনপুঞ্জে

ধবলীকৃত হইতে লাগিল। চারিদিকে বাত্যাবিধ্বস্ত সমীরণ স্বন্ স্বন্ শব্দে নভোমণ্ডল আকুলিত করিয়া যেন ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক জানাইতেছিল, "অদ্যকার অবস্থা আশঙ্কাজনক—সকলে সাবধান হও"।

ঘানার্ড বলিল, "অদ্য আমাদিগকে ক্যানে নগরেই রাত্রি-যাপন করিতে হইবে।"

অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল অতিক্রম করিতে না করিতেই আমরা লম্ববান ত্রিকোণাকৃতি পাইলটি নামাইয়া ফেলিতে বাধ্য হইলাম। তৎপরিবর্ত্তে একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন পাইল সংস্থাপিত করিয়া বৃহত্তম বাতবস্ত্রের কিয়দংশ সংবৃত করা হইল। ইহারই প্রায় অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে আমরা পুনরায় বাতবস্ত্র সঙ্কোচনে প্রবৃত্ত হইলাম।

গত্যন্তর না দেখিয়া আমি ক্যানে গমনই স্থির করিলাম। ক্যানে বন্দর আশ্রয়শূন্য বলিয়া সেরূপ নিরাপদ নহে। বিশেষতঃ জাহাজের নঙ্গর-স্থান দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে সংরক্ষিত না থাকায় সমুদ্রতুফানে নঙ্গরবদ্ধ পোত-সমূহের বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। উপযুক্ত আশ্রয় লাভের সুবিধা থাকিলে বহুসংখ্যক বিদেশীয় বিলাস-তরণী সর্ব্বদা বন্দরে উপস্থিত থাকিয়া নাবিকগণের যথেষ্ট অর্থাগমের সহায়তা করিতে পারিত। এ বিষয় প্রণিধান করিলে এতদ্দেশীয় লোকচরিত্রের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা সহজেই উপলব্ধ হইয়া থাকে। ইহাদিগের চিত্তে অলসতা এরূপ দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, ইহারা এতাবৎকাল শাসনকর্ত্তৃগণের নিকট এ প্রকার অপরিহার্য্য পূর্ত্তকার্য্যের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়া আবশ্যক সাহায্যলাভে সমর্থ হয় নাই।

বেলা ১০ ঘটিকার সময় আমরা লা ক্যানে নামক বাষ্পীয় পোতের অপর পার্শ্বে নঙ্গর ক্ষেপন করিলাম। আকস্মিক বিঘ্নে সমুদ্র-যাত্রার ব্যাঘাত ঘটায় আমি ভগ্নমনোরথ হইয়া এই স্থানেই অবতরণ করিলাম; দেখিলাম, সমগ্র স্থান শ্বেতবর্ণ ফেনলেখায় পরিব্যাপ্ত।

শ্রীগুরুদাস সরকার।

বিপত্নীক।

১

গৃহ নিরানন্দ অন্ধকার।
আমি কি এ গৃহস্বামী?
চোরের মতন আমি
ভয়ে ভয়ে হেরি চারিধার।

২

সারাদিন ঘুরি পথে পথে,
মিলি জন-কোলাহলে,
হৃদয় বাঁধিয়া বলে,
বিশ্বাস করিয়া কোন মতে—

৩

ফিরিয়াছি গৃহে আপনার।
আঁখি মেলি দেখিবারে
সাহসে কুলায় না রে,
পাছে ভুল ভাঙ্গে পুনর্ব্বার!

৪

নিঃশব্দে দাঁড়ায়ে আছি দ্বারে;
জগত আঁধার স্তব্ধ,
হৃদয়ে দারুণ শব্দ—
ভুলিতে পারি না আপনারে

৫

আবার আশায় করি ভর;—
ঘরে বা তুলসিতলে
যদি তা'র দীপ জ্বলে!
যদি তা'র শুনি কণ্ঠস্বর!—

৬

ঘুচে যায় এ চিত্তবিকার!
বলি তারে,—'আয় সতি,
দেখেছি দুঃস্বপ্ন অতি,
কি যে কষ্ট, নহে বলিবার।

৭

পা দিও না আর মৃত্তিকায়,—
মিলন-কাতরা ধরা,
রোগ-শোক-মৃত্যুভরা,
বিরহ ফিরিছে পায় পায়।

৮

এস, বুকে রাখি লুকাইয়া;—
কঠিন এ অস্থি-চর্ম্ম,
গভীর হৃদয়-মর্ম্ম,
দীর্ঘ—এই দীর্ঘ প্রাণ দিয়া।

৯

তা'র পর, যা হয় তা হোক।
মরণে মরণ যোগ,
একত্রে স্বরগ-ভোগ,
না হয়, একত্রে প্রেত-লোক।'

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

সরযুবালা।

—:*:—

১

যখন পিতামাতা আদর করিয়া রুদ্রেশ্বর নাম রাখিয়াছিলেন, তখন কি তাঁহারা জানিতেন, পুত্রের স্বভাবটিও রুদ্র হইবে? রুদ্রেশ্বর পিতামাতার একমাত্র সন্তান, ঠাকুরমা'র এক নাতি, পিসিমা'র এক ভাইপো। সুতরাং কেহই তাহাকে কিছু বলিত না। কত ঠাকুরের দ্বার ধরিয়া, কত দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়িয়া তবে তাঁহারা রুদ্রকে পাইয়াছেন। হইল বা সে একটু বেশী আবদারে, তাহাতে ক্ষতি কি? তাহার আবদার পূরণ করিয়া, তাহাকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া তাহার মুখখানি হাসিপূর্ণ দেখিলে তাঁহাদের যে আনন্দ হয়, লোকের একটা রাজ্য প্রাপ্তিতে বোধ হয় তত আনন্দ হয় না।

এত আদরেও কিন্তু রুদ্রেশ্বর অপব্যয়ী হয় নাই। বাল্যকাল হইতেই সে হাতে যথেষ্ট পয়সা পাইয়াছে, সে সকল পয়সা সে বন্ধুবান্ধবদিগকে খাওয়ান, চাঁদা দেওয়া, ঘুড়ি-লাটাই কেনা ইত্যাদিতে ব্যয় করিয়াছে; কখনও মন্দ কাযে ব্যয় করে নাই। সেকেণ্ডক্লাস অবধি পড়িয়া সে পড়া ছাড়িয়া দিল। পিতা দুই একবার তাহাকে স্কুলে যাইতে বলিলেন, তাহার মত হইল না। সে বলিল, "আমার চাকরী করে দিন, আমি পড়্‌বো না।"

চাকরীর বাজার যে কিরূপ তাহা পিতা জানিতেন। লোক পাশ দিয়াই ঘুরিয়া বেড়ায়, তা সে সেকেণ্ডক্লাস অবধি পড়িয়া চাকরী করিবে! মুরুব্বি বা বিদ্য—দুইটার একটা না হইলে যে চাকরী পাওয়া দুষ্কর, সেটা তাহার বুঝিবার দরকার হয় নাই। সে জানে, যখন যাহা চাহিয়াছি পাইয়াছি; এখন চাকরী চাহিতেছি—অবশ্য পাইব। প্রত্যহ স্কুল আর স্কুল—এটা তাহার বড় বিরক্তিকর মনে হইল। চাকরী যে চোরের বেড়ী, স্কুলের অপেক্ষাও বিরক্তিকর সেটা তাহার মাথায় আইসে নাই। পিতাও বুঝিলেন, যখন সে পড়িব 'না' বলিয়াছে তখন 'হাঁ' করান বড় কঠিন ব্যাপার। নাই পড়ুক—নাই চাকরী জুটুক তাঁহার যাহা আছে বুঝিয়া চলিলে তাহাতে জীবন সুখে কাটিয়া যাইবে। এই ভাবিয়া তিনি আর কিছু বলিলেন না।

খুব ঘটা করিয়া রুদ্রেশ্বরের বিবাহ হইল। বউটি বোধ হয় তত সুলক্ষণা

নহে, কেন না, বৎসর না ঘুরিতে ঘুরিতে রুদ্রেশ্বরের পিতামাতা ও ঠাকুরমা কলেরায় মর্ত্যলোক ত্যাগ করিলেন। বধূ বালিকা বলিয়া যম যেন দয়া করিয়া পিসিমা'কে ছাড়িয়া যাইল। পিতার টাকা-কড়ি রুদ্রেশ্বর সব বুঝিয়া পাইল। আর সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি মন্দচরিত্র যুবক তাহার তোষামদকারী হইয়া আসিয়া জুটিল। পিসিমা দেখিলেন, গতিক ভাল নহে; যদি ঐ ঘুঘুগুলি দিন কতক এই ভিটায় আশ্রয় লয়, তাহা হইলে "সোণার" রুদ্র "মাটি হইবে"। তিনি এক দিন রুদ্রকে একটা গল্প বলিতে বসিলেন। রুদ্র হাসিয়া বলিল, "সেকি পিসিমা, এখন কি আমায় সেই বালকটি পেয়েছ নাকি, যে গল্প শোনাতে এসেছ?"

পিসিমাও হাসিয়া বলিলেন, "আরে ক্ষ্যাপা আমার কাছে তুই তো বালকটিই আছিস। আর এটা গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। আমার শ্বশুরের এক জ্ঞাতির কথা। শোন্ না, বল্‌তে এসেছি। তোকে ছাড়া আর কা'কে বল্‌বো?" পিসিমা'র এত বলিবার ইচ্ছা দেখিয়া রুদ্র তাঁহার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শয়ন করিয়া বলিল, "বল শুনি"।

"আমাদের সেই জ্ঞাতির বাপের অনেক বিষয় ছিল। তার বাপের মৃত্যুর পর, সে সমস্ত তা'রা দু'ভায়ে ভাগ করে নিলে। বড়টি সেয়ানা ছিল, সে সেই বিষয় বুদ্ধির জোরে বাড়িয়ে আরও নূতন জমিদারী কিন্‌লে। ছোটটিকে বোকা পেয়ে তার অনেক বাজে-বন্ধু জুট্‌লো। বাজে-বন্ধু কেন বল্লুম জানিস্? বন্ধু নামটি শুনতে যেমন মধুর, তেমনই বন্ধুর দ্বারা উপকার ছাড়া অপকার হয় না। কিন্তু এমন কতকগুলি লোক আছে যা'রা এই বন্ধু সেজে এসে সর্ব্বনাশ করে চলে যায়। তাদের বাজে-বন্ধু বলে। ছোটটি তা'দের কুহকে পড়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে শেষে জেলে যাবার যোগাড় হলো। কেন না, সেই বন্ধুরা তাকে খুব হাণ্ডনোট কাটিয়ে দেনায় জড়িয়ে রেখেছিল। ভাগ্যে তা'র বড় ভাই ছিল, তাই সে বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করে, আপনার বাড়ীতে রেখেছে। না হলে তা'র দুঃখে শেয়াল-কুকুর কাঁদ্‌তো।"

"একি গল্প পিসিমা? একটুখানি; কোন আশ্চর্য্য কথা নেই। এ রকম কথা আমি ত ঢের শুনেছি।"

"রুদ্র, যদি শুনিছিস, বাবা, তবে ঐ যে বয়াটে ছোঁড়াগুলো এসে তোকে রাতদিন খোসামোদ করে স্বর্গে তুল্‌ছে, ওদের তাড়া। ওদের ছায়া মাড়ালেও সর্ব্বনাশ হয়। দাদা যা রেখে গেছেন, তুই যদি গুছিয়ে চল্‌তে পারিস, তাহলে কখনও কষ্ট পাবি না। পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাবি।"

রুদ্রও পিসিমা'র কথায় স্বীকার পাইয়া বাহিরে যাইল। পিসিমাও ভাই-পোর স্বভাব বুঝিয়া গল্পচ্ছলে কথা পাড়িয়াছিলেন। তাহা না করিয়া তিনি যদি প্রথমেই উপদেশ দিতে যাইতেন, তাহা হইলে রুদ্র রুদ্রমূর্ত্তি ধরিত; পিসিমা'র কথায় বিপরীত ফল ফলিত।

রুদ্রেশ্বরের রুক্ষ কথায় বন্ধুদল প্রস্থান করিল। পিসিমাও শান্ত মনে ভ্রাতুষ্পুত্র ও বধূ লইয়া সংসার করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন শান্ত হইল বটে, কিন্তু বধূ বা রুদ্র কেহ শান্তি পাইত না। বাল্যকাল হইতেই রুদ্র জানে, সংসারে যে কেহ আসিবে ও থাকিবে, সকলেই তাহার সুখ-স্বচ্ছন্দ-বিধানের জন্ত ব্যস্ত থাকিবে। তাহাদের আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিবে না। বধূটি ত সেরূপ করে না! ইহাতে রুদ্র বড়ই চটিত, আর স্ত্রীকে খুব শাসন করিত। গ্রীষ্মের সময় রুদ্রের ইচ্ছা, বধূ সারারাত তাহাকে বাতাস করিবে, সে ঘুমাইবে। কিন্তু বালিকা বাতাস করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িত। গ্রীষ্মের তাপে রুদ্রের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে সে স্ত্রীর উপর চটিয়া যাইত ও ক্রুদ্ধস্বরে বলিত, "দিনে তো কোন কায থাকে না, সে সময়ে ঘুমাতে পার না? আমার সেবা করতে গেলেই ঘুম আসে!" তিরস্কৃতা বালিকা যদি দিনে বেশী ঘুমাইত, পিসিমা বকিতেন, "একি অলক্ষণ; সারাদিন ঘুম কি?"

এইরূপ এমন এক একটি কায তাহার স্কন্ধে পড়িত, যাহা করিলে একজন সন্তুষ্ট হইবে, আর একজন অসন্তুষ্ট হইবে। সে পিসিমা'কে সন্তুষ্ট রাখিতেই অধিক সচেষ্ট হইত; আর নীরবে রুদ্রের কাছে তিরস্কার সহ্য করিত। সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিয়া তাহার হৃদ্‌রোগ জন্মিল। সে অসুখের কথা কাহাকেও বলিল না। এখন সে ক্রমে বড় হইতেছে ও বুঝিয়াছে, এরূপ যন্ত্রণাময় জীবন অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়ঃ। এই অবস্থায় একটি সুন্দরী কন্তা প্রসব করিয়া সূতিকা গৃহেই সে সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিস্তার পাইল। এই ঘটনায় রুদ্রেশ্বরের সুখের স্বপ্ন যেন ভাঙ্গিয়া গেল। সেই প্রচণ্ডমূর্ত্তি রুদ্র বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিল। স্ত্রীর স্মরণ-চিহ্ন কন্তাটিকে বুকে করিয়া রুদ্র আপনাকে সামলাইয়া লইল। পিসিমা ও একজন ধাত্রী কন্তাটিকে পালন করিতে লাগিল। পুনরায় রুদ্রের বিবাহ দিবার চেষ্টা পিসিমা অনেক করিলেন, কিন্তু কিছুতেই বিবাহে রুদ্রের মত হইল না। এতদিনের পর তাহার অন্যায় "গোঁ" তাহাকে একটা ভাল কায করাইল।

২

কন্যাটি যখন অষ্টম বৎসরে পড়িল, সেই সময় পিসিমা স্বর্গারোহণ করিলেন। পিসিমা'র মৃত্যুর পর রুদ্রেশ্বর কোথাও বেড়াইতে যাওয়া বন্ধ করিল। প্রাতে ও সন্ধ্যায় সে বৈঠকখানায় বসিত; অন্য সময় সরযূকে লইয়া কাটাইত। সরযূর সামান্য অসুখ হইলেই রুদ্রেশ্বর পাগলের মত হইত; মনে করিত, সরযূ বুঝি এইবার পলাইবে, এই বিশাল বিশ্বে সে একান্ত নিঃসঙ্গ হইবে। সরযূর খেলার সঙ্গী পিতা, সে কখন পিতাকে পুত্র সাজাইয়া খাওয়াইতেছে, কখন গান করিয়া পিতাকে ঘুম পাড়াইতেছে, আবার কখন বা চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তাহাকে ধমকাইতেছে। পিতাও শান্ত শিশুর মত সরযূর আদেশ যথাযথ পালন করিত। গভীর রাত্রিতে যখন সরযূ ধাত্রীর কাছে নিদ্রা যাইত, তখন রুদ্রেশ্বর নিজের সেই অযথা ক্রোধের কথা স্মরণ করিয়া বড়ই ক্লেশ পাইত। স্বীয় সুখের জন্য সে বালিকা পত্নীকে কত কষ্ট দিয়াছে। সেই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে এক একদিন তাহার যাতনা এত অসহ্য হইত যে, নিদ্রিত সরযূকে ধাত্রীর নিকট হইতে আনিয়া সে আপনার সেই যাতনা-পীড়িত বক্ষে স্নেহালিঙ্গন-পাশে বাঁধিয়া তবে শান্তি পাইত। সরযূ না থাকিলে বুঝি রুদ্রেশ্বর পাগল হইয়া যাইত।

সরযূ যখন দ্বাদশ বৎসরে পড়িল, তখন প্রতিবাসীরা উপদেশ দিল, এইবার কন্যাটির সম্বন্ধ দেখুন—আর স্থির থাকা উচিত নহে। সে কথা শুনিয়া রুদ্রেশ্বরের হৃদয় কম্পিত হইল, তবে কি এত দিন পরে সরযূ পর হইয়া যাইবে? এ যে কন্যা—ইহাকে ত পরের হাতে সমর্পণ করিতেই হইবে। রুদ্রেশ্বরের মন এত ব্যথিত হইল যে, সে প্রতিবাসীদের কথার কোন উত্তর করিতে পারিল না। তাহারাও তাহাকে নীরব দেখিয়া আর কিছু বলিল না—কে পরের কথা লইয়া মাথা ঘামায়?

সরযূ প্রতি দিনই পিতার সহিত এক পাত্রে আহার করিত। আজ পিতা কিছু খাইতেছেন না দেখিয়া সে বলিল, "আজ কিছু খাচ্ছ না কেন, বাবা? কি হয়েছে তোমার?" রুদ্রেশ্বর কোন উত্তর না দিয়া সজল নয়নে কন্যার দিকে চাহিল। পিতার নয়নে অশ্রু দেখিয়া, সরযূ ব্যস্তভাবে তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, "একি, তোমার চ'খে জল কেন বাবা? বল; না হ'লে আমিও খাব না।" তখন রুদ্রেশ্বর আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "নারে পাগলি, ও কিছু নয়, তুই খা।"

"না আমি খাব না; তুমি আগে বল, কেন তোমার চ'খে জল এসেছিল।"

"এইবার তোর বে দিতে হবে। সরযূ এইবার তোকে শ্বশুর-বাড়ী যেতে হ'বে। আমি একা থাক্‌বো,—তাই ভাবছিলাম আর চ'খে জল আসছিলো।"

বলিতে বলিতে রুদ্রেশ্বরের চক্ষু আবার অশ্রুপূর্ণ হইল। সরযূ পিতার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "বাবা আমার বে দিও না। আমি বে করবো না।"

বালিকার এই কথায় রুদ্রেশ্বর হাসিয়া ফেলিল। কত স্থান হইতে সরযূর সম্বন্ধ আসিল, কোনটাই রুদ্রেশ্বরের মনোনীত হইল না। যে স্থানেই ভাল সম্বন্ধ পায়, সেখানেই সে ভয়ে অমত করে, যেন তা'রা সরযূকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে আসিয়াছে। অমনোনীত স্থানে দেখাশুনা করিয়া পরে যাহার কাছ হইতে হউক খুঁত শুনিয়া রুদ্রেশ্বর সে সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রে; প্রতিবাসীদের বলে, "কি করবো, ঐ আমার নয়নের মণি যা'র তা'র হাতে তো দিতে পারি নে।"

প্রতিবাসীদের ভয়েই যেন রুদ্রেশ্বর সম্বন্ধ দেখিতেছে! প্রতিবাসীদের এরূপ ফাঁকি দিতে দিতে সরযূ চতুর্দ্দশ বৎসরে পড়িল। তখন রুদ্রেশ্বর দেখিল, তাহার এই অন্যায় স্নেহে সে আপনি ঠকিতেছে। এ যে রাখিবার নহে! এ যে চিরদিনের জিনিষ নহে! যাহা হউক শেষে সে স্থির করিল, একটি দরিদ্রের সন্তান দেখিয়া কন্যার বিবাহ দিবে ও তাহাকে ঘর-জামাই রাখিবে; তাহা হইলে সরযূ কাছে থাকিবে। এই রূপ স্থির করিয়া রুদ্রেশ্বর সত্য সত্যই সম্বন্ধ দেখিতে লাগিল। এত দিন মিছা অভিনয় চলিতেছিল। প্রথম প্রথম ঘটক-ঘটকী তাহার কথায় বিশ্বাস করিত না, বলিত, "জানি যে সম্বন্ধ আন্‌ব, সবই ফিরা'বে; কেন মিছা হাঁটা হাঁটি।" শেষে অধিক বিদায়ের লোভে তাহারা সম্বন্ধ দেখিতে লাগিল।

৩

আমতা গ্রামে সরযূর বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হইল। বরের অবস্থা তত স্বচ্ছল নহে। খোড়ো বাড়ী, পিতামাতা ও দুইটি ভ্রাতা; পাত্রটি জ্যেষ্ঠ। এইবার ওকালতি পাশ দিবে, বরের বাপ নগদ কিছু চাহেন নাই। কারণ, তিনি শুনিয়াছিলেন রুদ্রেশ্বরের ঐ এক কন্যা কাযেই চাহিবার প্রয়োজন নাই। পাকা দেখার পূর্ব্বে রুদ্রেশ্বর বলিল, "আমার মেয়েকে বের পর প্রথম পাঠাব, আটদিনের জন্য; তা'র পর আর পাঠাব না। জামাই এখানেই থাক্‌বে, আবার ইচ্ছা করলে, মাঝে মাঝে গিয়ে বাপমা'র কাছে থাকবে। এতে যদি মত হয় তা' হ'লে পাকা দেখ্‌বো, না হলে দেখ্‌বো না।"

কন্যার পিতার কোম্পানীর কাগজের কথা বরের পিতা শুনিয়াছিলেন। আর তাহার বৃহৎ বাটী ত তিনি দেখিয়া গিয়াছেন। রুদ্রেশ্বরের মৃত্যু হইলে ত সবই তাঁহাদের। তিনি রুদ্রেশ্বরের প্রত্যেক কথায় "তথাস্তু" বলিলেন। কাযেই বিবাহের ঠিক হইল। গাত্রহরিদ্রার পূর্ব্ব দিন সরযূ পিতার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—"বাবা যাঁ'রা সব এসেছেন তাঁ'রা যদি আমাদের বাটী থাকেন তো বেশ হয়। না, বাবা এত বড় বাড়ীতে তুমি আর আমি সমস্ত বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ করে, এখন বাড়ীটিতে এত লোক এসেছে বলে মনে বেশ আহ্লাদ হচ্ছে।" রুদ্রেশ্বর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সরযূ, ভগবানের ইচ্ছা তুই নির্জ্জনে থাকিস, না হলে এ বাড়ী এমন ছিল না। সকলই তোর আর আমার অদৃষ্ট। এঁরা আমাদের বাড়ী দু দিনের জন্য নিমন্ত্রণে এসেছেন, কিন্তু আদর যত্ন করবার লোক নাই। এ কি আমার কম দুঃখ।" পিতার বিষণ্ন মুখ দেখিয়া সরযূর আনন্দ দূরে পলাইল। সে পিতাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য বলিল, "বাবা, আমার নূতন গহনাগুলি দেখাবে চল না। কালকে আমি ভাল করে দেখি নি।"

রুদ্রেশ্বর সস্নেহে কন্যার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "চল্ দেখাইগে।"

৪

আজ আর রুদ্রেশ্বর শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সে সারারাত্রি ক্রন্দন করিয়া উপাধান সিক্ত করিয়াছিল। এখনও তাহার অশ্রু বন্ধ হয় নই। আজ সরযূর "বাসি বিবাহ," আজ সে শ্বশুরালয়ে যাইবে। একদিনও যাহাকে চক্ষুর অন্তরাল করে নাই, আজ কি করিয়া তাহাকে অন্য গৃহে পাঠাইয়া রুদ্রেশ্বর বাটীতে থাকিবে। তাহার গৃহের আলো, জীবনের আনন্দ আজ কাহার ঘরে যাইবে? তাহার দিবারাত্রির সঙ্গী, কথার সাথীকে আজ কে লইয়া যাইবে? কেন সরযূ পুত্র হয় নাই। তাহা হইলে এমন করিয়া ত তাহাকে ছাড়িতে হইত না। প্রাতঃকাল হইতে সানাই বাজিতেছে, সেও যেন করুণস্বরে বিদায় গান গাহিতেছে। কল্য সকালে সানাই কেমন মধুর মিলন-গান গাহিয়াছিল। আজ সানাইটাও ছাই প্রাতঃকাল হইতে যেন সরযূর বিরহে কাতর হইয়া ক্রমাগত করুণ রাগিনীতে গান করিতেছে। রুদ্রেশ্বর আপনা আপনি মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল, "কেন আট দিনের কড়ার করিয়াছিলাম। আট দিন কি থাকিতে পারিব? কেন তিন দিনের কথা বলিল নাই। মা আমার!" তখনই চেলীর কাপড় পরিয়া সিন্দুর-মণ্ডিত সিঁথি ও কপাল লইয়া

সরযূ পিতার বক্ষের উপর পড়িয়া বলিল, "কেন বাবা, কি বলছ? এ কি, তোমার চোখ দুটো যে ফুলে উঠেছে! মুখ রাঙ্গা হয়ে গেছে! তুমি কি কাঁদ্‌ছিলে? কেন কাঁদ্‌ছ বল।" রুদ্রেশ্বর দুই হস্তে কন্যাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল। পিতাকে এমন ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সরযূও কাঁদিতে লাগিল, তাহার পর আত্মীয়গণ যখন বাসি বিবাহের জন্য সরযূকে খুঁজিতে আসিল, তখন পিতাপুত্রীকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া অনেক করিয়া বুঝাইয়া তবে দুইজনকে গৃহের বাহিরে আনিতে পারিল। বর কনে বিদায়ের সময় একজন কুটুম্বিনী রুদ্রেশ্বরকে বলিলেন, "বরের হাতে সরযূর হাত দিয়া বল, 'এত দিন আমার ছিল এখন তোমার হলো'।" সজল-নয়ন রুদ্রেশ্বর বলিল, "ওটা আমি পার্‌বো না।" অনেকেই অমনই বলিয়া উঠিলেন "তা কি হয়! এ নিয়ম; এ কর্ত্তেই হবে।" রুদ্রেশ্বর আর কি করিবে? সে ধীরে ধীরে সরযূর হাতখানি হাতে লইয়া জামাতার হস্তের উপর রাখিল, তারপর কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "এত দিন আমার ছিল, এখন তোমার—" "হলো." কথাটি কিছুতে রুদ্রেশ্বর বলিতে পারিল না। সেই এক ঘর কুটুম্বিনীর সাক্ষাতে সে বালকের ন্যায় ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এ ক্রন্দনে সে গৃহের সকলেই যোগ দিল। এমন কি বরের চক্ষুতেও দুই বিন্দু অশ্রু ফুটিয়া উঠিল। সরযূ দুটি হাত দিয়া পিতার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার পর অনেক কষ্টে তাহাকে সেই স্নেহ আলিঙ্গন হইতে মুক্ত করিয়া মহিলাবর্গ মহাপায়ায় তুলিয়া দিয়া আসিলেন। রুদ্রেশ্বর শূন্য কক্ষে যাইয়া অর্গল বদ্ধ করিয়া শয়ন করিল। কারণ, এ সময় যদি কেহ সান্ত্বনা করিতে আইসে, সে সান্ত্বনা বিশেষ বিরক্তিকর এবং তাহাতে শূন্য হৃদয়ের দুঃখ উপশমিত না হইয়া শুধু বৃদ্ধি পাইবে। সেই সান্ত্বনার ভয়ে রুদ্রেশ্বর দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

৫

"এখানে ঢের উকিল; পশার ভাল হ'বে না। সেই জন্য আমার ইচ্ছা, মফঃস্বলে ওকালতি কর্‌বো। আর শুধু এর জন্যও নয়, এখানে হেম থাক্‌তে পারে না। সে ছেলে মানুষ, আমার কাছেই থাক্‌তে চায়, জ্যেঠাদের কাছে থাক্‌তে কিছুতেই ইচ্ছুক নয়, কখন ত থাকে নাই, তাই মন বস্‌ছে না। মা ও বাবা যদি না মারা যেতেন তাহলে ত হেমের জন্য আমায় ভাব্‌তে হ'ত না।"

"পশারের কথা যা বলছ, ও কথাটা দয়া করে ছাড়লেই ভাল হয়, কেন না আমার বাবার যা' আছে তা'তে আমাদের জীবন এক রকম চলে যাবে, তবে বড় মানুষী হবে না। আর ঠাকুরপোর কথা তোমার একটা ওজর। বাবা এত করে বল্লেন, আমি এত করে বল্লুম, কিছুতে তাকে এ বাড়ীতে আনতে মত হলো না। তুমিই তো তা'কে জ্যেঠাদের কাছে রেখে এসেছো। এখানে অপর কেউ থাকলে লজ্জা হতো, এতো তোমারই বাড়ী। তবে কেন অমত কর বুঝি না।"

"আমি তোমার বাবার পয়সার প্রত্যাশায় আপনার রোজকার ছাড়তে পারি না। আমার যা' দরকার হ'বে তা'র জন্য আমি কি তোমার বাবার কাছে হাত পাতবো নাকি? তোমার বাবা যতক্ষণ বেঁচে আছেন, ততক্ষণ এ আমার বাড়ী কি করে হলো। হেম আমার শ্বশুরবাড়ী কেন আস্‌বে।"

"কেন ঠাকুরপোর ত মত আছে, তোমারই মত হয় না। বাবা তোমাকে এত করে যত্ন করেন, তবু তোমার মন পান না। রোজকারত কেউ ছাড়তে বলছে না, যাহোক কিছু ত হবে, বেশী পশারের দরকার কি? এই বলছি।"

"হেম ছেলে মানুষ বোঝে না, তাই থাকতে চায়। আমি জানি, আমার শ্বশুরবাড়ী হেম থাকলে সেটা লজ্জার কথা। আমি যা' স্থির করেছি তা' করবো। তুমি তোমার বাবাকে ছেড়ে থাকতে যেমন রাজী নও, আমিও হেমকে ছেড়ে থাকতে তেমনই রাজী নই। বেশ ত তোমাদের বাড়ীতে চাবি দিয়ে তোমার বাবা কেন আমার সঙ্গে চলুন না।"

"তুমি এ কথা কি করে বল্লে? লেখাপড়া শিখে কি এই জ্ঞান পেয়েছ? তোমার ভাইয়ের সঙ্গে আমার বাবার সঙ্গে তুলনা করছ! তোমার ভাই ছোট, আমার ছেলের মত, পিতৃমাতৃহীন; এক্ষেত্রে কিছু দোষের নয়—আর এখন তুমি নিজে রোজকার করছ। আর আমার বাবা এই বুড় বয়সে বাড়ী ঘর স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে জামাইবাড়ী গিয়ে থাকবেন, কি করে বল্লে?"

"দেখ তোমার সঙ্গে অত তর্ক করতে আমি চাই না। ঠিক জবাব দাও—আমার সঙ্গে তুমি যাবে কি না?"

"বাবাকে কা'র কাছে রেখে যা'ব বলে দাও।"

"কেন ঝি, চাকর, বামুন, বুড়া ধাই, এত লোক রয়েছে। দেখবার ভাবনা কি? তা'রপর অসুকবিসুখ হলেই আমাদের টেলিগ্রাম করবেন, তখনই আমরা আস্‌বো"

"তুমি এমন নিষ্ঠুর কথাগুলো বলো না। যখন সেবার আমি আট দিন তোমাদের বাড়ী ছিলুম, তখন বাবা পাগলের মত কেঁদে কেঁদে আট দিন কাটিয়েছেন। আমায় ছেড়ে বাবা কোথাও যান না। আমায় না দেখ্‌লে তিনি থাক্‌তে পারেন না। সেই বাবাকে আমি লোক জনের কাছে দিয়ে যা'ব? কিছুতে তা পারবো না। ধাইমাও আমায় ছেড়ে এখানে থাক্‌বে না। আর ধাইমা যদিই থাকে,বাবাকে লোকজনের হাতে সমর্পণ করে আমি যা'ব না!"

"বেশ তুমি তোমার বাপকে নিয়ে থাকো। আমি হেমকে নিয়ে যা'ব।"

"যদি তোমার একান্ত তাই ইচ্ছা, তাই কর,কায বুঝে অবসর হলেই এসো।"

"আমার চেয়ে তোমার বাপ যখন আগে হলেন, তখন্ আমার আসায় আর দরকার নেই। শুধু আসা কেন, চিঠিপত্রও তুমি আমায় লিখ্‌লে জবাব পা'বে না। আমার কোন খবর আমি তোমায় দেব না, তোমার খবরও আমি চাই না।"

"এমনই নির্দ্দয়ের মত কথা বল্‌তে তোমার কি একটু কষ্ট হচ্ছে না। তুমি আমার মনের কথা একটু কি বুঝ্‌ছো না। আমার কি সাধ, যে আমিতুমি দূরে থাকি। শত কষ্ট হলেও বাবাকে ছেড়ে যেতে পারি নে, এ কি বুঝ্‌তে পারছ না।"

"না। সরয্ অত বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি জানি, স্ত্রীর স্বামী যা বলবে, সে তাই শুনবে। স্বামীর সুখই স্ত্রীর সুখ। বাপের বাড়ীর ওপর যা'র অত টান তা'র স্বামীতে ভালবাসা নেই—এই বুঝি। বাবা তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে পারবেন না—আমি কি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারি? তা'হ'লে এতদিন এখানে পড়ে আছি কা'র জন্য। সে কি তোমার বাবার টাকার জন্য, না তোমার জন্য। এখন বাপ মা মারা গেলেন, কাযেই হেমের জন্য আমাকে পৃথক থাকতেই হ'বে, তা' যেখানে একটু পয়সা বেশী পা'ব সেখানে থাকাই ভাল, এ তোমায় আজ দুমাসে বোঝাতে পাল্লুম না!"

"বাপের বাড়ীর উপর টান কি একে বলে? আমার বাবার আমি ছাড়া যে কেউ নেই! কি করে বাবাকে ছেড়ে যাই! তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুরপোকে এখানে আনো, এতে কোন দোষ নেই, বেশ করে ভেবে দেখ। আমি জানি তুমি আমায় ভালবাসো, তবে কেন আমার মনের সব কথা ভাল করে বুঝছো না। ভাল করে বুঝে দেখ বাবার আমি অন্ধের যষ্টি। তুমি কি সে যষ্টি কেড়ে নিয়ে যেতে চাও।"

সরযূবালা আর কিছু বলিতে পারিল না, কাতর নয়নে স্বামীর মুখে চাহিয়া রহিল। নবকুমারের দৃষ্টি সে দিকে ছিল না। সে অন্য দিকে চাহিয়া ছিল। সে এই কথাগুলির উত্তর অনেকক্ষণ দিল না; তাহারপর গম্ভীর স্বরে বলিল, "আমি হেমকে নিয়েই যাব। তুমি তোমার কুশল সংবাদ লিখ, আমিও লিখবো।" সরযূ স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, "প্রসন্নমুখে বলো। তুমি মুখ অমন করে বল্লে আমার মন স্থির হ'বে না।"

"তোমায় ছেড়ে দূরে যাচ্ছি; কি করে মুখ প্রসন্ন হবে, সরযূ।"

সরযূ নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। সরযূর নয়নে অশ্রু দেখিয়া নবকুমারের চক্ষুও সজল হইল। কিন্তু তাহার অটল প্রতিজ্ঞা টলিল না।

রুদ্রেশ্বরও জামাতাকে বিদেশে যাইতে নিষেধ করিয়াছিল। তাহার কথাও থাকে নাই। তাহাতে তাহার বড়ই কষ্ট। তাহার যাহা আছে তাহা যথেষ্ট। কেন যে তবে জামাতা এত ঝোঁক করিয়া বিদেশবাসী হইল, রুদ্রেশ্বর তাহা বুঝিতে পারিল না। সরযূর বিবাহের পর এ যাবৎ একদিনও রুদ্রেশ্বরের মুখ বিষণ্ণ হয় নাই। এখন এক এক দিন রুদ্র বড়ই বিষণ্ণ ভাবে দিন কাটাইত। পিতার অমন বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া, এক দিন সরযূ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আজকাল তোমায় এমন বিষণ্ণ দেখি কেন?"

"সরযূ, নবকুমার বিদেশবাসী হলো, তা'হ'লে তুই আর এখানে কতদিন থাকবি, মা? আমার অদৃষ্ট মন্দ। এই বুড়া বয়সে দেখ্‌ছি, একা থাকৃতে হ'বে। এই জনশূন্য পুরীতে কি করে একা থাক্‌বো তাই ভাবি।"

তখন সরযূর মন একটু স্থির হইল, পিতার মুখ অমন দেখিয়া সরযূর বড়ই ভয় হইয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, সে যে প্রত্যহ রাত্রিতে কাঁদে পিতা হয় ত জানিয়াছেন, তাই অমন বিষণ্ণ হইয়া থাকেন, তা নয়। সরযূ হাসিয়া বলিল, "বাবা বুড় হয়ে তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্ছে নাকি? তোমায় ছেড়ে আমি কোথায় যাব, বাবা? আর নিয়ে যাবার হলে তিনি এবারই নিয়ে যেতেন। তোমায় একা রেখে তিনি কি নিয়ে যেতে পারেন।"

এই কথাগুলিতে রুদ্রেশ্বরের বড়ই আনন্দ হইল, তবে জামাতা নিশ্চয়ই মেয়েকে এ কথা বলিয়াছে। তাহা না হইলে কি মেয়ে অমন সাহস করিয়া বলিতে পারে। এখন পিতাপুত্রীতে সে ছেলে-খেলা ত হইত না। এখন রুদ্রেশ্বর তাহার বাল্যকালের ক্রোধের কথা, পিতামাতার কথা, সরযূর জননীর কথা গল্প করিত, আর সরযূ নীরবে সব শুনিত। সেই অতীত

কাহিনীর আলোচনায় পিতা পুত্রী এত মগ্ন হইত যে, ঠাকুর আসিয়া খাবার ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে, স্মরণ করাইয়া দিলে তবে উঠিত।

৬

পূজার বন্ধে নবকুমার যখন আসিল না, তখন সরযূর বড় ভয় হইল, নিশ্চয়ই তিনি রাগ করিয়াছেন, নহিলে কেন আসিলেন না? পত্র হেমই প্রায় লিখিত। নবকুমার খুব কম পত্র দিত, ও লিখিত "কিছু মনে করিও না, বড়ই বেশী কায পাইয়াছি তাই লিখিতে পারি না, হেমের পত্রে তুমি সর্ব্বদা কুশল সংবাদ পাইবে।" তাহাতেই সরযূ মন বাঁধিয়া ছিল। কিন্তু ছুটিতে নবকুমার না আসাতে সে আর স্থির হইতে পারিল না। নবকুমারকে মিনতি করিয়া সে পত্র লিখিল; অন্ততঃ দুই চারি দিনের জন্যও একবার আসিতে লিখিল। সে পত্রের উত্তর নবকুমার দিল না। তাহার হইয়া হেম লিখিল, "দাদা এখন উপস্থিত যাইতে পারিবেন না; তজ্জন্য আপনি কিছু মনে করিবেন না।" হেমের এই পত্র পড়িয়া সরযূ বড়ই ব্যথিতা হইল। সে অত বড় পত্র লিখিল, নবকুমার কি একছত্র লিখিয়া উত্তর দিতে পারিল না! এত বড় ছুটিতে সে দুই দিনের জন্য আসিতে পারিল না? এই কি ভালবাসা! সরযূর যদি উপায় থাকিত, সে কি এক দণ্ডের জন্যও স্বামীকে ছাড়িয়া থাকিত? আনন্দময়ীর আগমনে নিরানন্দ হইতে নাই, কারণ তাহা হইলে বৎসর সেইরূপ কাটিবে; এই ভয়ে সরযূ সেই কয়দিন অনেক কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিল, কিন্তু পূজার পরই সরযূর কঠিন পীড়া হইল।

৭

সরযূর জরবিকার হইয়াছে। রুদ্রেশ্বর ও ধাইমা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহার শয্যায় বসিয়া আছে। আজ পঞ্চদশ দিন সে শয্যাগত। সরযূ বিকারের ঘোরে কেবল নবকুমারের নাম করিতেছে ও তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল ভাবে চারিদিকে চাহিতেছে। রুদ্রেশ্বর জামাতাকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছিল, কিন্তু নবকুমার আসেও নাই, টেলি-গ্রামের উত্তরও দেয় নাই। এই ব্যবহারে রুদ্রেশ্বর জামতার উপর বড়ই বিরক্ত হইয়াছে।

বাইশ দিন যমের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া রুদ্রেশ্বর সরযূকে বাঁচাইল। তাহার জর ত্যাগ হইয়াছে বটে, কিন্তু সে এত দুর্ব্বল হইয়াছে যে, দুই একটি কথা কহিলেই হাঁপাইয়া উঠে। ধাইমা'র মুখে সে শুনিয়াছে, অসুখের খবর

পাইয়াও নবকুমার আইসে নাই, বা পত্রের কোন উত্তর দেয় নাই। এ কথা শুনিয়া সে যে যাতনা পাইয়াছে তাহা ভাষার অতীত। প্রতিদিন রাত্রিতে তাহার নয়নজলে উপাধান ভিজিয়া যায়। ডাক্তার রুদ্রেশ্বরকে বলিয়াছেন, এখন দৌর্ব্বল্যই ভয়ের কারণ। রুদ্রেশ্বর কি করিয়া সরযূর দুর্ব্বলতা সারাইবে, ভাবিয়া অস্থির হইল।

সে দিন মধ্যাহ্নে সরযূ ধাইমা'র কাছে আর হৃদয়ের ভাব গোপন করিতে পারিল না; কাঁদিয়া বলিল, "ধাইমা, তিনি আমায় নিয়ে যেতে চেয়ে ছিলেন, আমি বাবাকে ফেলে যেতে চাইনি বলে তিনি হয় ত রাগ করেছেন। এই দোষে কি এত রাগ করা উচিত, ধাইমা, যে আমার এত অসুখে একখানা চিঠি দিয়ে খোঁজ নিলেন না?" ধাইমা কি উত্তর দিতে যাইতেছিল এমন সময় দেখিল, নবকুমার গৃহে প্রবেশ করিল। ধাইমা সরযূর দিকে চাহিয়া বলিল, "এই যে, মা, যাঁর জন্য কঁদ্‌ছিলে এই যে তিনি এসেছেন। বস', বাবা বস', আমি আস্‌ছি।"

"সরযূ এখোনো তুমি বিছানা থেকে উঠ্‌তে পার নি," বলিয়া নবকুমার সরযূর মস্তকের কাছে বসিল। সরযূ অশ্রুপূর্ণ নেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া চমকিত হইল। সে মনে করিয়াছিল, কত অভিমান করিবে, কত বলিবে। কিন্তু একি? নবকুমারের মস্তক মুণ্ডিত—শরীর শীর্ণ! সে স্বামীর হাত আপনার হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, "তোমার মাথা নেঁড়া কেন? শরীর এত কাহিল কেন?"

"সরযূ পূজার আগে আমার বড় অসুখ হইয়েছিল, না হলে কি ছুটিতে আসতুম না, না তোমার পত্রের উত্তর দিতুম না? আমি তখন জ্বরে পড়ে তাই হেমকে দিয়ে লিখিয়ে ছিলুম। তার পর জ্বর, বিকারে পরিণত হয়। যখন তোমার অসুখের টেলিগ্রাম যায়, তখন হেম আমায় নিয়ে এত ব্যস্ত যে তা'র উত্তর দিতে পারে নি। আমি ভাল হতে আমায় দেখালে, আমি তা প'ড়ে এই কাহিল শরীরেই চলে এসেছি। না হলে সেরে আসতুম।"

"তোমার অসুখের কথা কেন ঠাকুরপো লেখে নি। তাহলে তো আমি এত ভাবতুম না। আমার অসুখও হ'ত না। আর আমাতে বাবাতে যেতে পারতুম। বিদেশে একলা কত কষ্টই পেয়েছ!"

"তা'র জন্য আর কান্না কেন, সরযূ, এখনত সেরে এসেছি। পাছে তোমরা ভাব বলে আমি হেমকে লিখ্‌তে মানা করেছিলুম। এমন উল্টো

[illegible] ভাল হয়েছি।"

"ঠাকুর পো কি সেখানে রইল, না আমতায় গেলো।"

"তোমার অসুখ ব'লে হেম এবার আমতায় যেতে চাইলে না। আমার সঙ্গে এসেছে, তাঁকে তোমার বাবার কাছে বসিয়ে আমি আগে দেখতে এলুম। সে এখুনি আসবে।"

"আমি শুধু শুধু তোমার উপর কত রাগ করেছি, আমায় ক্ষমা কর।"

নবকুমার সাদরে তাহার মস্তক আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বলিল, "তুমি তো জান্‌তে না, রাগ করে ঠিকই করেছিলে। ক্ষমা কিসের?"

এখন সরযূ ও রুদ্রেশ্বর সর্ব্ব বিষয়ে সুখী হইল। কারণ, হেম সরযূকে ও রুদ্রেশ্বরকে ছাড়িয়া প্রবাসে যাইতে স্বীকৃত হইল না; এমনই স্নেহে ও যত্নে সরযূ ও রুদ্রেশ্বর তাহাকে বাঁধিয়াছিল। কাযেই নবকুমারের আর বিদেশে যাইবার প্রয়োজন হইল না। এই ব্যাপারের পর নবকুমারেরও বিদেশে যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল না—কেবল হেমের জন্য একটু 'কিন্তু' হইতেছিল। সে খুঁত হেমই মিটাইল।

শ্রীসুশীলাসুন্দরী দাসী।

সন্ধ্যায়।

সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে এল আঁধার-আলো-মাখা,
নদীর ধারে রাঙা আকাশ কালো গাছে ঢাকা;
ভাসিয়ে দিয়ে স্নিগ্ধমধুর লঘু মেঘের তরী—
বিলিয়ে দিতে এসেছিলে শান্তি— দু'হাত ভরি';—
হৃদয় দিয়ে তখন তোমায় বেসেছিলাম ভালো,—
প্রিয় আমার, প্রভু আমার, আমার জীবন-আলো!

শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

স্মৃতি-বিভ্রম।

—:*:—

'সাহিত্য'র শ্রাবণ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বনয়ারীলাল চৌধুরী মহাশয় 'স্বপ্ন, না পূর্ব্বস্মৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে যে বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, এবং যাহা প্রথমে তাহার নিকট অত্যদ্ভুত প্রাহেলিকাবৎ বোধ হইয়াছিল, তাহা তিনি যত নূতন মনে করিয়াছেন, বাস্তবিক তত নূতন নহে। অন্যূন অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ডাক্তার অলিভার ওয়েণ্ডেল হোম্‌স্ এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি এই সমস্যার যেরূপ সমাধান করিয়াছেন, তাহা দুই একটি ছোটখাট বিষয়ে বনয়ারী বাবুর অধ্যাপক-প্রদত্ত ব্যাখ্যা হইতে পৃথক্ হইলেও মূলতঃ এক। আমি তাঁহারই ভাষায় এই বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য পাঠকদিগের অবগতির জন্য নিম্নে বিবৃত করিলাম। তিনি বলেন—

All at once a conviction flashes through us that we have been in the same precise circumstances as at the present instant, once or many times before. *

কোন কোন সময়ে অকস্মাৎ আমাদের দৃঢ় প্রতীতি হয় যে, পূর্ব্বে একবার কিংবা বহুবার আমরা ঠিক এই রকম অবস্থায় ছিলাম।

How do I account for it? Why, there are several ways that I can mention, and you may take your choice, the first is * * * that these flashes are sudden recollections of a previous existence. I dont believe that; for I remember a poor student I know told me he had such a conviction one day when he was blacking his boots, and I can't think that he had lived in another word where they use Day and Martin's. †

অনেক রকমে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, এবং যাঁহার যেরূপ অভিরুচি তিনি ইহা সেইরূপ ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন। একটি কথা এই যে, এই সকল ভাব জন্মপূর্ব্ব জীবনের আকস্মিক স্মৃতি। কিন্তু আমি এ কথা বিশ্বাস করি না। কারণ আমি একটি দরিদ্র ছাত্রের বিষয় জানি; সে আমাকে বলিয়াছিল যে, যখন সে একদিন জুতা বুরুস করিতেছিল, তখন তাহার মনে এইরূপ ভাব হইয়াছিল। ইহা কখনই সম্ভবপর নহে যে, সে জন্মের পূর্ব্বে এমন কোন লোকে বাস করিত যেস্থানের অধিবাসিগণ ডে এণ্ড মার্টিনের কালী ব্যবহার করে। [এই স্থানে বলিয়া রাখি যে Holmes যাহাকে 'previous existence' বলিয়াছেন, তাহা ঠিক আমাদের পূর্ব্বজন্ম নহে। খ্রীষ্টানগণ জন্মান্তর মানেন না; বড় জোর তাঁহারা এই পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারেন যে, জন্মের পূর্ব্বে মানবাত্মা একটি স্বতন্ত্র লোকে

* The Autocrat of the Break-fast Table, 4th Discourse.

† Th Autocrat of the Break-fast Table.

বাস করে। ইহাই previous existence. ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Ode on the Intimations of Immortalityতে ইহারই আভাস পাওয়া যায়।]

অতঃপর এই ব্যাপার যে মস্তিষ্ক-ঘটিত, তাহারই প্রতিপাদনকল্পে তিনি বলেন—

Some think that Dr. Wigan's doctrine of the brain's being a double organ, its hemispheres working together like the two eyes, accounts for it. One of the hemispheres hangs fire, they suppose, and the small interval between the perceptions of the nimble and the sluggish half seems an indefinitely long period, and therefore the second perception appears to be the copy of another, ever so old. But even allowing the centre of perception to be double, I can see no good reason for supposing this indefinite lengthening of the time, nor any analogy that bears it out. It seems to me most likely that the coincidence of circumstances is very partial, but that we take this partial resemblance for identity, as we occasionally do resemblances of persons. A momentary posture of circumstances is so far like some preceding one that we accept it as exactly the same, just as we accost a stranger occasionally, mistaking him for a friend.

দুইটি চক্ষু যেমন একই কার্য্যে নিযুক্ত, সেইরূপ ডাক্তার উইগানের মতে মস্তিষ্কদ্বয় দ্বিত্বই কাহারও কাহারও মতে উক্ত ব্যাপারের কারণ। মস্তিষ্কের দুই ভাগ দুইটি গোলকার্দ্ধের ন্যায় এবং এই দুইটির একটি অপরটির সহিত একই সঙ্গে বাহ্যবস্তুর চেতনা লাভ করে না। দুইয়ের মধ্যে অনুভূতির এই সামান্য ব্যবধানটুকু অতি দীর্ঘকাল বলিয়া বোধ হয়। কাযে কাযেই দ্বিতীয় অনুভূতিটা আর একটির প্রতিরূপ বলিয়া বোধ হয়। আর মনে হয় যেন তাহা বহুপূর্ব্বের ঘটনা। কিন্তু অনুভূতি-কেন্দ্রটির দ্বিত্বভাব মানিয়া লইলেও, এইরূপ অনির্দ্দেশ্য দীর্ঘ কালের ব্যবধানের কোন সন্তোষজনক কারণ নির্দ্দেশ করা দুরূহ, এবং আর কোন ব্যাপারের বিষয়ও আমরা অবগত নহি যাহাতে ইহার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আমার বোধ হয় যে, বক্ষ্যমান অবস্থা-সাদৃশ্য অতি আংশিকভাবেই হইয়া থাকে কিন্তু আমরা যেমন অনেক সময় অপরিচিত লোককেও ভ্রমক্রমে পরিচিত বলিয়া মনে করি, সেইরূপ এই আংশিক সাদৃশ্য আমাদের নিকট একত্ব বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ডাক্তার হোম্‌সের ব্যাখ্যার সহিত বনয়ারী বাবুর অধ্যাপকের ব্যাখ্যার নিম্নলিখিত কয়েকটি বিভিন্নতা লক্ষিত হইতেছে। (১) 'উভয় মস্তিষ্ক সর্ব্বথা এক ভাবাপন্ন ও এক ধর্ম্মাক্রান্ত' নহে। (২) 'রক্তসঞ্চারের কার্য্যে অতি সামান্য বিপর্য্যয়েই' যে উক্তরূপ ব্যাপার সংঘটিত হয়, এবং উহার কারণ 'কেবল মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা' এরূপ কোন কথা হোম্‌সের ব্যাখ্যায় পাই না। (৩) বনয়ারী বাবু বলেন, 'প্রথমটি অস্পষ্ট ও দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট অনুভূত হয় বলিয়া, * * * পূর্ব্বটিকে বহুপূর্ব্বে দৃষ্ট স্বপ্ন বলিয়া ধরিয়া লই।' হোম্‌স্ ঠিক

ইহার বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন ; তাঁহার মতে the second perception appears to be the copy of another.

হোম্‌সের ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে একটি আপত্তি এই যে, এই ব্যাখ্যা অনুসারে সর্ব্বদাই আমাদের ঐরূপ অবস্থা-সাদৃশ্যের অনুভূতি হওয়া উচিত। বস্তুতঃ কিন্তু তাহা হয় না। ইহার উত্তর স্বরূপ তিনি বলেন,—The apparent similarity may be owing, perhaps, quite as much to the mental state of the time as to the outward circumstances. সম্ভবতঃ সেই সময়কার মানসিক ও বাহ্য অবস্থার জন্য ঐরূপ সাদৃশ্য অনুভূত হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোন এক বিশেষ মানসিক অবস্থা ও বিশেষ বাহ্য অবস্থা মস্তিকঘটিত কারণের সহিত সম্মিলিত ঐরূপ ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

সরস্বতী।

—:০:—

শুভ্র 'সত্য' আলোকের বর্ণ তব বরাঙ্গে কি ভায়
'শিব'-রূপা সরস্বতি! পদ্মাসীনা দিব্যহাস্যময়ী ;
'সুন্দর' ফুটিছে বিশ্ব চতুঃষষ্টি ললিত কলায়,—
তুমি যা'র কেন্দ্রমাঝে বিরাজিছ বিশ্বরমে অয়ি!
তোমার সত্যের দীপ্তি 'জ্ঞান'-পদ্ম-কোরক ফুটায়,
বিশ্ব-'বাসনা'র সার শুভ—তব দিব্য সুখাসন,
ওই দীপ্ত নেত্রালোক অন্ধ 'অনুভবে' যবে ভায়,—
সহস্র সঙ্গীতে তার গুঞ্জরিয়া উঠে ত্রিভুবন!

আদি যুগ হ'তে দেবি! বিশ্বমানবের মনোমাঝে
এমনি উরিয়া—তা'রে ফুটাইয়া তুলিছ যতনে ;—
তাই সনাতনী নামে অখণ্ড বিশ্বের শুভকাজে
নিত্যকাল বিরাজিছ শুভ্রকান্তি দীপ্ত-বরাননে!
তোমার পুলক-হাস্যে কটাক্ষে বিকাশে রবিশশী,—
অন্ধকার বিশ্বলোক উঠে কিবা আনন্দে উল্লসি'।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

বিশ্ব-বিশ্রুত বিশ্বকোষ।

—————:০:—————

গত বর্ষে একদিন প্রবীণ সাহিত্য-সেবী ও প্রসিদ্ধ সমালোচক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পদপ্রান্তে বসিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্য বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিতেছিলাম। সেই সময়ে প্রসঙ্গক্রমে বিশ্ব-বিশ্রুত বিরাট অভিধান 'বিশ্বকোষের' কথা উপস্থিত হয়। সরকার মহাশয় 'বিশ্বকোষ' অভিধান এবং তৎপ্রণেতা স্বনামখ্যাত মনস্বী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সম্বন্ধে নানা কথার অবতারণা করিয়া, তাঁহার স্বাভাবিক গম্ভীর মুখে হাসির রেখা ফুটাইয়া বলিলেন, "যিনি আমার কাছে আসিয়া নাকি সুরে বলেন, 'মহাশয়, বঙ্গ-সাহিত্যের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, পড়িবার মত একখানিও পুস্তক আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইল না, বাঙ্গালায় বই-এর মত বই একখানিও দেখিতে পাই না,'—আমি তাঁহাকেই বলি,—না, বঙ্গসাহিত্যের গৌরব 'বিশ্বকোষ' থাকিতে আপনার ঐ অনুযোগ চলিবে না। বঙ্গসাহিত্যের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, প্রতিদিনই তাহার লেখক-সংখ্যা বাড়িতেছে, কিন্তু একজনও পাঠকের মত পাঠক দেখিতে পাই না। নগেন্দ্রবাবু সারা জীবন ভূতের খাটুনি খাটিয়া যে অতুল অভিধান শেষ করিতে চলিলেন, তাহার পাঠক কৈ? আপনি বঙ্গভাষার দুঃখে আর কাঁদুনি গাহিবেন না, যদি বঙ্গমাতার প্রকৃত সেবক হ'ন, তবে আজ হইতে 'বিশ্বকোষ' পড়িতে আরম্ভ করুন। স্বীকার করি, বাঙ্গালায় বই এর মত বই বড়ই দুর্লভ, কিন্তু আমাদের 'বিশ্বকোষ' ত আছে, উহা একাই এক শ'।"

বাস্তবিকই যাহাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারে 'বিশ্বকোষের' ন্যায় নানাতত্ত্বসমন্বিত, বহু মৌলিকপ্রবন্ধ-বহুল, অশেষগবেষণাগর্ভ-নিবন্ধনযুক্ত, শাস্ত্রসাহিত্যেতিহাসপ্রত্নতত্ত্ব-বিজ্ঞান-ব্যাকরণ-সম্বন্ধীয় রচনাশোভিত দ্বাবিংশ খণ্ডব্যাপী অনন্ত বিদ্যার আধার, জ্ঞানের ভাণ্ডার সুবৃহৎ অভিধান বিদ্যমান, তাহাদের আবার কিসের অভাব?

বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রতি ভগবান্ বিশেষ সুপ্রসন্ন, তাই ছাব্বিশ বৎসর পরে বঙ্গমাতার প্রকৃত সেবক, বাঙ্গালীর গৌরব, সাহিত্যরথ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং অসাধারণ অধ্যবসায়গুণে বিগত ভাদ্র মাসে বিশ্ববিখ্যাত 'বিশ্বকোষ' সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই বিরাট ব্যাপার যে তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় সমাপ্ত করিতে পারিবেন, পূর্ব্বে তাহা অনেকেই বিশ্বাস করে নাই, এমন কি উহা কোন কালে শেষ হইবে কি না, তাহাই

আর্য্যাবর্ত্ত



শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব

Printed by K. V. Seyne & Bros.

সন্দেহের বিষয় ছিল। ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালায় আরও দুই তিন খানি বৃহৎ অভিধান-প্রণয়ন আরব্ধ হইয়াছিল, কিন্তু বাঙ্গালার দুর্ভাগ্যবশতঃ চিরন্তন প্রথানুসারে কেহ বা অঙ্কুরেই, কেহ বা দুই একটি পত্রপল্লবশোভিত হইয়াই অকালে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। জনসাধারণ মনে করিয়াছিল, হয় ত এখানিও "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" অবলম্বন করিবে। এমন কি 'বিশ্বকোষ'-রচয়িতা স্বয়ং নগেন্দ্রবাবুও রোগশোক-প্রপীড়িত হইয়া এবং দৈন্যতরবস্থার কঠোর কশাঘাত সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া সময়ে সময়ে মনে করিয়াছিলেন, হয় ত তাঁহার সাধের 'বিশ্বকোষ' অসম্পূর্ণ থাকিবে। সেই জন্য তিনি তাঁহার আত্মচরিতের একস্থানে লিখিয়াছেন,—"বড়ই আশায় উৎসাহিত হইয়া বিশ্বকোষের সঙ্কলন-ভার গ্রহণ করি। কিন্তু যে দেশে সাহিত্য-সেবীর অন্ন নাই, যে দেশের মহাকবি দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণত্যাগ করেন, সে দেশে আর আমার আশা কতদূর সফলা হইবে? বলিতে কি বিশ্বকোষ গ্রহণ করিয়া অল্প দিন মধ্যেই নানারূপ বিপদ্‌গ্রস্ত, এমন কি সর্ব্বস্বান্ত হইবার আশঙ্কায় কাতর হইয়াছিলাম। কিন্তু আমি একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সেই সকল বিপদ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছি। অনেক সময় তাঁহাকে জানাইয়াছি,—ভগবন্! হৃদয়ে বল দিন,—আমি যেন ভিক্ষা করিয়াও বিশ্বকোষ সমাধা করিতে পারি,—জীবনের একমাত্র ব্রত যেন উদ্‌যাপিত হয়।"

ভক্তের ভক্তিভরা প্রার্থনা কখনও নিষ্ফল হয় না। নগেন্দ্রবাবুর সুকরুণ কাতর প্রার্থনা করুণাময় পূর্ণ করিয়াছেন; শতসহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, বিপদের ভ্রূকুটিপূর্ণ রোষরক্তিম নয়নের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তিনি তাঁহার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়তর 'বিশ্বকোষ' সমাধা করিতে সমর্থ হইয়াছেন; তিনি তাঁহার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

সাহিত্যসেবী সুপরিচিত পণ্ডিত ৺রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় এবং তদীয় অনুজ প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক ১২৯২ সালে, (ইংরাজী ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে) ২৪ পরগণার অন্তর্গত রাহুতা গ্রাম হইতে প্রথমে 'বিশ্বকোষ' প্রকাশিত হয়। মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয়ই এই অক্ষয়কীর্ত্তিস্তম্ভের প্রতিষ্ঠাতা; ইঁহারা দুই বৎসর মাত্র, 'বিশ্বকোষ' প্রকাশিত করিয়া ছিলেন। ইঁহাদের তত্ত্বাবধানে সমগ্র 'অ'-বর্গ এবং 'আ'-বর্গের কিয়দংশমাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। অনন্তর নানা কারণে তাঁহারা এই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (পরে মহামহোপাধ্যায়)

মহাশয় 'বিশ্বকোষের' সূচনা হইতেই ইহার সঙ্কলন-বিষয়ে নিঃস্বার্থভাবে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি অযাচিত সাহায্য এবং সময়োচিত উপদেশ দান না করিলে হয় ত 'বিশ্বকোষ' সুধী-সমাজে প্রকাশিতই হইত না।

বড়ই দুঃখের বিষয়, রঙ্গলালবাবু পরলোকগমন করিয়াছেন। 'বিশ্বকোষের' সমাধান দেখিয়া আজ তিনি বিমল আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিলেন না। তদীয় সহোদর শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া বার্দ্ধক্যজীবনে এখনও মাতৃভাষার চর্চ্চায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের উপ্ত বীজ আজ পূর্ণাবয়ব বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে এবং পত্রপুষ্পফলপরিশোভিত হইয়া পরহিতার্থ জগতের সমক্ষে দাঁড়াইয়াছে দেখিয়া, ভগ্নস্বাস্থ্যজনিত ক্লেশ ভুলিয়া গিয়া তিনি নিশ্চয়ই অন্তরের অন্তস্তলে প্রীতি উপভোগ করিতেছেন।

'বিশ্বকোষের' প্রকাশ বন্ধ হইয়া গেল। বিদ্বজ্জন-সমাজ-মধ্যে অনেকেই ইহার জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্ব্বে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে গ্রেট ইডেন্ প্রেস হইতে 'শব্দেন্দু মহাকোষ' অভিধেয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষার একখানি বৃহৎ অভিধান প্রকাশিত হইতেছিল। 'বিশ্বকোষের' ভাবী সঙ্কলয়িতা নগেন্দ্রবাবুই উহার সঙ্কলন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুইজন সুযোগ্য সহকারি-সমভিব্যাহারে তিনি অত্যধিক পরিশ্রম করিয়া, এই কার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। কিন্তু সহকারিদ্বয়ের মধ্যে একজন অকালে কাল-কবলে পতিত হওয়ায় এবং অন্যান্য নানাবিধ দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ 'শব্দেন্দু মহাকোষে' 'অ' হইতে 'অনন্ত' শব্দ পর্য্যন্ত (প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠা) মুদ্রিত হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। বিগত তিন বৎসরের মধ্যে দুইখানি বৃহৎ অভিধান আরব্ধ হইয়া দুইখানিই অকালে লোপ পাইল দেখিয়া, পণ্ডিত মণ্ডলী কুহেলিকাচ্ছন্ন বঙ্গসাহিত্যাকাশের প্রতি করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিষাদে ম্রিয়মাণ হইলেন।

১২৭৩ সালের ২৩শে আষাঢ়, ইংরাজী ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই, শুক্রবার নগেন্দ্রবাবু জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং যে সময়ে তিনি 'শব্দেন্দু মহাকোষ' প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম আঠার বৎসর মাত্র। কিন্তু অজাতশ্মশ্রু কিশোর নগেন্দ্রনাথের প্রতিভা-স্ফুলিঙ্গ সেই সময়েই বাঙ্গালার দুই একটি মহাত্মার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এই প্রতিভা-স্ফুলিঙ্গ যে সুশিক্ষা ও সুবিধা-সংযোগে ক্রমে বৃহৎ জ্ঞানাগ্নিতে পরিণত হইয়া, পরিশেষে জ্ঞানালোক

বিকীরণ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ, এমন কি সুদূর পাশ্চাত্য জগতকেও উদ্ভাসিত করিবে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই রাজা স্যার্ রাধাকান্ত দেবের সুযোগ্য দৌহিত্র নানা ভাষাবিদ্ সুপণ্ডিত মহাত্মা ৺আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং প্রাজ্ঞ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সেই সময় হইতেই নগেন্দ্রনাথের প্রতিভাকে ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের যত্নেই ঐ অসামান্যা প্রতিভা বিপথগামিনী হইয়া বিনষ্ট হইতে পায় নাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আজ বিশ্ব-বিখ্যাত পণ্ডিত; তাঁহাকে কে না, জানে? কিন্তু আনন্দকৃষ্ণ বাবু সাধারণের নিকটে এমনই অপরিচিত ছিলেন যে, অনেকের নিকটেই তাঁহার নাম সম্পূর্ণ অজ্ঞতপূর্ব্ব। তিনিই প্রকৃত ধ্যানযোগীর মত বিরলে জ্ঞানার্জ্জনে সময় অতিবাহিত করিতেন, ভাব-চর্চ্চা করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের পূর্ণাদর্শের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করিতেন। এই জনতা-বহুল মহানগরে—যেখানে কারণে অকারণে সর্ব্বদা স্বার্থের সংঘর্ষে দারুণ দ্বন্দ্ব ও শূন্যগর্ভ সম্মানলাভ-চেষ্টায় কঠোর মনঃপীড়া উপস্থিত হয়,—সেখানে থাকিয়াও তিনি কখন স্বার্থের দিকে ফিরিয়া চাহেন নাই; কখন যশের কাঙ্গালী হয়েন নাই। তাই যাঁহারা তাঁহার পুণ্য নিকেতনে বহুকালের জ্ঞানসম্পৎসার পুস্তকে পরিবেষ্টিত ঋষিকল্প আনন্দকৃষ্ণবাবুকে দেখিয়াছেন, তাঁহারই তাঁহার জ্ঞানে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছেন, অপরের নিকট তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। অমর কবি গ্রে গাহিয়াছেন,—

"Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathom'd caves of ocean bear;
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air."

'শব্দেন্দু মহাকোষ' বন্ধ হইয়া গেলে, আনন্দকৃষ্ণ বাবুর পরামর্শানুসারে নগেন্দ্রবাবু পাথুরিয়াঘাটার বসু মহাশয় কর্তৃক নাগরাক্ষরে প্রকাশিত 'শব্দকল্প-দ্রুমের' পরিশিষ্টের শব্দ-সঙ্কলন-কার্য্যে ব্রতী হয়েন। এই সময়ে পুথি সংগ্রহাদির নিমিত্ত নগেন্দ্রবাবু মুর্শিদাবাদ জিলায় গমন করেন। তখন 'বিশ্বকোষ' দুই বৎসর মাত্র প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বহরমপুরের প্রসিদ্ধ কৃষিতত্ত্ববিদ্ ৺নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সহিত নগেন্দ্রবাবুর সাক্ষাৎ হয়। নৃত্যগোপালবাবু তৎকালে রেশমকীট-পালন এবং রেশম-বস্ত্রের উন্নতিকল্পে নানা গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। বেদে রেশম-কীট সম্বন্ধে কোন বিষয়ের

উল্লেখ আছে কি না, এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার জন্য তিনি নগেন্দ্রবাবুকে বিশেষ অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধ রক্ষার্থ নগেন্দ্রবাবু তাঁহাকে লইয়া বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাক্তার রামদাস সেনের পুস্তকাগারে গমন করেন। তখন রামদাস বাবু পরলোকে; কিন্তু তখনও তাঁহার স্বহস্ত-সংগৃহীত ঐতিহাসিক পুস্তকাগার তাহার অক্ষয় কীর্ত্তির ও প্রগাঢ় প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল। সেই বিখ্যাত পুস্তকাগারে তখনও বহু পণ্ডিত শুভাগমন করিয়া জ্ঞান-চর্চ্চায় ব্যাপৃত থাকিতেন। নগেন্দ্রবাবু তাঁহাদের সহিত পরিচিত হইয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিলেন; 'বিশ্বকোষ' বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া অনেকেই আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন এবং তৎপ্রকাশের আবশ্যকতা ব্যক্ত করিয়া নগেন্দ্রবাবুকে সেই কার্য্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

নগেন্দ্রবাবু কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শুনিলেন যে, 'বঙ্গবাসী'-সম্পাদক ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু এবং ঔপন্যাসিক ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 'বিশ্বকোষ' পুনঃ প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, তাঁহারা ঐ বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঐ কার্য্য বহুব্যয়সাধ্য ও দুরূহ জ্ঞানে, সেই সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া কিশোর নগেন্দ্র-নাথের মাথা ঘুরিয়া গেল,—অভীপ্সিত কার্য্য-সম্পাদন-কল্পে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। নগেন্দ্রবাবু ধনীর সন্তান হইলেও, তখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব, ঘটনাচক্রে সর্ব্বস্বান্ত, সামান্য চাকরীজীবী অথচ বৃহৎ-পরিবার-প্রতিপালক। তিনি শৈশবেই মাতৃহীন; তখন তাঁহার পিতৃদেব বর্ত্তমান, কিন্তু তিনিও স্বীয় অবস্থা-বিপর্য্যয়ে এবং অন্যান্য মানসিক কষ্টে বিকৃত-মস্তিষ্ক, উন্মাদ-রোগ-গ্রস্ত। পিতৃদেবের উপদেশ লইয়া যে তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, তাহারও উপায় নাই। সহায়-সম্বলহীন নগেন্দ্রনাথ কিন্তু স্বীয় সঙ্কল্প-বিচ্যুত হইলেন না। বাল্যকাল হইতেই, তিনি ভগবদ্ভক্ত। ভগবানের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া তিনি তাঁহার উপদেষ্টা ও শিক্ষাগুরু আনন্দকৃষ্ণবাবুর নিকটে উপনীত হইলেন। মহাত্মা আনন্দকৃষ্ণবাবু তাঁহার অসীম উৎসাহ ও ঐকান্তিক অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার এই সাধু সঙ্কল্প অনুমোদন করিলেন এবং তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া স্বাভাবিক স্নেহ-সিক্ত অমিয়বর্ষী ভাষায় বলিলেন,—"নগেন, যখন তুমি ভগবানের নাম স্মরণপূর্ব্বক সৎসঙ্কল্প ও সাধু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

হইয়া এই গুরুভার গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ, তখন ত ভগবানের কৃপায় তুমি নিশ্চয়ই তোমার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবে। 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'—ভগবানের এই মহদ্বাণী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিও, নিশ্চয়ই সফলকাম হইবে।" মহাত্মার ভবিষ্যদ্বাণী এতদিনে পূর্ণ হইয়াছে। তিনি জীবিত থাকিলে আজ আনন্দে আত্মহারা হইতেন।

আনন্দকৃষ্ণবাবুর উৎসাহ বাক্য নগেন্দ্রনাথের হতাশ হৃদয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত করিল। তিনি সেই দিনই কলিকাতার মিউজিয়মে গিয়া ত্রৈলোক্য বাবুর সহিত দেখা করিলেন। ত্রৈলোক্যবাবু সেই সময়ে মিউজিয়মের Econonic Section এর অন্যতম বিশিষ্ট কর্ম্মচারী। ত্রৈলোক্য বাবু তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া, উক্ত বিষয়ে তাঁহার আন্তরিক সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং অগ্রজ রঙ্গলালবাবুকে পত্র লিখিবার জন্য বলিলেন। রঙ্গলালবাবু সেই সময়ে তাঁহার কর্ম্মস্থান বীরভূমের লাঘাষায় অবস্থান করিতেছিলেন। নগেন্দ্রবাবু তাঁহার আত্মচরিতে লিখিতেছেন,—"সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত ভূতপূর্ব্ব বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এক পত্র লিখি। তিনি আমার পত্র পাইবামাত্র, বিশ্বকোষের স্বত্ব ও প্রকাশ-ভার অর্পণ করেন। এই সময়ে বিশ্বকোষের অন্যতম সম্পাদক উদার-হৃদয় সাহিত্যবীর ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দান ও বিশ্বকোষ-প্রকাশকল্পে সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করেন। বাস্তবিকই যখনই তাঁহার নিকট গিয়াছি, তাঁহার সৎপরামর্শ লাভে কখনও বঞ্চিত হই নাই।"

এইরূপে একুশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নগেন্দ্রবাবু বিশ্বকোষ-সঙ্কলন-ভার গ্রহণ করেন। তৎকালে তাঁহার সাংসারিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 'শব্দকল্পদ্রুমের' সামান্য চাকরীই তখন তাঁহার একমাত্র উপজীবিকা; তাহার উপর আবার আত্মীয়-স্বজনবহুল বৃহৎ পরিবার-প্রতিপালনের ভার তাঁহার উপরে ন্যস্ত। তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। যে দুই একখানি বহুমূল্য অলঙ্কার তখনও তাঁহাদের বাড়ীতে ছিল, নগেন্দ্রবাবু তাহাই বাঁধা দিয়া অর্থ সংগ্রহ করিলেন; গ্রেট ইডেন প্রেস হইতে 'বিশ্বকোষ' মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'অ'-বর্গের কিয়দংশ পর্য্যন্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের যত্নে প্রকাশিত হইয়াছিল। নগেন্দ্রবাবু 'অগ্নি' শব্দ—হইতে লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রথম কয়েক বৎসর আনন্দকৃষ্ণবাবু 'বিশ্বকোষের' যাবতীয় প্রবন্ধই মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে সংশোধন করিয়া দিতেন এবং 'বিশ্বকোষের' প্রথমাবস্থায় তিনি স্বয়ং গণিত-জ্যোতিষ-সংক্রান্ত কতিপয় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

নগেন্দ্রবাবু 'বিশ্বকোষের' কার্য্য চালাইতে লাগিলেন, কিন্তু তখনও 'শব্দকল্প-দ্রুমের' পরিশিষ্ট-সঙ্কলন-ভার পরিত্যাগ করিলেন না। এই ভাবে দুই বৎসর অতিবাহিত হইল। অতঃপর তিনি দেখিলেন যে, উভয় কার্য্য সম্পাদন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তখন অগত্যা তিনি 'শব্দকল্পদ্রুমের' সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

'বিশ্বকোষ' পুনরায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। কিন্তু গ্রাহক-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইল না, এমন কি যাঁহারা পূর্ব্বে গ্রাহক ছিলেন, তাঁহারাও গ্রাহকশ্রেণীচ্যুত হইতে লাগিলেন;—মনে করিলেন, নগেন্দ্রনাথ বালক, সে আর কত দিনই বা ইহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে? বালক, তাই এইরূপ দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। অনতিবিলম্বেই তাহার সাধ মিটিয়া যাইবে; সুতরাং অনর্থক গ্রাহক হইয়া অর্থ-নাশ করিয়া লাভ কি?

নগেন্দ্রবাবু মহা বিপদে পড়িলেন। দুই একজন গুণগ্রাহী ব্যক্তি ভিন্ন তখন কেহই তাঁহাকে চিনিতেন না। কাযেই জনসাধারণ তাঁহার উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না। এই সময়ে তিনি সমস্ত বৈদিক ও পৌরাণিক ভূগোল আলোচনা করিয়া 'বিশ্বকোষে' আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচীন মানচিত্র প্রকাশ করিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মহা আনন্দে সেই আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্র এসিয়াটিক সোসাইটীর অধিবেশনে প্রদর্শন করিলেন। সোসাইটীর সভাপতি-প্রমুখ সমবেত সুধীমণ্ডলী নগেন্দ্রবাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। পণ্ডিতে বুঝিলেন, বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে একজন অনুসন্ধিৎসু উদীয়মান প্রত্নতত্ত্ববিদের আবির্ভাব হইয়াছে। 'বিশ্বকোষের' গ্রাহক-সংখ্যা ক্রমে দুই একটি করিয়া বাড়িতে লাগিল।

এই সময়ে গভর্মেণ্টের সাহায্য-প্রার্থী হইয়া নগেন্দ্রবাবু শিক্ষাবিভাগের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ক্রফ্‌ট মহোদয়ের নিকটে আবেদন করেন। তখন মহামনা মনীষী মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি এই আবেদন অনুমোদন করিলেন। মহামতি ক্রফ্‌ট মহোদয় গুণের গৌরব বুঝিতেন। তাঁহার পরামর্শানুসারে গভর্মেণ্ট ১৫ কপি পুস্তকের গ্রাহক হইলেন।

এইরূপে 'বিশ্বকোষ' বিদ্বজ্জনসমাজে পরিচিত হইয়া নিজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল। 'বিশ্বকোষের' দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র স্বরবর্ণ সমাপ্ত হইল। তৃতীয় খণ্ডের প্রারম্ভে সম্পাদক মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া "কামরূপ" "কায়স্থ" ও "কুলীন" শব্দ লিখিলেন। 'বিশ্বকোষ'-পাঠক তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও গবেষণার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইল। সম্পাদকের গুণগরিমায় মুগ্ধ হইয়া শিক্ষিতমণ্ডলী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া 'বিশ্বকোষের' গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে লাগিলেন। গ্রাহক-সংখ্যা আশাতীত বৃদ্ধি হইল; কিন্তু তখনও 'বিশ্বকোষের' নিজের আয়ে তাহার ব্যয়-সঙ্কুলন হইতেছিল না। সম্পাদক মহাশয় ঋণগ্রস্ত হইয়া ইহার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছিলেন। অতঃপর নানা বিপদাপদ্ তুচ্ছ করিয়া, অসংখ্য বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি দশবৎসর 'বিশ্বকোষ' সম্পাদন করিলেন। দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিয়া 'বিশ্বকোষ' নিজের আয়ে নিজের ব্যয়-ভার বহন করিতে সমর্থ হইল। 'বিশ্বকোষ' নগেন্দ্রবাবুর নিজের "বিশ্বকোষ প্রেস" হইতে মুদ্রিত হইতে লাগিল। ১৩১০ সালে, নগেন্দ্রবাবু তাঁহার আত্ম-চরিতে লিখিয়াছেন,—"যে 'বিশ্বকোষ'রক্ষার জন্য আমি কতই আশঙ্কা করিয়াছি ভগবান্ সেই বিশ্বকোষের দ্বারাই কেবল আমাকে নহে, আমার আত্মীয়স্বজন অনেককেই প্রতিপালন করিতেছেন।"

'বিশ্বকোষ' নগেন্দ্রবাবুর কত স্নেহের সামগ্রী, আদরের বস্তু, তাহা বুঝাইবার জন্য একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করিব। ১৩১৬ সালের শ্রাবণ মাসে যখন তিনি বিষম 'বেরি-বেরি' ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া উত্থানশক্তিরহিত ও শয্যাগত হয়েন, সেই সময়ে একদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও সেই দিন রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। রোগক্লিষ্ট নগেন্দ্রবাবু আমাদিগের প্রতি কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। আমরা বুঝিলাম, তিনি কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু বলিতে পারিতেছেন না। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনি কি কিছু বলিবেন?" তাঁহার নয়ন হইতে দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু বিগলিত হইল। আমরা মনে করিলাম, তিনি রোগ-যন্ত্রনায় ঐরূপ কাতর হইয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমাদের ভ্রম দূর হইল। তিনি অতি করুণ স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আমার একটা বড় দুঃখ রহিয়া গেল যে, আমি বিশ্বকোষ শেষ করিয়া যাইতে পারিলাম না।" তাঁহার শত চেষ্টা সত্বেও অশ্রুধারা বাধা মানিল না—গণ্ড বহিয়া তাঁহার বুকের উপর পড়িতে লাগিল। তিনি কিঞ্চিৎ

প্রকৃতিস্থ হইলে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন,—"নগেন, তুমি পাগল হইলে নাকি? তুমি ত ভগবানে বিশ্বাস কর, তবে এত দুশ্চিন্তা করিতেছ কেন? 'বিশ্বকোষ' তোমার দ্বারাই সম্পূর্ণ হইবে। ঐরূপ চিন্তা করিও না। ভয় কি? তুমি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবে।" এই করুণ মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য আমি জীবনে কখনও ভুলিব না।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে 'বিশ্বকোষের' ন্যায় অথবা ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর একাধিক অভিধান বা Encyclopaedia প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির যত্নে ও কৃতিত্বে এরূপ বিরাট অভিধান আজ পর্য্যন্ত এক খানিও প্রকাশিত হয় নাই। সারা জীবন একমাত্র মহদুদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত করিয়া, ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া, শরীর পাত করিয়া পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে অকালে বার্দ্ধক্যের দ্বারে উপনীত হইতে অপর কাহাকেও দেখিয়াছেন কি?

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে 'বিশ্বকোষের' সমগ্র ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। কেবলমাত্র কয়েকটি বিশেষ ঘটনা লিখিত হইল। নগেন্দ্রবাবুর কৌতূহলোদ্দীপক জীবন-কথার এবং তাঁহার কৃতিত্ব, ধীশক্তি ও বহুদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিবার বাসনা রহিল।

একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলে, সত্যের অপলাপ করা হইবে। নগেন্দ্রবাবুর জ্যেষ্ঠতাতপুত্র সুলেখক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু মহাশয় 'বিশ্বকোষ'-সঙ্কলন-কার্য্যে দীর্ঘ দশ বর্ষ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথ,

"ভাই ভাই এক ঠাঁই,
ভেদ নাই ভেদ নাই।"

—মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এবং কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল,

"ভায়ের মায়ের এত স্নেহ,
কোথায় গেলে পাবে কেহ।"

—গাহিয়া ভাঙ্গা আসর যোড়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু তবুও বাঙ্গালী সেই পূর্ব্বের ন্যায়—"ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই"ই রহিয়াছে। এই "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" এর দিনেও নগেন্দ্রবাবু জ্যেষ্ঠগতপ্রাণ সোদর-প্রতিম ভাই পাইয়াছিলেন, তাই এত বড় ব্যাপারটা তিনি অনায়াসে সমাধা করিতে পারিলেন।

বাঙ্গালার আশার স্থল, ভরসার পাত্র নগেন্দ্রবাবু দীর্ঘজীবী হউন।

মৃত্যু-জয়।

সংগ্রামে জিত যবে শিখগুরু
তেগ বাহাদুর বীরে
দিল্লি-নগরে মোগল সৈন্য
আনিল অস্ত্রে ঘিরে'—
কহে বাদসাহ "হে গুরু, তোমার
দৈব শকতি দেখাও এবার,
কেমনে ধর্ম্ম করিলে প্রচার
পঞ্চ নদীর তীরে।"

গুরু কহে ধীরে, "কি আছে আমার,
ক্ষুদ্র মানব আমি,
শক্তির শুধু তিনি মূলাধার
যিনি অখিলের স্বামী।"
সম্রাট্ কহে, "দেখিব, হে বীর,
ধর্ম্মের তব মহিমা গভীর,
অসির আঘাতে উন্নত শির
ভূমে আসে কি না নামি।"

"মন্ত্র আমার পত্রে লিখিয়া—"
তেগ বাহাদুর কয়—
"ধরিলে কণ্ঠে অস্ত্র-আঘাতে
কিছুই নাহিক ভয়।"

লিখিয়া যত্র নৃপতি আদেশে,
বাঁধি সে পত্র নিজ গলদেশে,
"মন্ত্রের বলে"—কহে গুরু হেসে—
"মরণে করিব জয়!"

ঘাতুক আসিয়া নিমেষে সাধিল
নিষ্ঠুর কাজ তা'র,
ছিন্ন মুণ্ড লুটিল ধরায়
ছুটিল রক্তধার।
রুধিরলিপ্ত পত্র তখন
তুলি' পাঠ করে সভাসদজন,—
"দিলাম এ শির, দিবনা কখন
ধর্ম্ম—যা মোর সার।"

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

চিত্রপরিচয়।

বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত সরস্বতী চিত্র নিপুণ শিল্পী শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা মহাশয়ের অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি। চিত্রের কল্পনা ও বর্ণবৈচিত্র্য উভয়ই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক।

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ।

—:•:—

বর্ত্তমান কালে ভারতে দুর্ভিক্ষের সময় চাউল রপ্তানী বন্ধ করিবার প্রস্তাব সময় সময় উপস্থিত করা হয়। লর্ড নর্থব্রুকের শাসনকালে বাঙ্গালার ছোটলাট সারজর্জ্জ ক্যাম্বেল চাউল রপ্তানী বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। লর্ড নর্থব্রুক সে প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন নাই। ইংরাজী আমলের প্রথমভাগে ব্যবস্থা অন্যরূপ ছিল। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের কাগজপত্রে দেখা যায়, ১০ই জুন তারিখে কলিকাতার চাউল বিক্রেতাদিগকে চাউল রপ্তানী করিতে দেওয়া হয়; কারণ, তখন সরু চাউল টাকায় ৩২৷৷০ সের ও মোটা চাউল টাকায় ৪০ সের বিকাইতেছিল এবং ২০০০০০ মন চাউল মজুদ ছিল। ইহাতে তিনটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে—প্রথম চাউলের দর—এই দর শায়েস্তা খাঁর কথা মনে করাইয়া দেয়, দ্বিতীয় সরু চাউলের দামে ও মোটা চাউলের দরে তারতম্য, তৃতীয় কলিকাতার মত ক্ষুদ্র স্থানেও কত চাউল মজুদ থাকিলে চাউল রপ্তানীর আদেশ দেওয়া হইত।

———

গল্প আছে, এক ব্যক্তি ছারপোকার দংশনে বিব্রত হইয়া শেষে চারপাই-খানিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ ঘটনার উল্লেখ এদেশে ইংরাজের কাগজপত্রে আছে। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন লাটন উইয়ের অত্যাচারে বিব্রত হইয়া তরণীখানি জলমগ্ন করিবার আদেশ প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনা বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া তরণীখানি ডুবাইবার আদেশই দেওয়া হয়।

———

নবকৃষ্ণ ক্লাইবের মুন্সী ছিলেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব নবকৃষ্ণের জন্য কাউন্সিলের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া কাউন্সিল স্থির করেন—নবকৃষ্ণ যেরূপ ভাবে কায করিয়াছেন, তাহাতে তিনি অনুগ্রহের উপযুক্ত। তাঁহাকে ১৭ই জানুয়ারী হইতে মাসিক ২০০৲ টাকা বেতনে কোম্পানীর রাজনীতিক 'বেনিয়ান' নিযুক্ত করা হয়। ইহাই নবকৃষ্ণের সৌভাগ্যের সূচনা।

———

মিষ্টার জেম্স রেনেল এ দেশে ইংরাজ প্রাধান্যের সূচনাকালে দেশ জরীপ করিয়া যে মানচিত্র রচিত করেন, আজও অনেক স্থানে তাহাই ঐতিহাসিকের অবলম্বন। কাগজপত্রে দেখা যায় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে স্থির হয়, তিনি জরীপ কার্য্যে যেরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয় ও কোম্পানীর হিতকর বলিয়া তাঁহাকে মাসিক ৩০০ টাকা বেতনে সার্ভেয়ার জেনারল নিযুক্ত করা হয়। এই বেতন তখন যথেষ্ট বিবেচিত হইয়াছিল।

১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে চাউলের দুর্ম্মূল্যতাহেতু লোকের অসুবিধার কথা অবগত হইয়া ইংরাজ আদেশ প্রচার করেন যে, কেহ টাকায় ১ মন ১০ সেরের কম চাউল বিক্রয় করিলে দণ্ডিত হইবে।

১৭৫১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় চাউলের ও তৈলের দুর্ম্মূল্যতাহেতু লোকের কষ্ট হওয়ায় ইংরাজগণ এই দুই দ্রব্যের উপর শুল্ক উঠাইয়া দেন ও কুলীর পারিশ্রমিক বাড়াইয়া দৈনিক ২ পন ১২ গণ্ডা কড়ী দিবার ব্যবস্থা করেন।

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টারস কলিকাতায় পত্র লিখিয়া কোন্ কোন্ টেক্স দরিদ্রদিগের পক্ষে কষ্টকর তাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন; এবং স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন, বিবাহের উপর টেক্স দরিদ্রদিগের পক্ষে পীড়াদায়ক সুতরাং উহার বিলোপ বাঞ্ছনীয়। অন্ততঃ উহা যেন বিশেষ বিবেচনা করিয়া আদায় করা হয়।

শ্রীঅরুণেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

গোঁফের মূল্য।

(১)

"মিত্র সাহেব" (আমাদের প্রতিবেশী গঙ্গাধর মিত্রের পাশ্চাত্য-বেশভূষা-প্রিয় পুত্র ননীগোপাল মিত্রকে বিদ্রূপ করিয়া আমরা 'মিত্র সাহেবই' বলিতাম) যখন কক্ষদ্বার অর্গলরুদ্ধ করিয়া নানা দ্রব ও তরলপদার্থ-সহযোগে দুই ঘণ্টা ধরিয়া গুম্ফ-বিন্যাসের কঠোর সাধনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, তখন আমরা গোপনে গবাক্ষপথে তাঁহার এই দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া কতই না বিদ্রূপের হাসি হাসিতাম! কিন্তু হায়! কে তখন জানিত—। যাহা হউক, জীবনের সেই দুঃসহ দুঃখের কথাই বলিতে বসিয়াছি।

বাল্যকালে রমণী-সমাজে আমার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বালিকারা আমাকে তাহাদেরই একজন বলিয়া মনে করিত, যুবতীরা সরলচিত্তে আমার কাছে তাহাদের মনের কথা খুলিয়া বলিত, এবং বর্ষীয়সীগণের মাতৃস্নেহে আমার একচেটিয়া অধিকার জন্মিয়াছিল। এই রমণীজনপ্রিয়তার প্রধান কারণ, বোধ হয়, আমার রমণীসুলভ সুকুমার আকৃতি।

স্ত্রীবেশে সাজিয়া আমি যখন হাসি-হাসি-মুখে বাসরঘরে যাইয়া বসিতাম, তখন মুগ্ধ বর বধূকে ভুলিয়া সতৃষ্ণনয়নে আমারই মুখের দিকে চাহিত; কন্যা দেখিতে আসিয়া কত তীক্ষ্ণদৃষ্টি যুবক যে কন্যার পরিবর্ত্তে আমাকে দেখিয়া "সুন্দরী" বলিয়া পছন্দ করিয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। গীতবাদ্যেও আমার অধিকার ছিল। রমণী-সমাজে আমার অতুল প্রতিপত্তির তাহাই দ্বিতীয় কারণ।

আমার এই বিপুল সৌভাগ্য দেখিয়া আমার ঈর্ষ্যাপরায়ণ বালক-বন্ধুরা আমায় গালি দিয়া বলিত "মেয়েমুখো"। কিন্তু আমার প্রীতিময় বালিকা-বন্ধুদিগের স্নেহলাভে কৃতার্থ আমি সে অপবাদ সানন্দে মাথায় তুলিয়া লইতাম।

(২)

কিন্তু কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইতেই, কি জানি কেন, সহসা আমার মনের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সুকুমারী আমার সঙ্গে অবাধে মিশিয়া থাকে, আমার সঙ্গে ছুটাছুটি করিতে, আমার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে তাহার কিছুমাত্র আপত্তি নাই;

কিন্তু নগেনকে দেখিলে সে সঙ্কুচিতা হইয়া মুখ নীচু করিয়া দাঁড়ায়! আমার দিকে সে সরলভাবে—স্বাধীনভাবে চাহিয়া থাকে, কিন্তু নগেনকে দেখিবার জন্ত তাহাকে গবাক্ষপথের আশ্রয় লইতে হয়!—কি জানি কেন, তাহার নগেনের প্রতি আচরণই আমার অধিক লোভনীয় বলিয়া মনে হয়।

নগেন আমার সমবয়সী। যুবতীরা তাহাকে দেখিয়া মাথায় কাপড় দেয়, লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া লয়, অথচ আমার সঙ্গে তাস খেলিতেও সঙ্কুচিতা হয় না, আমাকে দিয়া আপনাদের প্রেমপত্র লিখাইয়া লইতেও ইতস্ততঃ করে না; ইহাতে আমার মর্য্যাদাবুদ্ধি যেন ব্যথিত হয়। এই অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতাকে আমার যেন উপেক্ষা বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এই বিষম পার্থক্যের কারণ কি? নগেনের নবোদ্গত ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফরাজিই নহে কি? হায়! আমি কি পাপে এ ধনে বঞ্চিত হইলাম? "হায়রে কি পাপে?"

(৩)

চেষ্টা, পরিশ্রম, অর্থব্যয়—কিছুরই ত্রুটি করি নাই, কিন্তু সকলই বিফল হইল। আমি রমণীর ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলে আজিও চারিদিকে করতালির ধূম পড়িয়া যায়—রমণীর ছদ্মবেশ ধারণ করিলে আজিও আমাকে অনেকে চিনিয়া উঠিতে পারে না! সুতরাং আমার দুঃখের অবধি ছিল না। লিখাপড়া শেষ করিয়াছিলাম, বুদ্ধি-বিবেচনারও সকলে সুখ্যাতি করিত; কিন্তু একটা মনের মত কায কোথাও জুটিল না।

ম্যানেজারীর প্রার্থী হইয়া মালিকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেই মালিক বলিতেন, "এ সকল কাযের জন্য একটু শক্ত লোকের প্রয়োজন, ম্যানেজারের প্রধান প্রয়োজন শাসন-ক্ষমতা; সেটুকু না থাকিলে কায চলা অসম্ভব।" আমার যে শাসন-ক্ষমতার অভাব নাই, এ কথা বুঝাইবার জন্য কত চেষ্টা করিতাম, কিন্তু গুম্ফাভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণে সকলই "বাতিল" হইয়া যাইত। সুতরাং কোন প্রকার দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম আমার পাইবার সম্ভাবনা রহিল না। অধিকাংশ স্থলেই বেতন দায়িত্বের উপরেই নির্ভর করে; সুতরাং কোন ভাল কাযই আমার অদৃষ্টে জুটিল না।

হতাশ হইয়া এক সওদাগরি আফিসে দায়িত্বহীন কেরাণীর পদ গ্রহণ করিলাম। কিন্তু হায়! দুর্ভাগ্যের শেষ হইল না।

(৪)

আকৃতিতে পৌরুষভাব না থাকিলেও, চিত্তে আমার "পুরুষত্বের" অভাব ছিল না আমি স্বাধীন প্রেমের প্রবল পক্ষপাতী ছিলাম। প্রেমের দান স্বাধীনতার দান। স্বাধীনভাবে স্রোতস্বিনী আসিয়া সাগরে মিলিত হয়—সে-ই প্রকৃত মিলন। খাল কাটিয়া জল আনিয়া মিলন ঘটাইয়া দিলে মিলন হয় না। প্রেম যে স্থানে স্বতঃ-নিঃসারিত উৎসের মত হৃদয়ের মধ্যে আপনি উথলিয়া উঠে, সেই স্থানেই সে পবিত্র, মহান্, অমূল্য। কিন্তু যথায় জোর করিয়া কর্ষণের দ্বারা, জলসেচনের দ্বারা, "সার" প্রদানের দ্বারা শস্যের মত তাহাকে উৎপন্ন করিতে হয়, তথায় তাহা নিতান্তই মূল্য-হীন। তাই হিন্দুসমাজের শিক্ষা ও সাধনা-সঞ্জাত বালিকা-বধূর দুর্ব্বল প্রেমের পরিবর্ত্তে, প্রেমের স্বতোচ্ছ্বসিত মন্দাকিনী-ধারা প্রাণ ভরিয়া পান করিবার আশায় অন্য সমাজে মিশিয়াছিলাম। কিন্তু তখন একটা কথা ভাবিয়া দেখি নাই। সংকীর্ণ প্রেম অপেক্ষা স্বতোচ্ছ্বসিত প্রেমের সংগ্রহব্যাপার অত্যন্ত ধৈর্য্য ও পরিশ্রমসাপেক্ষ! হিন্দুগৃহে পাঁচজন মিলিয়া এই প্রেম সংগ্রহ করিয়া দেয়, পিতা মাতা ভাই বন্ধু সকলেই প্রার্থীকে সাহায্য করে, এমন কি, অনেক সময় স্বয়ং প্রার্থীকে চেষ্টা-মাত্রও করিতে হয় না; কিন্তু হায়! স্বাধীন প্রেমের বিশাল ক্ষেত্রে ভীষণ নির্জ্জনতা—প্রার্থী শুধু "একা একাকী।"

আমি আত্মনির্ভরপরায়ণ হইয়া প্রার্থনা-মন্দিরে, ইডেন গার্ডেনে, মিউজিয়মে, বোট্যানিক্যাল গার্ডেনে, আলিপুরের চিড়িয়াখানায়, প্রেমের উৎস সন্ধানের জন্য চক্ষু যুগলকে অবিরত অতন্দ্রিত করিয়া রাখিলাম। অবশেষে একদিন শুভদিন আসিল। সে দিন মুগ্ধ হৃদয়কে গোধূলির অরুণ-রাগ-রঞ্জিত আকাশতলে "ধূলিশয়ান" রাখিয়া ম্লানমুখে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

(৫)

শুভ দিনে দেবী ভক্তের ধূলি-ধূসর হৃৎপিণ্ডটিকে স্নেহভরে আপনার করকমলে তুলিয়া লইলেন। দেবী আমারই প্রতিবেশী ভূধর বাবুর কন্যা। সবে মাত্র অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন; কোন কলেজের তৃতীয়বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন—নাম হেমাঙ্গিনী। শুধু কি নামে? অঙ্গে সত্যই তপ্ত কাঞ্চনের প্রদীপ্ত জ্যোতিঃ, মুখে শত সুধাকরের লাবণ্য,

মস্তকে জলভরা শ্রাবণের ঘনকৃষ্ণ কাদম্বিনী। চক্ষুতে বিদ্যুৎ ছিল, কিন্তু সে প্রেমের আচ্ছাদনে স্নিগ্ধ, দয়ার আবরণে শীতল।

ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমি আবৃত্তি করিতাম, হেমাঙ্গিনী শুনিত; হেমাঙ্গিনী আবৃত্তি করিত, আমি শুনিতাম। হেমাঙ্গিনী গান করিত—(কি মধুর, কি সুধাবর্ষী সঙ্গীত!)—আমি বাজাইতাম; হেমাঙ্গিনী বাজাইত, আমি গাহিতাম।

আমার নিকট হেমাঙ্গিনীর কিছুমাত্র সঙ্কোচ ছিল না; স্বচ্ছ সরলতায় সে আমাকে তাহার সহপাঠীর মত মনে করিত, আমার কাছে পড়া বুঝাইয়া লইত, আমাকে দিয়া প্রবন্ধ লিখাইত, জীবনের আশা ভরসা সুখ দুঃখের কথা সব আমার কাছে খুলিয়া বলিত।

স্বর্ণময় প্রভাতের নবোদিত রবিরশ্মিরেখা আমি আমার ভাগ্য-গগনে সুস্পষ্ট অঙ্কিত দেখিতে পাইতেছিলাম!

(৬)

রবিবার প্রাতে হেমাঙ্গিনীর ঘরে বসিয়া চা পান করিতেছিলাম। আজিকার পরিপূর্ণ অবকাশের দিন কিরূপে যাপন করা যাইবে, চা-পানের সঙ্গে সঙ্গে সে বিষয়েরও আলোচনা চলিতেছিল। সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যান হইতে সুরভিত বায়ু আসিয়া আমাদের আনন্দকে নিবিড় করিয়া দিতেছিল, উষার স্বর্ণকিরণ হেমাঙ্গিনীর চূর্ণ কুন্তলে পড়িয়া তাহাকে স্বর্গীয় শোভায় মণ্ডিত করিতেছিল, এমন সময়ে কে একজন যেন "ব্যস্ত-সমস্ত" ভাবে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃষভ-গঞ্জন স্বরে ডাকিল, "হেমাঙ্গিনী!" হেমাঙ্গিনী চমকিয়া মুখ ফিরাইল, আগন্তককে দেখিয়া এক মুখ হাসিয়া বলিল, "এই যে প্রবোধ বাবু! শিমলা থেকে কবে এলেন?" প্রবোধ বাবু বলিলেন, "এই মাত্র—" তিনি আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে সহসা আমার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। হেমাঙ্গিনীর দিকে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ইনি?" হেমাঙ্গিনী যেন একটু লজ্জিতা হইয়া বলিল "হাঁ হাঁ ইনি, ইনি বিনোদ বাবু এঁর সঙ্গে আপনার আলাপ হয় নি বুঝি? ইনি এই যে আমাদের পাশের বাড়ীতেই থাকেন।" প্রবোধ তখন তাহার খরদৃষ্টি আমার উপর স্থাপিত করিয়া কহিল "কই—আগেত এঁকে দেখি নি! কত দিন এ দিকে এসেছেন?" প্রবোধের দন্ত্যাগ্র স্থূল গুম্ফ দেখিয়া আমি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। অপরাধীর

মত কহিলাম, "আজ্ঞে এই সম্প্রতি।" প্রবোধ বলিল, "বেশ বেশ। আপনার সঙ্গে আলাপ হ'ল, বড় আনন্দের কথা।" কিন্তু তাহার সেই ভ্রূকুটি-কুটিল রুক্ষ বদনমণ্ডলে আনন্দের কোন লক্ষণই দেখিলাম না। হেমাঙ্গিনীকেও যেন একটু সঙ্কুচিতা বোধ হ'তে লাগিল। অগত্যা হেমাঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া বলিলাম, "এখন তবে আসি ?"

হেমাঙ্গিনী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "এখনি ? এখনি যাবেন ?"

দেখিলাম, আমি গেলে বেচারা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া আসিলাম।

(৭)

এখন হইতে অতি সাবধানে হেমাঙ্গিনীর বাটী যাইতে হয়। কি জানি কেন, প্রবোধের দৃষ্টিতে পড়িবার আশঙ্কা সর্ব্বদা আমাকে পীড়িত করিতে থাকে। প্রবোধের অনুপস্থিতিতে হেমাঙ্গিনী আমার সঙ্গে তেমনই সরলভাবে কথা কয়, তেমনই হাসে, তেমনই গান গায়। কিন্তু প্রবোধ আসিলেই সব গোলমাল হইয়া যায়।

প্রবোধ আমার দিকে উগ্রদৃষ্টিতে চাহিতে থাকে, আমার মুখ শুকাইয়া যায়, হেমাঙ্গিনী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে! আজকাল আর একটা দুষ্টসংশয় কঠিন কণ্টকের মত হৃদয়কে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। হেমাঙ্গিনী কাহাকে বেশী ভালবাসে ? আমাকে না প্রবোধকে ? আকৃতি, সৌন্দর্য্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, কবিত্ব, কল্পনা, সকল বিষয়েই প্রবোধ আমা অপেক্ষা নিকৃষ্ট ; তবু যদি হেমাঙ্গিনী তাহাকে ভালবাসে, তাহা হইলে স্ত্রীচরিত্র দুর্জ্জেয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু তবু কঠোর সন্দেহ থাকিয়া থাকিয়া হৃৎপিণ্ডকে পীড়িত করে। হেমাঙ্গিনীর মনোভাব স্পষ্ট বুঝা যায় না—জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হয় না!

(৮)

আশাভঙ্গের কঠোর বেদনা আজ হৃদয়কে ব্যথিত করিতেছিল। আমাদেরই আফিসে বড় কেরাণীর পদ শূন্য হইয়াছিল। আমি ও আর একজন কেরাণী এই দুই জনের মধ্যেই একজনের পদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল। "ছোট সাহেব" আমার জন্যই বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন। সুতরাং পদপ্রাপ্তি সম্বন্ধে অনেকটা আশান্বিত হইয়াছিলাম।

আজ আফিসে যাইবামাত্র "বড় সাহেব" আমাদের দুজনকেই ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমাদের কাগজ পত্র সব দেখিয়া অবশেষে 'সাহেব' আমাদের দুজনেরই মুখের দিকে চাহিলেন। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আপনার পরিপুষ্ট গুম্ফশ্রেণীকে মহিষশৃঙ্গরূপে বিন্যস্ত করিয়া আসিয়াছিলেন, আমার গুম্ফ ক্ষীণ কৃষ্ণরেখা অতিক্রম করে নাই। 'সাহেব' আমার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, "তোমাকে দেখিলে খুব বুদ্ধিমান বলিয়া মনে হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মের পক্ষে তোমার বয়স বড় কম।" আমি ব্যগ্রভাবে বলিলাম, "সে কি মহাশয়, আমি বিজয় বাবু অপেক্ষা বয়সে এক বৎসরের বড়।" 'সাহেব' উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "তোমরা বয়স কমাইতেও যেমন, বাড়াইতেও তেমনই; যখন যাহাতে সুবিধা হয়। বিজয় বাবু তোমা অপেক্ষা অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের বড়। আমি এদেশে কায করিয়া করিয়া চুল পাকাইয়াছি, বয়সের আন্দাজ, বোধ হয়, একটু আধটু করিতে পারি!" হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। বন্ধুবরের গুম্ফই বিজয় লাভ করিল। মনঃকষ্ট দূর করিবার জন্য লোকে প্রিয়জনের অন্বেষণ করে। অমর কবি মধুসূদন বলিয়াছেন:—

"তেমতি যে মনঃ
কাতর, দুঃখের কথা কহে সে অপরে!"

তাই ছুটিয়া হেমাঙ্গিনীর কাছে চলিলাম। কিন্তু দ্বারের কাছে পৌঁছিয়া যাহা শুনিলাম, তাহাতে পদদ্বয় অবশ হইল, মস্তকে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, নয়নে অন্ধকার দেখিলাম!

প্রবোধ রুদ্ধকণ্ঠে কহিতেছিল, "দেখ হেমাঙ্গিনী, আমি বিনোদ বাবুর সঙ্গে তোমার এতদূর ঘনিষ্ঠতা সহ্য করিতে পারিব না। প্রেম ঈর্ষ্যাপর।" শুনিয়া হেমাঙ্গিনী মধুর কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। বলিল, "তুমি কি সত্যি পাগল হ'লে? বিনোদ!—ও তো একটা ছোঁড়া মাত্র! ওর উপর তোমার হিংসে! কোন্ দিন হয় ত সুধীরের উপরও তোমার হিংসে হবে!" (সুধীর প্রবোধের দশম বর্ষীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা)। আর শুনিতে পারিলাম না। ছুটিয়া ঘরে আসিয়া উপাধানে মুখ লুকাইলাম।

হায় গুম্ফ! হায় পুরুষের বিজয়-নিশান, প্রেমবল্লীর আশ্রয়মঞ্চ, পৌরুষ তেজের অমোঘ মানদণ্ড!

সমবেদনা-পরায়ণ কোন কোন বন্ধু পরামর্শ দিলেন, স্বল্পমাত্র গোঁফ কামাইয়া ফেল, তাহা হইলে এ দুর্ব্বলতা আর কেহ বুঝিতে পারিবে না।

হতাশ হইয়া একদিন তাহাই করিলাম। কিন্তু তাহাতেও ফল হইল না! একদিন বৌদিদির সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম, তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আ কপাল! এ আবার কি কর্‌লে? এ যে ঠিক 'বিন্দে দূতীর' মত দেখাচ্চে!" বাল্যকালে পাঠ্য পুস্তকে পড়িয়াছিলাম ঘোড়ার নালের একটা পেরেকের জন্য যুদ্ধে পরাজয় হইয়াছিল। কথাটা তখন বিশ্বাসযোগ্য মনে করি নাই। আজ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি। শুদ্ধ একজোড়া গুম্ফের জন্য আমার সমস্ত জীবন আজ বিফল হইতে চলিল!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

শারদীয়া জ্যোৎস্না।

ত্রিদিবের কোন্ রশ্মি লো সুর সুন্দরি,
ছড়ায়ে দিয়াছ শ্যাম বঙ্গের মাঝারে;
আত্মহারা দিশাহারা মুগ্ধা! বিভাবরী,
কি হর্ষ উচ্ছাসে বক্ষে বাঁধিল তোমারে।
এ তিন ভুবনে কোথা এ হেন কিরণ,
মাধুর্য্যের পূর্ণ ছবি প্রকৃতি বাসরে;
বল বল জ্যোতির্ম্ময়ী এ জ্যোতি শোভন,
দাও কি বঙ্গেরে ভালবাসিয়া আদরে?
তুমি কি বাস গো ভাল বঙ্গের নলিনী?
স্বচ্ছ সরসীর বুকে জল ঢল ঢল;
তুমি কি বাস গো ভাল কুমুদ কামিনী?
পাপিয়ার উচ্চকণ্ঠে উচ্ছ্বাস শ্রবণ!
তাই কি বঙ্গের বুকে পড়েছ ঢলিয়া,
শরতের কম রূপে প্রণয়ে মজিয়া!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

য়ুরোপ-ভ্রমণ।

—:*:—

ইংলণ্ড।

প্যারিস হইতে যেদিন ইংলণ্ডে আসিলাম, সূর্য্যদেব সেদিন বড়ই সদয়। ইংলিশ-চ্যানেল পার হইবার সময় আকাশ মধ্যে মধ্যে একেবারে মেঘমুক্ত ছিল। এমন কি, কিছুক্ষণ বাস্তবিকই রৌদ্রে কষ্ট হইয়াছিল।

ক্যালে হইতে ডোভার আসিতে প্রায় দেড় কি দুই ঘণ্টা লাগে। ষ্টীমারগুলি খুবই ছোট। নিম্নে আহারের ঘর প্রভৃতি আছে, কিন্তু যাত্রীরা প্রায় সকলেই ডেকে থাকেন। আকাশ পরিষ্কার, সমুদ্র শান্ত, কাজেই কাহারও সমুদ্র-পীড়া হয় নাই। ডেকের উপর চেয়ার বিছাইয়া খবরের কাগজ পড়িতে লাগিলাম। মনে তখন অত্যন্ত কৌতূহল। এখনই ইংলণ্ড দেখিব, না জানি, সে কেমন। কিছুক্ষণ পরে যখন দূরে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ চকশৃঙ্গ chalk cliffs ধূম্রবৎ দেখা যাইতে লাগিল, তখন অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত উঠিয়া দেখিতে লাগিলাম। সেই সময় একজন ইংরাজ আসিয়া আমার সহিত আলাপ করিলেন। তিনি এককালে এ দেশে লাট ছিলেন, দেশে ফিরিয়াও অনেক উচ্চ রাজপদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তিনি আমাকে বাঙ্গালী দেখিয়া বাঙ্গালা দেশের অনেক সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন ও ডোভারের বন্দরে যে যে স্থানে দুর্গাদি আছে, তাহা দেখাইয়া দিতে লাগিলেন।

জাহাজের উপর Customs পরীক্ষা হইল। একজন কর্ম্মচারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি আপনার ব্যাগ ?" আমি বলিলাম, "হাঁ।" তিনি ব্যাগের উপর একটি টিকিট লাগাইয়া দিলেন; ঐ পর্য্যন্ত।

ডোভার হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত ফ্লোরেন্স নামক পুলম্যান গাড়ীতে গিয়াছিলাম। গাড়ীর এক দিকে অনুচরদিগের টেব্‌ল ও আলমারি, অবশিষ্ট অংশে ছোট ছোট টেব্‌ল এবং প্রত্যেক টেব্‌লের দুই পার্শ্বে এক এক খানা খুব বড় চেয়ার। চেয়ারের নিকটেই ইলেকট্রিক ঘণ্টার বোতাম। বোতাম টিপিলেই অনুচর আসিয়া আদেশ প্রতীক্ষা করে। গাড়ীতে বৈদ্যুতিক পাখা ও আলো। গাড়ীতে উঠিয়া ইংলণ্ডের ধনীদিগের ঐশ্বর্য্যের কিছু আভাস পাওয়া গেল। যত লোক ঐ গাড়ীতে ছিলেন, চুরুটের ও দেশ-

লাইয়ের বাক্স সকলেরই দেখিলাম—স্বর্ণ-নির্ম্মিত। দেখিয়া শুনিয়া আমি আর আমার চামড়ার চুরুটের খাপটি বাহির করিলাম না। অনুচরের নিকট সিগারেট কিনিয়া লইলাম। গাড়ীতে এক পেয়ালা চাএর দাম (অবশ্য ২।১ খানা কেক সহ) ৬॥ শিলিং এবং ৬টা সিগারেটের দাম এক শিলিং (৮৹ আনা)। ডোভারে জেটির উপরেই ট্রেণে উঠিলাম। তখনও ইংলণ্ডের মাটিতে পা দিই নাই। ডোভার হইতে লণ্ডন ৭৫ মাইল। আমাদের ট্রেণ কোথাও না থামিয়া বরাবর ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে লণ্ডন পৌঁছিল। ভূগোল পড়িয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে একটা ধারণা ছিল যে, ইংলণ্ড এমনই জনবহুল যে, খোলা জায়গা বুঝি মোটেই নাই। এখন দেখিলাম, সে ধারণা বড়ই ভুল। আমাদের দেশেরই মত রেলের দুইধারে কেবলই মাঠ, মধ্যে মধ্যে কেবল লোকের বাসভূমি, গ্রাম ও সহর। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, মাঠগুলি প্রায় সবই কর্ষিত এবং বিজ্ঞাপনে পরিপূর্ণ। মাঠের মধ্যে যেখানে সেখানে প্রকাণ্ড ভারা খাড়া করিয়া তাহার উপর চা, মদ, চুরুট, বিস্কুট প্রভৃতির বিজ্ঞাপন; আর কোথাও কোথাও জমীভাড়ার বিজ্ঞাপন। আর একটা জিনিষ বড় দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। ছোট ছোট গ্রামগুলিতে, ছোট ছোট বাড়ীগুলির মধ্যে ব্যবধান বেশ পরিষ্কার।

মাঠে যে সকল জানোয়ার বেড়াইতেছে—গোরু, ভেড়া, মুরগী, হাঁস, ঘোড়া প্রভৃতি—সবই আমাদের দেশের জীবজন্তু অপেক্ষা অনেক বড় বড়। বলিতে কি, প্রথম দর্শনে আমার একপাল ভেড়াকে গরুই মনে হইয়াছিল।

ডোভার ছাড়াইয়া রেল প্রথমে কয়েক মাইল সমুদ্রের খুব কাছ দিয়াই যায়। পাহাড়ের উপর ও ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে বামে সমুদ্র উঁকিঝুঁকি মারিতেছে, বাস্তবিকই বড় মনোরম! পথে অনেকগুলি সুড়ঙ্গ আছে। যেটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়, সেটি পার হইতে ৪ মিনিট ৪৫ সেকেণ্ড লাগিল।

সাড়ে পাঁচটার সময় চেয়ারিং-ক্রশ ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। তাহার কিছু পূর্ব্বেই লণ্ডনে ট্রেণ প্রবেশ করিয়াছে। কেবল বাড়ীর পর বাড়ী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। টেম্‌স্‌ পার হইয়া ষ্টেশনে পৌঁছিতে হয়। পুলের উপর হইতে পার্লামেণ্ট গৃহ দেখিলাম; খুব গাম্ভীর্য্য-গর্ব্বময় বোধ হইল।

যখন লণ্ডনে পৌঁছিলাম, তখনও বেলা আছে। ভ্রাতা ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি সেই স্থানে হ্যাট খুলিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক

পদধূলি লইলেন। সহযাত্রী ও অন্যান্য লোক হাঁ করিয়া থাকিল; বোধ হয় মনে করিল, আমি একটা ছোট খাট দেবতার মধ্যে।

ব্রেকে যে মাল ছিল, তাহা বাহির করিয়া লইয়া একটি Taxicabএ চড়া গেল। তারা বলিলেন, কিছুক্ষণ সহর দেখিয়া বাসায় যাওয়া যাইবে।

ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই বামে ট্রাফালগার উদ্যান ও নেল্‌সনের মনুমেণ্ট দেখিলাম। তাহার পর পার্লামেণ্টের নিকট দিয়া সেণ্ট-জেম্‌স্ পার্ক, হাইড্ পার্ক প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে রিজেণ্ট ষ্ট্রীট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাস্তা পার হইয়া লণ্ডনের উত্তরে ফিন্সবেরী নামক স্থানে বাসায় উপনীত হইলাম। তথায় প্রবাসী বাঙ্গালী যুবকদিগের শীর্ষস্থানীয় শ্রীমান্ ফণী আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সে রাত্রিতে আর কোথাও যাওয়া হয় নাই। আহারাদির পর ভ্রাতার সহিত গল্প গুজবেই ১টা পর্য্যন্ত কাটাইয়া দেওয়া গেল।

প্রথম দৃষ্টিতে লণ্ডনের দুইটি জিনিষ খুব নূতন বোধ হয়; এক, ইহার ঐশ্বর্য্য এবং দ্বিতীয়, লোকের ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। কেহই যেন আমাদের ন্যায় ধীরে চলে না; সকলেরই পদক্ষেপ খুব দ্রুত, সকলেরই মুখে ব্যস্ততার লক্ষণ।

আর বিস্ময়কর—বোধ হয় লণ্ডনের পার্কগুলি। এত জনবহুল এবং ব্যয়-বহুল সহরের মধ্যে এত বড় বড় পার্ক, এমন সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছে। ছোট পার্কগুলি প্রত্যেকটি কলিকাতার ঘোড়দৌড়ের মাঠের সমান; হাইড পার্ক ত গড়ের মাঠ অপেক্ষা কোন অংশে ছোট হইবে না।

আমি যে বাসাতে ছিলাম, তথায় আমি একটা শুইবার ও একটা বসিবার ঘর ভাড়া লইয়াছিলাম। গৃহকর্ত্রী আমার প্রাতরাশের ব্যবস্থা করিতেন। অন্যান্য সময় আমি যখন যেস্থানে থাকিতাম, সেই স্থানে খাইতাম।

দুইটি ঘর ও প্রাতরাশের জন্য সাপ্তাহিক ২১ শিলিং বা ১৫৮০ টাকা দিতে হইত। অবশ্য বড়মানুষ-পাড়ায় খরচ খুব বেশী। আমার একটি বন্ধু শুধু ঘরভাড়া সাপ্তাহিক ৪ গিনি বা ৬৩ টাকা দিতেন। তবে গৃহস্থ লোকের পক্ষে আমার যায়গা বেশ ছিল। ঘর দুইটি অবশ্য আবশ্যক আসবাবে পূর্ণ। বসিবার ঘরে একটা বড় টেব্‌ল, একটা ছোট টেব্‌ল, পাঁচখানা চেয়ার, আর্শি, কৌচ, এবং শয়নকক্ষে দুইটা আলমারি, একটা দেরাজ, একটা সজ্জা টেব্‌ল প্রভৃতি ছিল।

বলা উচিত, ইংলণ্ডে 'ছোটা হাজরি' নাই; প্রাতরাশই দিনের প্রথম আহার। ও সব দেশে আহার্য্যের ভাবনা কিছু নাই। বেড়াইতে গিয়া যে স্থানেই খাবার সময় হউক, সর্ব্বত্রই হোটেল বা রেস্তরাঁ পাওয়া যায়, যাইয়া খাইলেই হইল। পর্য্যটকের পক্ষে ইহা কম সুবিধা নহে। প্রাতে প্রাতরাশ খাইয়া ৯ টায় বাহির হইতাম, সমস্ত দিন টোটো করিয়া রাত্রিতে থিয়েটারাদির পর ১২টা বা ১টায় বাসায় ফিরিতাম; কোনও গোল নাই। যদি বাসায় আসিয়া লাঞ্চ ও ডিনার খাইতে হইত, তবে আমাকে অনেক জিনিষ না দেখিয়া ফিরিতে হইত; কারণ, সহরের কেন্দ্র হইতে আমার বাসস্থান ৩।৪ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।

লণ্ডনে মানুষের সুবিধার অন্ত নাই। অল্প খরচে এত সুখ-স্বচ্ছন্দ আর কোথাও পাওয়া যায় বলিয়া বোধ হয় না। প্রথম যান। আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলওয়েতে (ভূমধ্যস্থ রেল) সহরের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অতি শীঘ্র যাওয়া যায়; তদ্ভিন্ন রেল, ট্র্যাম, অম্‌নিবাস, ঘোড়ার গাড়ী, মোটর গাড়ী প্রভৃতি প্রচুর। আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলওয়ে মাটির নিম্ন দিয়া বৈদ্যুতিক বলে চলে। যন্ত্রে যাত্রীদিগকে ভূগর্ভে নাবায় ও উঠায়। নিম্নে প্রশস্ত প্ল্যাটফর্ম্ম; গাড়ী দুই মিনিট অন্তর আইসে; সেগুলি বৈদ্যুতিক আলোকে বিভাসিত। দুইখানি মাত্র গাড়ী—একখানি ধূমপায়ীদিগের জন্য, অপর খানি সাধারণের। শ্রেণীবিভাগ নাই। ভাড়া দূরত্বানুসারে—১ পেনি হইতে ৩ পেনি পর্য্যন্ত। প্রত্যেক গাড়ীতে একজন পরিচালক থাকে, সে গাড়ী ছাড়িবা মাত্র গাড়ী কোন্ ষ্টেশনে দাঁড়াইবে বলিয়া দেয়। এরূপ ৮।৯টি ভিন্ন ভিন্ন লাইন লণ্ডনে আছে। এক লাইন হইতে অন্য লাইনে যাইবার বদল টিকিট পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় সুবিধা টেলিফোঁ; প্রায় সব বাড়ীতেই টেলিফোঁ বসান। তদ্ভিন্ন রাস্তায় রাস্তায় টেলিফোঁর আফিস আছে। তথায় যাইয়া ২ পেনি দিলে ৩ মিনিট কথা বলিয়া লওয়া চলে। টেলিফোঁর ব্যবস্থা লণ্ডনে ৪।৫টি কোম্পানীর আছে; কিন্তু পরস্পরের মধ্যে অদল বদল চলে, কাষেই কিছু মাত্র অসুবিধা নাই।

তৃতীয়—কোথাও কোন জিনিষ কিনিলে, ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, বলিলেই বিনা খরচে বাড়ী পাঠাইয়া দেয়। বাজার করিয়া হয় ত ৬ মাইল দূরস্থিত বাটীতে আসিয়া দেখিবেন, ক্রীত জিনিষ সব আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

চতুর্থ—পৃথিবীতে যাহা কিছু দ্রব্য প্রস্তুত হয়, লণ্ডনে সবই পাওয়া যায়। এত দোকান আর কোথাও নাই। স্থানবিশেষে খুব সস্তায়ও জিনিষ পাওয়া যায়। আর যে সব বড় বড় দোকানে জুতা শেলাই হইতে চণ্ডী পাঠ পর্য্যন্ত হয়, সে রকম দোকান ৮।৯টা আছে। তাহাদের ভিতর ডাকঘর, রেস্তরাঁ, বিশ্রামাগার, এমন কি—ক্রেতাদের জন্ত স্নানাগার ও পাঠগৃহ পর্য্যন্ত আছে।

সাধারণের জন্ত স্নানাগার প্রভৃতি প্রায় সকল রাস্তাতেই আছে। সেগুলি প্রায়ই রাস্তার নিয়ে। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া একটি বাটীর মধ্যে গিয়া দেখা যায়, তথায় স্নানের জন্ত ঠাণ্ডা ও গরম জল, পরিষ্কার কাচা তোয়ালে, সাবান প্রভৃতি রহিয়াছে। কোনও কোনও স্থানে অবগাহন স্নান ও সন্তরণের বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত আছে।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার—লণ্ডনের পুলিশম্যান। প্রত্যেক মোড়ে একজন পুলিশম্যান থাকে, বড় বড় চৌমাথায় ২।৩ জনও থাকে। রাস্তায় গাড়ীর অত্যন্ত হুড়াহুড়ি, পদব্রজে রাস্তা পার হওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। রাস্তার ঠিক মধ্যস্থলে পুলিশম্যান অটলভাবে দণ্ডায়মান। গাড়ী যে দিক্ হইতেই আসুক, তাহাকে দক্ষিণে রাখিয়া যাইতে হইবে। সে যখন দেখে অনেকগুলি পাদচারী রাস্তা পার হইবার আশায় অপেক্ষা করিতেছে, তখন গম্ভীর ভাবে এক হস্ত উত্তোলন করে: সে দিকের যত গাড়ী মন্ত্রমুগ্ধবৎ একেবারে যুগপৎ যে যেরূপ অবস্থায় থাকে, থামিয়া যায়। পুলিশম্যান সঙ্কেতে পা-দল যাত্রীদিগকে রাস্তা পার হইতে বলে; সমবেত সকলে পার হইয়া গেলে, সে হাত নামাইয়া দিলে গাড়ীগুলি আবার চলিতে আরম্ভ করে। এ ব্যাপার প্রত্যেক রাস্তায় ক্রমাগতই চলিতেছে এবং বিদেশীর হর্ষ ও বিস্ময় উত্তেজিত করিতেছে। বাহাদুরী অধিক কাহার, পুলিশম্যানের না ইঙ্গিতমাত্রে পরিচালিত শকটচালকদিগের! লণ্ডনের পুলিশম্যানের আর এক অদ্ভুত ক্ষমতা রাস্তাঘাটের অবস্থান-জ্ঞান। যত দূরস্থ হউক না কেন, যে কোন স্থানের কথা জিজ্ঞাসামাত্র কোন্ দিকে কয়টা মোড় ফিরিয়া সে স্থানে উপনীত হওয়া যাইবে, একেবারে কলের ন্যায় বলিয়া দিবে। সময়ে সময়ে তাহাদের কথিত বিবরণ যাত্রীর মনে করিয়া রাখাও দুষ্কর হয়। এতদ্ভিন্ন অনেক লোক অনেকরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্নও পুলিশম্যানকে জিজ্ঞাসা করে, পুলিশম্যানও যথাসম্ভব সকলের কথার উত্তর দেয়। উহারা যে ভাবে মাথা ও মেজাজ ঠাণ্ডা রাখে, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

ইংলণ্ডের আর এক চমৎকার ব্যাপার, দাস-দাসী। চাকর খুবই কম, কারণ একে বেতন বেশী, তাহাকে চাকর রাখিলে টেক্‌স দিতে হয়। অধিকাংশ বাড়ীতে শুধু চাকরাণী থাকে। হয়ত একটা বাড়ীতে ৫ জন লোক, একটি মাত্র দাসী। সেই দাসী রান্নার জোগাড়, ঘর ঝাঁট, কাপড় চোপড় ঝাড়া, বিছানা পাতা, জুতা বুরুষ, বাজার করা, উনান ধরান—সমস্ত কাযই করিবে, অথচ কখন তাহার মুখে একটি কথা শুনা যায় না। তদ্ভিন্ন সকলেই হয়ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আহার্য্য চাহেন বা কোন জিনিষ চাহেন, ঠিক সময়ে প্রত্যেকের আদেশ পালিত হইবে, এক মিনিটের নড়-চড় হইবে না। ইহাদের বেতনও এমন কিছু অধিক নহে; বোধ হয় মাসিক ১।৹ পাউণ্ড আন্দাজ। এ স্থানে বলা উচিত যে, সে দেশের এক পেনি যদিও আমাদের দেশের কথায় এক আনা বা চারি পয়সা, তথাপি তথায় এক পেনি এক পয়সা মাত্র। ভিখারীকে পয়সা দিতে হইলে এক পেনি, একটা দেশলাই কিনিতে হইলে এক পেনি, রেলে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া প্রতি মাইল এক পেনি প্রভৃতি হইতে বুঝা যায় যে, পেনি তথায় পয়সা মাত্র, আনি নহে।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু।

সৌন্দর্য্য।

(স্কট)

গোলাপ সুন্দরতম—ফোট ফোট করে যবে ধীরে;
আশা সমুজ্জ্বলতম—ভীতি হ'তে মুক্তিপথে তা'র;
গোলাপ মধুরতম—সিক্ত যবে প্রভাত-শিশিরে;
প্রেমিকা সুন্দরীতমা নেত্রে যবে অশ্রুবারিধার।

গৃহাগত।

১

হেমন্তকুমার দত্ত কলিকাতার কোন সওদাগর আফিসে মাসিক আশী টাকা বেতনে কেরাণীগিরি করেন; শিয়ালদহের একটি মেসে থাকিয়া আফিসের কায করেন, আয়ের অল্পতা-বশতঃ তিনি স্বতন্ত্র বাসা করিয়া পরিবার লইয়া থাকিতে পারেন না; অগত্যা মেসের কদর্য্য অন্ন-ব্যঞ্জন উদরস্থ করিয়া এবং মেসের একটি আলোকহীন ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে দেড় টাকা মূল্যের আরুলকাষ্ঠনির্ম্মিত তিন হাত দীর্ঘ তক্তপোষে সাড়ে তিন হাত দীর্ঘ দেহ প্রসারিত করিয়া ও তৈলসিক্ত মলিন উপাধানে মাথা রাখিয়া অতি কষ্টে তাঁহাকে দিনপাত করিতে হয়।

হেমন্তকুমার যে মেসে থাকেন, তাহা আফিসারের মেস; সুতরাং আফিসের সময় ভিন্ন দিবসের অন্য সকল সময় মেসটি হট্ট-কোলাহলে মুখরিত থাকে। কোন কক্ষে হার্ম্মোনিয়ম-সহযোগে গান হয়, কোন কক্ষে তাস-দাবা-পাশা চলে,কোন কক্ষে গুড়ুকের গম্ভীর মন্দ্র,—ধূমে ঘর অন্ধকার,কোন কক্ষে হাসির গর্‌রা। কিন্তু হেমন্তকুমার মেসের মেম্বরগণের সহিত তেমন মিশিতেন না, হাসি-গল্প-গানেও তেমন যোগ দিতেন না; পাঠেই তাঁহার আনন্দ, সেইজন্য মেসের সকলে তাঁহার নাম রাখিয়াছে, 'প্রোফেসার'। হেমন্তকুমার ধর্ম্মভীরু, পবিত্র-চরিত্র, মিতভাষী যুবক, এজন্য সকলে তাঁহাকে বদ-রসিক মনে করিলেও কেহ তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে সাহস করিত না।

কলিকাতার বহু দূরে একটি গণ্ডগ্রামে হেমন্তকুমারের বাড়ী। বাড়ীতে তাঁহার মাতা, স্ত্রী, একটি পুত্র ও একটি শিশু কন্যা। পিতার মৃত্যুর পর সংসারের সকল ভার তাঁহার স্কন্ধেই পড়িয়াছে। তাঁহার পিতার আর্থিক অবস্থাও তেমন স্বচ্ছল ছিল না, তিনি পোষ্টমাষ্টারী করিতেন; যাহা উপার্জ্জন করিতেন,—তাহাতে কোন রকমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। সেই সামান্য আয়ে তিনি পুত্রটিকে বি, এ, পর্য্যন্ত পড়াইয়াছিলেন। হেমন্তকুমার এখন সংসারের একমাত্র অভিভাবক।

হেমন্তকুমারের পুত্র শিশিরকুমারের বয়স সাত বৎসর মাত্র, মেয়েটির বয়স চারি বৎসর। হেমন্তকুমার মেয়ের নাম রাখিয়াছিলেন, নির্ম্মলকুমারী;

কিন্তু তাহার ঠাকুমা তাহাকে আদর করিয়া উমাশশী বলিয়া ডাকিতেন। ঠাকুমা-প্রদত্ত নামেই সে সকলের নিকট পরিচিত, নির্ম্মলকুমারী বলিয়া ডাকিলে সে উত্তর পর্য্যন্ত দিত না; বলিত, "এ নাম ভাল নয়, ঠাকুমা'র নাম ভাল।"

হেমন্তকুমারের গৃহানুরাগ বড় প্রবল। কলিকাতার আড়ম্বর ও আমোদ-প্রমোদ, কলিকাতার জীবনযাত্রার প্রণালী তাঁহার আদৌ ভাল লাগিত না। কলিকাতার রাজপথে ক্রমাগত ট্রামের ঘড়ঘড়ি শুনিয়া, মেসের অন্ন-ব্যঞ্জন আহার করিয়া, এবং আফিসের অপরিবর্ত্তনীয় একঘেয়ে মামুলি কাযে কলম পিশিয়া, মধ্যে মধ্যে তিনি হৃদয়ে বড় অবসাদ অনুভব করিতেন; এক একবার তাঁহার ইচ্ছা হইত, আফিসের কাগজ-কলম ফেলিয়া, কর্ম্ম-কোলাহল-মুখরিত কলিকাতার দূষিত বায়ুমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া শ্যামল বৃক্ষের ছায়া শীতল, বনবিহঙ্গম-কলকণ্ঠ-কূজিত, অব্যাহত-নির্ম্মল-সমীরণ-নিষেবিত পল্লীভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কর্ম্মশ্রান্ত উত্তপ্ত মস্তিষ্ক শীতল করেন, কিন্তু আফিসের চাকরী সুদৃঢ় লৌহ-দ্বারের ন্যায় তাঁহার আশা-পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিত; আশী টাকা মূল্যের চাকরীটা যদি কোন কারণে খসিয়া যায়, তাহা হইলে সপরিবারে অনশনে থাকিতে হইবে বুঝিয়া তিনি তাঁহার উদ্বেল হৃদয়াবেগ সংযত করিতেন, আকুল দীর্ঘশ্বাসে তাঁহার হৃদয়ের হাহাকার শূন্যে বিলীন হইত। গত বৎসর বড়দিনের ছুটীতে তিনদিনের জন্য তিনি তাঁহার পল্লীভবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন;—তাহার পর সুদীর্ঘ আট মাস চলিয়া গিয়াছে, ছকর গাড়ীর পক্ষিরাজ ঘোড়ার মত তিনি নিরানন্দময় প্রবাসে অতি কষ্টে দৈনিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতে-ছেন। পূজার ছুটী কত দিনে আসিবে, কত দিনে আবার শ্যামলা পল্লী-জননীর ক্রোড়ে গিয়া আশ্রয় লইবেন, পুত্রকন্যার মুখ দেখিয়া প্রাণ জুড়াইবেন, এই আশায় আশ্বিন মাসের প্রথম হইতে তিনি দিন গণিতে লাগিলেন। কিন্তু দিন আর কাটে না, এক এক সপ্তাহ তাঁহার নিকট এক এক বৎসরের মত দীর্ঘ মনে হইতে লাগিল।

২

অবশেষে পূজার ছুটী আসিল। পঞ্চমীর দিন আফিস বন্ধ হইল; ইচ্ছা ছিল, সেই দিনই তিনি গৃহমুখে যাত্রা করেন, কিন্তু মেসের দেনা মিটাইতে, পূজার বাজার করিতে সে দিনটা কাটিয়া গেল। ষষ্ঠীর দিন বেলা দুইটার

ট্রেনে মধ্যম শ্রেণীর একখানি 'কনসেশন' টিকিট লইয়া হেমন্তকুমার তাঁহার বাল্য-জীবনের সুখস্বপ্নের লীলাভূমি পল্লীভবনে যাত্রা করিলেন।

সে দিন ট্রেণে ভয়ানক ভিড়; আফিস-আদালত সমস্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে; জনস্রোত হাবড়া ও শিয়ালদহ অভিমুখে ধাবিত হইতেছে; মুটের মাথায় মোট, ঘোড়ার গাড়ীর ছাদের উপর বড় বড় ট্রাঙ্ক, বাণ্ডিল, বোঁচকা; আরোহিগণের মুখে উৎসাহ ও প্রফুল্লতা অঙ্কিত; শিয়ালদহের প্রকাণ্ড ষ্টেশন বিপুল জনতায় ও সহস্র কণ্ঠের মিশ্র ধ্বনিতে যেন গম্‌গম্‌ করিতেছে; লৌহপথে ট্রেনের হুস্‌ হুস্‌ শব্দ, তীব্র বংশীধ্বনি, ট্রলির ঠেলাঠেলি, আরোহিগণের সহিত কুলির দলের বচসা, সহস্র আরোহীর ব্যাকুল পাদচারণ, কোলাহলপূর্ণ ষ্টেশনে যেন নূতন জীবন দান করিয়াছিল। খাল-বিল-পয়োনালা পূর্ণ করিয়া বর্ষাকালে বানের জল শত ধারায় নদীতে প্রবেশ করিলে নদীর যেমন জীবন্তভাব দেখা যায়, ষ্টেশনের অবস্থাও সেইরূপ।

দারজিলিং মিকস্‌ড ট্রেণ মন্থর গতিতে সকল ষ্টেশনে থামিতে থামিতে রাণাঘাটের দিকে অগ্রসর হইল। গাড়ীর মধ্যে যেমন গরম, সেইরূপ কোলাহল। কোন শ্রেণীতে একখানি গাড়ীও খালি নাই; তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলিতে আরোহীরা স্থানাভাবে দাঁড়াইয়া যাইতেছে; কেহ কোনও ষ্টেশনে নামিয়া যাইলে সেই স্থানটি অধিকার করিবার জন্য দশ জনে হাঙ্গামা করিতেছে, কোন কোন গাড়ীতে হাতাহাতি হইবারও উপক্রম দেখা যাইতেছে। কোথাও খোস গল্প চলিতেছে, কেহ গান আরম্ভ করিয়াছে, কেহ কেহ নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে। হেমন্তকুমার একখানি মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীর কামরায় একটি বাতায়নের পার্শ্বে বসিয়া পল্লী-প্রকৃতির দৃশ্যবৈচিত্র্যের শোভা উপভোগ করিতে লাগিলেন।

বর্ষার জল নামিয়া গিয়াছে, বাঁধের নীচে স্থানে স্থানে এখনও জল বাঁধিয়া আছে; যতদূর দৃষ্টি চলে, হৈমন্তিক ধান্যের ক্ষেত্র, মাঠের পর মাঠ মা-লক্ষ্মীর শ্যামল অঞ্চলের ন্যায় শস্যভারে পরিপূর্ণ। মুক্ত-সমীরণ-হিল্লোলে ধান্যশীর্ষগুলি আন্দোলিত হইতেছে; বায়ুপ্রবাহে তাহা হইতে শর্‌ শর্‌ শব্দ উত্থিত হইতেছে। মাঠের মধ্যে মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বট ও অশ্বত্থের গাছ। বিভিন্নজাতীয় শত শত বিহঙ্গমের সহর্ষ কাকলীতে তরুশির মুখরিত; বৃক্ষের সতেজ সবুজ পত্রে সূর্য্যরশ্মি যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে।

খালের জলে অপরাহ্নের রৌদ্র চিক্ চিক্ করিতেছে; আউসের ক্ষেত্র হইতে ধান উঠিয়া গিয়াছে; সেখানে শত শত গোরু চরিতেছে, কোথাও মেষের পাল। রাখালরা তালপাতার ছাতা মাথায় দিয়া রেল লাইনের তারের বেড়ার কাছে দাঁড়াইয়া ট্রেণের আরোহীদিগের দিকে চাহিয়া আছে, কেহ আরোহীদিগকে লক্ষ্য করিয়া সেলাম করিতেছে, কেহ মুখভঙ্গী করিতেছে, কেহ লাঠী তুলিয়া ভয় দেখাইতেছে। অপরাহ্নের সূর্য্য ক্রমে পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িল।

অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় ট্রেণ রামনগর ষ্টেশনে থামিল। হেমন্তকুমার ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন; কুলী তাঁহার মোট মাথায় লইয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিল। ষ্টেশনের প্রায় এক মাইল পশ্চিমে চূর্ণী নদী; নদী পার হইয়া, আট ক্রোশ দুরবর্ত্তী হরিশপুর তাঁহার বাস-গ্রাম। তাঁহার গোরুর গাড়ী নদী পার হইয়া ষ্টেশনে আইসে নাই, নদীর পশ্চিম পারে অপেক্ষা ক'রতেছিল। মুটের মাথায় মোট দিয়া তিনি নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি নদীতীরে আসিতে আসিতেই লোহিত তপন নদীপার-বর্ত্তী অশ্বত্থবটের সমুন্নতশীর্ষান্তরালে অদৃশ্য হইল।

চূর্ণী ক্ষুদ্র নদী, কিন্তু নদীর উভয় পাড় অত্যন্ত উচ্চ, বর্ষায় নদীর জল কূলে কূলে ভরিয়া উঠে, স্রোতও অত্যন্ত প্রখর হয়; কৃষ্ণগঞ্জে সাঁকোর নীচে দিয়া এই নদী ইচ্ছামতীতে মিশিয়াছে; ইচ্ছামতী কুম্ভীরের বিরাট দুর্গ। বর্ষাকালে ইচ্ছামতীর কুম্ভীর নদীপথে নানা দিগ্দেশে ছড়াইয়া পড়ে, কিন্তু দুর্গে সৈন্যের অভাব হয় না, সুন্দরবনের মত কুম্ভীর ইচ্ছামতীর নূতন জলে আড্ডা লইয়া থাকে।

বর্ষার জল নামিয়া গিয়াছে। নদীতীর শুভ্র বালুকারাশিতে সমাচ্ছন্ন। নদীগর্ভে জলরাশি নির্ম্মল। নদীতীরে ঘাটমাঝির ঘর; ঝাঁপের বেড়া দিয়া ঘেরা ক্ষুদ্র ঘরখানি, বারান্দায় বাঁশের মাচা, ঘাটের ইজারদার সেই মাচানের উপর একটি হাতবাক্স সম্মুখে করিয়া বসিয়া আছে; হাতে অন্য কায নাই, তাই বসিয়া বসিয়া ডাবা হুকায় তামাক খাইতেছে। অদূরে একটা কেরোসিনের বাক্সের উপর একজন জেলে ক্ষিপ্রহস্তে জাল বুনিতেছে, মুখে ইজারদারের সঙ্গে গল্প করিতেছে।

হেমন্তকুমার ইজারদারকে এক পয়সা পারানি দিলেন; তাহার পর হাঁকিলেন "নিতাই! ও নিতাই! গাড়ী এনেছিস্ নাকি রে?"

দূরে হইতে বাবুকে আসিতে দেখিয়া নিতাই 'চেন্দারিতে' খৈল ও ভুষির জাব মাখিয়া বলদ দুটিকে খাইতে দিয়াছিল। সে হাত ধুইতে ধুইতে বলিল "এ—জ্জে—জ্জে।"

হেমন্তকুমার অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইলেন। কোন কারণে গাড়ী না আসিলে এই আট ক্রোশ পথ অতিক্রম করিবার উপায় ছিল না; অনেক অধিক ভাড়ায় রামনগর ষ্টেশনে গোরুর গাড়ী পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে না আছে গদি, না আছে বিছানা, বাঁশের 'ফারোটা'র উপর বসিয়া আট ক্রোশ পথ পুষ্পক রথে অতিক্রম করা কিরূপ আরামদায়ক, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের অনুমান করিবার সাধ্য নাই।

নদী পার হইয়া হেমন্তকুমার গাড়ীতে বিছানা পাতিয়া লইলেন। গাড়ীর মধ্যে বিচালির পুরু গদি, তাহার উপর তোসক ও বিছানার চাদর প্রসারিত করা হইল। বলদের 'চারা করা' শেষ না হইলে গাড়ী যুড়িবার উপায় নাই। গাড়োয়ান নিতাই অন্য একজন গাড়োয়ানকে বেগার ধরিয়া গাড়ীতে তেল দিয়া লইল। তাহার পর, তৈলাক্ত হাতখানি বলদের শৃঙ্গে মুছিয়া তামাক সাজিতে বসিল।

হেমন্তকুমার অনেকদিন পরে বাড়ী যাইতেছেন, গাড়োয়ানের 'ঢিলিমিলি' দেখিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। নিতাই তাঁহার প্রতিবেশী গাড়োয়ান,নিতাইয়ের প্রভু হরিভক্ত নন্দী গ্রামসম্পর্কে হেমন্তকুমারের কাকা। প্রভু পিতৃস্থানীয়, সেই সম্পর্কে নিতাই গাড়োয়ান হেমন্তকুমারকে দাদা বাবু বলিয়া ডাকিত। হেমন্তকুমারের ক্রোধে নিতাই কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, 'ভড়র ভড়র' করিয়া হুকা টানিতে লাগিল, শেষে নাক-মুখ দিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, "দাদাবাবু, চটেন কেন? আট কোশ ভুঁই পাড়ি মারতে হবে, দুটো চারা করে না নিলে বলদ্ চল্‌তে পারবে কেন?"

হেমন্তকুমার বলিলেন, "কেন, এতক্ষণ কি নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলি? কখন্ ঘাটে এসেছিস্?"

নিতাই অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিল, "পহর দ্যাড়েক বেলার সময় ঘাটে এয়েলাম, স্তাব রাত্তিরে গাড়ী যুড়ে দিয়েলাম, রাত্তিরে ঘুম হয় নি, দুটো রান্না ক'রে, নাকে মুখে গুঁজে যেমন শুয়েছি, অমনি ঘুম এসেছিল। স্তাবে আপনার হাঁক শুনে তাড়াতাড়ি উঠে বলদ দু'টোকে জাব মেখে দিয়েছি।"

হেমন্তকুমার হতাশভাবে বলিলেন,—"আজ রাত্রিতে আর খেতে দিলি নে বোধ হয়।"

নিতাই সদম্ভে বলিল, "বলেন কি, দাদাবাবু, একবার গাড়ী যুড়তে যা দেরী; বলদ ঘোড়ার মত ছুট্‌বে, খোল-ভূষি খাইয়ে খাইয়ে বলদ দুটোকে 'চায়েন' ক'রে তুলেছি। আড় পহর রাত্তির মধ্যে বাড়ী যাব।"

হেমন্তকুমার তখন প্রীতমনে নিতাইকে গ্রামের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

বলদের চারা করা শেষ হইলে নিতাই 'চেঙ্গারি'খানা গাড়ীর ছইএর পশ্চাতে বাঁধিয়া গাড়ীতে বলদ যুড়িয়া দিল। বাছুর বলদ নিতাইয়ের করস্পর্শে গাড়ী কাঁধে লইয়া কাঁচা সরানের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিল।

৩

জেলা বোর্ডের মেঠো পথ রামনগরের পারঘাটা হইতে হরিশপুর পর্য্যন্ত প্রসারিত। পথের দুই ধারে নয়ঞ্জুলি, মেটে পথে মাটি ফেলিবার জন্য এই সকল নয়ঞ্জুলি কাটা হইয়াছিল; নয়ঞ্জুলির মধ্যে বড় বড় কেশে ঘাস, কাশকুসুমগুলি শ্বেত চামরের মত বায়ুভরে আন্দোলিত হইতেছে; মাঠে তিলের ক্ষেতে রাশি রাশি তিলফুল ক্ষেত্রের শোভা বিকাশ করিতেছে। সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় বহুদূর-বিস্তীর্ণ ইক্ষুক্ষেত্র কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন বোধ হইতেছে। মুক্ত প্রান্তরে অনেকগুলি শৃগাল একত্র সমবেত হইয়া 'হুয়া হুয়া' করিয়া ডাকিতেছে; তাহাদের স্বর-তরঙ্গ দিক্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতেছে; দুই একটি বরাহশিশু পুচ্ছ আন্দোলন করিতে করিতে পাটের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছে; এবং রাখাল বালকরা গরু চরাইয়া গান গাহিতে গাহিতে ধূলি-ধূসরিত অঙ্গে গোচারণক্ষেত্র হইতে অরণ্যঅন্তরালবর্ত্তী গ্রামের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে।

হেমন্তকুমারের গাড়ী দ্রুতগতি মেটে পথের ধূলা উড়াইতে উড়াইতে ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করিতে লাগিল। ক্রমাগত একঘেয়ে হটর হট্ শব্দ আর সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গের আন্দোলন! হেমন্তকুমার বালিশে মাথা রাখিয়া পল্লীপ্রকৃতির সান্ধ্য শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা নিবিড় হইয়া আসিল; এবং সেই অন্ধকারের যবনিকা বিদীর্ণ করিয়া শারদ ষষ্ঠীর খণ্ড চন্দ্র ঊর্দ্ধাকাশ হইতে ক্ষীণ কৌমুদীরাশি ধরাতলে বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। প্রতি মুহূর্ত্তে চন্দ্রকর স্ফুটতর

হইতে লাগিল। দুই এক খণ্ড রজত-শুভ্র মেঘ সুনীল গগন-সরোবরে মুক্তপক্ষ রাজহংসের ন্যায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল।—মাথার উপর দিয়া বাদুড়ের দল নিঃশব্দ পক্ষ-সঞ্চালনে আহারের সন্ধানে উড়িয়া যাইতেছে, বহুদূরবিস্তৃত-প্রান্তর-মধ্যে দুই একটি অশ্বত্থ ও বট বৃক্ষ উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাদের পত্রান্তরালে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, সেই অন্ধকারের মধ্যে সহস্র সহস্র খদ্যোত মিটমিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, তৃণদলের ভিতর অশ্রান্ত ঝিল্লিধ্বনি হইতেছে—আর দূরবর্ত্তী গ্রামের পর্ণকুটীরে মৃদু প্রদীপের ক্ষীণ আলোক-রেখা দেখা যাইতেছে; গ্রামপ্রান্তে দুই একটা ক্ষুধিত কুকুরের চীৎকারধ্বনি নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে, এবং গোপ-পল্লীর গোশালা হইতে সাঁজালের ধূমগন্ধ বায়ুভরে ভাসিয়া আসিতেছে। গাড়োয়ান নিতাই ঘোষ আউসের পোয়ালের নুড়ি পাকাইয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া এক ছিলিম তামাক খাইয়া লইল, তাহার পর তাহার হুকা কলিকা সাঁজালের মধ্যে রাখিয়া মোটা গলায় মেঠো স্বরে গান ধরিল—

"কার সাধ্য, ওমা সীতে, তব রন্ধন দূষিতে,
তুমি সীতে, তুমি অসীতে, তুমি অন্নদা কাশীতে।
অসীতারূপে অসি ধরা, দনুজকুল নাশ করা,
সীতা রূপে এসেছ ধরা, রাবণকুল নাশিতে।
দেহি অন্ন, দাসে দেহি, বিশ্বমাতা বৈদেহী,
ভবক্ষুধা নিবৃত্ত কর, আর দিওনা আসিতে।
যদি কৃপা না কর দীনে, অন্নাদি বসন দানে,
দাশরথীরে হবে নিদানে চরণ দানে তুষিতে।"

তাহার এই তানলয়বিহীন ভক্তিসঙ্গীতের উচ্ছ্বাস সেই চন্দ্রালোক-পরিব্যাপ্ত নিস্তব্ধ নৈশপ্রকৃতি প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রান্তরবক্ষপ্রবাহিত মুক্ত-সমীরণ-হিল্লোলে দিগন্তে বিলীন হইতে লাগিল।—হেমন্তকুমারের নয়নপল্লবে নিদ্রা ঘনীভূত হইয়া আসিল।

৪

রাত্রি প্রায় দশটার সময় হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে হেমন্তকুমার গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া বসিলেন। তিনি দেখিলেন, মাঠের সরান ছাড়িয়া গাড়ী গ্রামের পথে প্রবেশ করিয়াছে। গ্রাম্য পথের দুই ধারে আম কাঁঠালের বাগান, কোথাও বেতবন, কোথাও বাঁশঝাড়, পত্রভারাবনত কঞ্চিগুলি পথের উপর নত হইয়া

পড়িয়াছে; কোন কোন গৃহস্থের প্রাঙ্গণস্থ পেয়ারা গাছে বাদুড়ের দল ঝট্‌পট্‌ করিতেছে, এবং কামারবাড়ী হাতুড়ীর দমাদম শব্দ হইতেছে। ষষ্ঠীর চন্দ্রকলা তখন গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী আমবাগানের অন্তরালে অদৃশ্য হইলেও হেমন্ত-কুমার বুঝিলেন, ইহা তাঁহার গৃহে যাইবার পথ। এই পথের সহিত তাঁহার উজ্জ্বল শৈশব-স্মৃতি চিরবিজড়িত। কর্ম্মময় জীবন-মধ্যাহ্নে সমগ্র কার্য্যের মধ্যেও সুখদুঃখস্মৃতিবিমণ্ডিত এই পথের কথা তিনি কোন দিন বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; ইহা তাঁহার গৃহের পথ—বহির্জ্জগতের সহিত অন্ত-র্জ্জগতের মিলন-পথ। শৈশবে এই পথ দিয়া তিনি সমবয়স্ক সহপাঠিগণের সহিত কত অর্থহীন তুচ্ছ গল্প করিতে করিতে দত্তদের চণ্ডীমণ্ডপে শিবু সরকারের পাঠশালায় যাইতেন। নামতা মুখস্থ না হওয়ায় একদিন সরকার কালকাশিন্দার ডাল দিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে প্রহার করিয়াছিলেন। প্রহারে পিঠ ফুলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি ঐ ষষ্ঠীতলায় কাঠের গুঁড়ির উপর বসিয়া কত কাঁদিয়াছিলেন; তাঁহার স্নেহময়ী জননী সেই সংবাদ শুনিয়া ষষ্ঠীতলায় আসিয়া তাঁহাকে কোলে করিয়া বাড়ী লইয়া গিয়াছিলেন, পথে চলিতে চলিতে সস্নেহে শতবার তাঁহার মুখচুম্বন করিয়াছিলেন, মায়ের কোমল করস্পর্শে সেই প্রহার-বেদনা যেন জল হইয়া গিয়াছিল; জীবনের বহু গুরুতর কথা অপেক্ষা এ কথা তাঁহার হৃদয়ফলকে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত আছে। এই পল্লীপথ দিয়া যৌবনকালে তিনি মহা সমারোহে বাদ্যভাণ্ড লইয়া বিবাহ করিয়া আসিয়াছিলেন, পল্লীবাসিনীগণের আশীর্ব্বাদে ও নারীকণ্ঠের হুলু-ধ্বনিতে এই সংকীর্ণ বনপথ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল।—আবার তিন বৎসর পূর্ব্বে বর্ষার এক তমোময়ী রাত্রিতে মুহুর্ম্মুহু দামিনী-স্ফুরণ ও অশনি-গর্জ্জন অগ্রাহ্য করিয়া—অশ্রান্ত বৃষ্টিধারা মস্তকে গ্রহণ করিয়া সংসারের এক-মাত্র আশ্রয় ও জীবনের প্রধান অবলম্বন পিতৃদেবের মৃতদেহ স্কন্ধে বহন করিয়া এই পথ দিয়াই তিনি শ্মশানঘাটে যাত্রা করিয়াছিলেন। দুকূল-প্লাবিনী বর্ষার নদীর প্রবল তরঙ্গ যেমন সবেগে তটভূমিতে প্রতিহত হয়, সেইরূপ শত স্মৃতির উদ্দাম তরঙ্গরাশি তাঁহার হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। গৃহসন্নিকটে উপস্থিত হইয়াও এক অজ্ঞাত ভয়ে তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইল; মা কেমন আছেন, প্রিয়তমা পত্নী চারুশীলার কোন অসুখ হয় নাই ত, ছেলে মেয়ে দু'টির শরীর ভাল আছে কি না, তাহা-দের কেমন দেখিতে পাইব, এই কথাই পুনঃ পুনঃ তাঁহার মনে উদিত হইতে

লাগিল। দীর্ঘকাল পরে গৃহে ফিরিবার সময় এই প্রকার উৎকণ্ঠায় প্রবাসীর হৃদয় পূর্ণ হয়, ভুক্তভোগিগণের ইহা অজ্ঞাত নহে।

জামালকোটার বেড়ার পাশ দিয়া গাড়ী হেমন্তকুমারের গৃহদ্বারে আসিয়া থামিল। হেমন্তকুমার গাড়োয়ানের মাথায় পোর্টম্যাণ্টো চাপাইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন, "মা!"

হেমন্তকুমারের জননী তখন রান্নাঘরে পুত্রের জন্য ডাল, তরকারী, পায়স প্রভৃতি রন্ধন শেষ করিয়া লুচি ভাজিতেছিলেন, চারুশীলা অদূরে বসিয়া লুচি বেলিয়া দিতেছিলেন; এবং পুত্রকন্যা দু'টি উননের পাশে বসিয়া সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে একবার লুচির থালার দিকে—একবার ঠাকুমা'র ঘর্ম্মাক্ত মুখের দিকে চাহিতেছিল। অন্যান্য দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রান্নাঘরের দরজা বন্ধ হয়, অদ্য নূতন ব্যবস্থা দেখিয়া তাহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল।

কর্ত্রী লুচি ভাজিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কাণ পথের দিকে ছিল। ক্রমেই তাঁহার উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হইতেছিল; তিনি ভাবিতেছিলেন, "বাছার আমার বাড়ী আসিতে এবার এত বিলম্ব হইতেছে কেন?—হঠাৎ কোন অসুখ হয় নাই ত? ঠিক সময়ে গাড়ী পাইয়াছে ত? অন্যান্য বার তাহার বাড়ী আসিতে এতখানি রাত্রি হয় না, এবার কি হইল? হে মা কালি, বাছাকে ভালোয় ভালোয় বাড়ী আনিয়া দাও, আমি মঙ্গলবারে তোমার পূজা পাঠাইয়া দিব। হে হরি, ঘরের ছেলে ঘরে আসুক, আমি হরিরলুট দিব।"

মা কালী, ভক্তবৎসল হরি, পুত্রগতপ্রাণা স্নেহময়ী জননীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে বিলম্ব করিলেন না। পুত্রের কণ্ঠোচ্চারিত মধুময় 'মা' শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি উনন হইতে কড়া নামাইয়া মাটীর প্রদীপ হস্তে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চারুশীলার ললাটে এক একবার চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাঁহার চক্ষু দুইটি ছলছল করিতেছিল, তিনি শ্বাশুড়ীর মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছিলেন না, নতমস্তকে লুচি বেলিতেছিলেন। গৃহপ্রাঙ্গণে সমাগত প্রিয়তম স্বামীর চিরপরিচিত সুধাময় কণ্ঠস্বর যেমন শ্রবণ করিলেন, অমনই তাঁহার চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, লজ্জা ও আনন্দ সাধ্বীর সুন্দর মুখে লোহিত আভা ফুটাইয়া তুলিল। তিনি সে স্থল ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অবগুণ্ঠন টানিয়া লজ্জামাখা সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে প্রিয়তমের প্রেমপরিপ্লুত হাস্যোজ্জ্বল উদার মুখের দিকে চাহিলেন; এবং

বালকবালিকাদ্বয় হাতের লুচি ফেলিয়া রাখিয়া "বাবা এসেছে রে!" বলিয়া আনন্দোচ্ছ্বসিত হৃদয়ে সবেগে ছুটিয়া গিয়া হেমন্তকুমারকে একেবারে জড়াইয়া ধরিল। পিতাকে দেখিবার আশায় তাহারা আজ এত রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া আছে, উৎসাহে তাহাদের ঘুম আইসে নাই।

হেমন্তকুমার ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে জননীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন, তাহার পর পুত্রকন্যাদ্বয়কে উভয়বাহুপাশে বাঁধিয়া কোলে তুলিয়া সস্নেহে তাহাদের মুখচুম্বন করিলেন। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল আছ ত বাবা? এত রাত্তির হ'লো যে?"

হেমন্তকুমার সহাস্যে বলিলেন, "তোমার এত আশীর্ব্বাদেও ভাল থাক্‌বো না? নিতাই বলদ দু'টোকে খাইয়ে নিতে দেরী ক'রে ফেলেছিল। তোমরা সকলে ভাল আছ ত, মা?"

মা বলিলেন, "হ্যাঁ, সব ভাল। আহা, তোমার মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে। এত কাহিল হ'য়ে গিয়েছ কেন, বাবা? কল্‌কাতায় মেসের খাওয়া ত! খেয়ে কি পেট ভরে; না গায় মাস লাগে? বৌমা, তুমি বাছাকে হাত মুখ ধোবার জল দাও, আমি লুচি ক'খান ভেজে নিয়ে যাচ্ছি।"

হেমন্তকুমার পুত্রকন্যাকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। চারুশীলা স্বামীর পদপ্রক্ষালনের জল তুলিবার জন্য কুয়ায় ঘটি নামাইয়া দিলেন।

চারুশীলাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া খুকী বলিল, "মা, বাবার খাবার আন, বাবার যে খিদে পেয়েছে!"

হেমন্তকুমার কন্যাকে কোলে লইয়া বলিলেন, "মা লক্ষীর আমার কত দরদ। এত রাত্তিরেও তুমি ঘুমাও নি কেন, মা?"

খুকী বলিল, "ঘুমালে যে তোমাকে দেখ্‌তে পেতাম না।"

পুত্র শরৎকুমার বলিল, "বাবা তোমার সঙ্গে কাল ঠাকুর দেখ্‌তে যাব"

খুকী বলিল, "আমি ত যাব, বাবা? দাদা বড়, হেঁটে যাবে, আমি তোমার কোলে চোড়ে যাব।

"মেয়ের আবদার দেখ।"—বলিয়া চারুশীলা হাসিলেন।

হেমন্তকুমার হাতমুখ ধুইয়া মাদুরে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। চারুশীলা স্বামীর জল খাবারের আয়োজন করিতে বসিলেন। গৃহপ্রাঙ্গণস্থ শেফালিকা বৃক্ষ হইতে প্রস্ফুটিত সেফালিকার সুমিষ্ট সৌরভ নৈশবায়ু প্রবাহে ভাসিয়া আসিতে লাগিল, এবং তিনি শুনিতে পাইলেন তাঁহার

প্রতিবেশী নবীন মণ্ডলের বাড়ীতে গ্রাম্য পাঁচালীর দল সমস্বরে আগমনী গাহিতেছে,—

কারে মেয়ে, বল পাষাণী,
আমার মা এ জগতের মা,
তোর মা, মা এই তোর ঈষাণী।
একবার এসে দেখ্, মা পদ,
এ সম্পদ হবে জ্ঞান যেন বিপদ।
দেখিলে মেয়ের পদ, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হ'বে রাণী!
কারে মেয়ে৷ বল, পাষাণী?"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

দেবদূতের প্রতি অরিষ্টনেমি।

(যোগবাশিষ্ট রামায়ণ)

চির বসন্ত বিরাজিত সেই নন্দন উপবন?
গন্ধ-প্রবাহী মন্দ পবনে স্নিগ্ধ করয় মন?
যন্ত্রমিলিত স্বর্গরাগিণী বাজে নিশা দিনমান;
কিন্নরী গাহে কোকিলাকণ্ঠে শুনিয়া শিহরে প্রাণ?
অপ্সরা সেথা চিরসঙ্গিনী সঙ্গী দেবতা সব
শয্যাআসন পারিজাতরাশি পানীয় স্বর্গাসব
উপাধান সেথা সুরললনার সুললিত বাহুপাশ?
শুনে কাঁপে বুক। ফিরে যাও দূত চাহি না স্বর্গবাস,
বোল দেবরাজে জানায়ে প্রণতি দাস আমি চির তাঁর'
অধমের প্রতি অযাচিতরূপে প্রেরিলা করুণাতার
সেবক তাঁহার পারিল না নিতে তাঁহার করুণারাশি
চাহে না স্বর্গভোগসুখ, দেব, ক্ষুদ্র মর্ত্ত্যবাসী
ভোগের অন্তে আসিব আবার কর্ম্মের তরে ফিরে
কেন্দ্রভ্রষ্ট তারকার মত ধরণীর ধূলিপরে
যাও নিজবাসে ফিরি' দূতবর। প্রণাম তোমার পায়
কঠিন কঠোর তপেতে মগ্ন রহিব যাবৎ কায়
উগ্র কর্ম্মে কর্ম্ম নাশিয়া ঘুচাব জন্ম ক্লেশ
নির্ব্বাণ লাভ করিব যখন জীবন হইবে শেষ
ফিরে যাও দূত। নরবাঞ্ছিত চাহি না স্বর্গধাম
জন্ম মরণে জিনি সংগ্রামে লভিব মহা বিরাম।

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

যাস্কের নিরুক্ত।

আমরা বহুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, বেদ, বেদাঙ্গ এবং বেদান্ত বিদ্যাস্থান। জ্ঞানলাভ করিতে হইলে ইহাদের অধ্যয়ন আবশ্যক। আর্য্য বলিয়া যাঁহারা পরিগণিত, তাঁহাদের বেদপাঠ অবশ্য কর্ত্তব্য। বেদপাঠ, বেদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম এবং বেদের উপদেশ অনুসারে নিজের জীবনকে পরিচালিত করিতে পারিলেই আর্য্যদের জীবন সার্থক। বেদ পাঠ করিতে হইলে বেদাঙ্গও অধ্যয়ন করিতে হয়, নতুবা বেদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। এই বেদাঙ্গ বলিতে আমরা বুঝি—(১) শিক্ষাগ্রন্থ, (২) কল্পগ্রন্থ, (৩) ব্যাকরণ, (৪) নিরুক্ত, (৫) ছন্দ ও (৬) জ্যোতিষ। বেদের জ্ঞান সম্পূর্ণ করিতে হইলে কেন যে এই ছয়টি বেদাঙ্গের অধ্যয়ন আবশ্যক তাহা আমরা বেদাঙ্গের পরিচয় লইলেই বুঝিতে পারিব। প্রথমেই শিক্ষাগ্রন্থ কি তাহা আমরা দেখিব।

(১) শিক্ষা—বেদমন্ত্র যথাযথ ভাবে উচ্চারণ না করিলে ফললাভ হয় না। এমন কি, যে মন্ত্রটি যেরূপে উচ্চারণ করিতে হইবে তাহার ব্যতিক্রম হইলে অনিষ্ট ফলও লাভ হইয়া থাকে। যথার্থ উচ্চারণের উপরই বেদমন্ত্রের ফলাফল নির্ভর করে। সুতরাং বেদমন্ত্র যথার্থ ভাবেই উচ্চারণ করা আবশ্যক। কোন্ বর্ণ কিরূপ ভাবে উচ্চারিত হইবে, কোন্ স্বর উদাত্ত হইবে, কোন্ স্বর অনুদাত্ত হইবে, কোন্ স্বর স্বরিত হইবে, সমাসের কোন্ অংশ কিরূপ ভাবে উচ্চারণ করিলে ঠিক অর্থটি হৃদয়ঙ্গম হইবে, এই সকল বিষয় যে গ্রন্থে লিখিত আছে তাহাকেই শিক্ষাগ্রন্থ বলা হইয়া থাকে। সংক্ষেপতঃ যে শাস্ত্রে বা গ্রন্থে বেদমন্ত্রের উচ্চারণ-পদ্ধতি বিহিত আছে তাহাই শিক্ষাগ্রন্থ। স্বর সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত—

উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ ত্রয়ঃ স্বরাঃ।
আয়ামবিশ্রম্ভাক্ষেপৈস্ত উচ্যন্তেঽক্ষরাশ্রয়াঃ।
একাক্ষরসমাবেশে পূর্ব্বয়োঃ স্বরিতঃ স্বরঃ।
তস্যোদাত্ততরোদাত্তাদর্দ্ধমাত্রার্দ্ধমেব বা।
অনুদাত্তঃ পরঃ শেষঃ স উদাত্তশ্রুতির্ন চেৎ।

ইত্যাদি।

মন্ত্র যথাযথ ভাবে উচ্চারণ করিতে না পারিলে যে অনিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত—

মন্ত্রোহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥

এস্থলে "ইন্দ্রের শত্রু (শাতয়িতা) পুত্র" অর্থই অভিপ্রেত ছিল। তৎপুরুষ সমাস যে ভাবে উচ্চারণ করিতে হয়, বহুব্রীহি সমাস সেইভাবে উচ্চারিত হয় না। বৃত্রাসুরের পিতা ইন্দ্রান্তক পুত্র প্রার্থনা করিয়া আহুতি প্রদান করিলেন, কিন্তু আহুতি দিবার সময় "ইন্দ্রশত্রু" শব্দটি এরূপভাবে উচ্চারিত হইল যে, তাহা বহুব্রীহি সমাসে পরিণত হইল। অর্থ দাঁড়াইল—ইন্দ্র যাহার শত্রু (শাতয়িতা নাশক)। ফলে বৃত্র কর্ত্তৃক ইন্দ্র নিহত না হইয়া—ইন্দ্র কর্ত্তৃক বৃত্র নিহত হইল।

(২) কল্প—যজ্ঞই বৈদিক যুগের প্রধান এবং প্রথম অবলম্বন। যজ্ঞ সম্বন্ধীয় বিধিনিষেধ যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে তাহাই কল্প। কল্পগ্রন্থ পাঠ না করিলে বৈদিক যজ্ঞাদি সুসম্পন্ন করা যায় না। বেদ পাঠ করিতে হইলে কল্পের জ্ঞান আবশ্যক। এই জন্যই কল্পগ্রন্থকে বেদাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে।

(৩) ব্যাকরণ—কোন ভাষা বুঝিতে হইলে যে সেই ভাষার ব্যাকরণ পাঠ করা আবশ্যক, এ কথা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না।

(৪) নিরুক্ত—যে সময়ে ঋষিগণ বেদমন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন, তাহার কিছুকাল পরে বেদের কোন কোন শব্দ সাধারণের দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে যেমন মন্ত্র পাঠ করিলেই তাহার অর্থ বুঝা যাইত, এখন আর সেরূপ রহিল না। যে যে শব্দ সাধারণের দুর্ব্বোধ্য হইল তাহাদের তালিকা প্রস্তুত হইল। কোন্ কোন্ শব্দের অর্থ পৃথিবী, কোন্ কোন্ শব্দের অর্থ জল, কোন্ কোন্ শব্দের অর্থ রশ্মি ইত্যাদি শব্দের তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে একত্র করা হইল; এবং বলিয়া দেওয়া হইল এই ২১টি পৃথিবীর নাম; এই ১০১টি শব্দে জল বুঝিতে হইবে, এই ১৫টি শব্দ রশ্মি-বাচক ইত্যাদি। এইরূপে যে গ্রন্থ প্রস্তুত হইল, তাহার নাম "নিঘণ্টু"। ইহার পরবর্ত্তী সময়ে মহামুনি যাস্ক এই নিঘণ্টুর ব্যাখ্যা

করিলেন। তিনি যে যে শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেই সেই শব্দ বেদের মধ্যে যে যে মন্ত্রে আছে, সেই সেই মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইরূপে আমরা যাস্কের নিকট হইতে কতকগুলি বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা পাইয়াছি এবং ব্যাখ্যার একটা রীতিও পাইয়াছি। আমরা বেদের যে সকল ব্যাখ্যা পাই, এই নিরুক্তই তন্মধ্যে প্রাচীনতম। সুতরাং বেদ পাঠ করিতে হইলে নিরুক্তগ্রন্থ অধ্যয়ন করা আবশ্যক। এই জন্যই নিরুক্তকে বেদাঙ্গ মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে। এই নিরুক্ত গ্রন্থেরই পরিচয় প্রদান করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

(৫) ছন্দ—মন্ত্রসকল ছন্দে গ্রথিত। নানারূপ ছন্দে বেদমন্ত্র সকল লিখিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ও জগতী প্রধান। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মন্ত্রের যথাযথ উচ্চারণের উপরই তাহার ফলাফল নির্ভর করে। উপরে যে সমস্ত ছন্দের নাম করা হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকের উচ্চারণ-প্রণালী বিভিন্ন। সুতরাং বেদমন্ত্রের যথারীতি উচ্চারণ করিতে হইলে ছন্দশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। এই জন্যই ছন্দকে বেদাঙ্গ বলা হইয়াছে।

(৬) জ্যোতিষ—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যজ্ঞই বৈদিক যুগের প্রধান কার্য্য ছিল। এখন আমাদের দেশে যজ্ঞ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন আমাদের দেশে কতকগুলি ব্রত স্ত্রীলোকরা পালন করিয়া থাকেন। সেই সকল ব্রতের কাল আমরা মুদ্রিত পঞ্জিকাতেই দেখিতে পাই। একাদশী, অনন্ত চতুর্দ্দশী প্রভৃতির জন্য আমাদিগকে জ্যোতিষ সংক্রান্ত বিচার করিতে হয় না। পঞ্জিকা খুলিলেই দেখিতে পাই, "একাদশীর ব্রত ও উপবাস"। কিন্তু পুরাকালে মুদ্রিত পঞ্জিকা ছিল না। আর্য্যগণ জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আকাশে গ্রহনক্ষত্রের গতির দ্বারা যজ্ঞের কাল নিরূপণ করিতেন। সেইজন্য জ্যোতিষকে বেদাঙ্গ বলিয়া গণনা করা হয়।

নিরুক্তের নাম বেদাঙ্গের মধ্যে নির্দ্দেশ করিবার সময় আমরা এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। এক্ষণে একটু বিস্তারিত ভাবে ইহার পরিচয় দিবার চেষ্টা করা যাউক। নিরুক্ত যে কেবল "অর্থ পুস্তক" তাহা নহে। সাধারণ অর্থে আমরা যাহাকে "অর্থ পুস্তক" বলি, ইহা সেই শ্রেণীর গ্রন্থ নহে। যাঁহারা এই গ্রন্থের সহিত পরিচিত, তাঁহারাই জানেন যে, এরূপ ব্যাখ্যা পুস্তক অদ্বিতীয়। মহামুনি যাস্ক অসাধারণ প্রতিভার

সাহায্যে এক বৃহৎ ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছেন; তাঁহার লিখিবার রীতিই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই পুস্তকখানি ভাষা-বিজ্ঞানের একখানি প্রাচীনতম গ্রন্থ। যাঁহারা ভাষা-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, সুদূর অতীতে লিখিত এই গ্রন্থে ভাষা-বিজ্ঞানের কি অমূল্য নিধি সঞ্চিত আছে। আর এক হিসাবে, এখানিকে দর্শনের একখানি গ্রন্থ বলা যায়। যাস্ক নিজের মত (Doctrine) সমূহ সুন্দর ভাবে আমাদের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাকে ইংরাজীতে Exegesis বলা হইয়া থাকে, ইহা সেই শ্রেণীর গ্রন্থ। আমরা এই গ্রন্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

গ্রন্থের প্রথমেই মহামুনি যাস্ক শব্দ-সমূহকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—"চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতে চোপসর্গনিপাতাশ্চ"। শব্দ-সমূহ চারিভাগে বিভক্ত,—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত। নাম পদার্থের অর্থ প্রধানভাবে প্রকাশ করিয়া থাকে; আখ্যাত ক্রিয়ার অর্থ প্রধান ভাবে প্রকাশ করিয়া থাকে। এই দুইটি যাস্ক দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই স্থলে যাস্কের পূর্ব্ববর্ত্তী একজন দার্শনিক ঔদুম্বরায়ণ আপত্তি করেন, যতক্ষণ বাক্য উচ্চারিত হইতেছে ততক্ষণই তাহার সত্তা, উচ্চারিত হইবামাত্রই তাহা অতীতে পরিণত হয়; সুতরাং পদসমূহকে কিরূপে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, একের সহিত অন্যের সম্বন্ধই বা কি করিয়া বুঝা যায়, সন্ধি প্রভৃতি ব্যাকরণের নিয়মই বা কিরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে? তিনি বলেন,—"রামো গচ্ছতি"—এই বাক্যে যতক্ষণ "রা" উচ্চারণ করিতেছি, ততক্ষণ "রা" বর্ত্তমান, "ম" এখনও ভবিষ্যৎ; যখনই "ম" উচ্চারণ করিলাম, তখনই "রা" অতীত হইয়া গেল; এইরূপে ঃ-গ-চ্ছ-তি, পর পর উচ্চারণ করিবার সময় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণ অতীত হইয়া গেল; ইহাদের সম্বন্ধই বা কি প্রকারে রক্ষিত হয় এবং 'ঃ'-স্থানে ওকার এই সন্ধিই বা কিরূপে সাধিত হয়? অতীতের সহিত কি বর্ত্তমানের সম্বন্ধ সংসাধিত হইতে পারে? ইহার উত্তরে যাস্ক বলেন—"ব্যাপ্তিমত্ত্বাত্তু শব্দস্য"—শব্দ ব্যাপ্তিমান, "রা" উচ্চারণের পর "ম" উচ্চারণের সময়ও "রা" বিদ্যমান; এই জন্যই আমরা বাক্যের (Sentence অর্থবোধে সমর্থ হইতে পারি। এই ভাবে তিনি ভাষা-বিজ্ঞানের একটি তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন। ভাব বা ক্রিয়ার কি কি প্রকার ভেদ হইতে পারে, উপ-

সর্গের কোন অর্থ আছে কিনা; নিপাত কাহাকে বলে এবং নিপাতের কোন্ কোন্ অর্থ হইতে পারে, এই সমস্ত যাস্ক উদাহরণ দ্বারা পরিষ্কাররূপে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। যে যে উদাহরণ দ্বারা তিনি এই সকল বিষয় আমাদিগকে বুঝাইয়াছেন, তৎসমস্তই বেদমন্ত্র। এই উদাহরণ হইতে আমাদের উভয়বিধ প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। যে শব্দ বুঝাইবার জন্য তিনি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে শব্দের অর্থ আমরা সম্যক বুঝিলাম, তাহার সহিত সেই মন্ত্রোক্ত সত্যও লাভ করিলাম। যাস্ক উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন। সমগ্র মন্ত্রটি তিনি ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। আমরা একটি উদাহরণ দেখি—"ত্ব" একটি নিপাত; যাস্ক বলিতেছেন, কেহ কেহ বলেন, "ত্ব" অর্থে "এক" বুঝিতে হইবে। তিনি উদাহরণ স্বরূপ ঋগ্বেদের ৮ অষ্টকের ২ অধ্যায়ের ২৪ বর্গের একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সেই মন্ত্রটি এই—

ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্
গায়ত্রং ত্বো গায়তি শকরীষু।
ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং
যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত উত্বঃ॥

"ঋত্বিক"দিগের কর্ম্মের পরিচয় এই মন্ত্রে পাওয়া যাইতেছে। ঋত্বিগ-গণের মধ্যে একজন (হোতা) ঋক্ পাঠ করিবেন, একজন (উদ্গাতা) ঋক (আশ্রয়) করিয়া গান করিবেন; একজন (সর্ব্ববিদ্যঃ ব্রহ্মা) সন্দেহস্থলে প্রমাদিপ্রদর্শন করিবেন, একজন (অধ্বর্য্যু) যজ্ঞের আহুতির মাত্রার পরিমাণ করিবেন। যে সময় এই মন্ত্র 'দৃষ্ট' হয়, তখনও অথর্ব্ব বেদ বেদনামে প্রচলিত হয় নাই। ত্রয়ী বলিলেই আমরা সমগ্র বেদ বুঝিয়া থাকি। ত্রয়ী—'ঋক্' 'সাম' ও 'যজু'র সমষ্টি। উপরে যে মন্ত্র উদ্ধৃত হইল তাহাতেও এই তিন বেদেরই নাম সূচিত হইয়াছে—ঋগ্বেদী হোতা, সামবেদী উদ্গাতা, যজুর্ব্বেদী অধ্বর্য্যু, এবং ব্রহ্মা ত্রিবেদজ্ঞ। চারি প্রকার ঋত্বিক লইয়া যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়; তাহাদের মধ্যে একজন ঋগ্বেদী হোতা, একজন সামবেদী উদ্গাতা, একজন যজুর্ব্বেদী অধ্বর্য্যু থাকি-বেন, আর ইঁহাদের কার্য্য পরিদর্শন করিবার জন্যও সন্দেহ স্থলে সন্দেহ দূরীকরণের জন্য একজন সর্ব্ববেদজ্ঞ থাকিবেন ব্রহ্মা,—এই তথ্য আমরা ঐ মন্ত্র হইতে শিখিলাম, আর শিখিলাম 'ত্ব' অর্থে 'এক'। যাস্ক কিরূপ

উদাহরণ উদ্ধৃত করেন, এই একটি হইতেই আমরা তাহার পরিচয় পাইলাম।

ব্যাকরণকারগণের মধ্যে শাকটায়ন এবং সমস্ত নিরুক্তকার* বলেন—সমস্ত 'নাম' 'আখ্যাত' হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে; আবার নিরুক্তকারগণের মধ্যে গার্গ্য এবং ব্যাকরণকারগণের মধ্যে প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ বলেন যে, সকল নামই যে আখ্যাত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এ কথা যথার্থ নহে। এই বিষয় যাস্ক যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বিচার করিয়াছেন। এই সকল কারণেই নিরুক্তকে ভাষা-বিজ্ঞানের গ্রন্থ বলিয়াছি।

নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাতের বিচারের মধ্যে একস্থলে যাস্ক সংক্ষেপে বেদের উদ্দেশ্য বা বেদপাঠের আবশ্যকতা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

"পুরুষবিদ্যানিত্যত্বাৎ কর্ম্মসম্পত্তির্মন্ত্রো বেদে।" ১।২

পুরুষের অর্থাৎ মনুষ্যের জ্ঞান অনিত্য বলিয়া অপৌরুষেয় জ্ঞানের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। সেই জন্যই বেদে মন্ত্রসমূহ রহিয়াছে। বেদে যে সমস্ত মন্ত্র আছে, তাহা অপৌরুষেয়, কোন মনুষ্যের দ্বারা রচিত নহে, সুতরাং তাহা অনিত্য নহে। মানবের জ্ঞান ভ্রমাত্মক ও অমূলক বলিয়াই বেদ হইতে সত্য জ্ঞান লাভ করা আমাদের প্রয়োজন।

নিরুক্ত গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা—বুঝাইবার সময় যাস্ক বলিতেছেন—"অথাপীদমন্তরেণ মন্ত্রেষ্বর্থপ্রত্যয়ো ন বিদ্যতে"। নিরুক্তগ্রন্থ পাঠ না করিলে বেদমন্ত্রের অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। যাস্ক উদাহরণ দিয়া এই কথা বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা একালের পুস্তক হইতে এই কথার উদাহরণ উদ্ধৃত করিব। সকলেই জানেন মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগ্‌বেদের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। নিরুক্তকে অগ্রাহ্য করিয়া বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া যে বৃথা, তাহা আমরা দেখিতে পাইব।

মিত্রং হুবে পূতদক্ষং বরুণং চ রিশাদসং।
ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা। ঋ ১—১—৪—২।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যানাবসরে দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন যে, যদিও ঘৃত অর্থে নিরুক্তকার জলই বুঝিয়াছেন, যদিও সায়ণাচার্য্য স্বকীয় ভাষ্যে ঘৃত অর্থে

* যাস্কের পূর্ব্বেও অন্য নিরুক্ত গ্রন্থ ছিল, কিন্তু এখন তাহাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে।

জলই লইয়াছেন, তথাপি যখন ঘৃত সাধারণ অর্থে—"ঘি" বলিয়াই পরিচিত, তখন এই অর্থ ত্যাগ করিয়া 'জল' অর্থ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহারা বেদের সহিত কিঞ্চিন্মাত্রও পরিচিত, তাঁহারা এই যুক্তির অসারত্ব বুঝিতে পারিবেন। বেদের মধ্যে ঘৃত শব্দ উদকবাচক, "ঘি" এই অর্থ কোন স্থানেও নাই। আমরা যে কালের গ্রন্থ পাঠ করি, অর্থবোধের সময় সেই কালেরই প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। ঘৃত অর্থে এখন "ঘি" বুঝাইতে পারে, কিন্তু বৈদিক যুগেও যে তাহাই অর্থ ছিল, এমন কোন নিশ্চয়তা যখন নাই, এবং যখন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, ঘৃত শব্দ অর্থান্তরেই ব্যবহৃত হইত, তখন ঘৃত শব্দে "ঘি" না বুঝিয়া "জল" বুঝাই উচিত। দত্ত মহাশয় অনুবাদ করিয়াছেন যে, তাঁহারা আসিয়া আমাদের যজ্ঞে ঘৃতাহুতি প্রদান করুন। যথার্থ অনুবাদ হইবে এইরূপ—পূতদক্ষ মিত্র (সূর্য্য) ও শত্রুনাশক বরুণ (সূর্য্য) কে আহ্বান করি, তাঁহারাই উদকপ্রেরণারূপ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন। (সূর্য্য যখন আমাদের মস্তকে থাকেন, তখন তাঁহার নাম মিত্র, যখন অধোদেশে গমন করেন, তখন তাঁহার নাম বরুণ)। দত্ত মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তিও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। যাস্ক সত্যই বলিয়াছেন—"অথাপীদমন্তরেণ মন্ত্রেষর্থপ্রত্যয়ো ন বিদ্যতে।"

যাস্ক আবার বলিতেছেন—"অথাপীদমন্তরেণ পদবিভাগো ন বিদ্যতে।" নিরুক্তে অভিজ্ঞতা না থাকিলে মন্ত্রের পদ-বিভাগ করা যায় না। "দূতো নির্ঋত্যা ইদমাজগাম"—এই স্থানে নির্ঋত্যাঃ পঞ্চমী এবং ষষ্ঠী দুইই হইতে পারে। "পরো নির্ঋত্যা আ চক্ষ্ব"—এস্থলে নির্ঋত্যৈ"—চতুর্থীর স্থানে সন্ধি হইয়া আকারান্ত হইয়াছে। "ইন্দ্রং ন ত্বা শবসা দেবতা বায়ুং পৃণন্তি"—এস্থলে "ইন্দ্র" এবং "বায়ু" উভয়ই রহিয়াছে, মন্ত্রের দেবতা কে?—এই সকল বিষয়ের মীমাংসার জন্য নিরুক্ত পাঠ করা আবশ্যক। অর্থ-জ্ঞান না হইলে কোন কার্য্যই সাধিত হয় না। বেদের মধ্যেও জ্ঞানের প্রশংসা এবং অজ্ঞানের নিন্দা আছে—

স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থম্।
যোঽর্থজ্ঞ ইৎসকলং ভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞান বিধূতপাপ্মা॥

প্রথমাধ্যায়ে যাস্ক এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে তিনি নির্ব্বচন (Derivation) সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন।

পূর্ব্বে নিরুক্তের সাধারণ পরিচয়ের সময় বলা হইয়াছে যে, যাস্ক নিঘণ্টুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ হইতে সেই ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়াছে। আমরা এইবার তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

নিঘণ্টুর প্রথমাধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে ২১টি পৃথিবীবাচক শব্দ একত্র করা হইয়াছে। প্রথম শব্দটি "গৌঃ"। যাস্ক ইহার ব্যাখ্যা করিলেন। তৎপরে গো শব্দ কোন্ কোন্ অর্থবাচক তাহারও নির্দ্দেশ করিলেন। ধেনু অধিষবণ-চর্ম্ম, চর্ম্ম, ধনুর জ্যা, আদিত্য, চন্দ্র, রশ্মি—এই সকল অর্থ নির্দ্দেশ করিলেন। গো শব্দ আদিত্যবাচক, এই কথা বলিয়াই যাস্ক বলিতেছেন—"অথাপ্যস্যৈকো রশ্মিশ্চন্দ্রমসংপ্রতি দীপ্যতে, আদিত্যতোঽস্য দীপ্তির্ভবতি।"—আমরা আমাদের শিক্ষকগণের উপদেশানুসারে বৈদিক যুগকে অজ্ঞানের যুগ বলিয়া থাকি। বিজ্ঞান (Science) সে সময় লোকের নিকট অপরিচিত ছিল। কিন্তু যাস্ক যাহা বলিতেছেন, তাহা দেখিয়া এই কথা মিথ্যা বলিয়াই বুঝিতে পারি। যাস্ক বলিতেছেন, সূর্য্যেরই রশ্মি চন্দ্রের দিকে যায়; চন্দ্রের দীপ্তি সূর্য্য হইতেই প্রাপ্ত। এ সম্বন্ধে পাছে কেহ কোন সন্দেহ উপস্থাপিত করেন, যেন এই আশঙ্কায় যাস্ক বলিতেছেন—আরও দৃষ্টান্ত আছে,—চন্দ্রের নাম গন্ধর্ব্ব, চন্দ্র সূর্য্যের যে রশ্মি লইয়া নিজে দীপ্তিমান তাহার নাম সুষুম।* গো শব্দ রশ্মিবাচক—তাহার দৃষ্টান্ত (ঋগ্বেদ—২ অ-২ অ-২৪ বর্গ দ্রষ্টব্য) উদ্ধৃত করিয়া যাস্ক আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। কোন্ রূপ গৃহে আমাদের বাস করা উচিত, তাহাই এই মন্ত্রে জানিতে পারি। "যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ"—যেখানে সূর্য্যের আলোক প্রভূত পরিমাণে গমনাগমন করিতে পারে—সেইরূপ গৃহে বাস করা উচিত।

এইরূপে নিঘণ্টুর শব্দ-পর্য্যায় যাস্ক পর পর ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বেদমন্ত্র হইতে নিজের ব্যাখ্যার সমর্থন করিয়াছেন। সেই সমস্ত শব্দের প্রতি এখন বিশেষ মনোযোগ না দিয়া আমরা অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিব। যাস্ক আমাদের শিক্ষার জন্য যে যে কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহার প্রতি আমরা সমধিক মনোযোগ দিব। ঋ ৮—৫—১২—৫ ঋকের এক অংশ—"হোত্রমৃষিনিষীদন্"। যাস্ক তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী নিরুক্তকার ঔপমন্যবের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন—"ঋষির্দর্শনাৎ, স্তোমান্ দদর্শেত্যৌপমন্যব-স্তদ্যদেনাংস্তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভ্বভ্যানর্ষত, ঋষয়োঽভবন্, তদৃষীণামৃ-

* সুষুমঃ সূর্য্য রশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্ব ইত্যপি নিগমো ভবতি। নি° ২।৬

লিখিয়াছেন।" ঔপমন্যব বলেন, দৃশ্‌ ধাতু হইতেই ঋষি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহার অর্থ—যিনি ঋক্‌ দর্শন করিয়াছেন, * তিনিই ঋষি। "তপস্যমান" ইঁহাদিগের নিকট বেদ স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়াই, ইঁহারা ঋষি; ব্রাহ্মণ-গ্রন্থেও এই কথা লিখিত আছে। নিরুক্তমতে, যাঁহারা ঋক্‌ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই ঋষি। আজ কাল এই ঋষি শব্দের অপব্যবহার দেখিয়া কোন্‌ সহৃদয় ব্যক্তি না ব্যথিত হইবেন! (নি—২।১১)

ঋ০ ১—২—৩৭—৫ ঋকের এক অংশ "বৃত্রস্য নিক্তং বি চরন্ত্যাপঃ"। ইহার ব্যাখ্যানাবসরে যাস্ক বলিতেছেন—"তৎকো বৃত্রো মেঘ ইতি নৈরুক্তাস্ত্বাষ্ট্রোঽসুর ইত্যৈতিহাসিকাঃ।" বৃত্র কে? নিরুক্তকারগণ বলেন, বৃত্র মেঘ; ঐতিহাসিকগণ বলেন, বৃত্র ত্বষ্টার পুত্র—একজন অসুর। ইহার প্রথমাংশ আমরা সকলেই বুঝিতে পারিতেছি। দ্বিতীয় অংশের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। ত্বষ্টা রূপকৃৎ দেবতা— যিনি সকল দ্রব্যের রূপ প্রদান করেন—তিনিই ত্বষ্টা। আমরা জানি সূর্য্যই রূপ প্রদান করিয়া থাকেন। বেদে পৃশ্নি সূর্য্যের একটি নাম। পৃশ্নি শব্দ ব্যাখ্যা করিবার সময় যাস্ক বলিয়াছেন—"পৃশ্নিরাদিত্যো ভবতি, প্রাশ্নুতে এনং বর্ণ ইতি নৈরুক্তাঃ"। সূর্য্য হইতে মেঘ উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব মেঘ সূর্য্যের পুত্র সুতরাং ত্বাষ্ট্র; কিন্তু অসুর শব্দের অর্থ কই? অসু—অর্থে জল, "র" দানে; যে জল দান করে। "ঐতিহাসিকগণের মতেও যে বৃত্র মেঘ, তাহা বুঝিলাম। কিন্তু বেদের মধ্যে যে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের যুদ্ধের কথা বর্ণিত আছে, সে কি তবে একেবারেই অমূলক? বেদে ত অমূলক কথা নাই। যাস্ক যেন আমাদের এই সন্দেহ আশঙ্কা করিয়াই বলিতেছেন—"অপাঞ্চ জ্যোতিষশ্চ মিশ্রীভাবকর্ম্মণো বর্ষকর্ম্ম জায়তে, তত্রোপমার্থেন যুদ্ধবর্ণা ভবন্তি; অহিবত্ত খলু মন্ত্রবর্ণা ব্রাহ্মণবাদাশ্চ।"

জল এবং তেজের মিশ্রণ হইতেই বৃষ্টি হইয়া থাকে; এই বৃষ্টিই রূপকে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের যুদ্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মন্ত্রের গতি সর্পের ন্যায়। সর্প যেমন একস্থানে গমন করিবার সময় কুটিল গতিতে

* এই প্রবন্ধে আমি পূর্ব্বেই ঋক্‌ 'দৃষ্ট' হইয়াছিল লিখিয়াছি,—ঋক্‌ রচিত হইয়াছিল এরূপ লিখি নাই তাহার কারণ বেদ কাহারও রচিত নহে; বেদ ঋষিগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা শ্রুত হইয়াছিল; এই জন্যই বেদকে শ্রুতি বলা হইয়া থাকে। ইংরাজীতে এই দৃষ্ট বা শ্রুতকে বলা হয়—revealed.

গমন করে, সেইরূপ মন্ত্রও যে তথ্য প্রকাশ করিতে চায়, সেটি একটু ভিন্ন দিক দিয়া প্রকাশ করে। (নিঃ ২।১৬)।

অহন্ শব্দ দিবাবাচী। অহন্ শব্দের উদাহরণ স্বরূপ ঋ ৪—৫—১১—১ ঋক্ উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

অহশ্চ কৃষ্ণমহরর্জ্জুনঞ্চ বিবর্ত্তেতে রজসী বেদ্যাভিঃ।
বৈশ্বানরো জায়মানো ন রাজাবাতিরজ্জ্যোতিষাগ্নিস্তমাংসি॥

রাত্রি ও দিন অনবরত ঘুরিতেছে। সূর্য্য জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি কিরণ দ্বারা অন্ধকার নাশ করেন। মনে হয় সূর্য্য উদিত হইতেছেন। সূর্য্য স্থির ভাবে একস্থানেই থাকেন, পৃথিবী অনবরত ঘুরিতেছে, সেইজন্য পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ কৃষ্ণ বর্ণ, অর্দ্ধাংশ শুক্ল (অর্জ্জুন)। যখন পৃথিবীর যে স্থান সূর্য্যের সম্মুখে থাকে, তখন সেই স্থানে সূর্য্য "উদিত" হয়েন; সর্ব্বদাই এই ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে; সেইজন্য সূর্য্যকে "জায়মান ইব" বলা হইয়াছে।* আমরা মনে করি, পৃথিবী মেরুদণ্ডের উপর অনবরত ঘুরিতেছে বলিয়াই, দিন ও রাত্রি হইতেছে—এই সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য মনীষিগণই করিয়াছেন। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত ঋক্ পাঠ করিলে সেই মতের অসারতা প্রতিপন্ন হইবে। যাঁহারা আমাদের বেদকে "চাষার গান" বলিয়া উপহাস করেন, তাঁহারা দেখুন আমাদের দেশের চাষার গানই বা কিরূপ!

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে অপত্যবাচক শব্দের ব্যাখ্যা করিবার সময় যাস্ক এই ভাবের মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পুত্রই দায়ভাগী, কন্যা নহে; সেই জন্যই কন্যাকে পরহস্তে সমর্পণ করা যায়। এমন কি, কন্যাকে দান, বিক্রয়, ত্যাগ করিতে পারা যায়, পুত্রকে পারা যায় না। কিন্তু অন্য এক সম্প্রদায় বলেন—পুত্রকেও বিক্রয় করা যায়, কেননা শুনঃশেপকে তাঁহার পিতা বিক্রয় করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, অভ্রাতৃমতী কন্যা দায়ভাগ গ্রহণ করিতে পারে। এই সূত্র ধরিয়া যাস্ক এক বিচার করিয়াছেন, অভ্রাতৃমতী কন্যার বিবাহ হইতে পারে কি না। বিচারে সিদ্ধান্ত হইল অভ্রাতৃমতী কন্যাকে বিবাহ করিতে নাই। যাঁহারা এ বিষয়ে বিস্তারিত

---

* অহশ্চ কৃষ্ণং রাত্রিঃ শুক্লং চাহরর্জ্জুনং বিবর্ত্তেতে রজসী বেদ্যাভির্বেদিতব্যাভিঃ প্রবৃত্তিভি বৈশ্বানরো জায়মান ইবোদ্যন্নাদিত্যঃ সর্ব্বেষাং জ্যোতিষাং রাজাবাহন্নগ্নির্জ্যোতিষা তমাংসি। ২।২১

বিচার জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিরুক্তের ৩ অধ্যায়ের ১—৪ খণ্ড দেখিবেন। যাস্ক অথর্ব্ব বেদের ১।১৭।১ মন্ত্র——

অমূর্যা যন্তি জাময়ঃ সর্ব্বা লোহিতবাসসঃ।

অভ্রাতর ইব যোষাস্তিষ্ঠন্তি হতবর্ত্মনঃ॥

উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন (দ্বিতীয়ার্দ্ধের ব্যাখ্যা)

"অভ্রাতৃকা ইব যোষাস্তিষ্ঠন্তি সন্তানকর্ম্মণে পিণ্ডদানায় হতবর্ত্মান ইত্যভ্রাতৃকায়া অনির্বাহ ঔপমিকঃ।"

আমরা স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও জানিতে পারি যে, যে কন্যার ভ্রাতা নাই তাহাকে শ্রেয়স্কাম ব্যক্তি বিবাহ করিবে না। কেন না সে কন্যা ধর্ম্মতঃ তাহার পিতার পুত্রিকা; তাহার পুত্র তাহার স্বামীর পুত্র বলিয়া ধর্ম্মতঃ পরিগণিত হইতে পারে না।

যস্যাস্তু ন ভবেদ্ ভ্রাতা ন বিজ্ঞায়েত বা পিতা।

নোপযচ্ছেত তাং প্রাজ্ঞঃ পুত্রিকা ধর্ম্মশঙ্কয়া॥ মনু, ৩।১১

আমাদের নাম আর্য্য, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ 'ঋ' ধাতু হইতে আর্য্য শব্দ নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, 'ঋ' ধাতুর অর্থ "চাষ-বাস" করা। 'ঋ' ধাতুর উত্তর ণ্যৎ প্রত্যয় করিয়া যখন আর্য্য শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে, তখন বুঝিতে পারা যায় আর্য্যগণ কৃষক-সম্প্রদায়-বিশেষ ছিলেন। এই মতই এখন সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। পাণিনির ধাতু পাঠের মধ্যে দুইটি 'ঋ' ধাতু, একটি 'ৠ' ধাতু, আছে। একটি ভ্বাদিগণীয়—অর্থ গতি ও প্রাপণ; একটি জুহোত্যাদিগণীয়, অর্থ গতি; একটি ক্র্যাদি, অর্থ গতি। "চাষ-বাস করা" অর্থ কোথায়ও নাই। Latinএ or-ior, re-mus, aro: Gothicএ ar-gan: Anglo-Saxonএ ar: Old High German এ ruo-dar, ar-an: Lithuanian এ ir-ti=to row; ar-ti=to plough (জমি চষা)—এত কষ্ট করিয়া আর্য্য শব্দের অর্থ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। পাঠকগণ দেখিবেন, যে ভাষার শব্দ সে ভাষার ধাতু হইতে অর্থ গ্রহণ করা হইতেছে না। এই টুকুই বিস্ময়কর। আমরা এইবার নিরুক্তের আশ্রয় লইয়া আর্য্য শব্দের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। ঋগ্বেদের অষ্টকের ৮ অধ্যায়ের ১৭ বর্গে একটি মন্ত্রে আছে—

উরু জ্যোতিশ্চক্রথুরার্য্যায়।

যাস্ক আর্য্য শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন—"আর্য্য ঈশ্বরপুত্রঃ" (নি° ৬।২৬)।

পূর্ব্বে একস্থানে (৫।৭) যাস্ক বলিয়াছেন—(ঋগ্বেদের ৫-৬-২৩-৫ ঋকের ব্যাখ্যা কালে)—"অর্য্যোঽহমীশ্বরঃ।" এই "আর্য্য" পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের হস্তে কতদূর লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে, তাহা দেখিবার ও ভাবিবার বিষয়। যে সময় যাস্ক নিরুক্ত-গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তখন তিনি ভাবিতে পারেন নাই যে, আর্য্যশব্দের এত দূর দুর্দ্দশা হইবে।

উদাহরণ উদ্ধৃত করিবার একটা রীতি আমরা বুঝিতে পারিলাম। যাস্ক এই ভাবে শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন এবং উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা অমূল্য, বেদপাঠিগণের ইহা পরম সহায়।

কোন মন্ত্র পাঠ করিতে হইলে অথবা কোন মন্ত্র কোন কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হইলে সেই মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ এবং দেবতা জানিয়া সেই মন্ত্রের প্রয়োগ করিতে হইবে। ঋষি কাহাকে বলে, তাহা আমরা নিরুক্তকারের ব্যাখ্যা হইতেই জানিতে পারিয়াছি। যে ঋষি যে মন্ত্র দর্শন করিয়াছেন, তিনি সেই মন্ত্রের ঋষি বলিয়া অভিহিত। ছন্দের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কোন্ মন্ত্রের কোন্ দেবতা তাহা জানিবার উপায় যাস্ক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"সৈষা দেবতোপপরীক্ষা। যৎকাম ঋষির্যস্যাং দেবতায়ামার্থপত্যমিচ্ছন্‌স্তুতিং প্রযুঙ্‌ক্তে তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি।" কোন মন্ত্রে যাহাকে প্রধানভাবে স্তুতিকরা হয়, অথবা যাহার সম্বন্ধে প্রধান ভাবে কিছু বলা হয়, সেইটিই সেই মন্ত্রের দেবতা। এই জন্যই আমরা উপানদ্দেবতা পর্য্যন্ত দেখিতে পাই। উপনয়নের সময় "উপানদ্দেবতা উপানৎপরিধাপনে বিনিয়োগঃ"—এই বাক্যের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। দেবতা সম্বন্ধে আমাদের যে সাধারণ ধারণা আছে মন্ত্রের দেবতা সেই অর্থে বুঝিলে চলিবে না। উপরে যাস্ক যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহারই সাহায্যে আমাদের দেবতা চিনিয়া লইতে হইবে।

দেবতার সংখ্যা—নির্দ্দেশ করিবার সময় যাস্ক বলিতেছেন—"তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তা অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ুর্ব্বেন্দ্রো বান্তরিক্ষস্থানঃ সূর্য্যো দ্যুস্থানঃ।"—দেবতা তিনটি, একটি পৃথিবীতে, একটি অন্তরিক্ষে, আর একটি দ্যুলোকে; পৃথিবীর দেবতার নাম অগ্নি, অন্তরিক্ষের দেবতার নাম বায়ু বা ইন্দ্র এবং দ্যুলোকের দেবতার নাম সূর্য্য। এই তিনটি দেবতারই ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার কল্পনা করা হইয়া থাকে। এই

রূপে 'ব্রাহ্মণে' আমরা তেত্রিশ দেবতার পরিচয় পাই—অগ্নির স্থানে ৮ বসু, বায়ুর স্থানে ১১ রুদ্র, সূর্য্যের স্থানে ১২ আদিত্য, ১ প্রজাপতি, ১ বষট্কার। এই তেত্রিশ দেবতা পরবর্ত্তী সময়ে তেত্রিশ কোটি দাঁড়াইয়াছে, এখন আর তেত্রিশ কোটিতেও কুলায় না। মূলে কিন্তু দেবতা তিনটি। আবার এই তিনটি দেবতা একই তেজের রূপান্তর মাত্র। এই তেজ অগ্নি। বিদ্যুৎকে মাধ্যমিক অগ্নি বলা হয় এবং সূর্য্যকে দ্যুলোকের অগ্নি বা উত্তম অগ্নি বলা হয়।

বিশ্বানর এবং বৈশ্বানর অগ্নির নাম। অগ্নি তিন প্রকার, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কোন্ অগ্নির নাম বিশ্বানর, কোন্ অগ্নিরই বা নাম বৈশ্বানর, তাহার এক বিস্তারিত বিচার যাস্ক দেখাইয়াছেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিশ্বানর বলিতে মাধ্যমিক অগ্নি (বিদ্যুৎ) ও উত্তম অগ্নি (সূর্য্য), এবং বৈশ্বানর বলিতে পার্থিব অগ্নি বুঝিতে হইবে। যাস্ক বলিতেছেন—পার্থিব অগ্নি বিদ্যুৎ ও সূর্য্য হইতে উৎপন্ন বলিয়া এবং বিদ্যুৎ ও সূর্য্যের নাম বিশ্বানর বলিয়া পার্থিব অগ্নির নাম বৈশ্বানর। তিনি একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথা সুস্পষ্ট করিয়াছেন। যদি কোন গৃহ বিদ্যুৎ দ্বারা আহত হয়, তাহা হইলে সেই গৃহ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়; যতক্ষণ বিদ্যুৎ কোন দ্রব্যে আঘাত না করে, ততক্ষণ জলই তাহার ইন্ধন, কিন্তু যখন কোন দ্রব্য কর্তৃক সে "উপাদীয়মান" (attracted) হয়, তখন তাহাতে দ্রব্যাদি দগ্ধ হয়, এবং জল তখন তাহাকে নির্ব্বাপিত করিতে পারে। মাধ্যমিক অগ্নি-বিশ্বানর হইতে উৎপন্ন বলিয়া পার্থিব অগ্নি বৈশ্বানর। এইরূপ উত্তম-অগ্নি-বিশ্বানর হইতেও অগ্নি উৎপন্ন হয়। কাঁসার কোন পাত্র পরিষ্কার করিয়া মাজিয়া যদি সূর্য্যের রশ্মির বিরুদ্ধে ধারণ করা যায় (Concave mirror) অথবা যদি মণি মাজিয়া ঘসিয়া সূর্য্যের রশ্মির বিরুদ্ধে ধারণ করা যায়, (lens) তাহা হইলে শুষ্ক গোময়াদি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। * এই জন্যই যাস্কের মত—বিশ্বানর বলিতে বিদ্যুৎ ও সূর্য্য বুঝিতে হইবে এবং বৈশ্বানর বলিতে পার্থিব অগ্নি বুঝিতে হইবে।

* যত্র বৈদ্যুতঃ শরণমভিহন্তি যাবদনুপাত্তো ভবতি মধ্যম ধর্ম্মৈব তাবদ্ভবত্যুদকেন্ধনঃ শরীরোপশমনঃ উপাদীয়মান এবায়ং সম্পদ্যত উদকোপশমনঃ শরীরদীপ্তিঃ। অথাদিত্যাৎ। উদীচি প্রথম সমাবৃত্ত আদিত্যে কংসং বা মণিং বা পরিমৃজ্য প্রতিস্বরে যত্র শুষ্কগোময়-সংস্পর্শয়ন্ ধারয়তি তৎ প্রদীপ্যতে সোঽয়মেব সম্পদ্যতে। নি০ ৭।২৩ (দৈবতকাণ্ড ১।২৩)

এইরূপে একটির পর একটি করিয়া নিঘণ্টুর যাবতীয় শব্দ যাস্ক ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বেদ হইতে মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া আমাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন। আমরা যদি তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করি, তাহা হইলে এই অগাধ জ্ঞানরাশি অন্ধকারেই রহিয়া যাইবে। হইয়াছেও তাহাই। আমরা আজ কাল বেদের চর্চ্চা করি না, বেদ অন্ধকার গুহার মধ্যে অযত্নে পড়িয়া রহিয়াছে। যাঁহারা বেদ সম্বন্ধে সামান্য কথাও জানিতে চাহেন, তাঁহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুবাদ পাঠ করিয়াই নিজেদের অনুসন্ধিৎসাকে নির্ব্বাপিত করেন; মূল বেদপাঠ তাঁহাদের ঘটিয়া উঠে না। যাঁহাদের অনুবাদ পাঠ করেন তাঁহারাও নিরুক্ত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ না করিয়াই অনুবাদ করিয়াছেন; কাজেই অন্ধের নিকট অন্ধের গন্তব্য পথ নিরূপণ করার ন্যায় তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। আজ কাল তাই বেদ "চাষার গানে" পরিণত হইয়াছে। যে বেদ সর্ব্ব জ্ঞানের আধার, সেই বেদের এই দুর্দ্দশা! কেহ কেহ ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বেদপাঠ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও নিরুক্ত গ্রন্থ ভাল করিয়া পাঠ করেন না। ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, আজ কাল যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই বেদ সম্বন্ধে দুইচারি কথা বলেন, বেদমন্ত্রের কল্পিত ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহাতে সাধারণ লোকের সমূহ ক্ষতি সাধিত হয়,—মূল তথ্য নষ্ট হইয়া যায়।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

সংগ্রহ।

সমাজ তত্ত্ব।

সামাজিক সমৃদ্ধি।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২রা মে তারিখে বিলাতের অ্যাডেলফি নগরে রয়েল সোসাইটী অব আর্টসের গৃহে সোসিওলজিক্যাল সোসাইটীর এক অধিবেশন হইয়াছিল। তথায় 'ষ্ট্যাটিষ্ট' নামক বিখ্যাত পত্রের সম্পাদক মিঃ জর্জ্জ পার্শ—'সামাজিক মঙ্গল' শীর্ষক একটি সন্দর্ভ পাঠ করেন। অর্থের ও বিলাসের বৃদ্ধিই সামাজিক মঙ্গলের একমাত্র লক্ষণ ও নিদর্শন,—ইহাই প্রবন্ধ লেখকের ধারণা। ইনি সুখবাদী (optimist)। ক্রমশঃ পৃথিবীর লোকের সুখবৃদ্ধি হইতেছে,—ইহাই ইহাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়। বিলাস ও স্বচ্ছন্দতাই সেই সুখের অভিব্যক্তি। এই সন্দর্ভটি লইয়া বিলাতে একটু আন্দোলনও হইয়াছিল। লেখক সমগ্র মানবজাতির কথার আলোচনা করিলেও—তাঁহার অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শন কেবল য়ুরোপীয় জাতিগণের মধ্যে নিবদ্ধ। সেই জন্য তাঁহার মন্তব্য কেবল য়ুরোপীয় জাতি সমূহ সম্বন্ধে যেরূপ খাটে, অন্য জাতি সম্বন্ধে সেরূপ খাটে না। যাহা হউক, আমরা তাঁহার সন্দর্ভের স্থূল মর্ম্মমাত্র নিম্নে বিবৃত করিলাম।

আজ কাল পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই আর্থিক আড়ম্বর বৃদ্ধি পাইয়াছে। আধুনিক লোক যেরূপ অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে, তাহা দর্শন করিলে প্রাচীনকালের লোক বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইত। শান্তির সময়ে সমরোপকরণের জন্য এখন যত অর্থব্যয় হয়, সে কালে যুদ্ধের সময়েও সেরূপ অর্থ ব্যয়িত হইত না। ভ্রমণ ও আমোদের জন্য আজ কালকার লোক বিপুল অর্থব্যয় করিতেছে। ধনীদিগকে জল-পথে বিদেশে লইয়া যাইবার জন্য ভাসমান হোটেল রহিয়াছে,—তাঁহারা জাহাজে করিয়া বিলাস-সাগরে সাঁতার দিতে দিতে এদেশ সেদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। বহু অর্থব্যয়ে সুখদ ট্রেণসমূহ তাঁহাদিগকে দ্রুতবেগে নানা দেশে লইয়া যাইবার জন্য চারিদিকে ছুটিতেছে। সে কালের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ রাজারাও এরূপ সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইতেন না। এখন সাগরতীরে সুন্দর সুন্দর হোটেল,—নিদাঘ-নিবাস প্রভৃতি বিদ্যমান, অনেকেই তাঁহাদের আয়ের কতকাংশ সাগরতীরে বা পল্লীবাসে চিত্তবিনোদনের জন্য ব্যয়িত করিয়া থাকেন। পোষাকপরিচ্ছদে লোক এখন যে কত অর্থব্যয় করিয়া থাকে,—তাহা ধারণা করা যায় না। গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে প্রাসাদতুল্য সৌধরাজি নির্ম্মিত হইতেছে। সহরে সহরে প্রমোদ কানন, ও সুসজ্জিত আরামের মাঠ দেখা দিতেছে। জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি ও আরামের জন্য

অধুনাতন জাতি-সমূহ।

সহরমাত্রই সংস্কৃত হইতেছে। নিউ ইয়র্ক, বোষ্টন, ফিলাডেলফিয়া, পিট্‌স্ বর্গ, সিকাগো প্রভৃতি সহরের উপকণ্ঠে অজস্র অর্থব্যয়ে কত সুন্দর সুন্দর প্রমোদ-প্রান্তর ও বিলাস-কুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে,—তাহা দেখিলে মন আহ্লাদে মাতিয়া উঠে। গরিব মজুরদিগের অবস্থারই বা কত উন্নতি? তাহাদের বস্তি প্রায় সে কালের ধনীর ভবনের মত সুন্দর, তাহাদের জন্ত নির্ম্মল পানীয়, সুন্দর স্নানাগার প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। অচিরকালমধ্যে শ্রমজীবিসম্প্রদায় প্রাতঃস্নান ব্যাপারটিতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিবে।

বর্ত্তমান যুগে জনসমাজে এক দিকে যেমন শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি পাইতেছে অন্ত দিকে তেমনই মানসিক উন্নতির সুবন্দোবস্ত হইতেছে। অজ্ঞানান্ধকারসমাচ্ছন্ন দেশ ভিন্ন আর সর্ব্বত্রই সার্ব্বজনীন শিক্ষা প্রদানের সুব্যবস্থা হইয়াছে।

সমৃদ্ধির লক্ষণ।

পূর্ব্বকালে অতি অল্প বয়স্ক বালকবালিকাগণকে সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অর্থার্জ্জন করিতে হইত, এখন তাহা হয় না। এখনকার বালকবালিকারা অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে,—তাহাদের অধ্যয়ন কাল ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইদানীং সংবাদ পত্র, মাসিক পত্র, পুস্তক প্রভৃতি দ্বারা জনসাধারণের শিক্ষার, আমোদের ও উপদেশ লাভের কার্য্য অতি সুন্দর ভাবে নির্ব্বাহিত হইতেছে। জনসমাজের মধ্যে মৃত্যুর হার হ্রাস পাইতেছে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে চিকিৎসা ও রোগিশুশ্রূষার ক্রমশঃ উন্নতি সাধিত হইতেছে,—স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে লোক অধিক মনোযোগ দিতেছে। ইহাতেই সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে যে, জনসমাজ ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে।

এই সকল উন্নতি ও তাহার আনুষঙ্গিক ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকের আহার সম্পর্কেরও বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন জনসংখ্যার অনুপাতে বহু পরিমাণ অধিক খাদ্য সংগৃহীত হইতেছে,—লোক খাদ্য সংগ্রহের জন্ত অনেক অধিক অর্থ ব্যয় করিতেছে,—সেই জন্ত অসন, বসন, আবাস ও বিলাসিতা প্রভৃতি ব্যাপারে জনসমাজ বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিতেছে। তাম্র বর্ণ পীত বর্ণ ধূসর বর্ণ ও শ্বেত বর্ণ মানব সমাজে সমৃদ্ধির এই সকল নিদর্শন অল্পাধিক আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

বিভিন্ন জাতির সমৃদ্ধি।

জগতের এই সমৃদ্ধিবৃদ্ধির অনেক কারণ বর্ত্তমান। সামাজিক মঙ্গল সম্বন্ধে জনসাধারণের জ্ঞানের বৃদ্ধি ও বিস্তার ইহার কারণ। পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে ব্যক্তির ও জাতিরা অন্ত ব্যক্তি ও জাতিকে দরিদ্র করিয়া আপনারা সমৃদ্ধিশালী হইতেছে,—কিন্তু এখন লোক ক্রমশঃই বুঝিতে পারিতেছে যে অন্তকে দরিদ্র করিয়া কোনও ব্যক্তি বা জাতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারে না। যে সকল মানবসঙ্ঘ এক ধর্ম্মের উপাসক, এক ভাষা ভাষী, একই স্বার্থে স্বার্থবান, তাহারা পরস্পরের স্বার্থসাম্য ক্রমেই দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করিতেছে, আপন আপন লাভালাভের অভিজ্ঞতা অধিকতর নিশ্চয়তার সহিত বুঝিতে সমর্থ হইতেছে,—সেই জন্ত তাহারা ব্যক্তিগত, পরিবারগত, সমাজগত ও গ্রামগত সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া আপনাদের

সমৃদ্ধির কারণ।

বিরাট রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় স্বার্থে অধিকতর অবহিত হইতেছে। সেই রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় সমৃদ্ধির বর্দ্ধনকল্পে তাহারা পদে পদে স্বার্থত্যাগ করিতেছে। পূর্ব্বে লোক বিদেশী-দিগকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিত,—এখন বৈদেশিকদিগের প্রতি সেই ঘৃণা জনসমাজ হইতে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে।

ফল কথা অর্থ সম্পর্কিত ব্যাপারে পৃথিবী ক্রমশঃ পূর্ণ পরিণতি লাভের সন্নিহিত হইতেছে। সেই সাযুজ্য লাভের পথে মানবসমাজে যে সমস্ত শারীরিক ও মানসিক বাধা বিঘ্ন ছিল, তাহা অন্তর্দ্ধান করিতেছে। যখন হইতে মানব জাতি প্রত্যেক আপন আপন পরিবারকে প্রথম ও প্রধান গণনীয় বলিয়া মনে না করিয়া এক একটি জেলা বা অঞ্চলকে সমৃদ্ধির হিসাবে প্রথম ও প্রধান গণনীয় (economic unit) বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছে,—তখনই সামাজিক হিসাবে মানবজাতি অপোগণ্ডত্ব পরিহার করিয়াছে বুঝিতে হইবে। সামাজিক হিসাবে ইহা বিশেষ উন্নতি। আবার যখন মানব জাতি জেলা বা অঞ্চলকে সামাজিক সমৃদ্ধির হিসাবে প্রথম ও প্রধান গণনা ত্যাগ করিয়া সমস্ত রাষ্ট্রকেই ঐ হিসাবে প্রথম ও প্রধান গণ্য করিতে শিখিয়াছে,—তখনই মানব সমাজ বালকত্ব পরিহার করিয়া কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র মানব-সমাজই সামাজিক ও আর্থিক হিসাবে প্রথম ও প্রধান গণনীয় (unit) বলিয়া লোক উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে—যদিও সেই উপলব্ধির পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটিতে এখনও বিলম্ব আছে—তথাপি তাহার অনেক বাধা বিপত্তি বিনষ্ট হইতেছে—এই উপলব্ধি যখন পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিবে তখন মানব-সমাজের যে উন্নতি হইবে তাহার কল্পনা করাও বিশেষ কল্পনাকুশল ব্যক্তির পক্ষেও সম্ভব নহে।

দ্বিতীয় কারণ।

সামাজিক মঙ্গল সম্বন্ধে উচ্চতর মূলমন্ত্রের উপলব্ধি এবং অধিকতর জ্ঞান যতই বিকশিত হইতেছে, ততই তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক চমৎকার রকমের যন্ত্রাদিরও উদ্ভাবনা হইতেছে। এই সমস্ত যন্ত্রতন্ত্র প্রভাবে দেশের সহিত দেশের, অঞ্চলের সহিত অঞ্চলের সান্নিধ্য সৃষ্ট ও দূরত্ব বিনষ্ট হইতেছে, শ্রমের যোগ্যতা ও সাফল্য বৃদ্ধি পাইতেছে, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ার্থ নূতন নূতন দেশে পণ্যবীথিকা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে;—ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার প্রতিষ্ঠা আরব্ধ হইয়াছে।

তৃতীয় কারণ।

আর এক কথা; য়ুরোপীয়গণ অন্যান্য দেশ হইতে কাঁচা মাল ও খাদ্য সংগৃহীত করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছেন। তাঁহারা ইহাও বুঝিতেছেন যে পৃথিবীর অন্যান্য খণ্ডের ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধিও নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

উর্ব্বরতা বৃদ্ধি।

ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি সাধন এই সমৃদ্ধিবৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ। অধিকাংশ লোক যাহা সঞ্চয় করিয়া রাখে তাহা ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার ও উন্নতির ফলে তাহার অধিকাংশ সাধারণের উন্নতিসাধক কার্য্যে নিয়োজিত হইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে মিতব্যয়ী লোকেরা যাহা সঞ্চয় করিত,—তাহা দ্বারা সময়ে অসময়ে তাহাদিগেরই প্রয়োজন সাধিত হইত। এখন ব্যাঙ্কের প্রসাদাৎ তাহা সাধারণের হিত-সাধক কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে।

ব্যাঙ্কের প্রভাব।

শিক্ষার বিস্তারও সামাজিক উন্নতির অন্যতম কারণ। ইংলণ্ড ও ম্যার্কিণের ধন বৃদ্ধির হিসাব দেখাইয়া বক্তা বলিয়াছেন পৃথিবীতে যত নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবিত ও নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইবে, ততই লোক-বৃদ্ধির হিসাবে অধিকতর ধন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। বক্তার এই সিদ্ধান্তে মতদ্বৈধ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।
